তৃতীয় অধ্যায়ঃ

ক) অগ্রণী কবিদের আলোচনাঃ

ঃ সমর সেনের কবিতা

ঃ বিষ্ণু দে-র কবিতা

ঃ সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের কবিতা

ঃ সুকান্ত ভট্টাচার্যের কবিতা

খ) প্রগতি সাহিত্য আন্দোলন ও সমকালীন কয়েকজন কবি

সমর সেনের কবিতা

(জন্ম: ১৯১৬ খ্রীষ্টাব্দ)

'Today all bourgeois culture struggles in the throes of its final crisis. The contradictions whose tension first drove on the development of society's productive forces are now wrecking them and a new system of social relations is already emerging from the womb of the old — that of communism. Communism is not an ideal, it is the inevitable solution of the ripening contradictions in capitalism.'

— Christopher Candwell

'The Future Of Poetry,' Illusion And Reality, People's Publishing House, New Delhi, Reprinted, 1981, pp. 286-7.

ভূমিকা ও শিল্পতত্ত্ব :

প্রগতি সাহিত্য আন্দোলনে প্রত্যক্ষ যুক্ত না থেকেও যিনি সর্বাধিক সমালোচিত ও বিশ্লেষিত, সেই ব্যক্তি এবং ব্যক্তিত্বের অপর নামই সম্ভবত সমর সেন। তাঁর সম্পর্কে এ-মন্তব্য একেবারেই অপরিহার্য সত্য নয় যে, তিনি এই সাহিত্য আন্দোলনের একটি বিশিষ্ট ফলশ্রুতি, যেমন সুকান্ত আর সুভাষ সম্পর্কে এ কথা নিঃসংশয়িতভাবে অপরিহার্য। তিরিশের প্রথম থেকে সমর সেনের কবিতা রচনার সূত্রপাত। যুক্ত ছিলেন বুদ্ধদেব বসু-সম্পাদিত 'কবিতা'-পত্রিকার সঙ্গে। ৩০, ৯, ১৯৩৪ খ্রীষ্টাব্দে রবীন্দ্রনাথকে লেখা একটি চিঠিতে বুদ্ধদেব রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলেন, 'একজন কবির রচনা আমরাই প্রথম প্রকাশ করলাম---সমর সেন। ওঁর ছোট ছোট কবিতাগুলো আমার নিজের খুব ভালো লেগেছে। ওঁর বয়েস

অল্প, সাহিত্যক্ষেত্রে ইনি এখন পর্যন্ত অপরিচিত---কিন্তু ওঁর রচনায় এমন একটি বিশেষ স্বকীয়তা আছে যাতে ওঁর সম্বন্ধে খুব আশা পোষণ করতে বাধে না।'[১] উত্তরে কবিও সমর সেনের প্রতি গভীর আস্থার ভাব নিয়ে বলেন, 'সমর সেনের কবিতা কয়টিতে বুদ্ধির ভিতর দিয়ে ভাবের লাবণ্য প্রকাশ পেয়েছে। সাহিত্যে ওঁর লেখা টাঁকসই হবে বলেই বোধ হচ্ছে।'[২] এ আলোচনা আরও খানিকটা এগোয়, বুদ্ধদেব বসু বলেন, 'সমর সেনের কবিতা আপনার ভালো লেগেছে জেনে বিশেষ কারণে খুশি হলাম। ওঁর বয়েস অল্প, লিখেছেন অল্পদিন ধরে, কিন্তু ওঁর কবিতা প্রথম দেখেই আমার মনে হয়েছিলো বাংলা গদ্যছন্দে সম্পূর্ণ নতুন একটি সুর ইনি ধরেছেন। তাছাড়া, যেটা প্রকৃত কাব্য-বস্তু, তারও অভাব নেই।'[৩] সমর সেন প্রথম আবির্ভাবে এভাবেই জেনে নিতে থাকেন অগ্রজদের অকৃত্রিম আন্তরিক সোৎসাহ সমর্থন। তাঁর আবির্ভাবে গদ্য-কবিতার যে যুগান্তর সাধিত হল তাকে বুদ্ধদেব বসু 'অবাধ-মুক্তি'র সঙ্গে মিলিয়ে দেখেছেন। আধুনিক কবিতার ক্ষেত্রে এই ধারা-প্রবর্তনার ক্ষেত্রে সমর সেনের কৃতিত্বকে মেনে নিয়েছেন সুধী কাব্যরসিকগণ।

কিন্তু এ তো গেল হয়ত-বা একটি বিশিষ্ট গঠন-সৌষ্ঠবের কথা, অন্ততই যাকে মনে হতে পারে বহিরঙ্গিক ব্যাপার। সমর সেন যে কবিতার কেবল শরীরে-অবয়বে নয়, বরং তার আত্মা-চারিত্র্যেও সঞ্চার করতে পেরেছেন নতুন কালের নতুন যুগের নতুন মননক্রিয়া, সমকালের পারিপার্শ্বিক আবহ থেকে তুলে আনা জীবন্ত প্রতিচ্ছবি ও তার প্রতিভাস, এ কথা ভুললে চলবে না। কেননা, প্রগতি সাহিত্য আন্দোলনে মননক্রিয়ার একটি দিক, সচেতন বুদ্ধিবাদের একটি দিক সংশ্লিষ্ট মানবিক-আবেগের সঙ্গে জড়িত হয়ে প্রকাশ পেতে চেয়েছে। সফল নভেম্বর বিপ্লবের পর এদেশেও ক্রমে সাম্যবাদী চিন্তা-ভাবনা লেখক-শিল্পী-বুদ্ধিজীবিদের আলোচনায় প্রশ্রয় পেতে থাকে। বিশেষত কল্লোলোত্তর কালে এর প্রাধান্য স্বীকৃত হয়। তিরিশের প্রথম থেকেই সাম্যবাদের চিন্তা-চেতনা ও বিষয়গত বিবিধ উপাদানসমূহ কৌতূহলের বিষয় হয়ে ওঠে কবি সমর সেনেরও। কৌতূহলের ক্ষেত্রে বিষয় আর বিষয়ীর মানসিক ব্যবধান প্রায়শ লক্ষণীয়। কিন্তু এমন-কিছু উপাদান-উপকরণ-বিষয়, যার সঙ্গে বিষয়ীরও রয়ে গেছে একরকমের আত্মিক সম্বন্ধ, সে ক্ষেত্রে সমস্ত বিষয়ের গুণগত মাত্রা স্বতন্ত্র স্বাদবহ হয়ে ওঠে। এই আত্মপ্রাধান্যের স্বীকৃতি কৌতূহলময়তার জন্ম দিতে পারত, তার বদলে তা কবির অনুসন্ধানের দৃষ্টি খুলে ধরেছে। নগর কলকাতার মধ্যবিত্ত সমাজ ও মধ্যবিত্ত জীবন-পরিধির বৃত্তে সমর সেন তাঁর ক্ষেত্র-সমীক্ষণের কাজটি অত্যন্ত সীমায়িত করে রেখেছেন। প্রগতি সাহিত্য আন্দোলন ঘনীভূত হয়ে ওঠার আগে সমর সেন হয়ত ভেবেছিলেন, সাহিত্যের সীমিত সামর্থে ক্ষেত্র-সমীক্ষণ যতটা সহজ, ততটা সহজ নয় সমস্ত সমাজকে বদলানোর চেষ্টা, তাই প্রথম থেকেই শ্লেষ আর বিদ্রূপের তীক্ষ্ণ অস্ত্র তুলে নিয়েছিলেন যথাসম্ভব বর্তমান

ব্যবস্থার ত্রুটি-দুর্বলতা-ক্ষুদ্রতা-স্বার্থপরতা-সংস্কারসমূহের বিরুদ্ধে আঘাত হানবার প্রবণতায়। এই প্রয়াস আপাতদৃষ্টিতে জীবনের বিপরীত মনে হলেও, তিরিশের দশকের প্রথমার্ধে, এই বিপরীতমুখী জীবনেরও একটা সহজ বাস্তবতা ছিলই যা আজ অনস্বীকার্য। নন্দরানী চৌধুরীর মতে, 'সেইজন্যে সমাজ-জীবনে প্রগতির পরিপন্থী যে সব ভ্রান্ত সংস্কার বিরুদ্ধ শক্তির মত প্রবল সেগুলি সম্বন্ধে সচেতন করার জন্য সম্ভবতঃ সমর সেন একটু ভিন্নভাবেই তাঁর বিপ্লবী মতাদর্শকে কাজে লাগাতে চেয়েছিলেন। ভূমিকা নিয়েছিলেন তীক্ষ্ণ ব্যঙ্গপ্রবণ, প্রখর বুদ্ধিসম্পন্ন অথচ বাচাল বিদূষকের।'[৩] কবিকে এই ভূমিকায় দাঁড় করালে, তাঁর বক্তব্যের উৎসে আমরা সঠিকভাবে পৌঁছতে পারি।

'অরণি'[৫]তে বিষ্ণু দে-র 'পূর্বলেখ' কাব্যের রিভিয়্যু করতে গিয়ে সমর সেন কয়েকটি জরুরি কথা বলেন। আমাদের মনে হয়, কথাগুলি তাঁর নিজস্ব মতাদর্শ ও শিল্পতত্ত্বের জনপ্রকাশক।

প্রথমত, তিনি মনে করেন, কবিতা কেবল 'হৃদয়ের' ব্যাপার নয়। বুদ্ধিবৃত্তি তথা মস্তিষ্কের ওপরও তা অনেকখানি নির্ভরশীল। দ্বিতীয় দশকের শেষে বাংলা সাহিত্যে মননশীলতার (সমর সেনের ভাষায়-'কঠিন সংযম ও বুদ্ধিবৃত্তি') এই প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত হয়। দ্বিতীয়ত, এই পর্বে উদ্ভূত হয় এমন এক পরিস্থিতি যাতে করে আমাদের দেশের সাহিত্যিকরা 'বাংলা ঐশ্বর্যের' সন্ধান না করে জীবনের নৈরাজ্যে ফিরে যান। এই নৈরাজ্য থেকে মুক্তির পথ প্রদর্শন করে 'বামপন্থী ভাবধারা'। তৃতীয়ত, তিনি বামপন্থী সমালোচনার সার্থকতা সম্পর্কে সংশয় পোষণ করেও বলেন, ...'অন্তত এটা বামপন্থীরা বোঝাতে পেরেছেন যে সঙ্কীর্ণ কেন্দ্রে আসীন হয়ে সাহিত্যচর্চা করলে সাহিত্যেরই ক্ষতি হয়।' চতুর্থত, ঐতিহ্যের সন্ধানের জন্যে তিনি পরামর্শ দেন। পঞ্চমত, ঐতিহ্যের সঙ্গে 'সাম্প্রতিক জনজীবনের সংযোগসাধনের' ওপর জোর দিয়েছেন তিনি। ষষ্ঠত, তিনি বিষ্ণু দে-র সম্পর্কে তাঁর নিরপেক্ষ দৃষ্টির যে নিরপেক্ষতা আত্মস্ফূর্তিতায় পরিণত হয় না[৬] প্রশংসা করেছেন, ফলত, আমরা সিদ্ধান্ত নিতেই পারি যে, এই দৃষ্টিভঙ্গির তিনিও উপাসক।

উপরিউক্ত সিদ্ধান্তে পৌঁছতে সমর সেনকে বাংলা সাহিত্যের পূর্ব-ঐতিহ্যের সঙ্গে পরিচিত হতে হয়েছে এবং উত্তরাধিকার-পর্বের বিশেষ প্রান্তটি সম্পর্কে অবহিত হতে হয়েছে। ভারতীয়দের মধ্যে বাঙালিই প্রথম বিদেশী ভাষার সাহায্যে নতুন শিক্ষা লাভ করে। বিদেশী এবং স্বদেশী ভাব ও আদর্শের সঙ্গে, তাঁর মতে, প্রথম সমন্বয়সাধন করেন মাইকেল মধুসূদন দত্ত। কিন্তু সেকালের শিক্ষা কুফলও কম প্রসব করে নি। এই শিক্ষা, তাঁর মতে, 'ব্যবহারে একটা নিরানন্দ, শূন্যজীবী ভাব এনেছে'। প্রতিভাবানেরা এর বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করেছেন, কিন্তু তা বলে বিদেশী ভাবধারাকে সম্পূর্ণতঃ অগ্রাহ্য করে নয়। তাঁর মতে, 'সাহিত্যের

জনযুদ্ধে বস্তুকট আন্দোলন বোধহয় চলে না।' রবীন্দ্রসাহিত্যে সেই অধিকারে হয়ে উঠেছে 'একটি জাতির কবিতা'। সমর সেন মনে করেন, পরবর্তীকালে এ ধারা উপেক্ষিত হয় 'নিকৃষ্ট লেখকদের হাতে'। পাশাপাশি দ্বিতীয় দশকের শেষ দিকে 'সংযম ও বুদ্ধিবৃত্তি'র প্রতিষ্ঠা ঘটিয়ে তোলেন একদল, যাঁদের চোখে ধরা পড়ে 'চারিদিকে অবক্ষয়ের রূপ, সমাজে সংহতির অভাব, মনের ও কর্মের জীবনে নৈরাজ্য জড়ী, পৃথিবীর অধিকাংশ দেশ থেকে সামাজিক জীবনের মূলসূত্র অন্তর্হিতপ্রায়।' এ পরিস্থিতিতে 'সাম্যবাদী হওয়া ও তরলকণ্ঠে অন্ধে স্ফূর্তি করা বিরাট প্রবঞ্চনা'। এই উপলব্ধি তাই কাব্যে আনল নৈরাশ্য ও বিদ্রূপের সুর'। সমর সেন যথার্থই বলেছেন, 'কোন সম্পূর্ণ সক্রিয় জীবনদর্শন না থাকলে এ বিদ্রোহ সস্তা সিনিসিজম্-এ শুরু ও শেষ হত।' তা হয় নি। তার বদলে ১৯৩০-এর আন্দোলনের পর 'বামপন্থী ভাবধারা' বাংলাদেশে বিস্তৃতি লাভ করে।[৬] এর ফলেই বাংলা আধুনিক কবিতার সুর ও স্বাদে প্রভূত বৈচিত্র্য ও বাস্তবতা আসে। প্রসঙ্গত স্মরণ করতে হয় আবারও যে, সাহিত্যের ইতিহাস পর্যালোচনায় এই ধারার মূল উৎসবিন্দু সম্ভবত বিষ্ণু দে-কে ঘিরেই যদিও, তথাপি এই ধারার সঙ্গে সমর সেনকেও মিলিয়ে নিতে আমাদের সংশয় নেই। আমাদের বিশ্লেষণে আরও মনে হয় যে, সমর সেনের কাব্যসাধনার সীমিত অধ্যায়ে আমরা দেখতে পাই, প্রথম পর্বে তিনি কীভাবে নৈরাশ্যের আর নৈরাজ্যের হাতের ক্রীড়নক হয়ে উঠেছিলেন এবং পরে গণ-সংগঠনের তথা গণ-সংযোগের দাবি মেনে নিয়ে গণ-আন্দোলনের একজন সহযাত্রী ও দরদী হিসেবে মার্কসবাদী-চিন্তা ও চেতনার প্রতি পক্ষপাত প্রদর্শন করেন যা তাঁরই কবি মানসের-দৃষ্টিভঙ্গির এক সুবিরোধী সিদ্ধান্ত।

তাহলেও, এ বিষয়ে সমর সেনের নিজস্ব কিছু বক্তব্যের দিকে তাকানো যেতে পারে। 'অরণি' পত্রিকার দ্বিতীয় বর্ষ, চতুর্থ সংখ্যায় (এপ্রিল, ১৯৪০) সরোজকুমার দত্তের 'গতি আধুনিক বাংলা কবিতা' শীর্ষক সমর সেন-বিরোধী প্রবন্ধের উত্তরে সমর সেন পরবর্তী সংখ্যায় (অর্থাৎ দ্বিতীয় বর্ষ, পঞ্চম সংখ্যা, মে, ১৯৪০) একটি শিরোনামযুক্ত প্রবন্ধে[৭] তাঁর কিছু মতামত উপস্থাপন করেছেন। মতগুলি সংক্ষেপে:

১) 'আমি নিজেকে 'বিপ্লবী' বলে জাহির করি নি, উপরন্তু কর্মভীরু, পলাতক, আধা-বাস্তব, আধা-রোমান্টিক ভাবেই আমার কাব্যের নায়ককে বর্ণনা এবং বিদ্রূপ করে এসেছি।'

২) 'গ্রহণ'-এর নাম কবিতায় যে টাইপের জীবন, এবং আত্মপরিত্যাগের কথা আছে সে টাইপ বিপ্লবী নয়: মুমূর্ষুশ্রেণীর প্রতীক'...

৩) ...'গণআন্দোলনে যোগদানের সম্বন্ধে আমার এই কয়েকটি কথা...:" Consciousness

or decay is certainly a power. But a critical situation arises where we find that at a certain stage this also is not enough ... ... We will reach that stage very soon, and we must make a choice if we are to continue as living writers. This involves an entire reconstruction of our ways of living. An active part in the mass-movement will certainly help that poet who has been able to preserve his integrity... He who is bent on living in a little cell, all will be dying with a little partience.'

৪) 'শক্তি থাকলে যন্ত্রতন্ত্রের অনেক পরিচয় এবং নিজস্ব বিপ্লবের কৌশল সংগ্রহ করা... সম্ভব'.... যদিও উদ্ধৃত বক্তব্যগুলি সরোজকুমার দত্তের জবানী বক্তব্য, তথাপি এর থেকে সমর সেনের সাম্যবাদী চিন্তা-চেতনার মূল প্রবৃত্তি অনুমান করা চলে। প্রথমত তিনি কৈফিয়ৎ দিয়েছেন এই বলে যে, তাঁর কবিতাগুলি 'বৈপ্লবিক গুণসম্পন্ন'(বা 'বিপ্লবী') নয়। বরং তাঁর সমধিক উৎসাহ মধ্যবিত্ত শ্রেণীর দোলাচল মনোবৃত্তিকে আঘাত করা। কেননা, এই মানসিকতা অলস, কর্মভীরু, পলাতক, আধা-বাস্তব, আধা-রোমান্টিক মানসিকতা। মনে রাখতে হবে, সমর সেন নিজেই এই শ্রেণীর প্রতিনিধি। কাজেই এই ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ তাঁর নিজেকেও। বুর্জোয়াশ্রেণীকেও তাঁর উদ্যত অস্ত্রাঘাত সইতে হয়েছে। বুর্জোয়াশ্রেণীর যা কিছু প্রগতিশীলতা তা সামাজিকক্ষেত্রে উৎপাদন-সম্পর্ক, উৎপাদন-পদ্ধতি কিংবা অধিক মুনাফার নিবিড় স্বার্থের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট। 'কমিউনিস্ট মেনিফেস্টোতে' বুর্জোয়াশ্রেণী, মধ্যশ্রেণী ও প্রলেতারিয়েতের সংজ্ঞা নির্দেশিত হয়েছে সুনির্দিষ্টভাবে। সংক্ষেপে ব্যাপারটি আলোচনা করা যেতে পারে: প্রলেতারিয়েত হল মজুরি-শ্রমিকেরা, এদের হাতে উৎপাদনের উপায়সমূহ নেই। ফলে নিজেদের শ্রমশক্তি এরা বিক্রয় করতে বাধ্য হয়। এই ইস্তেহারে আরও বলা হয়েছে যে সামন্ত শিল্পব্যবস্থা কেমন করে শিল্পগুলির হাত থেকে ক্রমে হস্তশিল্পীর কারখানা হয়ে বাষ্প ও কলের যন্ত্রের দ্বারা বিপ্লবী-পরিবর্তন সংঘটিত করল এবং বৃহদাকার আধুনিক শিল্পের দিগন্ত খুলে গেল। হস্তশিল্প কারখানায় ভূমিকা নিল মধ্যশ্রেণীর আর আধুনিক ভারী শিল্পে লক্ষপতি কোটিপতির দল প্রতিনিধিত্বে আসীন হল। বিশ্বব্যাপী যোগাযোগ আর বিশ্ববাজার প্রতিষ্ঠার অদম্য আগ্রহে মধ্যযুগ থেকে আগত সমস্ত শ্রেণীকে সরিয়ে দিল আধুনিক এই বুর্জোয়া, বাড়িয়ে তুলল তার পুঁজি। বুর্জোয়াশ্রেণী দেশের বহির্মুখতাকে পরিণত করেছে বিশ্বমুখতায়,

সম্মানীয় বৃত্তিধারী লোকের মূল্য ও মাহাত্ম্য এর ফলে গেছে ঘুচে। চিকিৎসাবিদ, আইনবিদ, পুরোহিত, কবি, বিজ্ঞানী---সকলেই পরিণত হয়েছে তাদের মজুরিভোগী শ্রমজীবীরূপে। এই ইস্তেহারে স্পষ্ট করে আরও বলা হয়েছে যে এই বুর্জোয়াশ্রেণী উৎপাদনের উপকরণে অবিরাম বিপ্লবী পরিবর্তন না ঘটিয়ে উৎপাদন-সম্পর্ক ও সমাজ-সম্পর্ক উভয়ত্র বিপ্লবী পরিবর্তন না এনে টিকে থাকতে পারে না। সামন্তযুগে পদ্ধতিতে ছিল এর বিপরীত বৈশিষ্ট্য---সেখানে উৎপাদনের উপকরণে বা পদ্ধতিতে কোন পরিবর্তন আনা তো দূরের কথা, সমগ্র ব্যবস্থাটাই অপরিবর্তিত রাখার চেষ্টা ছিল। বুর্জোয়াযুগের উৎপাদন-পদ্ধতি ও উৎপাদন-সম্পর্কে বিপ্লবী পরিবর্তন আনা তো বটেই, সমস্ত সামাজিক অবস্থার অবিরাম পরিবর্তন, চিরস্থায়ী অনিশ্চয়তা ও উত্তেজনার আবহমণ্ডল তৈরি করাই এর উদ্দেশ্য, এর ব্যত্যয় হলে সে টিকে থাকতে পারে না। এর ফলভোগ করে সমাজের মধ্যশ্রেণী, নিম্নবিত্ত, মজুরশ্রেণী প্রভৃতি। বিশেষত মধ্যশ্রেণীর অবস্থা আরও সংকটজনক হয়ে ওঠে এই অনিশ্চয়তা, হতাশা বা উত্তেজনার সময়। মধ্যশ্রেণীও বুদ্ধিবাদের সর্বোচ্চ পর্যায়ে তার অবক্ষয় সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণার দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হলে সমাজের অগ্রগণ্য বিপ্লবীশ্রেণীর সঙ্গে মিলে যায়। কিন্তু এই মিলন তত্ত্বগত ধারণায় যতটা সহজ, বাস্তবে তার বিপরীত। বুর্জোয়া-প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে সম্পৃক্ত থাকার ফলে মধ্যশ্রেণী আরও বেশি করে দ্বিধান্বিত হয়। সমাজের অগ্রগণ্য বিপ্লবীশ্রেণীর সঙ্গে এই শ্রেণী তখনই মিলতে পারে না, সর্বহারাশ্রেণীর জয় সুনিশ্চিত হবার সম্ভাবনার ওপর তাদের ঐক্য নির্ভর করে।[১] সমগ্র দেশের সামনে স্পষ্টতই মার্কসের এই বিশ্লেষণ উপস্থিত ছিল বাংলাদেশের তদানীন্তন ঔপনিবেশিক পরিকাঠামোতেও। ব্রিটিশ শাসকের প্রশাসনগত সুবিধার্থে তৈরি হয়েছিল এ দেশের দেশীয় বুর্জোয়া (বেনিয়া, মুৎসুদ্দি, দালাল প্রভৃতির সঙ্গে দেশীয় রাজন্যবর্গ ও ভূস্বামী বা নতুন জমিদারসম্প্রদায়কে এই শ্রেণীর মধ্যে ধরতে হবে) শ্রেণী এবং মধ্যবিত্ত কেরানী সম্প্রদায়। বিশেষত মধ্যশ্রেণীর চরিত্রের প্রগতিশীল দিকটি হল মধ্যযুগীয় মানসিকতায় পাশ্চাত্য ইংরেজিশিক্ষা ও ইউরোপীয় সংস্কৃতির প্রভাব। ১৯০৫ খ্রীষ্টাব্দের বঙ্গভঙ্গবিরোধী আন্দোলনে এই শ্রেণীই তাদের 'অর্ধশিক্ষা, বুদ্ধিচর্চা বা যুক্তিপ্রিয়তা, স্বাধিকারলাভেচ্ছা, ভাবপ্রবণতা ও চমকপ্রদতা' নিয়ে নেতৃত্ব দিয়েছিল। এই শ্রেণীই উৎপাদন-কর বন্ধের আন্দোলনে অগ্রণী হয়, জমিদাররা দেশব্যাপী পুরনো ভূমিব্যবস্থার পুনঃপ্রতিষ্ঠার দাবি জানায়, বিদেশীর শাসনকার্যে অংশীদার হতে চেয়ে সিভিল সার্ভিসে ভারতীয় নিয়োগের দাবি জানায়, আর সেই সঙ্গে দেশপ্রেমের ভাববন্যায় ভেসে গিয়ে সন্ত্রাসবাদ তথা ভাববাদী বিপ্লবী-আন্দোলনে অংশগ্রহণ করে। পরবর্তী অবস্থা, বিনয় ঘোষের বিশ্লেষণে এইরূপ: '১৯০৫ সালের পর থেকে পঁচিশ-তিরিশ বছরের কঠিন অভিজ্ঞতা, আর্থিক ক্রম-অবনতি এবং গান্ধীজীর অসহযোগ ও

আইন অমান্য আন্দোলনের ব্যর্থতায় ক্রমে ক্রমে শুধু বিপ্লবাদর্শের নিঃসীম নীতিবাদ যেন প্রবল তা নয়, মধ্যশ্রেণীর বাস্তবক্ষেত্রেও ভাঙন ধরল। আর্থিক দুর্গতি ও সংকটের ফলে মধ্যবিত্তশ্রেণীর একটি অংশ নিচে এসে প্রায় শ্রমজীবিশ্রেণীর দৈনন্দিন জীবনের মুখোমুখি দাঁড়াল, একটি অংশ আত্মমর্যাদা সম্বন্ধে অতি-সচেতন হয়ে হলো ত্রিশঙ্কু, এবং আর একটি অংশ বিদেশীর শাসনশোষণ কার্যে আরও তৎপরতার সহিত মনোনিবেশ করল, উন্নততর স্তরে উন্নীত হবার জন্যে।'[১০] সমর সেন বারংবার এই শ্রেণীচ্যুতি বিদ্রূপ করেছেন। 'গ্রহণ'-এর নাম কবিতাই শুধু নয়, অন্যত্রও মুমূর্ষু ধনতন্ত্রের দ্রুত অবক্ষয় সম্পর্কে তীব্র সচেতনতার পরিচয় দিয়েছেন। তাঁর প্রবন্ধ 'ইন ডিফেন্স অব ডেকাডেন্স' যা ১৯৩৮ খ্রীষ্টাব্দে কলকাতায় অনুষ্ঠিত প্রগতি লেখক সংঘের দ্বিতীয় সর্বভারতীয় সম্মেলনে পঠিত হয়েছিল, তাতে গণ-আন্দোলনের প্রসঙ্গ তুলে বলেছিলেন--- 'An active part in the mass-movement will certainly help that pout who has been able to preserve his integrity.'[১১] গণ-আন্দোলনের সঙ্গে কবিদের সংযোগ যে এক বিশাল ভূমিকা গ্রহণ করতে পারে সে সম্পর্কে তিনি প্রায় নিঃসন্দিগ্ধ। শেষ অবধি অন্তত বুদ্ধিবাদের আলোকের দ্বারা তিনি গণ-আন্দোলনের তাৎপর্যকে স্বীকরণ না করলেও স্বীকার করে নেন।

আধুনিক কালে পুঁজিবাদের বিকাশের সঙ্গে শিল্পপ্রসারের সম্বন্ধ অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ। ব্রিটিশ প্রশাসন দেশীয় ক্ষেত্রে শিল্পপ্রসারের উদ্যোগ ততটুকুই নিয়েছে যা তাদের অনুকূল স্বার্থের উপযোগী। কাজেই এ অবস্থায় পুঁজির বিকাশ ইংলেন্ড কিংবা ফ্রান্সের মতন এদেশে হবার কথা নয়। হয়ও নি তা। তথাপি ১৭৯৩ খ্রীষ্টাব্দের পর এ দেশের ভূমিব্যবস্থায় যে পরিবর্তন সংঘটিত হতে থাকে, তাতে গ্রামীণ জীবনের পুরনো কাঠামোয় সুনিশ্চিত ভাঙন ধরে, অন্যদিকে নগরজীবনে শিল্পের মন্দ বিকাশের পরিণামেও মানুষের বিপর্যয় ঘনিয়ে ওঠে। এ দুয়ের ফলে যে পরিস্থিতি উদ্ভূত হয় সারা ভারতবর্ষ জুড়ে তা ছিল ঔপনিবেশিক ব্যবস্থারই একটি পরিণতি। মার্কস দেশজয়ের দরুন তিনটি ফলের কথা বলেছেন যার প্রথমটিতে দেখা যায়, বিজেতা জাতি বিজিত জাতির উপরে তার নিজস্ব উৎপাদন-ব্যবস্থা চাপিয়ে দিয়ে থাকে।[১২] আর্থ-সামাজিক ক্ষেত্রে এই ব্যবস্থার সূত্র ধরেই গড়ে উঠতে থাকে জাতি-চেতনা, ব্রিটিশবিরোধিতা, বিবিধ গণ-আন্দোলন, সংঘ গঠনের মানসিকতা, তদুপরি শ্রেণীসচেতন জনগণের ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণীস্বার্থের টানাপোড়েন। কডওয়েলের ধারণা, এই টানাপোড়েনের ভেতর থেকেই জাত হয় কমিউনিজম, এর ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে তিনি বুর্জোয়া সংস্কৃতির সমূহ অবস্থাটি বিশ্লেষণ করে বলেছেন: 'Today all bourgeois culture struggles in the throes of its final crisis. The contradictions

whose tension first drove on the development of society's productive forces are now wrecking them and a new system of social relations is already emerging from the womb of the old — that of communism. Communism is not an ideal, it is the inevitable solution, of the ripening contradictions in capitalism.'[13]

সামাজিক সংগঠনের বিভিন্ন স্তরে যে সমস্ত মৌলিক বুর্জোয়া দ্বন্দ্বগুলি রূপদান(working out)-কে সূচিত করে, সে দ্বন্দ্বের রূপগুলি সমর সেন চিনেছেন, এবং বুঝেছেন, সেই কারণে তাঁর মধ্যে একটা সচেতনতা লক্ষ্য করা যায় যা তাঁর কাব্যের ভেতরকার দ্বান্দ্বিক রূপগুলিকে অতি সহজে চিনিয়ে দেয়। তাঁর শিল্পতত্ত্বে এই সচেতনতা বস্তুতই সামাজিক-সচেতনতা হিসেবে গ্রাহ্য, এই সচেতনতাই তাঁকে দায়বদ্ধ শিল্পীর মর্যাদা দেয়। বুর্জোয়া শিল্পতত্ত্বে এই দায়কে অস্বীকার করা হয়। সব দেশেই সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ প্রাগ্রসর ভূমিকা পালন করে থাকেন সে-দেশের আলোকপ্রাপ্ত শিক্ষিত সম্প্রদায় তথা মধ্যশ্রেণীর বুদ্ধিজীবী-গণ---বুর্জোয়া প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যাদের অবিচ্ছিন্ন সংশ্লিষ্ট সম্পর্ক, মার্কসও একথা স্বীকার করেছেন। এ দেশেও তার ব্যত্যয় হয় নি। সাহিত্য-সংস্কৃতির পোষ্টা একদা আমাদের দেশেও ছিলেন রাজা-মহারাজা, বর্তমানে সে-চরিত্রের জায়গা বদল হয়েছে সামাজিক তথা রাষ্ট্রিকক্ষেত্রে বিভিন্ন সম্পর্কের মধ্য দিয়ে। এই সম্পর্কের উন্মোচন করতে গিয়ে কডওয়েল যথার্থই বলেছেন যে বুর্জোয়াশ্রেণীর হাতে কবিতা (Poetry)সামাজিক-পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে পদসান্নিধ্য থেকে সরে গিয়েছে, তাঁর নিম্নোক্ত মন্তব্যে সেই সত্যই উদ্ঘাটিত হয়েছে: '... with the Industrial Revolution all feudal survivals were finally swept away. Poetry became a commodity, the poet a producer for his wares. During the past half-century capitalism has ceased to be a progressive force; and so bourgeois culture, including poetry, is losing its vitality. Our contemporary

poetry is not the work of the ruling class — what does big business care about poetry? — but of a small and isolated section of the community, the middle-class intelligentsia, spurned by the ruling class but still hesitating to join hands with the masses of the people, the proletariat, who alone have the strength to break through the iron ring of monopoly capitalism. And so bourgeois poetry has lost touch with the underlying forces of social change.'[১৪] কাজেই, কাব্যচর্চার ক্ষেত্র হয়ে পড়ে সীমাবদ্ধ। প্রগতি সাহিত্য আন্দোলনের বিভিন্ন প্রস্তাবে, আমরা দেখেছি, এই ঝোঁকের বিরুদ্ধে তীব্র সমালোচনা করা হয়েছে। পুঁজিবাদী ব্যবস্থায় ব্যক্তিস্বাদের অত্যুগ্রতাই যে এই সীমাবদ্ধতার জন্ম দেয়, সমাজ-বিচ্ছিন্ন নিজের মুমুক্ষুতার কথা ঘোষণা করে, এটা আজকের দিনে তেমন জোরালো বিতর্কের অপেক্ষা রাখে না। তথাপি প্রাসঙ্গিক কারণেই এই আন্দোলনের শরিক ইংরেজ লেখকের বক্তব্য স্মরণ করা যেতে পারে: 'If you assert that the values of art are higher than those of society, and if in your view any constructive attitude towards the changing of the environment of society amount to a betrayal of the artistic conscience, you will be driven continually towards introspection, the springs of creativity will be frozen, the spirit that giveth life will evaporate.'[১৫]

সামাজিক দায়বদ্ধতার কথা স্পষ্টভাবেই এতে প্রকাশ পেয়েছে। সমর সেন সম্পর্কে প্রগতি সাহিত্য আন্দোলনের সঙ্গে জড়িত অনেক সদস্যই এই অভিযোগ এনেছেন যে, তিনি কেবল বিশেষ শ্রেণী-চরিত্রের সমালোচনাই করেছেন, অধিকন্তু মার্কসবাদীরা জীবনসম্পর্কে যে একটি ইতিবাচক দিক নির্দেশ করে, সে বিষয়ে তিনি নীরব। তত্ত্বগত দিক থেকে এই বিতর্কের সূচনা করেন সরোজ দত্ত, বিনয় ঘোষ, মঙ্গলাচরণ চট্টোপাধ্যায়, শান্তি বসু প্রমুখ।[১৬] আমরা আগেও বলেছি, দায়বদ্ধতার প্রশ্নে সমর সেন নিঃসন্দিগ্ধ, কিন্তু জীবনের ইতিবাচক ইঙ্গিতপ্রদানের ক্ষেত্রে তিনি সমর্থকদলের সংকীর্ণ তত্ত্ব মেনে নিতে পারেন নি বলেই কবিতার ভাষায় জানিয়েছেন: 'আমি ভেবেছি, নতুন ঘোড়া কিনব, / হাওয়ায় উড়েছে ধুলো, / মনের সামনে বসেছে মাছি, / আর আগেকার লজ্জা, ভয়, গর্ব, / আর সব বর্তিকা নিভেছে সঙ্গ, / [illegible], / নিঃশেষে কালের স্রোতে রবানী যে মাধুরী শান্তি, / তাতে হয়তো শুধু প্রভুদের অধিকার।' (নবযাত্রা-৬)। একজন সচেতন কবি হিসেবে তিনি তাঁর দায়বদ্ধতার প্রশ্নে একটি বিশেষ জায়গায় সীমাবদ্ধ থাকতে

চেয়েছেন, এবং উপলব্ধি করেছেন 'দিনশেষে কালের মেহেরবাণী' শুধু মামুলি শান্তি দেয় মাত্র, মার্কসবাদী বীক্ষায় জ্যোতিষচর্চার তথা ভবিতব্য-নির্ণয়ের সহজ পন্থা নেই। বস্তুতই তা জটিল এবং বিস্তৃত বিশ্লেষণের অপেক্ষা রাখে। বিষ্ণু দে যাকে বলেছেন 'শর্ট-কাট-রাস্তা', তা নেই। এ কথা আজ আর অস্বীকার করে লাভ নেই যে, সমর সেন তাঁর প্রথম দিককার কবিতায় মুমূর্ষু ধনতন্ত্রের অবক্ষয়ী পটভূমির বিস্তারিত রূপ পর্যবেক্ষণের প্রতিটি পর্যায়ে নৈরাশ্যবাদের একটি 'বিকৃত সুর' পরিবেশনেই মগ্ন থাকতে চেয়েছিলেন। হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়কেও তাই সঙ্গতভাবেই খানিকটা নরম সুরে এই অভিযোগ করতে শোনা গিয়েছিল: 'সমর সেনের কাছে অভিযোগ করলে অন্যায় হবে না যে তাঁর লেখায় এক এক সময় সত্যই নৈরাশ্যের একটা বিকৃত সুর বেজে ওঠে, আর তাঁর অনুরাগীদের মনে সন্দেহ হয় যে হয়তো তিনি প্রায় আড়চোখে আর্তসমাজের দিকে তাকিয়ে শুধু বহুজনের ব্যক্তিগত বিপত্তির ভিত্তিতে কাব্য রচনা করছেন, মার্কস-পন্থীর পক্ষে যা অকর্তব্য।'[১৭] হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় ঠিক এইখানে এসে দলীয় কর্মীসুলভ একটি ঔচিত্যবোধের প্রশ্ন উচ্চারণ করেছেন---'পৃথিবীকে গণশক্তিবলে ধ্বংস করার ঔচিত্য সম্বন্ধে নিশ্চিতি'র চেতনা সঞ্চার করতে পারেন কি না কবিরা, বিশেষত মার্কসবাদী চিন্তাই যাঁদের মৌল অনুধ্যান। সমর সেনের 'ডেকাডেন্ট সাহিত্যে'র বিরুদ্ধে প্রায় একইভাবে অভিযোগ করে সরোজ দত্ত বলেন, 'ধ্বংসোন্মুখ ধনতন্ত্রী সমাজ' decadent 'অতএব এ সমাজে সত্য, শিব ও সুন্দরের সাধনা অসম্ভব এবং decadent সাহিত্যই একমাত্র আন্তরিক সাহিত্য। এই আন্তরিকতার জন্য decadent হইয়াও তাঁহাদের সাহিত্যে বৈপ্লবিক শক্তিমত্তা বর্তমান।'[১৮] এর উত্তরে সমর সেন অত্যন্ত পরিষ্কার ভাষায় উত্তর দেন 'In these times of dereliction and dismay, of wars, unemployment and revolutions, the decayed side of things attracts us most... ... Perhaps that is because we have our roots deep in the demoralised petty-bourgeoisie and lack the vitality of a rising class.' এছাড়াও তিনি মনে করেন, 'Consciousness of decadence is certainly a power.'[১৯] ধনতন্ত্রের ভেতরে নিহিত যে অন্তঃসারশূন্যতা, সেই শূন্যতাকে প্রকাশ করার মধ্য দিয়ে, সর্বাঙ্গীন বিপ্লবসাধনার একটি বৃত্তসম্পূর্ণ করে তোলবার দায়িত্ব অত্যন্ত সচেতনভাবে গ্রহণ করেছেন সমর সেন, তাঁকে তাই বলতে হয়েছে, ধনতন্ত্রের গলিত অংশ নিঙড়ে বিপ্লবের কৌটা সংগ্রহের কথা, বলতে হয়েছে, '... এলিয়টের " decadence " নিঙড়ে অনেক কৌটাই আধুনিক ইংরেজ কবিরা কাজে লাগিয়েছেন।'[২০] এ প্রসঙ্গে স্বভাবতই তিনি সি. ডে. লুইস, স্পেন্ডার, ম্যাকনীস প্রমুখের নাম স্মরণ

করেছেন ও তাঁদের রচনাধারার প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। সম্ভবত এই দৃষ্টিভঙ্গির মধ্যেই সমর সেনের শিল্পতত্ত্বের অন্তর্গূঢ় মূল প্রোথিত রয়েছে বলে মনে হয়।

সমর সেনের প্রথম পর্বের কবিতা:

অভিজ্ঞ পাঠক সমর সেনের কাব্যধারায় স্পষ্টত দুটি পর্ব বা অধ্যায় লক্ষ্য করে থাকবেন। একটি পর্বে অর্থাৎ প্রথম দিকে দেখতে পাই সমর সেন নগর সভ্যতার পরিপ্রেক্ষিতে ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থায় মধ্যবিত্ত-মানসিকতার এক অসাধারণ রূপকার হিসেবে এই মানসিকতার এবং এই ব্যবস্থার যাবতীয় ত্রুটি-দুর্বলতার বিদ্রূপবর্ষণে প্রবৃত্ত। দ্বিতীয় পর্বে দেশ-কাল জুড়ে যে গণ-আন্দোলনগুলি হয়েছে, তার সঙ্গে আত্মিক সখ্যবোধে জন্ম নিয়েছে তাঁর কিছু উল্লেখ্য কবিতা। ১৯৩৪ খ্রীষ্টাব্দকে প্রথম রচনাকাল হিসেবে ধরলে, প্রথম পর্বের কবিতার পটভূমি ১৯৪০ খ্রীষ্টাব্দ অবধি প্রসারিত---'সমর সেনের কবিতা' শীর্ষক কাব্যসংকলনের প্রথম কবিতা 'নিঃশব্দতার ছন্দ' থেকে এই প্রবাহ 'শেষ সন্ধ্যা' অবধি বয়ে এসেছে এবং সমকালীন নগর সভ্যতার এক বিশেষ পটভূমি নানা শাখা-প্রশাখায় বহুবিধ উপকরণসম্ভারে আধুনিক বাংলা কবিতার একটি পরিচিত ভৌগোলিক পরিসীমার বিস্তৃতি সাধন করেছে।

পুঁজিবাদী সমাজব্যবস্থার যে কোন দেশে মেট্রোপলিটন সিটিগুলিই খুব স্বাভাবিক কারণে সবচেয়ে বেশি ঐশ্বর্যপূর্ণ হয়ে ওঠে। কলকাতা সেইরকম একটি নগরী, তদুপরি তা ব্রিটিশ-ভারতের রাজধানী-শহর। এই মহানগরী কলকাতার মানচিত্রের মধ্যেই পাওয়া যায় শ্রেণী-বিভক্ত ভারতবর্ষের খণ্ড অথচ এক অখণ্ডিত রূপ---উচ্চতম ধনী থেকে নিম্নতর শ্রেণী, এমন কি সর্বহারা (মার্কসকথিত 'প্রলেতারিয়েত' বলছি না, একেবারে আক্ষরিক অর্থেই শব্দটি গ্রহণীয়) মানুষের এক অনিবার্য উপস্থিতি। ব্রিটিশ-ভারতের শহর আর গ্রামের মধ্যে, জীবন-যাপনের পদ্ধতির মধ্যে, তার চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য আর বৈচিত্র্যের মধ্যে যে বিশাল ব্যবধান গড়ে উঠেছে তার মূলে আছে বুর্জোয়া-উৎপাদন পদ্ধতির বিপ্লবী-ব্যবস্থা। নগর-পরিকল্পনার মধ্যে মার্কস লক্ষ্য করেছেন বেশ কয়েকটি বৈশিষ্ট্য: 'The greatest division of material and mental labour is the separation of town and country. The antagonism between town and country begins with the transition from barbarism to civilisation, from tribe to State, from locality to nation, and runs through the whole history of civilisation to

the present day' ... তাঁর অর্থনৈতিক বিশ্লেষণে বিষয়টি আরও স্পষ্ট হয়েছে : 'The existence of the town implies, at the same time, the necessity of administration, police, taxes, etc., in short, of the municipality, and thus of politics in general. Here first became manifest the division of the population into two great classes, which is directly based on the division of labour and on the instruments of production. The town already is in actual fact the concentration of the population, of the instruments of production, of capital, of pleasures, of needs, while the country demonstrates just the opposite fact, isolation and separation. The antagonism between town and country can only exist within the framework of private property. It is the most crass expression of the subjection of the individual under the division of labour, under a definite activity forced upon him —— a subjection which makes one man into a restricted town-animal, the other into a restricted country-animal, and daily creates anew the conflict between their interests.'[২১]

মার্কসের কথাগুলি মনে রাখলে সমর সেনের মহানগরীকে বুঝতে খানিকটা সুবিধে হবে। সমর সেন নগরীর এই পটভূমিকে সামনে রেখে তাঁর কবিতায় বেশ কিছু ছবি উপহার দিয়েছেন, যার কাব্যের রচনায়, বিশেষ করে কবিতায়, মহানগরীর চিত্র একটা গুরুত্ব পেয়েছে বলে মনে হয় না। কল-কারখানা-ধোঁয়া-ভিড়-বাস-ট্রাম-নদী-মিছরিদানা রাস্তা-পান্থশালা-গর্দভ-ট্রেন-রিকশা-টিনে গণিকা--সাইকেলে-ফেরা কেরানী-ক্লান্ত বেশ্যাজীবী-মাতাল-লম্পট-দেঁতো-পুলিশ-বেকার কুকুর-গ্যাসের আলো-ট্রেন গোলাপসহ সমস্ত কলকাতা সমর সেনের অস্তিত্বকে বারবার বিপন্ন করে তুলেছে তার আধুনিক সর্বনাশের বীভৎস রূপ নিয়ে। গ্রামীণ জীবনের ফিউডাল কাঠামোয় যে শান্ত নিস্তরঙ্গ মুহূর্ত, নগরজীবনে তার বৈপরীত্য প্রায় অবিকল। ফিউডাল যুগের মূল্যবোধগুলির ওপর আঘাতের মত নেমে আসে বুর্জোয়া যুগের মূল্যমান, টাকার দখলের বেপরোয়া প্রতিযোগিতা একপাশে সরিয়ে দেয় মানুষের সনাতন ভাবাবেগগুলিকে আর তার জায়গায় উঠে আসে 'ফাঁপা মানুষ' তার অস্তিত্বহীনতা নিয়ে। কোলাহলমুখর বাস্তবতায় নিঃসঙ্গ নির্ভর সভ্যতা কলকাতার প্রতীক

বুর্জোয়া-সিস্টেমের সমস্ত দুর্বলতা-ত্রুটি-বিচ্যুতিকে এক নিখুঁত চিত্ররূপ দান করেছে, তুলে ধরেছে মানুষের মানসিক-পীড়নের সেইসব নিষ্ঠুর দৃশ্যাবলীও, যন্ত্রের কর্কশ সুরে মুমূর্ষু ধনতন্ত্রের তাণ্ডব হয়ে উঠেছে আরও স্পষ্ট, আরও তাৎপর্যপূর্ণ। কয়েকটি দৃষ্টান্ত অনুসরণ করা যেতে পারেঃ

১। 'ঘনায়মান অন্ধকারে
করুণ আর্তনাদে আমাকে সহসা অতিক্রম করল
দীর্ঘ, দ্রুত যান---
বিদ্যুতের মতো,

(একটি রাতের সুর)

২। মোটরের হাওয়ায় ধূলি হয়ে এল পরেঃ
সমস্ত পশ্চিম আকাশ যেন ইন্দ্রজিতের কুন্তল,
আর দূরে পাহাড়ের অস্পষ্ট শিখরে
চাঁদের অদ্ভুতরেখা।'

(তিনটি কবিতা---'রক্তকরবী')

৩। 'কলের ছুটি হল,
কিন্তু এই মন্থর ক্লান্ত বিকেলে বাড়ি ফিরে কি হবে ?

...   .

তার চেয়ে ভালো
কাছাকাছি কোনো বন্ধুর আড্ডা, কোনো হস্টেল,
সেখানে উত্তেজনাহীন অশ্লীলতায়
কাটুক একটি সন্ধ্যা।'

(বস্তু--১)

৪। 'আকাশে ধোঁয়ার ক্লেশ, চারিদিকে ধোঁয়ার গন্ধ,
আর হাওয়ায় অসংখ্য ধুলোর কণা
জীবন্ত বীজাণুর মতো।'

(বস্তু--৩)

৫। কিন্তু সাইকেলে-ফেরা কেরানীর ক্লান্তিতে
দিনের পর দিন
ঘড়ির কাঁটায় মরুর মুহূর্তগুলি মরে,
ডাস্টবিনের সামনে
মরা কুকুরের বুকের যন্ত্রণায়
সময় এখানে কাটে,

(চার-অধ্যায়--৪)

৬। 'কত উৎসুক চোখে অশ্লীল, নাগরিক আনন্দ/পিচের পথে
অগণিত মানুষের ক্লান্ত পদক্ষেপ'

(মৃত্যু--২)

৭। 'রাত্রির শেষে
রাস্তার ধুলোকে চূর্ণ-বিচূর্ণ ক'রে
ধাবমান মোটরের উদ্দাম বেগ,
চারিদিকে ক্রিচিং শাউটারের তীক্ষ্ণ শব্দ।'

(মৃত্যু--৩)

৮। 'আর এখনো আকাশের মরুভূমিতে
নিঃসঙ্গ পশুর মতো রাত্রি আসে,
ট্রামহীন শেষ হলে, শেষ হলে ধূসর শহর।'

(স্বর্গ হতে বিদায়--১)

মহানগরীর বর্ণনায় সমর সেন যেন এক ক্লান্ত বিদূষক। তাঁর সভায়-সজ্জায় কলকাতা হানা দিতে থাকে এক চরম ট্র্যাজিক-বেদনায়, উৎসাহ অথবা উল্লাসের আধিক্য তাতে নেই, বরং এক রূঢ় নিষ্ঠুরতায় প্রায় নির্বিকার বিজ্ঞানময় দৃষ্টিতে একের পর এক উদ্ঘাটন করতে থাকেন কলকাতার মেদ-মজ্জা-কঙ্কালের সম্পূর্ণ শারীরিকতা। বুর্জোয়া উৎপাদন-পদ্ধতির ভেতরেই রয়েছে কেন্দ্রীকরণের বিশেষ ঝোঁক, সমস্ত কিছুকে একই সঙ্গে পেতে চাওয়ার আকাঙ্ক্ষা,---নগরভিত্তিক পরিকল্পনাগুলির মধ্যে তাই কিছু সুবিধাবাদী ঝোঁক গোড়া থেকেই তৈরি হয়ে যায় বিশেষ বিশেষ শ্রেণীর জন্যে। তাছাড়া 'মার্কেন্টাইল বিজনেস-সেক্টর' হিসেবে তার প্রধান মর্যাদা গ্রামজীবনের চাইতে অনেক অনেক বেশি। আমাদের এ কথাও অবিদিত নয় যে, বুর্জোয়া শ্রেণী যেখানেই প্রাধান্য পায় সেখানেই সমস্ত সামন্ততান্ত্রিক, পিতৃতান্ত্রিক ও প্রকৃতিশোভন (Idyllic)সম্পর্কগুলি শেষ করে দেয়, মানুষের সঙ্গে মানুষের অনাবৃত স্বার্থের বন্ধন ছাড়া, নির্বিকার 'নগদ বিদায়ের'(Cash payment)বন্ধন ছাড়া আর তারা কিছুই বাকি রাখে না। সামন্ততান্ত্রিক ব্যবস্থায় নদী-বন্দরকেন্দ্রিক নগর-গঠন পত্তনের ব্যবস্থা, পুঁজিবাদী-কাঠামোয় এসে অভ্যন্তরীণ ও বহির্বাণিজ্য ও প্রশাসনগত সুবিধাগুলিকে 'মেট্রোপলিটানাইজড' করবার প্রয়াস দেখা যায় অল্প সংখ্যক কয়েকটি নগরে। ফলত এই ধরনের নগর বা মহানগর লাভ করে একটি 'কসমোপলিটান-চারিত্র্য'(Character of Cosmopolitan)বা বৈশ্বিক-চারিত্র্য। সমর সেন তাঁর অভিজ্ঞতা সংগ্রহ করেন এই অর্থ-ব্যবস্থার বাইরে থেকে নয়, বুর্জোয়া সমাজের মৌলিক দ্বন্দ্বগুলির একেবারে ভেতর থেকেই, তাঁর সৃষ্টি-উপকরণ তাই এত জীবন্ত, এত প্রত্যক্ষ।

১৯৩০খ্রীষ্টাব্দের পরবর্তী সময়গুলি বিশ্বজোড়া অর্থনৈতিক-সংকট, পুঁজিবাদী ও সাম্রাজ্যবাদী রাষ্ট্রগুলির পরস্পর প্রতিযোগিতা, যুদ্ধের উন্মাদনা, অভ্যন্তরীণ রাজনৈতিক-বিরোধ ও বিদ্বেষের সংকট-কাল। এই

কলকাতার পরিমণ্ডলে সেই উত্তপ্ত আবহাওয়া, সেই অস্থিরতা বিদ্যমান ছিল, সমর সেন এর থেকে বিচ্ছিন্ন থাকতে পারেন নি। তাঁর চোখে ধরা পড়েছিল এই শহরের সামূহিক বিকৃতির উপাদানগুলি: 'হে শহর হে ধূসর শহর।/কালিঘাট ব্রিজের উপরে কখনো কি শুনতে পাও/লম্পটের পদধ্বনি/কালের যাত্রার ধ্বনি শুনিতে কি পাও/হে শহর হে ধূসর শহর।/রুদ্ধ লোকের ভিড়ে যখন তুমি নাচো/মদ টাকায় কেনা কয়েক প্রহরের হে উর্বশী,/তখন শাড়ির আর দাড়ির উল্লাসে,/মধুকের শুক্রের বুকে চিত্ত বাষ্পহারা/নাচে রক্তধারা/আর দিগন্তে জ্বলন্ত চাঁদ ওঠে/হে শহর হে ধূসর শহর।'(স্বর্গ হতে বিদায়--৩)। সারা কলকাতাজুড়ে অতঃপর অন্ধকার ঘনায়, সমর সেন এই অন্ধকারের ভেতর দিয়ে দেখতে পান বিপর্যস্ত মূল্যবোধ, নৈতিক অবক্ষয়, ধনতন্ত্রের নাভিশ্বাস। অন্ধকারই হয়ে ওঠে মহানগরীর মূল পটভূমি। 'আলকাতরার মতো রাত্রি' জড়িয়ে থাকে কলকাতাকে। সমস্ত দিন এখানে শোনা যায় রোলারের শব্দ, রাস্তাগুলিকে মনে হয় 'সোনালি সাপের মতো'। গঙ্গার তীরে তীরে পাটের কলের ওপরে আকাশকে মনে হয় 'পাথরের মতো কঠিন'। কখনও কলকাতাকে মনে হয় 'ইঁটের অরণ্য'। একদা রবীন্দ্রনাথও নগরীকে দেখেছিলেন এইভাবে: 'ইঁটের 'পরে ইঁট/মাঝে মানুষ-কীট'। সমর সেনের মহানগরী জুড়ে 'লাল শাড়ি আর নরম বুক, আর টেরিকাটা মসৃণ মানুষ', 'হাওয়ায় কত লোভজ ফুলের গন্ধ', কখনও বসন্তের অবকাশে স্কুল আর কলেজ শেষ হলে 'হ্রাইড স্ট্রিট জনহীন', 'দশটা-পাঁচটার দীর্ঘশ্বাস' থেমে যায়, কখনও 'কলেরা আর কলের বাঁশি আর ম্যালেরিয়া আর বসন্ত/বন্যা আর দুর্ভিক্ষ' নিয়ে বিভূষিত হতে থাকে কলকাতা, আবার কোন এক 'সকালে কলকাতায়/ক্লান্ত গণিকারা কোলাহল করে,/খিদিরপুর ডকে রাত্রে জাহাজের শব্দ' শোনা যায়, সকালে ঘুম ভেঙে গেলে কখনও কলকাতাকে মনে হয় 'বণিক সভ্যতার শূন্য মরুভূমি'র মত। অতীতের কোন নগরীর তুলনা আসে মনে: 'কোনো নগরে একদিন ছিল/চারদিকে মেখলার মতো শালবনের অন্ধকার,/পাহাড়ের মতো শ্বেতবর্ণ প্রাসাদ, সুমধুরা প্রেম'; কিন্তু বর্তমান নগরে: 'আর আজো আছে/কাঁচা ডিম খেয়ে প্রতিদিন দুপুরে ঘুম,/স্ফীতোদর দাম্ভিক স্বামীর পিছনে গর্ভবতী সতী সাবিত্রী,/আর বন্যার মতো পুত্রকন্যা'। (ঘরে বাইরে)। দুটি শহর দুটি ভিন্ন মেরুর উপস্থিতিসহ তাঁর চেতনায় হানা দেয় বলেই তিনি শুনতে পান মহানগরীর বুকে ধ্বংসের গান---'ধূসর বালুর উপরে/কর্কশ কাকেরা করে ধ্বংসের গান।' "জনহীন চৌরঙ্গিতে' তাঁর শুধু চোখে পড়ে 'পাথরের মূর্তি'। 'বসন্তের কার্জন পার্কে' স্তব্ধ বসে থাকে 'বঙ্গদেশ নায়কের দল'(সন্ধ্যা ও প্রভাত), 'গম্ভীর শব্দে শহরের উপরে আকাশ কাঁপে'(অখ্যাত নায়ক), এখানে তাই 'সোফারলেস ঐশ্বর্যের মূর্ধ চূড়ায় ওঠার দুঃস্বপ্ন' আর দিন কাটে 'মধ্যযুগীয় কামার্ত প্রার্থনায়'(একটি বুদ্ধিজীবী),

গ্যাসের আলোকে মনে হয় 'দুঃস্বপ্নে কোটরহীন চোখের মতো গ্যাসের আলো জ্বলে', এ নগর 'অন্ধকারবর্ণ কুয়াশায়' ছেয়ে যায়, নাগরিক যন্ত্রণায় অংশভাক কবি মাঝে মাঝে কলকাতার প্রকৃতিতে মনোনিবেশ করেন: 'জেটি গিয়াছে ওপারে, হাওড়ার পোল তোলা, / বসে থাকি বিষণ্ণ মুখে', (বকধার্মিক)। শহরে 'কালসন্ধ্যা' ঘনিয়ে ওঠে---'রাস্তায় হাসির গররায় ঘোরে মুখোড় ইয়ারের দল, / রেস্তহীন পুলিশের, সৈন্যের, মাতাল, / ... ...আবার ব্রাহ্মমুহূর্তে 'চিৎপুরের বারান্দায় কোকিল ডাকে', 'হাই তোলে বেকার কুকুর", 'গঙ্গাতীরে নিরানন্দ নারীমন জাগে', (ঐ)। তাঁর চোখ এড়িয়ে যায় নি কলকাতা করপোরেশনের বেহাল দশা: 'নালানর্দমায় দুর্গন্ধ, স্তূপীকৃত জঞ্জাল / শুনেছি বর্ষাতে করপোরেশন বেহাল / কলেরা বসন্ত প্লেগের আসন্ন উৎসব'। (ব্রহ্মচারী)। এ শহরে কেবল 'অন্ধকার গায়ে হাতছানি দেয়' এমন নয়, আমরা দেখব, পরবর্তীতে এই শহর 'অতীতপাপের পুনরাবৃত্তি' রচনার মোহসংকট কাটিয়ে উঠবে। কিন্তু ১৯৪০ খ্রীষ্টাব্দ অবধি এই প্রত্যাশাকে ঘনিষ্ঠভাবে সমর সেন লালন করতে পারেন নি। বরং মহানগরীর ক্ষত-পুঁজ-গ্লানি-কদর্যতা-বীভৎসতা তাঁর দৃষ্টিতে বাস্তব ও জীবন্ত রূপেই প্রতিভাসিত হয়েছে বারবার। মনে রাখতে হয়, যে-সমস্ত খুঁটিনাটি দৃশ্য বা উপকরণসম্ভারে গড়ে ওঠে একটি উপন্যাসের ডিটেলিং-এর কাজ, সেই কাজ যখন কবিতায় এক সূক্ষ্ম কাঠিন্যে ফুটে ওঠে, তখন তার স্রষ্টাকে যথার্থ শিল্পী না বলতে পারার কোন কারণ নেই। কবিতায় এত তীব্রতায় তিক্ততায় নিপুণ কাঠিন্যে এমন ডিটেলিং-এর কাজ সমর সেন ছাড়া আর কেউ করেছেন বলে জানা নেই। বিস্তর পার্থক্য সত্ত্বেও প্রতি-তুলনা মনে আসে, গ্রামবাংলার রূপ-সন্ধানী জীবনানন্দ দাশ যেমন রূপসী বাংলার দক্ষ এবং যথার্থ রূপকার সমর সেন তেমনি নগরজীবনের, বিশেষ করে কলকাতার যথার্থ রূপকার।

সমর সেন তাঁর অভিজ্ঞতা চয়ন করেছেন ঘনিষ্ঠ জীবন থেকে। তাঁর 'বাবুবৃত্তান্তে' (১৯৭৮ খ্রীষ্টাব্দে) ব্যক্তিজীবনের কিছু কিছু তিক্ত অভিজ্ঞতার কথা বলেছেন। তাঁর পিতৃদেব একাধিক সন্তান থাকা সত্ত্বেও দ্বিতীয় দার গ্রহণ করেন। এবং বারোটি সন্তানের জনক হন। একটি যৌথ-পরিবারে এত সন্তান-সন্ততির আবির্ভাব মধ্যবিত্ত জীবনের প্রতি সমর সেনকে সহজেই বিদ্রূপপরায়ণ করে তোলে, লেখেন---'আর আছো তো আছে / কাঁচা ডিম খেয়ে প্রতিদিন দুপুরে ঘুম, / স্ফীতোদর সাত্ত্বিক স্বামীর পিছনে গর্ভবতী সতী সাবিত্রী, / আর বন্যার মতো পুত্রকন্যা, অরণ্যে রোদন, / হে ঈশ্বর, এ কী অপরূপ!' (ঘরে বাইরে)। এই মধ্যবিত্ত চরিত্রগুলো আমাদের মনে পড়ে যায় অডেনের 'আধুনিক মানুষ' (The Modern Man) সেই 'অনামা নাগরিক'কে, জনসংখ্যার ভিড়ে যার অবদানের কথা বলতে গিয়ে অডেন বড় সহজ ভঙ্গিতে ব্যঙ্গ-শীতল গলায় বলেন,

'He was married and added five children to the population,
Which our Eugenist says was the right number
for a parent of his generation'[22]

(The Unknown Citizen)

অডেন যেখানে এই তরুণ প্রশ্ন করে রেখে যান---' Was he free? Was he happy?' অথবা উত্তর যার নেতিবাচক ('The question is absurd'), সেখানে সমর সেনের প্রচ্ছন্ন বিদ্রূপ সুবিজ্ঞতার প্রয়োগে এক অসাধারণ তাৎপর্য লাভ করে, 'হে ঈশ্বর, এ কী অপরূপ !'

সমর সেন বলেছেন, 'আমার গন্ডী সীমাবদ্ধ ছিল মধ্যবিত্ত শ্রেণীতে, সে গন্ডী কখনো কাটিয়ে উঠতে পারিনি।'[23] এই বক্তব্যের স্বীকারোক্তির দৃষ্টান্ত তাঁর কবিতাগুলি। সমর সেনের মধ্যবিত্ত-চরিত্রগুলিতে সবচেয়ে যাঁকে অনুভব করা যায় তিনি হলেন এলিয়ট। প্রসঙ্গত মনে রাখতে হয় সমর সেনের মন্তব্যটি: 'আমার বেশি অনুরাগ ছিল এলিয়টের প্রতি। 'Poetry is not a turning loose of emotion' কথাটি এখনো মনে পড়ে বাংলা কবিতা পড়তে।'[24] প্রুফ্রকের সচেতন আত্ম-উদ্ঘাটনে এই চরিত্রটির মৌল রূপ ধরা---

'No! I am not Prince Hamlet, nor was meant to be ;
Am an attendant lord, one that will do
To swell a progress, start a scene or two,
Advice the prince; no doubt, an easy tool,
Deferential, glad to be of use,
Politic, cautious, and meticulous;
Full of high sentence, but a bit obtuse;
At times, indeed, almost ridiculous ---
Almost, at times, the fool.'[25]

(The Love Song of J. Alfred Prufrock)

সমর সেন যুগ-যন্ত্রণার প্রবলতাকে সঞ্চার করতে গেছে যেন এমন একটি চরিত্র, যে চরিত্র নিজের সম্পর্কে যুগ আর যুগের ইতিহাস সম্পর্কে সচেতন, কিন্তু পুঁজিবাদের মরণান্তিক অবশ্যম্ভাবী পর্যায়ের কবি শুদ্ধ-বা

এমন একটা চরিত্রের মধ্য দিয়েই প্রকাশ পেতে পারে বলে কবি মনে করেন।-

ক) 'তাই ঘরে ব'সে সর্বনাশের সমস্ত ইতিহাস
অন্ধ ধৃতরাষ্ট্রের মতো বিচলিত শুনি,
আর ব্যর্থ বিলাপের বিকারের বলিঃ
আমাদের মুক্তি নেই, আমাদের জয়াশা নেই,
তাই এ দেশের দুর্যোগে নিশ্চিত নপুংসক মন
সমস্ত ব্যর্থতার মূলে অবিরত খোঁজে
অদৃষ্টরতি উর্বশীর অভিশাপ।'

(একটি বুদ্ধিজীবী)

খ) 'আমি যার
মেদিনীর সামনে সরল কেরানী,
ফিরে যাই ঘরে, ভাবি, এখনো সময় হয় নি,
দেখি,
বিকেলের নদী নির্বিকার নীল,
ধানক্ষেতে সন্ধ্যার সবুজ জলে,
মেঘলোকে অপরূপ রঙ।

... ...

দুর্দিনের আগে কী করে জানাই,
পলায়নজীবিকা আমার,
পৃষ্ঠদেশে চিহ্ন অসংখ্য প্রহারের।'

(অজ্ঞাতবাস)

গ) 'নিজের ছায়াটির,
ছায়া যন হলে বাইরে বেরোই,
অদৃষ্ট বিরূপ হলে নিষ্ফল পুরুষকার,
মহাশূন্যে কণামাত্র স্ফুলিঙ্গ নেই,
বিচ্ছিন্ন ভাঙ্গা মেঘ মুখোমুখি, মনে হয়,
আসন্ন প্রলয়।
তবু সাহসে বুক বেঁধে, প্রায়-খালি বাসে চেপে
ময়দানে উধাও।

... ...

পলায়ন ছাড়া বেরোবার পথ জানা নেই,
চক্রব্যূহে ঢোকা কেন প্রয়োজন।
অলস চোখে তার শান্ত সমর্পণ,
কঠিন বুক দুরু দুরু কাঁপে,
অনাগত কার পদধ্বনি।

চারিদিকে বন্ধ দুয়ার, অন্ধ ঘরে একলা থাকি,
রক্তের জোয়ার হৃদয় কাঁপায়,
মুহূর্তের সমর্পণের দারুণ সাহস ছাড়া
তীব্র যন্ত্রণায় আর কিছু নেই।'

(গ্রহণ)

খ) 'একদা আমরা ছিলাম বিমর্ষ বাঁদর,
আজ আস্ফালনে মত্ত যেন বীর হনুমান।'

(আত্মসমালোচনা)

ঙ) 'যুদ্ধ, লোভী পাপ দিগ্বিজয়ী,
মহুয়ার বন মাঝে মাঝে মনে পড়ে,
দিনগুলির বুকে স্পন্দন থামে।
সাংসারিক চাপ বাড়ে, কারণে অকারণে আক্রোশ জমে,
অবশ্য বিজ্ঞাপিত সিংহ নই,
কলে বিকল ইঁদুরের সঙ্গে
সম্ভবত সাদৃশ্য আরো বেশি।'

(নানা কথা- -৪)

শেষ দুটি কবিতার উদ্ধৃতি ১৯৪০-পরবর্তী, প্রথম পর্বের প্রবণতার তুলনায় কিঞ্চিৎ ভিন্নকোণের হলেও, তবুও মধ্যবিত্ত মানসপ্রবণতাকে দেখবার প্রণালী প্রায় একইরকম। কিন্তু কেন এই প্রবণতাগুলি এমন কুট, হাস্যকর, অতি অবহিত, অতি তৎপরভাবে মধ্যবিত্ত-চরিত্রে পূর্ণ অসংগতিতে প্রকাশ পায়? মার্কসীয় অর্থনীতির তত্ত্বটি সমর সেন জানেন, আর তাই অতি অনায়াসে এর প্রকৃত রহস্য-উন্মোচনে কোথাও অস্পষ্টতা রাখেন নি: 'সমাজে মধ্যপদ ধীরে ধীরে লোপ পায়, / বণিকেরা প্রাকার বানায়, / দিনে দিনে চক্রবৃদ্ধি হারে / নিরন্ন বেকারের মজুরের ভিখিরির সংখ্যা বাড়ে, / সারি সারি রক্তমুখ সৈন্য চলে যমের দক্ষিণ দুয়ারে, / দিন হতে দিনে, মৃত্যু হতে আর এক মৃত্যুতে এ কী যাত্রা, / প্রবল মড়কে, শেষহীন নরকে তার শেষ যাত্রা।' (নববর্ষের প্রস্তাব--২)। সমর সেন এই শ্রেণীরই আত্মীয় ও ঘনিষ্ঠ প্রতিনিধি, এই ব্যবস্থার সন্তান। নিজেকে নিয়ে তাঁর অনায়াস ব্যঙ্গ--'কয়েক টাকার কয়েক প্রহরের আমার প্রেম', বলেন, 'কত মধুরাতি রভসে গোঙায়নু', কিন্তু এসবই সব নয়, এর পেছনে আছে আরও গভীরতর উদ্দেশ্য, আছে এর থেকে উত্তরণের চেষ্টা। মনে রাখতে হবে, মধ্যবিত্ত প্রবণতা বা মানসিকতাকে নিয়ে ব্যঙ্গ করবার এইসব রীতি কেবল সমর সেনই অনুসরণ করেন নি, সুভাষ, বিষ্ণু দে, সুকান্ত প্রমুখেরাও এর আশ্রয় নিয়েছেন, প্রগতি সাহিত্য আন্দোলনের শরিক কবিরা মোটামুটিভাবে কেউই এই অস্ত্রটির ব্যবহার সম্পর্কে অনীহা দেখান নি, বরং এর লোভনীয় আশ্রয়ে ও প্রশ্রয়ে সবচেয়ে বেশিই উৎসাহিত হয়েছেন।

সংশয়ে-সন্দেহে দীর্ণ মানস তার পরিচয় মুদ্রিত রাখে দৈন্যে। সমর সেন জানেন, মানসদৈন্যের এই ব্যাধি সমাজে চেপে বসে আছে পিতৃপুরুষের সামন্ততান্ত্রিক মূল্যবোধের উত্তরাধিকারসূত্রে। আধুনিক যুগ-যন্ত্রণা তাই কখনও নিঃসঙ্গতার আকারে অথবা অবক্ষয়ের আকারে নানাভাবে প্রকাশ পায়। অন্য করার, সামন্ততান্ত্রিক মূল্যবোধের ভেতরে ধর্মীয় বা আধ্যাত্মিক-চেতনা মানুষকে কখনও একাকিত্ব বা নিঃসঙ্গতায় বা প্রবলতর বেদনাবোধে পীড়িত ও পর্যুদস্ত না করে বরং ধরে রেখেছিল সুস্থ রহস্যে, কিন্তু ধনবাদের ব্যাপকতায় অচিরে মানুষ সংশয়ে সন্দেহে কেন্দ্রচ্যুত হয়ে এক মহাশূন্যের মুখোমুখি এসে দাঁড়াল। সমর সেন আধুনিক এই মানুষের যন্ত্রণাকে ব্যক্ত করতে ভোলেন নি। এ শুধু ব্যক্তির যন্ত্রণা নয়, ব্যক্তিগত নয়, বৃহত্তর সামাজিক জীবনেরই সে অংশরূপ। এলিয়ট কবিতাকে 'ব্যক্তিত্ব থেকে মুক্তি'র বাহন হিসেবে ভেবেছিলেন---এই ব্যক্তি সমাজের অন্যতম সদস্য হিসেবে এসেছে তাঁর কবিতায়। সমর সেন প্রথম পর্বের কবিতায় বিশেষত মধ্যবিত্ত ব্যক্তি-চরিত্রের প্রতি আলোকপাত করতে চেয়েছিলেন। তাঁর কাছে ব্যক্তির এই সমস্যা আর্থ-সমাজ-মন ব্যতিরিক্ত কোন বহুচারী সমস্যা নয়, অথবা নয় কোন অলীক জগতের অবাস্তব সমস্যা। এলিয়টের ব্যক্তি-চরিত্রগুলিকেও প্রথম বিশ্বযুদ্ধ-উত্তর পর্বের আর্থ-সামাজিক সংকটের ফলে অবক্ষয়-বোধে পীড়িত হতে দেখি। এলিয়টের চোখে এই আধুনিক মানুষের অন্তঃসারশূন্যতা এত বেশি প্রকট যে, এদের তিনি নামকরণ করেন 'ফাঁপা মানুষ' বলে। যখন আশা করবার, প্রত্যাশাপূরণের সমস্ত পথ অবরুদ্ধ, এক নিরুপায় অসহায়তা যখন শক্তি-মজ্জা-সত্তাকে নৈরাশ্যের অভিমুখী করে তোলে তখন তার বেঁচে থাকাটাই অর্থহীন বলেমনে হয়--সমস্ত সংসারকে তার মনে হয়--

'This is the dead land
This is cactus land
Here the Stone images
Are raised, here they receive
The supplication of a dead man's hand
Under the twinkle of a fading star.' [২৩]
(The Hollow Men)

প্রসঙ্গত এলিয়টের 'ওয়েস্ট ল্যান্ড' বা 'পোড়ো জমি'র কথাও মনে পড়বে। অনুর্বর, নিষ্ফলা জীবনের তথা সভ্যতার প্রতীকে যে যন্ত্রণা উদ্ঘাটিত হয় তাও শুধু ব্যক্তির নয়, বরং বিশ্ব-সংকটের অন্তর্গত সমস্যা। সমর সেনও তিরিশের দশকের বিশ্ব-সংকটের অন্তর্গত মানুষের অন্তরের অন্তঃসারশূন্যতাকে

ফাঁপা-মানুষের অভিব্যক্তিরূপে উপলব্ধি করেছেন---

'বহু আগাছাতে ছেয়েছে মন,
বহুদিন তো হল, আর কেন তীব্ররতি,
প্রভুহীন কুকুরের মতো আর কতকাল।
আপনচর্চায় শুধু শূন্য ফানুস ফাঁপে,'
(একটি কবিতা)

বর্তমান সভ্যতাকে তাই তাঁর মনে হয়, 'বণিক সভ্যতার শূন্য মরুভূমি', এলিয়টের 'dead land' তাঁর কাছে হয়ে ওঠে 'অদৃশ্য এ দেশের প্রেমিয়ার', দেখতে পান 'cactus land' -এর বদলে 'কুটিল ফণিমনসা গাছে', 'রূপহীন ফণিমনসায়, রুক্ষ বালুতে/প্রাণের প্রতিরোধে চঞ্চল চলে'। এই পটভূমি আরও স্পষ্টতা পায়: 'আজ শহর হতে বহুদূরে, শালবনের পথে/বালুতে প্রতিফলক দিগন্তরাজির স্তূপস্তূপ,/বিকেলে কাঁপছে রুক্ষ দিগন্তপ্লাবিত লাল সৌন্দর্য/বন্ধুর মাঠে সন্ধ্যায় শেয়াল, কোকিল ডাকে,/ ... ... 'আজ শুধু মনে হয়,/কুণ্ঠিত স্নেহাক্ত মুখের উপরে টর্চের লাল আলোর পর,/পাথর-কঠিন যুগের যন্ত্রণায়/আর পৃথিবীতে পুঞ্জীভূত শতাব্দীর স্তব্ধতার পর/সমুদ্রের শঙ্খের মতো শেষহীন বক্ষের গুরু গুরু প্রতিধ্বনি।' (কয়েকটি দিন)। এই কবিতায় এলিয়টের সঙ্গে সমর সেনের একটু ভিন্ন মেজাজের পার্থক্য এসে পড়েছে---এলিয়ট মানুষের সর্বব্যাপক যন্ত্রণা দেখেও অনায়াসে বলেন 'এবং প্রার্থনা করি ঈশ্বরের কৃপা চাই আমাদের তরে'[২৭]--আর সমর সেন 'দিগন্তপ্লাবিত লাল সৌন্দর্য' অথবা 'টর্চের লাল আলো'র সংগোপন বাসনাকে ভেতরে ভেতরে লালন করতে থাকেন। এই আরোপিত আকাঙ্ক্ষা প্রথম পর্বে খুব একটা স্পষ্ট হয় নি, পরবর্তী পর্বে শোনা যাবে আর একটু উচ্চগ্রামে। সে কথা পরে। সমর সেন সম্পর্কে এ কথা বলা যায় যে, ফাঁপা যুগের যন্ত্রণাকে সমর সেন যথার্থ কাব্যভাষা দিতে পেরেছেন। ব্যক্তিসত্তার অন্তঃসারশূন্যতা তিনি যেমন দেখিয়েছেন তেমনি ব্যক্তির অন্তহীন নৈঃসঙ্গ্যের যন্ত্রণাকেও তিনি কাব্যরূপ দিয়েছেন। সুধীন্দ্রনাথ দত্ত এই নৈঃসঙ্গ্যতাকে অনুভব করেছিলেন এইভাবে---'বিরূপ বিশ্বে মানুষ নিয়ত একাকী'। বিষ্ণু দে সাম্যবাদে আস্থাশীল হওয়ার আগে অনুভব করেন---'মানুষের অরণ্যের মাঝে আমি বিদেশী পথিক'। সমকালীন অন্যান্য কবিদের বিদ্ধ করেছে এই নৈঃসঙ্গ্যতার বোধ। জীবনানন্দও প্রবলভাবে আলোড়িত হয়েছেন। অনতি অগ্রজ বুদ্ধদেব বসু অনুভব করেন তিনি যেন 'কালের বিশাল চাকায় বদ্ধ পাখির মতো বন্দী', বলেন, 'দিন শূন্য, পচা ডোবার মতো চুপচাপ। রাত্রিও বোবা,/কিছু নেই। নেই নেই।/বৃষ্টির ধূসর কাপড়ে, বাতাসের শহরের আর্ত সুরে/সৃষ্টির মুখ ঢাকা। কিছু নেই। আমি একা। একা।'[২৮] ('বৃষ্টি আর ঝড়', নতুন পাতা)। বোঝা যায়, এক বিশেষ এই দশকের সব অগ্রজ কবিরাই নিঃসঙ্গতাবোধের শিকার হয়েছিলেন। সমর সেন এর থেকে মুক্ত নন। বলা দরকার, এর থেকে মুক্তি পান নি সাম্যবাদী হয়েও

কিংবা যথার্থ খ্রীষ্টান এলিয়ট। ১৯৩৬ খ্রীষ্টাব্দেও অডেনের মধ্যে এই যন্ত্রণার প্রকাশ দুর্লক্ষ্য ছিল না, লিখেছেন---

'All grew so fast his life was overgrown
Till he forgot what all had once been made for :
He gathered into crowds but was alone.'[২৯]

(Sonnets from China)

এলিয়ট নেমে যেতে চেয়েছিলেন নিঃসঙ্গতার আরও গভীরে---'আরো নিচে নামো, নামি নামো/ চিরন্তন নিঃসঙ্গের তিমির জগতে,/জগৎ জগৎই নয়, যে জগৎ অপ্রাকৃত/আভ্যন্তরিক অন্ধকার'[৩০]। বুর্জোয়া সমাজে মানবিক বা সামাজিক সম্পর্কগুলির মূল্য নিরূপিত হয় স্বার্থ ও সম্পত্তির ওপর ভিত্তি করে। শিল্পে যখন অবক্ষয়ের (alienation)রূপটি ধরা পড়ে, তখন শিল্পীরই আত্মকেন্দ্রীক সংবেদন হিসেবে তা আসে সামাজিক অভিজ্ঞতার সারসংগ্রহ করে। এই সমাজে প্রকৃতি, সমাজ ও সত্তা থেকে ক্রমান্বয়ে নিজেকে সরিয়ে নিতে থাকেন শিল্পীরা, দেখা দেয় নৈরাশ্যমূলক মানসিক-বিশৃঙ্খলা, দেখা দেয় আত্ম-বিচ্ছিন্নতা বা ' alienation of self , এর থেকেই সূচিত হতে পারে 'death instinct' যা ক্রমাগত ক্ষয় করে ফেলতে থাকে শিল্পীর সমগ্র সত্তাকে। মানবিক সম্পর্কগুলি যতই ক্ষীণ হতে থাকে, এই যন্ত্রণা তত বেশি গাঢ় হতে থাকে, এবং একসময় তা পরিণত হয় নেতিমূলক প্রবণতায়।

সমর সেনও এই প্রবণতার থেকে মুক্তি পান নি। 'স্মৃতিকথা' মূলক গ্রন্থ 'বাবুবৃত্তান্তে' তিনি নিজের আত্মহত্যার ঘটনার উল্লেখ করেছেন। সেই নৈরাশ্যমূলক মানসিক-বিশৃঙ্খলার পরিচয় পাওয়া যায় তাঁর গভীর নিঃসঙ্গতাবোধে। এই পরিচয় লুকিয়ে আছে তাঁর আত্মহননের প্রবণতায়, মৃত্যুচেতনায় আর শূন্যতার পীড়নবেদনায়। মধ্যবিত্তের দিবাস্বপ্নকল্পের প্রবল আততিই হয়ে উঠেছিল তাঁর প্রধানতম সুর, বিশেষ করে এই সময়। প্রগতি সাহিত্য আন্দোলন, বলা বাহুল্য নয়, প্রথম দিকে ব্যক্তিগত নৈরাশ্য ও আত্মধ্বংসবৃত্তি ('death instinct')-র এই প্রবণতাকে প্রতিরোধ করতে পারে নি, সুধী প্রধান প্রশ্ন তুলেছেন, বিষ্ণু দে'র অনূদিত এলিয়টের 'ফাঁপা মানুষ' কিংবা সমর সেনের 'একটি বেকার প্রেমিক' কেন 'প্রগতি' সংকলনে জায়গা পায়।[৩১] প্রথম দিকে সমর সেন যে এবংবিধ যন্ত্রণার দ্বারা আক্রান্ত হয়েছিলেন, এটা ঘটনা। নানাভাবে তাঁর নিঃসঙ্গতাবোধ, তজ্জনিত বেদনা সৃষ্টিশীল আবেগের উৎস খুলে দিয়েছিল, এও সত্য। তাঁর বেদনা রূপ পায় এইভাবে:

ক) 'ধূসর সন্ধ্যায় বাইরে আসি/নির্জন প্রান্তরের সুকঠিন নিঃসঙ্গতায়' ,(একটি রাত্রির সুর)।

খ) 'সাঁওতাল পরগণায় নিঃসঙ্গ স্তব্ধতা'

(ঝড়-১)

গ) আমার অন্ধকারে আমি
নির্জন দ্বীপের[৩২] মতো সুদূর, নিঃসঙ্গ'

(মুক্তি)

ঘ) 'ফাঁকা মাঠের নিঃশব্দ, গভীর রাত্রি,
আর নীড়হারা পাখির শব্দ নিঃসঙ্গ আকাশে'

(চার অধ্যায়--২)

ঙ) 'নিঃসঙ্গ বট
যেন পূর্বপুরুষের স্তব্ধ প্রেত'

(পলাতক)

সমর সেন 'নিঃসঙ্গ' শব্দটির সঙ্গে সম্ভবত আত্মীয়সূত্রে জড়িয়ে গিয়ে থাকবেন। এই শব্দের যথেচ্ছ ব্যবহার করেছেন তিনি। শব্দটির অভিধানগত অর্থকে আরও ব্যঞ্জনাপূর্ণ করে তুলেছে 'স্তব্ধতা', 'ধূসর', 'নিঃশব্দতা' বা একাকীত্ববোধক কিছু শব্দ ও অনুষঙ্গ। এই 'স্তব্ধতা' কবিকে শান্তি দেয় না, মুক্তি দেয় না। 'কেন তুমি বাইরে যাও স্তব্ধ রাতে/আমাকে একা ফেলে'---এই স্তব্ধতা একাকীত্বকে ঘনীভূত করে তোলে, মিলনের বদলে তা হয়ে ওঠে 'বিরহের স্তব্ধতা'। (নিঃশব্দতার ছন্দ)। এই স্তব্ধতা যেন এক গভীর নিঃশব্দ অন্ধকার থেকে উঠে আসে, এর থেকে জাত শুধু ব্যক্তিসত্তার প্রবল যন্ত্রণা---'হাহাকার' তারই প্রতিভাস। 'বিরহ' কবিতাতেও কবি লক্ষ্য করেন পাহাড়ের মধ্যে 'স্তব্ধ গভীরতা'। সাঁওতাল পরগনার 'স্তব্ধতা' হল নিঃসঙ্গ'। আদিম বাসভূমির স্তব্ধতা 'দূরোত্তর নির্জন পথে মোটরের কর্কশ শব্দে' দীর্ণ হয়ে যায়। (ঝড়--১)। এই স্তব্ধতা থেকে বেরিয়ে আসার জন্যে কবি শুধু নিজেকেই আহ্বান জানান: 'তোমার রাত্রির এই ক্লান্ত স্তব্ধতা পার হয়ে এস'। (ইতিহাস)। 'অনুদ রক্তের চাঁদ' রক্তে যখন ম্লান হয়ে আসে তখনও পৃথিবীতে স্তব্ধতা নামে---কিন্তু এই স্তব্ধতার অর্থ আরও বেশি বেদনাময়, স্মৃতিভারাতুরের যন্ত্রণায় ভারাক্রান্ত। (বিস্মৃতি)। 'বসন্তের কার্জন পার্কে/বর্ষার সিক্ত পশুর মতো স্তব্ধ ব'সে/বক্তৃমেঘ নায়কের দল'---এই স্তব্ধতার ভেতর দিয়ে আবিষ্ট হয়ে ওঠে বুর্জোয়া-লিপ্সুটদের গলিত বিকৃত দিক। নিঃসঙ্গ বটগাছকে কবির মনে হয়েছে 'স্তব্ধ' প্রেতের মত। (পলাতক)। উদ্‌ভ্রান্ত কবিপ্রাণ তাই খুঁজে ফিরেছে 'তিব্বতী স্তব্ধতা'কে'। 'নিঃশব্দতা' শব্দটি একই শক্তিবোধক শব্দ। 'ধূসর' শব্দের প্রতিও কবির প্রবল আগ্রহ। এই শব্দটির প্রতি আর এক আধুনিক কবি জীবনানন্দেরও আগ্রহ লক্ষ্য করবার: 'সব রাঙা কামনার শিয়রে যে দেয়ালের মত এসে জাগে/ধূসর মৃত্যুর মুখ।'[৩৩] (মৃত্যুর আগে)। এই কবিকেও আমরা তিরিশের ও চল্লিশের প্রবল সঙ্কটে অত্যন্ত পীড়িত হতে দেখি। তবে তাঁর বিশেষ মনোভঙ্গিতে কিয়ের্কগার্ড-

প্রমুখ অস্তিত্ববাদীর(Existentialist)প্রাণপণে টিকে থাকার তথা ব্যক্তির অস্তিত্ব সংকটের প্রবৃত্তি সবচেয়ে বড় হয়ে উঠেছে। কিয়ের্কগার্ড-দর্শনের যে সমস্ত লক্ষণ ইংরেজি সাহিত্যে ফুটে উঠেছে তা হল---

'particularly the awareness of a general latent anxiety, not as the product of some particular pressure of events, but as instrinsic to the human condition itself' ...ক্লেশার ব্যাপারটি আরও পরিষ্কার করেছেন----

'kierkegaard was especially aware of the burden and mystery of one's individual existence to oneself .... The most important things in life for kierkgaard was the relation of the individual soul to a transcendent God, who was in a position to judge that soul; it was from the extreme loneliness, and perhaps from the over-scrupulousness, of his own religious life that his emphasis on dread, awe, and anxiety (he has little, I am afraid, to say about jou) springs. In a sense he represents a genuine religious attitude, but a crippled one.' [৩৪]

অন্তরে অন্তরে ভয়প্রাপ্তির কথা কিয়ের্কগার্ডের দর্শনে ফুটে উঠলেও, একে কেবল ব্যক্তির ভয় বা বিবমিষা হিসেবে দেখা যে অনুচিত, অনেক সমাজতাত্ত্বিক সে-বিষয়ে আলোচনা করেছেন। সি. ডব্লিউ. মিলস, ই. এফ. কে. কেনিসটন থেকে শুরু করে একেবারে হাল আমলের আর. সি. টুকার, ড্যানিয়েল বেল, সার্ত্রে, মেলজারোস প্রমুখ অনেকেই ব্যাপারটা নিজের নিজের মত করে অনুভব করবার প্রয়াস পেয়েছেন। কেউ কেউ যেমন ব্যক্তির সত্তা-সংকটকে বড় করে দেখেছেন, তেমনি মার্কসবাদীরা এই সংকটকে একটু ভিন্নভাবে উপলব্ধির চেষ্টা করেছেন, উৎপাদন-সম্পর্ক, উৎপাদন-ব্যবস্থা, উৎপাদন-শক্তির সঙ্গে শ্রমজীবী মানুষের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধের ওপর ভর করে আছে সমস্যাটি, বলে তাঁরা মনে করেন। আদি মানব সভ্যতার প্রাক্-পর্বে প্রকৃতির ক্রোড়চ্যুত হয়েছে এই মানুষ, যন্ত্রতান্ত্রিক ব্যবস্থায় এই মানুষ হয়ে পড়েছে পুরোপুরি শ্রমবিচ্ছিন্ন, যে বস্তু সে উৎপাদন করে সেই বস্তুর সঙ্গে সেই শ্রমিকের বা মজুরের কোন সম্পর্কই থাকে না। আর্থ-সামাজিক বা আর্থ-রাজনৈতিক প্রবৃত্তির সঙ্গে সঙ্গে শ্রমজীবী মানুষের জীবনে মনস্তত্ত্বগত বিচ্ছিন্নতাও বাসা বাঁধে। প্রসঙ্গত শচীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছেন, 'শ্রমবিচ্ছিন্নতা সব

রূপের বিচ্ছিন্নতার মূল,---এই তত্ত্ব উপলব্ধির মধ্যে পরিণত মার্কস-এর মনীষীদের অঙ্কুর নিহিত রয়েছে।'[34] বস্তুত যন্ত্র-প্রতিষ্ঠান পরম্পরার ভেতরে যে সমস্ত বৈশিষ্ট্য অর্জন করে তারই ফলে বিস্তার ঘটতে থাকে বিচ্ছিন্নতার---এই প্রসঙ্গে মেসজারোসের বক্তব্য উদ্ধার করে মন্তব্য করেন যে, সমাজতন্ত্রই এই দুষ্ট বৈশিষ্ট্য দূর করতে সক্ষম। মেসজারোস বলেন,

'Human instruments are not uncontrollable under capitalism because they are instruments ... but because they are instruments — specific; reified second order mediations-of capitalism. As such they cannot possibly function except in a "reified" form; that is, they control man instead of being controlled by him. It is, therefore, not their universal characteristics of being instruments that is directly involved in alienation but their specificity of being instruments of certain type ... Precisely because they are capitalistic second order mediations — the fetish character of commodity, exchange and money; wage and labour; antagonistic competition; internal contradictions mediated by the bourgeois state; the market; the reification of culture; et. — it is necessarily inherent in their "essence" of being "mechanism of control" that they must elude human control. That is why they must be radically superseded : "the expropriators must be expropriated", "the bourgeois state must be overthrown"; antagonistic competition, commodity production, wage labour, the market, money-fetishism must be eliminated; the bourgeois hegemony of culture must be broken'[36].

কাজেই, বিচ্ছিন্নতা-বোধের প্রশ্নে সমর সেন ও জীবনানন্দের দর্শনগত, দৃষ্টিভঙ্গির কাঠামোগত এবং আদর্শগত এক প্রকার ঐক্য যে ফুটে উঠবে এ কথা বলাই বাহুল্য। সমর সেন একাধিকবার একথা ভেবেছেন যে, চিন্তায় ও কর্মে সমন্বয় না আনতে পারলে বিপ্লবী হওয়া যায় না।[37] তিনি আরও জানিয়েছেন, যীশুর বিপ্লবে তিনি বিশ্বাস করেন না।[38] বলেছেন, তাঁর কমিউনিস্ট পার্টির ওপর আস্থা নষ্ট হয় নি।[39] যদিও তিনি তাঁর নক্সালাইট সুভাষের কথা নানাভাবে আলোচনা করেছেন। আসলে

তাঁর মনের গঠনেই ছিল মধ্যবিত্তশ্রেণীর পেটি-বুর্জোয়াসুলভ চারিত্রিক-বৈশিষ্ট্য যা তাঁকে শ্রমজীবী মানুষের প্রতি দরদে ও সহানুভূতিতে বারংবার আকর্ষণ করেছে কিন্তু ব্যক্তিগত ও পারিবারিক দায় তাঁকে কমিউনিস্ট পার্টির বিপ্লবী-কার্যক্রমের অঙ্গীভূত হতে দেয় নি। এই বিশেষ আদর্শে প্রভাবিত হয়ে তিনি বুর্জোয়া সমাজের ক্ষয়িষ্ণু রূপটি সতত অনুধাবন করতে সচেষ্ট হয়েছেন, এই ব্যবস্থায় যে বিচ্ছিন্নতার মনোভাব গড়ে ওঠে তাও উপলব্ধি করতে চেষ্টা করেছেন ব্যক্তিগত যন্ত্রণা ও উক্ত ব্যবস্থার সান্নিধ্যসংশ্লিষ্ট হয়ে। সামাজিক সদস্য হিসেবে তাঁর এই যন্ত্রণা প্রকাশ পেয়েছে যা কেবল ব্যক্তিগত নয়, সমগ্র সমাজেরও সেই যন্ত্রণা---যে ধূসরতার কথা, শূন্যতার কথা কিংবা নৈঃসঙ্গ্যের কথা তাঁর কবিতায় পাই তা ঐ সামাজিক যন্ত্রণার অবিচ্ছেদ্য অংশরূপে। কিন্তু মনে রাখতে হবে, সমর সেন একজন মার্কসবাদী হিসেবে কখনও ভুলে যান নি যে, আদর্শসমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রে এই বিচ্ছিন্নতার অবসান হবে। সমাজতন্ত্রের কেন্দ্রস্থ শক্তি হল ব্যক্তি মানুষ, ব্যক্তি মানুষের বিচ্ছিন্নতা-বোধকে অবলুপ্ত করাই এই রাষ্ট্রের বহুবিধ উদ্দেশ্যের অন্যতম একটি। মার্কস শ্রেণী-অবলুপ্তির কথা বলেছেন তাঁর কমিউনিজম তত্ত্বে, শ্রম বিচ্ছিন্নতা ও শ্রেণীবিচ্ছিন্নতা যেখানে নেই, সেখানে সামাজিক উৎপাদন-ব্যবস্থা ও তৎসম্পর্কিত বুর্জোয়া-ব্যবস্থাজাত এই অবক্ষয়-বোধেরও অবসান। এই বিশ্বাস না থাকলে তিনি কখনও বলতে পারতেন না যে, 'কোন সম্পূর্ণ সক্রিয় জীবনদর্শন না থাকলে এ বিদ্রোহ সন্ধ্যা নিবিশিখর-এ শুরু ও শেষ হত।' কাজেই, সমর সেনের মধ্যে যে বিরূপতা, বিচ্ছিন্নতা ও তজ্জাত বেদনা তা পুঁজিতান্ত্রিক আর্থ-সামাজিক ব্যবস্থার প্রতিক্রিয়া হিসেবেই গণ্য, ব্যক্তির সত্তা-সংকটের প্রতিভাস নয়, সমগ্র সামাজিক-সংকটেরই তা অভিব্যক্তিরূপ।

আমরা নৈঃসঙ্গ্যের কথা আগেই বলেছি, ধূসরতা, মৃত্যুময়তা ও শূন্যতার প্রাসঙ্গিক দৃষ্টান্তে বুঝতে পারব, তাঁর এই গভীর বেদনাবোধ কতটা সামাজিক সংকটের তথা যুগ-সংকটের অন্তর্গত ছিল।

'ধূসর' শব্দের আভিধানিক অর্থ 'ঈষৎ পাংশুবর্ণ'[৪০]। সহজ স্বাভাবিকতা থেকে বিকৃতিই এর মৌল বৈশিষ্ট্য। যখন কবিকে বলতে শুনি 'ধূসর সন্ধ্যায় বাইরে আসি/ নির্জন প্রান্তরের সুকঠিন নিঃসঙ্গতায়' (একটি রাত্রের সুর), কিংবা 'অন্ধকার ধূসর, সাপের মতো মসৃণ' (ঐ), 'রাত্রে, ধূসর সমুদ্র থেকে হাহাকার আসে' (ঋতু-১), 'তোমার ধূসর জীবন হতে এস' (ইতিহাস), তখন ধূসর শব্দটি বর্ণপ্রতিভাস হিসেবে নয়, আরও গূঢ় অর্থ বহন করে আমাদের কাছে আসে। 'ধূসর জীবন'-এর বিবর্ণতা ব্যক্তি তথা একটি যুগের সামগ্রিক সংকটের প্রেক্ষিত তুলে ধরে। 'ধূসর সমুদ্র' এই সামগ্রিক সংকটের অন্যতর একটি উপাদান। 'আর আগুন লাগে জলের অন্ধকারে ধূসর ফেনায়' (মহুয়ার দেশ), ধূসর সমুদ্র এখানে এসে 'ধূসর ফেনায়'

পরিণত হয়েছে। এই ধূসরতা প্রকৃতি, জীবন ও একটি কালের একেবারে বিরোধী বর্ণ-উপাদান। 'সে শহর যে ধূসর শহর' (মৃত্যু)---সেই একই উপাদান। 'বর্ণহীন শহরে' (পরিস্থিতি) শব্দের মধ্যে ধূসরতাই ব্যঞ্জিত। শূন্যতার বোধ একইভাবে কবিকে গ্রাস করেছে। অজস্রবার 'শূন্য' শব্দের ব্যবহারে প্রকাশ পায় জীবন-বিচ্ছিন্ন এক বিশেষ অনুভবের যা কবিকে তাড়িত করে ফিরেছে বর্তমান ব্যবস্থার জটিল বন্ধনের বিরোধে। হয়ত-বা মাঝে মাঝে সংঘর্ষজনিত উত্তাপও তাতে প্রকাশ পেয়েছে, কিন্তু সুকান্ত বা সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের মধ্যে যে সংঘবদ্ধ মহতী প্রেরণা আমরা পেয়েছি, তার বিস্তার সমর সেনের মধ্যে পাই না, বরং, তিনি বিমুখ আত্মপ্রেমের অন্ধ হাতে তুলে দিয়েছেন বলে এই শূন্যতা-বোধের সংবেদনা মর্মস্পর্শী হয়ে উঠেছে আরও নিবিড়ত্ব নিয়ে। ব্যক্তিচ্যুত শূন্যের বেদনায় একধরনের নিরুপায় অসহায়তা মানুষের ট্র্যাজিডিকেও ফুটিয়ে তোলে:

ক) 'সমুদ্র শেষ হল
চাঁদের আলোয়
সময়ের শূন্য মরুভূমি জুড়ে।'
(স্বর্গ হতে বিদায়)

খ) 'তাই দিনান্তে কলের বাঁশিতে
মনে হয় পৃথিবীর শেষ প্রান্তে
করাল শূন্যের বুকে
ব্যক্তিচ্যুত শূন্য যেন কাঁদে
লুপ্ত পাহাড়, লুপ্ত বোধ,
শব্দ, গন্ধ, স্পর্শ।'
(রোমন্থন)

গ) 'একেই শূন্য। শূন্য চারিধার।'
(পরিস্থিতি)

ঘ) 'কী অতীত, কী স্মৃতি মনে জাগে,
শুধু শূন্য মাঠ, পোড়োবাড়ি, গাছের শকুন।'
(শহরে)

শূন্যতার কথা এভাবেই ব্যক্ত করেছেন সমর সেন 'ক্রিসমাস', 'অজ্ঞাতবাস', 'একটি কবিতা', 'ত্রৈবার্ষিক', 'গ্রহণ' প্রভৃতি নানান কবিতায়। 'বিশাল শূন্যে তার করতালি বাজে' (অজ্ঞাতবাস)---এ শব্দ শূন্যতাকে ভেঙে তাকে আরও সোচ্চার করেছে, শূন্যতা যে কী ভয়ঙ্কর, তারও ছবি মুদ্রিত করে দিয়েছেন কবি, 'শূন্য মাঠে কোটরহীন চোখের মতো গ্যাসের আলো জ্বলে' (ক্রিসমাস)---শূন্যমাঠের বিস্তারকে আতঙ্কের আবেগে এভাবে তুলে ধরেছেন তিনি। এই বোধ নির্জন ও একা এক ব্যক্তি-হৃদয়ের নয়, বিশিষ্ট সময়ের,

সর্বোপরি কবির সহজভাষায়: 'বণিক সভ্যতার শূন্য মরুভূমি'(একটি বেকার প্রেমিক)। বুর্জোয়া-সভ্যতার চেতনার এটি এক নিশ্চিত যান্ত্রিক পরিণাম। এই শূন্যতার মধ্যেই রয়ে যায় মূল্যহীনতা, বিচ্ছিন্ন বন্ধ্যা এক চূড়ান্ত পরিণাম, নৈরাজ্যবাদী জীবনের দিকে স্বতঃই যা কবিকে অমোঘভাবে ঠেলে দিতে থাকে। বস্তুত শূন্যাচারী এই মনোভাব শিথিল করে তোলে ব্যক্তিকে, কিন্তু সত্য কথার, সমর সেনের ক্ষেত্রে এটা অন্যতর ইঙ্গিতও দিয়েছে। তাঁর এই শূন্যাচার কবির সত্ত্ব-চেতনার ওপর প্রতিষ্ঠিত হলে আশাবাদীর আলো-উদ্ভাসন তাঁর দৃষ্টি এড়ায় নি আর্তের পরিপ্রেক্ষিতেও---'তবু জানি, কালের গলিত গর্ভ থেকে বিপ্লবের ধাত্রী/ যুগে যুগে নতুন জন্ম আনে,/তবু জানি,/জটিল অন্ধকার একদিন জীর্ণ হবে চূর্ণ হবে ভস্ম হবে/আকাশগঙ্গা আবার পৃথিবীতে নামবে।'(ঘরে বাইরে)। কিন্তু এই যে ইতিবাচক চেতনা, এটা প্রথম দিকে অত্যন্ত ক্ষীণাকারে ছিল, বরং অঙ্কুরোদ্গমের প্রাক্-পর্বে যে গর্ভ-অন্ধকার, তার কথাই সমর সেনকে বেশি করে ভাবিত করেছে। দুঃখ-কষ্ট-যন্ত্রণা-অবক্ষয়-নৈরাশ্য-ক্লান্তি-বিষণ্ণতার প্রেক্ষিতে ধনতান্ত্রিকব্যবস্থার সমূহ দুর্বলতাগুলি তাঁকে যত বেশি মুখর করে তুলেছে, আশাবাদী চেতনা ততটা প্রশ্রয় হয়ে তাঁর কবিতায় প্রকাশ পায় নি। যাই হোক, বুর্জোয়া সমাজকে যেভাবে তিনি পর্যবেক্ষণ করেছেন, তাতে তাঁর সুতীক্ষ্ণ দৃষ্টির প্রশংসা করতে হয়। নরকের বাস্তব অবয়ব নিয়ে আধুনিক বুর্জোয়া সভ্যতার গভীর অন্ধকার তাঁকে কিভাবে আলোড়িত করেছে, কয়েকটি পংক্তি উদ্ধার করলে তা দেখতে পাব:

১। 'কত সবুজ সকাল তিক্ত রাত্রির মতো'

২। 'নিঃসঙ্গ পঙ্গুর মতো রাত্রি আসে'

৩। 'মহানগরীতে এল বিবর্ণ দিন, তারপর আলকাতরার মতো রাত্রি'

৪। 'রাত্রি শুধু পাথরের উপরে রোলারের মুখর দুঃস্বপ্ন'

৫। 'রাত্রির দুষিত রক্তে বিকলাঙ্গ দিনের প্রসবে আমাদের তন্দ্রা ভাঙে'

৬। 'দিনের ভাগাড়ে নামে রাত্রির শকুন'

রাত্রি শব্দের আক্ষরিক অর্থই এখানে বড় কথা নয়, বুর্জোয়া ব্যবস্থার ত্রুটিগুলি ঘৃণা, তিক্ততা, নৈঃসঙ্গ্য, বিকৃতি, হতাশা, ক্লান্তি ইত্যাদি বোঝাতে গিয়ে এই শব্দটিকে একান্ত আশ্রয় করেছে, অন্ধকারগ্রস্ত সভ্যতা এর দ্বারা আরও অর্থপূর্ণ হয়ে উঠেছে। অন্ধকার রাত্রি শব্দেরই সমার্থক শব্দ, কবি বলেন, 'অন্ধকারে ভিজে ভিজে পৃথিবী মরে'(রোমান্স)---এ শতকের সভ্যতাকে অন্ধকারের অবয়বে দেখেছেন তিনি। তাঁর চোখে পড়েছে, দিনগুলি 'রক্তহীন মুখ' মেলে 'অন্ধকারে' চলে যায়---এ অন্ধকার তাঁর কাছে

বন্ধ্যানারীর প্রতীকে উদ্ভাসিত হয়---'নববর্ষের নাগর চলে গেল ত্রিজগতে,/বন্ধ্যা নারীর অন্ধকারে পৃথিবীকে রেখে',(কয়েকটি দিন)।কখনও উড়ন্ত পাখির প্রতীকে ভয়ের আবেগে তাঁর মনে হয়---'আজ দুরন্ত অন্ধকার ডানা নাড়ে/উড়ন্ত পাখির মতো'।(স্বর্গ হতে বিদায়)।কখনও অন্ধকারকে জান্তব বলে মনে হয় কবির:'হিংস্র পশুর মতো অন্ধকার এল।'(মুক্তি)।এমনকি যুবতী শরীরের খাঁজে খাঁজেও তিনি এই আদিম অন্ধকারকে দেখতে পেয়েছেন---'শরীরের খাঁজে নমনীয় অন্ধকার।' (নবযাত্রা)।এই অন্ধকার এই সভ্যতার প্রবল অভিশাপের মত,এক চূড়ান্ত ঘৃণায় তাই অন্ধকার হয়ে ওঠে তাঁর কাছে ঘৃণিত রক্ত-সদৃশ।বলেন,'শীতের আকাশে অন্ধকার ঝুলছে শুয়োরের চামড়ার মতো।' (মৃত্যু--১)।এইরকম প্রেক্ষিতে জীবনানন্দ দাশও শত শত শূকর-শূকরীর প্রসব-যন্ত্রণার প্রবল আর্তি-আক্রান্ত পৃথিবীতে 'অন্ধকার' দেখেছিলেন,তাঁর ঘৃণায় ফুটে উঠেছিল বমনের তীব্র আভাস,মাঝে মাঝে সমর সেনের মধ্যেও বমনের এই আভাস দেখা গেছে,জীবনানন্দের বহুপূর্বেই।এই অন্ধকার সমর সেনের কাছে আরও বীভৎস ঠেকেছে,অনেকটা র‍্যাঁবোর মতই অন্ধকারকে তাঁর নারকীয় মনে হয়েছে।ত্রিশ-চল্লিশের দশক জুড়ে দুঃখ-দারিদ্র্যই যেন এই অন্ধকারের মূল পটভূমি,বলেন, 'সমুদ্রে/অন্ধকার গলির গহ্বরে ঝিঁঝিঁ', (২২শে জুন)।অন্যত্র বলেন,'পচা অন্ধকারে/অপরূপ প্রেতের বাজার'।(আকাশ)।মনে হয়েছে,মানুষের কাছে এই অন্ধকার নিয়তির মত ভয়ঙ্কর,এর থেকে মুক্তি নেই মানুষের:'এসেছি অন্ধকার থেকে,যাত্রা শেষ হবে অন্ধকারে'।(ইতিহাস)।দিনগুলি অসহায়তায় কাতর,চারদিকে শ্মশানের গন্ধ,এই পটভূমিতে কবির উপলব্ধি---'শেষহীন শবের পাশে/আসন্ন রাত্রির পদক্ষেপে স্তব্ধ'---এও সেই অন্ধকারেরই ভয়ঙ্কর আভাস।সন্ধ্যা' শব্দও যেন অন্ধকারের সমার্থক,বর্তমান অবস্থাকে ব্যঞ্জিত করতে চেয়েছেন 'কালসন্ধ্যা'র 'কুটিললগ্ন' বলে।(একদা তোমাকে সত্য বলে জানি)।'যুবতী-সবুজ আদরে' সান্ধ্য সংগীতে সংহত বন্দিবেশে কবির চোখে পড়ে---'সন্ধ্যার অন্ধকারে অন্ধ নদীর/ মদির ক্লান্ত গান', (এবার ফিরাও মোরে)।নগরে যখন সন্ধ্যা নামে তখনকার অবস্থা: 'সন্ধ্যার সময়/রাস্তায় অনুর্বর আত্মার উচ্ছ্বাসে/মাঝে মাঝে আকাশে শুনি/হাওয়ার চাবুক,/আর হাসপাতালে শুধু অনুভব করি/ চারদিকে রক্তের নিঃশব্দ সঞ্চারণ'।(নাগরিক)।এই সন্ধ্যা রক্তের আগেকার এক আর্ত অবক্ষয়ের প্রতীকী অনুষঙ্গ হয়ে উঠেছে,এ সন্ধ্যা অন্ধকারেরই এক বিস্ফোরক রূপ,হয়ত-বা।এটা বোঝাতে গিয়ে তাই বলতে হয়---'এখানে সন্ধ্যা নামল শীতের শকুনের মতো'। (মৃত্যু)।

নষ্ট করবার,সমর সেনের আততিতে বিষণ্ণতাও হানা দিতে থাকে।এই বিষণ্ণতা সম্পূর্ণ নিঃশেষিত হয়ে যাওয়ার আগেকার আভাস,মৃত্যু-চেতনার পূর্ব সংকেত।কবি এই বিষণ্ণতাকে নিজের অন্তরেই শুধু নয়,

অনুভব করেন অন্যের চোখেও: 'মাঝে মাঝে তোমার চোখে দেখেছি/বাসনার বিষণ্ণ দুঃস্বপ্ন।'(দুঃস্বপ্ন)। এই দুঃস্বপ্নের সঙ্গে জড়িয়ে থাকে রাতের 'ক্লান্তি', 'দিগন্তের কান্না', আর এই দুঃস্বপ্নকে মনে হয় 'অন্ধকারের মতো ভারি'---সব মিলিয়ে তা 'বিষণ্ণ অন্ধকার'।(ঐ)। এই সভ্যতার সবচেয়ে অবহেলিতা নারীর হাসিতে যখন 'রাত্রির অবিশ্রাম, অশান্ত বিষণ্ণতা' দেখেন, তখন কবির আর সংশয় থাকে না পুঁজিবাদী ব্যবস্থার বিকৃতি সম্বন্ধে। কবি চমকে ওঠেন 'কঠিন অন্ধকারে অবরুদ্ধ বাতাস/দেওয়ালের উপরে বিষণ্ণ ছায়া' (চার-অধ্যায়-১) দেখে। চিত্তরঞ্জন সেবাসদনে যেসব 'উর্বর মেয়েরা' থাকে তাদের মুখেও এই বিষণ্ণতার ছায়া কবির চোখ এড়ায় না।(উর্বশী)। দূর সমুদ্র থেকে যে গান ভেসে আসে তাও এক 'বিষণ্ণ নাবিকের গান'।(মন্মথের প্রার্থনা)। বসন্তের কার্জন পার্কে যে সমস্ত বজ্রদেহ নায়কের দল বসে বসে আড্ডা দেয়, তারা 'বিগলিত বিষণ্ণতায় কুয়াশার মুখ দেখে'।(সন্ধ্যা ও প্রভাত)। নগরসভ্যতার আকাশে যখন কাঁপন লাগে, নিচের বস্তিগুলি বিবর্ণ দেখায়, অথবা ঘাসের মাঠ হয়ে ওঠে হলুদ, তখন 'বৃষ্টির দেশে' যে 'শান্ত ইন্দ্রধনু' তাও কবির চোখে 'বিষণ্ণ'।(অখ্যাত নায়ক)। নদীর ঘাটে হাওয়া খেতে এসে, কেল্লাঘাটে স্টিমার দেখতে দেখতে কেমন এক বিষণ্ণতায় ভরে ওঠে কবি-মন। (বকধার্মিক)। হয়ত-বা এই বিষণ্ণতা অথবা বিষাদের মূলে থাকে 'প্রেম ও পলিটিকস': 'প্রেম ও পলিটিক্সের বিচিত্র গতি/হৃদয় বিষাদে ভরায়।' (জনান্তিকে)। বৃদ্ধা পত্নী মারা গেলে 'সঙ্গীহীন বুড়ো ভাবে সন্ধ্যায়'---'দূর ছাই, কিছু ভালো লাগে না'। (কয়েকটি মৃত্যু)। এও একধরনের বিষণ্ণতা। যা আলোড়িত করে তোলে সত্তার এই সমাধানহীন সংকটকে। কোন এক 'জোড়া রাতে কালো ধূমে' হানা দিয়ে যায় 'বিষণ্ণ গানের কলি'। (ধূম)। বিশ্বযুদ্ধের করাল ছায়া এই বিষণ্ণতার আবহ গড়ে তোলে: 'বিষণ্ণ ঝিল্লি, কানে কানা মাছির গান।' (বঙ্গবাসিনী)। সত্তার বিষণ্ণতা এভাবেই মৃত্যু-তাড়িত করে তোলে কবিচিত্তকে। নাগরিক সভ্যতার তীব্র যান্ত্রিকতা, মধ্যবিত্তজীবনের দৈনন্দিনের গ্লানি, নাগরিক মানসের যৌনসর্বস্ব অশ্লীলতা যেন সভ্যতা ও ব্যক্তি মানুষের মৃত্যুকে ত্বরান্বিত করে তোলে। কবি বলেন, 'আমাদের মৃত্যু হবে পান্ডুর মতো।' (মৃত্যু--৫)। মহাভারতীয় পান্ডু ছিলেন অভিশপ্ত, নারী-সংসর্গই হবে তার মৃত্যুর কারণ---একথা জানা সত্ত্বেও, মাদ্রীসম্ভোগলিপ্সিত কারণে মৃত্যুবরণ করেন। একেই মনস্তত্ত্বের পরিভাষায় বলে 'ডেথ ইনস্টিংক্ট' (Death Instinct)। আত্মধ্বংসের প্রবৃত্তি বৃদ্ধিকে যখন রোধ করা সম্ভব হয় না, তখন মৃত্যু-তাড়িত মানুষের ভয়ঙ্কর বিপন্নতা সামাজিক ট্র্যাজিডিতে পরিণত হয়। আত্মহননের এই অনিবার্যতাকে ডাক্তারী পরিভাষায় বলে, 'ক্রনিক সুইসাইড' (Chronic Suicide), যা আধুনিক মানুষের জীবনের একটি নির্দিষ্ট লক্ষণ। সামনে যে জীবন পড়ে রয়েছে, যে ভবিষ্যৎ, নির্দিষ্ট

এই বন্ধনটি সেখানে কোন আশার সঞ্চার করতে পারে না: 'আরো দুরন্ত সমুদ্রের মতো আকাশে/ চাঁদ ওঠে, /আরো আসবে /মৃত্যুর মতো মন্থর জীবন।'(স্বর্গ হতে বিদায়)। কবির কামনা, যেদিন পৃথিবীতে পুরুষের জন্ম হয়, সেই দিনটি লুপ্ত হোক---কারণ ? যে যৌনতা ব্যভিচারের আকারের পৃথিবীতে ছড়িয়েছে তাতে কল্যাণ নেই, 'সুমধুর প্রেম' নেই যেখানে সেখানে গলিত বিকৃত উন্মাদনা, পুরুষতান্ত্রিক ব্যবস্থার যৌন স্বেচ্ছাচার তো নারীমুক্তির সম্পূর্ণ বিরোধী, আর সেই কারণেই গলিত পুরুষের জন্মসার্থকতাও নেই, কবি বলেন, 'সময়ের চূর্ণ পাহাড়ে পিঙ্গল মানুষেরা মরে, /কর্দম কাকের কণ্ঠে শুনি ধ্বংসের গান।'(ঘরে বাইরে)। এই মৃত্যু কবির কাছে কিন্তু শোকের কারণ নয়, ব্যথার কারণ নয়, ধ্বংসগর্ভ সভ্যতার এই পঙ্কিল তীর হেতু কবি জানেন, দ্রষ্টা তিনি, আবার দ্রষ্টা বলেই তিনি মনেপ্রাণে কামনা করেন এর ধ্বংস, এর মৃত্যু। কবি মৃত্যুকে আরও নানাভাবে দেখেছেন। মহাযুদ্ধের নান্দীরোলে আশঙ্কিত মানুষের মনে যখন ক্লান্তি কিংবা হতাশা, তখনও সে তাড়িত 'ভঙ্গুর শিরা দেখার' ব্যাকুলতায়, তখনও 'কবন্ধ মৃত্যুর' ছায়া তার চারপাশে। (ঘরে বাইরে)। কবি স্বীকার করেন যে, 'জীবিকার স্রোতে ভেসে যায় জীবন যৌবন, /আশেপাশে বর্বরতায় চিরকাল মৃত্যু আসে আর যায়।' (সন্ধ্যা ও প্রভাত)। এই বর্বরতা ও মৃত্যুর দায় অর্থ-সামাজিক ব্যবস্থার, সামন্ততান্ত্রিক নৈতিক-বোধেরও নয়। মৃত্যুর কথা বলতে গিয়ে এভাবেই অনিবার্য হয়ে ওঠে ক্ষয়িষ্ণু জীবনে জরার যন্ত্রণার কথা অথবা গলিত দেহের ওপরে গভীর রাত্রে চক্কর দিতে থাকা 'দুঃস্বপ্নের নিঃশব্দ শকুনের' কথা। মধ্যবিত্তশ্রেণীর প্রতি ছুঁড়ে দেন যখন ব্যঙ্গের বিষমাখানো তীর, তখনও তাতে মৃত্যুর কথা মিশিয়ে দিতে ভোলেন না সমর সেন, 'তুমি ধন্য, সম্মুখ সমরে হত'(অজ্ঞাতবাস), এ মৃত্যু কিন্তু শারীরিক নয়, আত্মিক, জীবনমূল্যে বর্জিত নিষ্প্রাণতা মৃত্যুরই যেন আর এক অন্যতর রূপ। এই মৃত্যুরই বিস্তার সারা পৃথিবী ব্যাপী--- 'অন্ধকারে ভিজে ভিজে পৃথিবী মরে।' (রোমান্স)। বিশ্বব্যাপী মৃত্যুর এই লীলা দেখে তাঁর মনে হয়: 'স্বেচ্ছাচারী যম একমাত্র অধিপতি।'(স্বস্তিকা)। যম মৃত্যুর দেবতা। এই দেবতার স্বেচ্ছাচারের অর্থ আরো অগণন মৃত্যু। এ এক অদ্ভুত সময়, ঘনিষ্ঠ আত্মীয়ের মৃত্যুও মনে আর রেখাপাত করে না। স্ত্রীর মৃত্যুর পর বৃদ্ধকে ভাবতে হয়: 'সমাজ বদলেছে অনেক, নিরুপায়, /নইলে হে হরি, /এ বয়সে রক্ত নাচত না আর একটি কিশোরী।' যদিও যৌনতা উদ্দীপকের কাজ করেছে এখানে, তবুও তা-ই সব নয়, 'সাম্য মৈত্রী স্বাধীনতার বুলি', 'রোমান্টিক বুলবুলের অবিরত গান', 'ঘরে ঘরে সমাজধর্মিকেন্দ্র নির্লজ্জ জন্মাদি যন্ত্রিত যে অর্থ-সমাজ, তারও ব্যাপক একটি ভূমিকা রয়েছে, তাই বৃদ্ধকে বলতে হয়: 'সুতরাং শোক বৃথা, মরে তুমি হয়তো বেঁচেছ, /আমরা বাঁচিনি।' (কয়েকটি মৃত্যু)। এই মৃত্যু সার্বিক মৃত্যু,

শারীরিক এবং মানসিক, নগর-গ্রামব্যাপী সর্বসাধারণের মৃত্যু-ঘোষণার এক অমোঘ উচ্চারণ এতে প্রতিফলিত: 'সত্য নিহত প্রথম আক্রমণে।' (ঘরে বাইরে)। কিন্তু মার্কসবাদ তাঁকে এই প্রত্যয় দিয়ে গেছে, মৃত্যু, যে কোন মৃত্যুই, জীবনের শেষ কথা নয়। পরবর্তীকালে এই প্রত্যয় নিবিড় বিশ্বাস নিয়ে উচ্চারণ করেছে: 'মৃত্যু শুনেছি শেষ কথা নয়' (নবযাত্রা), কৌমিনগ্রামের সংগ্রামী জনতার প্রেরণায় কবি শুনতে পেয়েছেন: 'রাত্রে ভয়ঙ্কর মৃত্যুর মুখে জীবনের জয়গান বাজে।' (কৌমিনগ্রাম)। মৃত্যু-উত্তীর্ণ হওয়ার প্রেরণা গণসংস্পর্শে, গণ-আন্দোলনে ও সংগ্রামে অংশ গ্রহণের পরে---এ সত্য বিস্মৃত হন নি সমর সেন, অন্তত তত্ত্বের দিক থেকেও এটা তিনি মেনে নিয়েছেন।

আমরা লক্ষ্য করে থাকব, সমর সেন বিশেষ একটি শ্রেণীকে লক্ষ্য করেই তাঁর সমস্ত বক্তব্য রেখেছেন। তাঁর সমস্ত সমালোচনাশক্তি উজাড় করে দিয়েছেন বুর্জোয়া শ্রেণী ও বুর্জোয়া সংস্কৃতিপুষ্ট মধ্যবিত্ত শ্রেণীর প্রতি উদ্দেশ করে এক ব্যাপকতর বিরোধিতায়। কিন্তু কেন? এর সদুত্তর পাওয়া যায় ক্রিস্টোফার কডওয়েলের বক্তব্যে:

'সুতরাং তাই অবক্ষয়ের যাবতীয় অধ্যায়েই যেরকম দেখা যায় সেইরকম বর্তমানেও বুর্জোয়া সংস্কৃতিতে চেতনাকে ত্রুটিপূর্ণ বলে মনে হতে থাকে এবং সত্তা তার সঙ্গে সংগ্রাম করে। আর এটাকেই মনে হয় চেতনা বুঝি অচেতনতাকে পঙ্গু করে তুলছে। বুর্জোয়া সামাজিক সম্পর্কের ব্যবস্থার এই ত্রুটিগুলি সবই পণ্যমূল্যের বন্ধন থেকে উদ্ভূত। পণ্য মূল্যের বন্ধন অন্য সমস্ত সামাজিক বন্ধনের স্থান নিয়েছে। ফলে পারস্পরিক ভালোবাসা বা কোমলতা বা কৃতজ্ঞতা সমাজকে ধরে রেখেছে বলে মনে হয় না। মনে হয় অর্থই বুর্জোয়া দুনিয়াকেই চালাচ্ছে। তার অর্থ হল এই যে বুর্জোয়া সমাজ স্বার্থপরতাকে কেন্দ্র করে আবর্তিত হচ্ছে। কারণ, অর্থ হল অধিকারভুক্ত সামগ্রীর প্রতি এক প্রাধান্যবিস্তারকারী সম্পর্ক। যাবতীয় সামাজিক সম্পর্কের এই ব্যবসায়ভিত্তিক হয়ে ওঠার ফলে তা ঘনিষ্ঠতম আবেগকেও আঘাত করে এবং নারী ও পুরুষের ভিন্নধর্মী অর্থনৈতিক পরিস্থিতির দ্বারা যৌন সম্পর্কগুলিও প্রভাবিত হয়। বুর্জোয়া সম্পর্কগুলির ক্ষেত্রে ব্যক্তিগত সম্পত্তির ধারণা গুরুত্ব লাভ করে ও প্রবল ক্ষমতাশালী হয়ে ওঠে এবং তা ভালোবাসার ক্ষেত্রেও প্রসারিত হয়। পুঁজিবাদী সমাজ অর্থনৈতিক সম্পর্কগুলি কেবল এই যে প্রত্যেক মানুষই সেখানে এক নৈর্ব্যক্তিক বাজারে নিজের নিজের জন্য সংগ্রাম করছে। সেই কারণে এমনকি সর্বাধিক 'পরার্থবাদী' আবেগগুলির সঙ্গেও ঈর্ষা, লোভ ও ঘৃণার অন্ধকার শক্তিগুলি মিশে যায় এবং সেগুলিকে দূষিত করে তোলে। আর এই অন্ধকার শক্তিগুলি দুনিয়াটাকে যেন ছিন্নভিন্ন করে ফেলছে বলে মনে হয়।'[৩১]

এ হল উৎপাদন-সম্পর্ক ও উৎপাদিকাশক্তিগুলির মধ্যেকার একটা সংঘাত। বুর্জোয়া সভ্যতা ও বুর্জোয়া

চেতনার মধ্যেই এই ত্রুটিগুলি নিহিত। সমর সেন, বস্তুতপক্ষে এখানে সেই কবি, যিনি এই দুর্বলতাগুলি আঙুল তুলে দেখিয়েই ক্ষান্ত নন, একটি গঠনমূলক কার্যকারিতাও তার রয়ে যায়, অবশ্য বৃহত্তর অর্থে।

গণমুখিতা ও সমর সেনের কবিতা

মার্কস প্রলেতারিয়েতের বিপ্লবী সম্ভাবনাকে শিল্প বুর্জোয়ার বিকাশের ওপর নির্ভরশীলরূপে কেন দেখেছেন ? তাঁর প্রত্যক্ষ পরিষ্কার বক্তব্যঃ শিল্প প্রলেতারিয়েতের বিকাশ সাধারণত শিল্প বুর্জোয়ার বিকাশের উপরেই নির্ভরশীল। একমাত্র তাদের শাসনে প্রলেতারিয়েত এমন ব্যাপক জাতীয় সত্তালাভ করে যা তার বিপ্লবকে উন্নীত করতে পারে জাতীয় স্তরে, সে নিজেই সৃষ্টি করে নেয় আধুনিক উৎপাদনের উপায় যা সেইসঙ্গে হয়ে দাঁড়ায় তার বৈপ্লবিক মুক্তিলাভেরই উপায়। মার্কস বলছেন, 'একমাত্র তাদের শাসনই ফিউডাল সমাজের বৈষয়িক মূল পর্যন্ত উৎপাটিত করে এমনভাবে মাটি সমান করে দেয় যার ওপরেই শুধু সম্ভব প্রলেতারিয়েতের বিপ্লব।'[৭২]

এই কথাগুলি মনে রাখলে সমর সেনের কবিতায় গণমুখিতা তথা বৈপ্লবিকতার একটি সম্যক তাৎপর্য অনুধাবন করা সহজ হবে বলে মনে হয়। সুকান্ত, সুভাষ ও বিষ্ণু দে-র কবিতায় কমিউনিস্ট পার্টি পরিচালিত প্রায় প্রতিটি গণ-সংগ্রামে অংশগ্রহণ কিংবা সমর্থনের সূচক এক স্পষ্ট উপাদানের সন্ধান পাই আমরা, প্রগতি আন্দোলনের দ্বারা সংঘটিত বিভিন্ন কার্যক্রমের সঙ্গে যোগসূত্রের সন্ধানও তাতে মেলে, কিন্তু সমর সেনের বিশিষ্টতা একটু ভিন্নার্থবহ বলে মনে হয়। চল্লিশের দশকে সারা বাংলাদেশব্যাপী যে বিক্ষুব্ধ পরিস্থিতি তৈরি হয়েছিল, ফ্যাসিবিরোধী সংঘগঠন থেকে শুরু করে নানা কার্যক্রম আরম্ভ হয়েছিল তাতে অংশগ্রহণ তো দূরের কথা, এই আন্দোলনের তথ্য সম্বন্ধেও বোধকরি সম্পূর্ণ অবহিত ছিলেন কিনা তা সন্দেহের বিষয়। অবশ্য, এর নৈতিক দায়িত্ব তিনি এড়ান নি বলেই কৈফিয়ৎ দিতে গিয়ে স্পষ্টত বলেছেন, 'বাংলাদেশের বিক্ষুব্ধ বিপর্যস্ত চল্লিশ দশকে আমি প্রবাসে ছিলাম। সে কারণে হয়তো আমার মানসিক বিকাশ ব্যাহত হয়েছে।'[৭৩] তিনি নিজেই লিখেছেন যে, চিন্তায় ও কর্মে সমন্বয় না আনতে পারলে বিপ্লবী হওয়া যায় না। নানা কারণে তাঁর মধ্যে এই সমন্বয়জনিত অভাব আমরা লক্ষ করেছি। যদিও তিনি এ কথা কখনও ভোলেন নি যে, বিপ্লবী কবিতা লিখতে অন্তত তাঁর 'বিবেক সাফ থাকবে'।[৭৪] এটা যে শ্রেফ ভণিতা এমন নয়, তিনি অনেক মধ্যবিত্ত শ্রেণীর প্রতিনিধি কবিদের মনের কথাই এতে বলে ফেলেছেন। যাই হোক, সত্যকার বিপ্লবী কবিতায় আমরা সাধারণত যে সমস্ত লক্ষণ দেখতে পাই, চরিত্রের দিক থেকে প্রবল প্রতিবাদী, বক্তব্যের দিক থেকে কমিউনিজমের আদর্শের প্রতি আস্থা ঘোষণা, সর্বহারার জীবনানুভূতিকে

অবদমন করে মিলন-বিষাদের এক সচেতন আবেগ---এসবই তাঁর কবিতায় কোন-না-কোনভাবে এসেছে এবং তা স্বীকৃত সত্য। 'কয়েকটি কবিতা'য় কবির বিদ্রোহের উৎসকে বুদ্ধদেব বসুও দেখেছেন 'সামাজিক বিরোধ ও শ্রেণী-সংঘর্ষ'[৩৫]-এর পরিণাম হিসেবে। বলা বাহুল্য, এই পরিণতিই তাঁকে প্রগতি সাহিত্য আন্দোলনের ধারায় অন্যতম পুরোধা-কবির মর্যাদা দিয়েছে। আর এই ধারা যে বিপ্লবী ধারা এতে স্বভাবতই কোন সন্দেহ থাকা উচিত নয়।

আমাদের আলোচনার সূত্রপাতেই বলেছিলাম যে, সমর সেনের সতর্ক পাঠক লক্ষ্য করে থাকবেন তাঁর কাব্যের দুটি স্তর বা দুটি পর্ব। প্রথম পর্বে, বুর্জোয়াশ্রেণীর ক্ষয়িষ্ণু রূপটি তিনি বিদ্রূপে-ব্যঙ্গে-শ্লেষে-কশাঘাতে ছিন্নভিন্ন করে দিয়ে প্রলেতারিয়েতের আত্ম-অভ্যুত্থানের রাস্তা পরিষ্কার করে দিতে চেয়েছেন। দ্বিতীয় পর্বে, প্রলেতারিয়েতের অভ্যুত্থানকে ইতিহাসের বস্তুবাদী ধারার সঙ্গে মিলিয়ে তাঁকে স্বাগত জানিয়েছেন। অবশ্য মনে রাখতে হবে, শুধু স্বাগত জানিয়েছেন এমন নয়, স্খলন-পতন-ত্রুটিজনিত যে সমস্ত কারণ বিদ্যমান থাকলে বৈপ্লবিকশক্তির বিকাশ ব্যাহত হয়, সুদৃঢ় আত্মপ্রত্যয়ের সঙ্গে সে সম্পর্কে সতর্ক করে দিতে কুণ্ঠিত হন নি।

প্রথম পর্বে তাঁকে বলতে শুনেছিলাম, 'যতদূর চাই ইটের অরণ্য, /পায়ে চলা পথের শেষে কান্নার শব্দ।' (নাগরিক)। এই কান্নাই যেন জীবন ও সভ্যতার শেষতম পরিণতি। কিন্তু না, এই পরিণতির কথা সচেতন কোন কবি উচ্চারণ করেন না, প্রগতি সাহিত্য আন্দোলনের পথিক কোন কবি উচ্চারণ করেন নি, কেননা এ উচ্চারণ প্রকৃত নৈরাশ্যবাদীর। তাই সাম্রাজ্য-সংকটের এক বিশেষ মুহূর্তে কবি প্রার্থনা করে ওঠেন: 'মৃত্যুহীন প্রেম থেকে মুক্তি দাও,/পৃথিবীতে নতুন পৃথিবী আনো/হানো ইস্পাতের মতো উদ্যত দিন।' (একটি বেকার প্রেমিক)। ভবিষ্যতের প্রতি অন্যত্র আস্থা স্থাপন করতে গিয়ে তাঁকে বলতে শুনেছিলাম: 'তবু জানি, কালের গলিত গর্ভ থেকে বিপ্লবের ধাত্রী/যুগে যুগে নতুন জন্ম আনে।' (ঘরে বাইরে)। প্রথম পর্বে যে বেদনা ছিল তা 'বণিক সভ্যতা'র জন্যে, 'শূন্য মরুভূমি'জনিত সেই বেদনা। এই পর্বেই যখন বিপ্লবের নতুন আবির্ভাব সম্পর্কে কবি অনেকখানি আশাবাদী, তখন বিশ্বযুদ্ধ শুরু হয়ে গেছে:...'কিছুদূরে প্রখর রৌদ্রে মোড়ে/মহাযুদ্ধের প্রস্তুত।' এই যুদ্ধ প্রতিফলিত হয়েছে অন্যত্রও: 'দূরে পশ্চিমে/বিপুল আসন্ন মেঘে অন্ধকার স্তব্ধ নদী।' (কয়েকটি দিন)। যুদ্ধের কোলাহলের মধ্যে তাঁকে এখন ভাবতে হচ্ছে 'গণ-আন্দোলনের রূপকথা', সচেতন কবিই এ কথা ভাবতে বসেন, মানবসত্তার প্রশ্নে বিচলিতচিত্ত তিনি আত্মসমালোচনাকে মূল্য দেন---'শেষ কি আমাদের দিন?' সংশয়তাড়িত তাঁর আত্মজিজ্ঞাসা মাটির খুব কাছে নেমে আসে: 'কেন কানা গরু, মরা মাঠ, শূন্য গোলাঘর,/কেন শেষ আমাদের দিন?' যে মধ্যবিত্ত-

যখন ভাবতে শেখায় স্বচ্ছন্দ সুখী জীবনযাত্রার আদর্শ, ভাবতে শেখায় 'খাদ্য চিন্তাই পরমচর্চা' অথবা 'জনগণ বর্বর'---তাঁকে এখন নতুন করে ভাবতে হচ্ছে ভারতবর্ষের ঐতিহ্যবাহী জাতীয় আন্দোলনগুলির কথা---'বয়ঃসন্ধির সময়/মহাত্মাজীর আন্দোলন শুরু হল।/লবণ আইন ভাঙে, দলে দলে জেলে যায়,/মাঝে মাঝে বিপ্লবী বোমা ফাটে---/হাতে হাতকড়া, নানাবিধ হামলা, চরম শাস্তি।/বন্ধ সংবাদপত্র, রাস্তায় নিষিদ্ধ পোস্টার:/অগ্নিবর্ষী বুলি বা বক্তৃতাসাগরে এল।/লাল পাগড়ির লাঠির সামনে/(বন্দিনী সে রাতি)/দেশবন্ধু পার্কে এলোমেলো পলায়ন,/আজো মনে পড়ে।' (রোমন্থন)। কিন্তু এই আন্দোলনগুলি বস্তুতপক্ষে কোন ইতিবাচক পদক্ষেপ নিতে পারে নি এবং 'অবশেষে আজ/অসংখ্য নিরন্নের দুঃখের দেশে/নিঃসঙ্গ পর্যটক মাত্র' বলে হয়েছে তাঁর নিজেকে। 'বিশাল ভারত,/ভগ্ন আর জরা, জীর্ণ জাল' নিয়ে বিচ্ছিন্ন সে, 'লক্ষ্যহীন কত লোক', তারই মধ্যে চাষীর সাথে 'মালগুজারী কেঁপে কেঁপে/বাজে ভেরি জিন্দাবাদ' অথবা

'কারখানায় ধর্মঘট,
গ্রামে খাজনাবন্ধ কর,
জমিদার, বণিক বরবাদ,
ইনক্লাব্ জিন্দাবাদ,
অথচ, বিপুল নির্জীব লোক।'

(ঐ)

কালের এই জোয়ারে নিজেকে ভাসাতে পারেন নি কবি: 'সাঁতারের শক্তি কি সাহস কিছু কখনো ছিল না।' এ শুধু কবির আত্মবাক্য নয়, কাব্যপ্রয়োগ নয়, নয় তা অতি বিনয়ও। কেন এই আন্দোলনের সঙ্গে তিনি একাত্মতাবোধ করেন নি? এ সম্পর্কে তাঁর অভিমত---'অবোধ মন, বোঝানো ব্যর্থ', 'জানি না কী পাপে শুষ্ক শরীর যুগের আশ্রয়'। এগুলি কবিতার ভাষায় বললেও এর ভেতর দিয়ে তিনি যেন মধ্যবিত্ত মানুষের স্বরূপটিকে যথাসাধ্য চিনে নিতে চেয়েছেন। ভারতবর্ষের অমোঘ ভবিতব্য হিসেবে তিনি দেখতে পেয়েছেন 'অন্তর্জলহীন মৃত্যু হয়তো'। অথবা 'ভারতের ভাগ্যাকাশে/অন্ধকার স্তরে স্তরে জানি না কী বড় ঘনায়' (পরিস্থিতি)---এতৎসত্ত্বেও কলকাতা করপোরেশনের বিরুদ্ধে ধাঙড়দের ধর্মঘটকে তিনি মনে মনে ধন্যবাদ জানান ('বিবেক সাফ' ?), কিন্তু এই আন্দোলনকে মাঝপথে থামিয়ে দিয়ে যারা ফিরে যায় তাদের উদ্দেশে তাঁর তীব্র বিদ্রূপ ধ্বনিত হয়: 'হঠাৎ কোথা থেকে এত লোক,/ একী গণ্ডগোল,/ প্রায় রাজপথ দুপুর,/উপরন্তু হাতে লম্বা লাঠি।/হরতাল, ঊর্ধ্বশ্বাসে বাড়ি ফিরে আসি।' (ব্রতচারী)। যখন 'পশ্চিমে ভয়ঙ্কর বিপত্তি' আর প্রতিবেশী রাষ্ট্রের ভারতসীমান্তে আক্রমণ শুরু হয়ে গেছে, তখনই হিন্দু-মুসলিম ঐক্যের ধুয়ো তুলে রাজনৈতিক দলগুলি রীতিমত ক্ষমতা লুটতে ব্যস্ত, মূল রাজনৈতিক

আন্দোলনের জাতীয়স্রোত থেকে বিচ্ছিন্ন ও জাতিচ্যুত দুটি দল জাতীয় কংগ্রেস ও মুসলিম লীগ ক্রমশ সাম্প্রদায়িক-বিভেদে জড়িয়ে পড়তে থাকে। অন্যদিকে 'নব্য বামপন্থী'রাও হঠাৎ হয়ে পড়ে 'আন্দোলনে মুখর'---গণ-আন্দোলন থেকে সরে থাকা এই রাজনৈতিক-দৈন্যকে সমর সেন মেনে নিতে পারেন নি, তার কারণঃ 'এখানে যে সংগ্রাম শুরু, এ্যাসেম্বলি হলে হবে শেষ' এই নিশ্চিত দুরভিসন্ধি তাঁর আস্থা অর্জনের সহায়ক নয়, আর তাই 'অলীক সুখ থেকে একদিন পড়ে নেমে আসা।' (খোলা চিঠি)। সেই সময় কমিউনিস্ট পার্টির তরফ থেকে ডাক দেওয়া হয়েছিল স্ট্যালিনের অনুসরণে জনযুদ্ধের(১৯৪১খ্রীষ্টাব্দ), অন্যদিকে জাতীয় কংগ্রেসের 'অগাস্ট-আন্দোলন'(১৯৪২খ্রীষ্টাব্দ)-এর প্রস্তুতি, কমিউনিস্ট পার্টি ব্রিটিশ-বিরোধী ভূমিকা থেকে এ সময় পশ্চাৎ সরে আসে এবং বড় হয়ে ওঠে ফ্যাসিবিরোধী এক আন্তর্জাতিক ভূমিকা। সমর সেন বলেন, 'দিনে দিনে প্রতিপন্ন হয় আমাদের প্রয়োজন নেই/স্বাধীনতায়। কারণ, জার্মান আসলে সকলই যায়।' (ঐ)। কমিউনিস্ট পার্টি, পার্টিকর্মী ও অন্যান্য বিপ্লবী কবির সঙ্গে সমর সেনের এ জায়গায় স্পষ্ট একটা পার্থক্য। তিনি যে কারণে কংগ্রেস এবং লীগের বিরোধিতা করেছেন(ধর্মীয় বিভেদবুদ্ধি), তেমনি বিরোধিতা করেছেন কমিউনিস্ট পার্টির বক্তব্যও। এই অবস্থায় তিনি তথাকথিত 'বামপন্থী বিপ্লবীদের' উদ্দেশে কঠিন গলায় বলতে দ্বিধা করেন নাঃ 'এ অবস্থায় বৃন্দাবনী বাঁশি যদি চড়িতে শুনি,/তাহলে বলবে লোকেঃরোমান্টিক বুর্জোয়া।/...ব্যক্তিগত গান গাওয়া কর্তব্য নয়,/...তথাপি বামপন্থী পত্রিকায়/আসন্ন বিপ্লবের গান অবশ্য উচিত।' (ঐ)। মার্কসবাদের প্রতি আস্থা রেখেও মার্কসবাদীদের আক্রমণ করা সত্ত্বেও তিনি কিছুতেই মেনে নিতে পারেন নি জার্মানির মিত্রতায় ভারতবাসীকে দেবে পরমকাম্য স্বাধীনতা। সুভাষচন্দ্র দেশছাড়া। জার্মানিতে গঠন করেছেন 'আজাদ হিন্দ বাহিনী'। কবি স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন এমন অবস্থায় বাঙালির অতীত ইতিহাসঃ'আমরা বাঙালী, মীরজাফরী অতীত, মেকলের/বিষবৃক্ষের ফল।'([illegible])। কমিউনিস্ট পার্টির দিক থেকেও এই প্রচার তখন তুঙ্গে, সুভাষচন্দ্র দেশদ্রোহী ও বিশ্বাসঘাতক, জার্মানির 'দালাল'। সমর সেন এই মতটির সঙ্গে এক, তবু ব্যঙ্গ ঝরে পড়েছে তাঁর কথায়ঃ 'এ ঘোর রজনী, মেঘের ঘটা/কী করে আসবে বাটে,/দূর বার্লিনে বঁধুয়া তিতিরে,/বেতারে শুনে পরাণ কাটে।' (ঐ)। একই ব্যঙ্গ ধ্বনিত হয়েছে বুদ্ধিজীবী মানুষ আনোয়ারের গলাতেও: 'উনকে সাথ আজাদী আনেওয়ালী হিন্দুস্থানমে।' কবি এ প্রার্থনায় গলা মিলিয়েছেন, বিশ্বাসঘাতকতার বিষবৃক্ষ নষ্ট হোকঃ 'আমাদের জীবনে এ ক্লান্তি সম্পূর্ণ শেষ হোক,/কিন্তু আগামীকাল আসুক নব-কিরীটি মজুরের গানে/কৃষাণীর আত্মদানের প্রথম বেদনায়/নবজাত শিশুর সহজ কান্নায়,/শতাব্দীর যন্ত্রণার পর/নতুন দিন আসুক সভ্যতার পরম চিত্তশুদ্ধিতে।' সমর সেন যে ক্রমে গণমুখী হয়ে উঠেছেন, এই কবিতা তার

অব্যর্থ দৃষ্টান্ত। সোমেন চন্দের স্মৃতিতে লেখা 'নববর্ষের প্রস্তাব' কবিতাটিতেও প্রকাশ পেয়েছে তাঁর গণমুখিতা। 'সভার কৌলিন্য' খোয়াতে রাজি নয় যে সব বুদ্ধিজীবীরা অথবা 'পিতৃপুরুষের পুণ্যবোধে' পাওয়া উত্তরাধিকারী মসীজীবীরা, তাঁদের উদ্দেশে তাঁর আহ্বানঃ 'দিগ্বিজয়ী অন্ধকারে শুভবুদ্ধির আলো,/ কে জ্বালবে বল ?'---এই আহ্বানে বুদ্ধিজীবী শ্রেণীর সঙ্গে শ্রমজীবী মানুষের মিলনপ্রস্তাব রয়ে গেছে। তাঁর অভিজ্ঞতাঃ 'অনেক ঘাটের জল খেয়ে বুঝি/ অনেক লোক যেখানে/ সেখানে সভার নতুন সূর্য ওঠে'---আত্মত্যাগের মধ্য দিয়েই সম্ভবপর হয় সব মানুষের মুক্তিঃ 'কালের মোহানাতে এলে জোয়ার লাগায়/সম্ভব হয় অনেকের খেয়া পারাপার,/গভীর জলে একের সব শেষ ডোবে।' (ঐ)। সোমেন চন্দের সংগ্রাম ছিল ফ্যাসিবিরোধী জোট গঠনের মাধ্যমে ফ্যাসিস্ট-স্বৈরাচারকে প্রতিহত করা, সারা ভারত-বর্ষের শ্রমজীবী জনতার মুক্তিসংগ্রামকে আন্তর্জাতিক সংকটের সঙ্গে মিলিয়ে বিশ্ব-গণমুক্তিসংগ্রামে প্রবর্তিত করা---তাঁর মৃত্যু, কবির গোপন অভিলাষ যে, যেন 'অনেকের খেয়া পারাপার'কে সুনিশ্চিত করে। 'পঞ্চমবাহিনী' নামকরণ এদিক থেকে তাৎপর্যপূর্ণ, যে হঠকারী শক্তি ফ্যাসিস্ট কায়দায় সোমেন চন্দকে হত্যা করেছে, তাদের আখ্যায়িত করা হয়েছে ঐ ভাবে। যে বিচ্ছিন্ন সত্তা কবিকে এতদিন ধরে সমষ্টি থেকে বৃন্তচ্যুত করে রেখেছিল ১৯৪২খ্রীষ্টাব্দের পর দেখা যায়, তাতে একটু একটু ভাঙন ধরেছে। সেই উপলব্ধি প্রকাশ পেয়েছে 'পোড়ো মাটি' কবিতাটিতে। সেখানে তাঁর উপলব্ধি 'সভার খনিতে তবু আলস্য কমলের সোনা তুলে', যে মজুরানী আধবসনক্লিষ্টে কুয়ো থেকে জল তোলে, সেই শ্রমজীবীর শ্রমশক্তির প্রতি তাঁর আস্থা আরও গভীর হয়ে ওঠেঃ 'জানি জানি/আমার রক্তের মধ্যে আজো বাজে জাতির ধমনী,/ আমাকে ডাকে/অসংখ্য সহোদর সেখানে প্রাণ দেয় মাঠে মাঠে/ফসলহীন মজুরের মাঠে।'(পোড়ো মাটি)। মহাযুদ্ধের ঘনিষ্ঠ অন্ধকারে এই প্রত্যয় আরও সুস্থ হয়ে ওঠে :'হঠাৎ সূর্য ওঠে, বলিষ্ঠ প্রহারে/ কুয়াশায় নদীর জল ঝলকায়---শানিত হাতিয়ার। মাঠে মাঠে বালুচর, কাদাখোঁচা জলে নামে,/ ধানখেতে কাস্তে হাতে কিষাণ,/হাতুড়ি বাজে কামারশালে,/সবুজ আগুন জ্বলে অনেক মাঠে।'(ইতিহাস)। ১৯৪২খ্রীষ্টাব্দের ২৩ আগষ্ট 'স্ট্যালিনের নামাঙ্কিত শহর স্ট্যালিনগ্রাডের উপরে জার্মান-সেনা প্রবেশ করে প্রায় ৪০ হাজার লাল সেনা খতম করে, পরবর্তী ১৯নভেম্বরে লাল সেনা পাল্টা আক্রমণ শুরু করে তাদের বীরত্ব প্রদর্শন করে। এবং বিশ্বের ফ্যাসিবিরোধী জনগণ এর থেকে প্রবল প্রেরণা লাভ করে। এটি নিছক একটি ঘটনা নয়, মুক্তিকামী মানুষের বহুকাঙ্ক্ষিত যুদ্ধের প্রথম সাফল্যের খবর, এবং ইতিহাস। 'স্ট্যালিনগ্রাড' শিরোনামের কবিতায় সংগ্রামী মানুষকে সমর সেনও অভিনন্দিত না করে পারেন নিঃ 'কত বর্বরের গোরস্থান এ শহরে/ রাত্রে ভয়ঙ্কর মৃত্যুর মুখে জীবনের জয়গান বাজে।' বিপ্লবী কবি মাত্রেই

মুক্তিকামী মানুষের সংগ্রামের সাথী। সমর সেনও মধ্যবিত্ত মানুষের যাবতীয় দুর্বলতা পরিহার করে একসময় মানুষের পাশে এসে দাঁড়ান, বিশ্বের ভিন্ন প্রান্তের মুক্তিসংগ্রামকে অভিনন্দিত করেন, এই সময় আশ্চর্য হয়ে লক্ষ্য করার, তাঁর আগেকার সেই ব্যঙ্গপ্রবণতা কেমন ধীরে ধীরে মিলিয়ে গিয়ে তার জায়গায় এসে পড়েছে এক সুগম্ভীর সুরের নিবিড় উচ্চারণ। এ পর্বের কবিতাগুলি প্রায়শ দীর্ঘ। অথচ প্রথম দিকের কবিতাগুলি তা নয়। অবয়বে বা আকারে ছোট, কিন্তু তীব্র ও অমোঘ বক্তব্যে একনিষ্ঠ। পরবর্তী কবিতাগুলি শুধু দীর্ঘই নয়, দীর্ঘ বলেই অনেকটা শিথিল, এই শৈথিল্য ভাবনায় ছেয়েছে। খুব সম্ভব, সমর সেন গণমুখী কবিতা রচনায় খানিকটা অস্বাচ্ছন্দ্যও অনুভব করে থাকতে পারেন। কিংবা তাঁর মানসিক-পরিমণ্ডল বুর্জোয়া সমাজের সমালোচনায় যতটা সাড়া দেয়, বিপ্লবী জনগণের পাশে পাশে সংগ্রামের প্রতিটি স্তরকে তাঁর মন তেমন তীব্রতায় স্পর্শ করতে পারে না। এ ধরনের কবিতায় তাই সতর্ক পাঠক কিছু দুর্বলতা আবিষ্কার সহজেই করতে পারেন। তথাপি সমর সেনের কবিতায় (বিশেষত এই পর্বের) একটি গুরুত্বপূর্ণ সময় কথা কয়ে উঠেছে, গণমুখী জীবনের প্রতি তাঁর অঙ্গীকার বেজে উঠেছে, প্রগতি সাহিত্য আন্দোলনের লক্ষণগুলি তার সমস্ত উৎকর্ষ নিয়ে তাঁর কবিতায় ফুটে উঠেছে যা আমাদের মননকেই শুধু তৃপ্ত করে না, কাব্যপাঠের আনন্দও দেয়। যাই হোক, তবু বলতে হবে, এ পর্বের কবিতায় মূলত জনগণই প্রধান হয়ে উঠেছেন। 'খোলা চিঠি' কবিতাটি প্রথম প্রকাশিত হয় 'অরণি'র জুন-সংখ্যায়।[৩৬] কবিতাটিতে আন্তর্জাতিক যুদ্ধ-পটভূমির প্রেক্ষিতে দেশের বর্তমান অবস্থার বিশ্লেষণ করা হয়েছে কিষাণ-মজুরদের দৃষ্টিকোণে এবং সমাপ্তিতে আশাবাদ প্রকাশ করা হয়েছে। 'ভিটেবাড়ী বর্গীর নামে' সারা ইউরোপজুড়ে যখন 'করাল মৃত্যুর ছায়া', তখন ১৯৪২খ্রীষ্টাব্দের বসন্ত জন্ম দিচ্ছে এক নতুন উত্তরাধিকার, এক নবীন প্রজন্মের---'এ বসন্ত কাদের? নব লাল সৈন্য অগ্রসর নির্ভয় উদ্যানে, / রক্তলোভী বন্য সৈন্য হত হয় অক্লান্ত অভিযানে, / উদয় সূর্যের দেশ প্রাচ্যে ছায়া ফেলে, নড়ে বীর চীনে / নির্ভয় সঙ্গীনে।' মুক্তিযোদ্ধা রাশিয়া এবং চীনের সৈন্যের বীরত্বকে অভিনন্দনের সঙ্গে সঙ্গে সাম্রাজ্যবাদের নাৎসিদের মুহূর্তে 'প্রতিবিপ্লবের অগ্রবাহিনী' যেভাবে দেশে দেশে সাম্রাজ্যবিস্তারে মনোনিবেশ করেছে তাতে তাঁর সন্দেহ যে, ভারতবর্ষেও সেই একই রীতি-পদ্ধতি অনুসৃত হচ্ছে কি না---'এ প্রান্তিতে, এতদিন অহিংস অসহযোগে মজ্জাহীন, / মুষ্টিমেয় বেনে, আর মধ্যবিত্ত, পরজীবী, দেশী দালাল, / যদি ক্ষীণ সূর্যের স্নায়ুতে / মনের অন্ধকারে, বামন বুদ্ধির প্রান্তিতে ঘেরে / কূপমণ্ডূকের মতো, যদি তারে, পীড়াকরী কিংবা মন্দ কি, / ডাকে কুমির, কাটে খাল, যদি বলে, স্বাধীনতা তৈরি মাল, / এ চিড় এদেশে আনবে ভদ্রলোক নন্দদুলাল, / কুরুক্ষেত্রে ক্লীবের পন্থা ধর।' (খোলা চিঠি)। এই ক্লীবত্বের বিরুদ্ধে প্রতিবাদে

শোষণের কারা ?'যারা নাঙলে ফিরে ফিরে সোনা ফলায়', 'কারখানায় জলে যারা দধীচির হাড়ে সভ্যতার বনিয়াদ গড়ে'---তারাই:'তারা বলে, দুনিয়ার দুশমনের প্রতিরোধে/দুনিয়াকো কিষাণ মজদুর মজদুর কিষাণ এক হো।' এ আহ্বান কমিউনিজমের প্রধান প্রবক্তা কার্ল মার্কসেরও, 'দুনিয়ার মজুর, এক হও।' কিন্তু তবু সমর সেন এই অতর্কিত আহ্বানের চাইতেও অত্যন্ত সূক্ষ্মতরভাবে বাস্তব-রূপ পরিবেশনে অকৃপণ: 'আমরা বাঁধা এখনো, তবু বন্দী তোমরা নিজেদের জালে।' সমর সেন ২২শে জুন (১৯৪১খ্রীষ্টাব্দ)-এর ঘটনাটির স্মরণে দুটি কবিতা লিখেছেন '২২শে জুন' শিরোনামে। 'অরণি'তে প্রকাশিত '২২শেজুন' কবিতাটি 'সমর সেনের কবিতা' সংকলনে স্থান পায় নি। তৃতীয় স্তবক থেকে নিম্নোক্ত পংক্তিগুলি উদ্ধার করছি:

"আজ ২২শে জুন", দেশে দেশে জনগণ বলে,
"অখ্যাত অজ্ঞাত আমাদের অনেকে প্রাণ দিল
ছিন্ন-ভিন্ন পৃথিবীর বিচ্ছিন্ন প্রান্তরে,
তারা জয়ী হবে, তাদের মৃত্যুতে জন্ম হয় নতুন ঐশ্বর্য,
কৃষ্ণচূড়া, পলাশ, রক্তকরবী, আমাদের বাহুর বীর্য
মহাযোদ্ধা ইন্দ্রের উদ্যত বজ্র,
জানি ছিন্ন হবে তাতে বৃশ্চিক দিন,
আমরা পৃথিবীর মাটি, তাই অমর,
আমাদের সাহায্যে সূর্য আগুন জ্বালে।'[৩৭]
('২২শে জুন', অরণি, সোভিয়েট সংখ্যা)

১৯৪৩-৪৪খ্রীষ্টাব্দেও সম্ভবত আর একবার সমর সেন বাংলাদেশের দুর্ভিক্ষের পটভূমিতে এই দিনটি স্মরণ করে থাকবেন '২২শে জুন'[৩৮] শিরোনামের অন্য একটি কবিতায়। স্ট্যালিনের নেতৃত্ব ট্যাঙ্কের গর্জনকে কিভাবে স্তব্ধ করে দিয়ে ট্র্যাক্টরের দিন আবার সুপ্ররচনা করে চলেছে আর সেই প্রেরণার থেকে শতযোজন দূরে 'কলোনিয়াল' দেশের অন্যতম ভারতবর্ষ প্রতিনিয়ত 'জীবের বিনাশ' কিংবা অরণ্যরোদন করে চলেছে---কবিতাটিতে প্রকাশ পেয়েছে সেই গভীর মনোবেদনা, যদিও কবি লেখেন বলেন, 'আশা রাখি একদিন এ কান্নার পার হয়ে পাব লোকের বসতি'। তাঁর মনোবেদনা যতটা আন্তরিক, ততটা বিশ্বাস্য হয়ে ওঠে নি তাঁর আশাবাদ। কারণ তাঁর নিজেরই ব্যক্তিগত অবিশ্বাস অথবা সংশয় এর জন্যে দায়ী। তাই তাঁকে স্বগতোক্তি করতে হয়---'দুধ ও তামাকে সমান আগ্রহ যার,/দুনৌকোর যাত্রী এই বাঙালী কবিকে,/বুঝি না নিজেকে।' (ঐ)।

ভারতের পূর্বপ্রান্তে ১৯৪২-৪৩খ্রীষ্টাব্দের দিকে জাপানি আক্রমণে যে ভয়াবহ পরিস্থিতির উদ্ভব হয়

দিল্লী প্রবাসী কবি সে-ব্যাপারে একেবারে নিঃসাড় ছিলেন এমন নয়, ব্যক্তিগত মধ্যবিত্ততার শ্রেণী দৃষ্টিকোণে এ কথা এ সময় উপলব্ধি করেন: 'জীবনধারার ধাপ চেতনাকে গড়ে,/চেতনার ধাপ জীবনধারাকে নয়।' এ কথা প্রথম ঘোষণা করে 'জার্মান প্রলেতারীয় পার্টি' তাদের ঐতিহাসিক বস্তুবাদী ধারণাকে অবলম্বন করে জার্মান দর্শনের মার্কসীয় ব্যাখ্যায়: It is not the consciousness of men that determines their being, but their social being that determines their consciousness.'[৪৯] বাক্যটি সম্পর্কে মন্তব্য করতে গিয়ে এঙ্গেলস বলেন, 'The proposition is so simple that it must be self-evident to anyone who is not bemused by idealist delusions.'[৫০]

'অগ্নিকোণ' কবিতায় জাপানি আক্রমণে ভারতের পূর্ব সীমান্তে যে আতঙ্ক ছড়িয়েছে এবং সেই সঙ্গে দুর্ভিক্ষের যে ছায়া যুদ্ধের দরুন বাংলাদেশে পড়েছে---সেই সংকট এবং সেই সংকটের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গিভাবে 'ভারত ছাড়ো' আন্দোলনের প্রতিক্রিয়াও সম্ভবত যুক্ত হয়েছে। 'অগ্নিকোণ' হল সেই সংকট যা মানুষকে উদ্‌ভ্রান্ত করে তোলে এক বিশেষ লগ্নে, হয়ত-বা কবির মতিভ্রমে, এ হল এক কালগত সংকট: 'মানিকতলা চোখে/অন্ধকারে নীল বিদ্যুৎ চমকায়।/সুনসান ইতস্তত উদ্‌ভ্রান্ত মানুষ/চড়কের যন্ত্রণায় সান্ত্বনা চায়।' চমৎকার একটি চিত্রকল্পে এই সংকটকে দেখেছেন কবি: 'মধ্যদিনে সূর্য, মনে হয় এক অতিকায় ক্ষুধার্ত বণিকের চোখ শূন্য থেকে একমনে জ্বালায় গোঁজে'---কিন্তু এই সমাধান ব্যর্থ হয় 'ছিন্নপত্রে, বালুতে, পাথরে, অবশেষে ছিছিবিছি কেটে।' তবু নৈরাশ্যের ভেতরেই দানা বেঁধে ওঠে জনতার আন্দোলন এবং তার সুদূর প্রতিক্রিয়াও শুরু হয়ে যায়: 'পথে আর লোক নেই, জবাবী হামলা হল শুরু।/কারাগার অবারিত দ্বার, গ্রামে গ্রামে বিপর্যয়,/রাস্তায় বিক্ষুব্ধ লোক দুই দিকে সামন্ত, সন্ধ্যা রক্তরাঙা।' ... 'দিকে দিকে কালো শিবির, দেশ জুড়েছে তারা সারি সারি জমে,/জ্বালায় আগুন, বন্দরের কী বাহার।/সাম্রাজ্যের পতাকা ওড়ায় দাপটে।/আর হঠাৎ জনতা, পিঁড়ে পিঁড়ে রুদ্ধ করে পরাক্রম যোগ,/তোরে, সংহত দাপটে চূর্ণ হবে শতাব্দীর আপদ।' (অগ্নিকোণ)। 'বরাহকান্তা বিদেশী রাজ', 'রক্তলোলুপ স্বদেশী বণিক' আর 'সর্বিল পাতাবাহিনী'র দাপটে বাংলাদেশের শহরে-গ্রামে শুরু হয়ে যায় দুর্ভিক্ষ। অগণন লোক এখন 'চাষের কাঙাল', বাংলাদেশকে এই পটভূমিতে কবির মনে হয়েছে: 'আর তামসীতা, উলঙ্গিনী দুর্ভিক্ষকন্যা আমাদের দেশ/নগরের সামনে অস্থিচর্মসার সন্তানের ভিড়ে নীরবে ব'সে।' ধান, গম উধাও, সারি সারি মানুষের মৃতদেহ, আর 'ছিন্নশিশুর রক্তজবা'---তবুও বেড়ে ওঠে 'কালের বিতান':

'কারখানায় সংঘবদ্ধ জনে অনেকের ভিড়,/হাতে বিপ্লবের রাখী,/পোড়ামাটিতে অন্তরালে প্রহরী জাগে ক্ষুধিত কিষাণ।' গণ-আন্দোলনের এই দৃশ্যাবলী কবিকে প্ররোচিত করে বিপ্লবী চেতনায়ঃ ...'ইতিহাসপতি,/বিপ্লবী চেতনার সেতুতে/সঙ্কীর্ণ হয় এ দুস্তর ব্যবধান।' এই ব্যবধান বস্তুত শ্রমজীবী সংগ্রামী জনতার সঙ্গে একজন মধ্যবিত্ত বুদ্ধিজীবীর, নতুন জীবনের গণ চেতনাকে এভাবেই গড়ে তোলে বলে কবির বিশ্বাস।

দিল্লী প্রবাসী কবির পক্ষে সম্ভব ছিল না বাংলাদেশের দুর্ভিক্ষের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা সঞ্চয়ের। এ সময় তাঁকে খবরের কাগজ ও আনুষঙ্গিক বিবিধ উপায়ে এ খবর সম্পর্কে সচেতন থাকতে হয়েছে চেতনাকে আরও বেশি পরিণত করে তোলবার ইচ্ছায়। দুর্ভিক্ষ প্রগতি সাহিত্য আন্দোলনের প্রায় প্রত্যেক কবি-শিল্পীকেই নাড়া দিয়ে গেছে। সমর সেন এর প্রত্যক্ষ শরিক নন। কিন্তু অভিজ্ঞতাসম্পন্ন। 'অরণি'তে 'মন্বন্তর' নামে একটি কবিতা প্রকাশিত হয়। প্রথম স্তবক এখানে তুলে দেওয়া হলঃ

'মহিষবর্ণ জনপ্লাব মেঘে
দিগন্ত রুদ্ধ করে বৈশাখের এ দিন।
শহরের প্রান্তে
জমাট অন্ধকারে কর্দমাক্ত পথে
দুর্ভিক্ষের কঙ্কাল চলে আপন মনে।
পশ্চিমে চটকল, গঙ্গা, মধ্যে শুষ্ক শান্ত প্রাসাদে
বর্ণিল মেদে নিদ্রারত কুবের দুলাল,
আরো আগে বিস্তীর্ণ মাঠ, অনিষ্ট সবুজ।'[৩১]

('মন্বন্তর', অরণি, শারদীয় সংখ্যা)

সুকান্ত কিংবা সুভাষ, এমন কি বিষ্ণু দে-ও, জীবনের চরম দুঃখের কাছে কখনও আত্মসমর্পণের কথা বলেন নি, নৈরাশ্যের তীব্রতায় তাঁদের যন্ত্রণায় আন্তরিকতারও অভাব নেই, তবু তাঁদের আন্তর-সংকটের যে চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য তাতে উজ্জ্বলতর আশাবাদ ও বিশ্বাসবোধের সুদৃঢ় উপস্থাপনাই প্রাধান্য পেয়েছে। আর সমর সেনের মধ্যে প্রায়শঃ একটা দ্বিধা, একটা সংশয়, একটা নির্বিকল্প দুশ্চিন্তার উপস্থাপনা তাঁকে আর একটি বৈশিষ্ট্য দান করেছে। দুর্ভিক্ষ-পরিস্থিতিতে সমর সেন বিচলিত, তাঁর এই বিচলন কোন নির্দিষ্ট অথচ সুগভীর আশ্রয়ের দিকে তাঁকে ঠেলে দেয় না---' ...সে কি জানে,/তার গণতায়, দশপুত্র, দুগ্ধহীন শিশু/স্খলিত পায়ে দুর্ভিক্ষ পার হয়ে পাবে দেশান্তরী দিন,/জনক সূর্যের আশীর্বাদে পরিচ্ছন্ন গ্রাম ?'(শহরে)। এই প্রশ্নচিহ্ন তাঁর দ্বিধাদীর্ণ সংশয়-আচ্ছন্ন মানস-প্রেক্ষিতেরই একটি বিকল্পবিহীন প্রতিক্রিয়া মাত্র। দুর্ভিক্ষের বর্ণনা 'জোয়ার ভাঁটা'য় চমৎকারভাবে সমর সেনের কবি-মনকে চিনিয়ে দেয়ঃ

'হেমন্তের প্রবীণ বিষণ্ণতা/দিগন্তের মাঠে, জনহীন গ্রামে/তিতেতে ঘুঘু ডাকে,/চাষীরা পায়ে হেঁটে গেছে দূর দেশান্তরে/প্রাণের সন্ধানে নগরের প্রেতলোকে।' এই প্রেতলোকের মাঝখানে পত্রহীন সবুজস্পর্শ-হীন একটি বুড়ো বটের কথা এসেছে, যার শেকড়গুলি আকাশসন্ধানে ঊর্ধ্বমুখ---কিন্তু কেন এই সন্ধান, বুড়ো বট সে-সন্ধানে কখনও সফল হবে কি না---এমন কোন কথা কবি কিছুতেই বলতে চান নি, বরং তিনি বলেন---'কুয়াশায় ছেয়েছে সমস্ত দিক,/জানি না বুড়ো বট কিসের প্রতীক।' কাব্য-সাহিত্যে শিল্পধর্ম রচনার ক্ষেত্রে দায়বদ্ধ লেখকেরা নিজস্ব কমিটমেন্টকে যে নিঃসঙ্কোচ প্রাধান্য দিয়ে থাকেন, কোন কোন কবিতায় সে-আভাস পরিলক্ষিত হলেও বেশির ভাগ কবিতায় সমর সেন তার ব্যতিক্রমী দৃষ্টান্ত রাখতেও সমর্থ হয়েছেন। যদিও দায়বদ্ধতার প্রশ্ন ভিন্ন ব্যঞ্জনায় প্রকাশ করেন তিনি, যেমনঃ 'সাপ যত বসে আছে শিকারের আশে।/রাত্রি ঘন এল, মৃত্যু লেখা ব্যাঙের কপালে॥/মহাজন পান খায়, বসায়ং ধান।/অন্ধকার প্রেতলোকে জাগে ভগবান॥' (স্তোত্র)। এটিও দুর্ভিক্ষের পটভূমি মনে রেখে লেখা। কবিতাটিতে চাষী প্রজারা ব্যাঙের উপমায় আর সাপ মহাজনের উপমায় এসেছে---ব্যাঙের নয়, মৃত্যু লেখা চাষীর কপালে, বাংলাদেশের চাষীরা সবে যখন দুর্ভিক্ষের দৈন্যদশা কাটিয়ে 'শ্যামবর্ণ মুক্তি' (ধান বর্ষে)-র স্বপ্ন দেখতে শুরু করেছে, তখন 'ধান বেচে মহাজন বলেছে সাবাস।' এই বৈপরীত্য আভাসিত হয়েছে শুধু সঙ্কেতেঃ 'আকাশে শুনেছি আজ মেঘের বিষাণ।' কবি কোথাও শ্রেণী-সংঘর্ষের কথা সরাসরি না বলেও, চাষী-প্রজার সমর্থনে কোনও ভবিষ্যৎ নির্দিষ্ট না করেও এক অতর্কিত সপাট বক্তব্য বলে ওঠেন, 'প্রভুর বন্যা শুনি দেশের ভবনে',---এ তো কেবল বিশুদ্ধ ব্যঙ্গোক্তি নয়, এতে সমর সেনের সংশোধন সমর্থনের নিখুঁত একটি আভাস ছড়িয়ে আছে যা তাঁর দায়বদ্ধতার তথা একটি রাজনৈতিক আদর্শসংবলিত কমিটমেন্টেরই অঙ্গ বিশেষ। দুর্ভিক্ষের প্রস্তাবনায় তাঁর নৈতিক সমর্থন সর্বতোভাবে সর্বহারা মানুষের সপক্ষে---বয়স বঁচিদের কেরানীসন্তানকেও 'বিকল অন্তরে' ভাবতে হয় 'কালের রাখাল/ফেরে না নির্জন মাঠে গভীর সন্ধ্যায়', 'বিচ্ছিন্ন শহর প্রান্তে' দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখতে হয় ঃ 'দূরে দেখি মাঠে কত ধানের দুলাল,/কিষাণের চষা ক্ষেত নিমকহারাম।'(আকাল)। অন্যত্রঃ 'আমার সোনার ধানে/পরিচিত হাত রাখে নতুন দালাল।'(বিকল্প)। '২২শে জুন' কবিতাতেও কবিকে বলতে শুনি 'কঙ্কালে ভরেছে দেশ', 'এ রোদে সোনার ধান পোড়ে'।(২২শে জুন)। অন্যত্রঃ 'ফ্যান খুঁজে খোঁজে গৃহস্থের দুয়ারে দুয়ারে/বিরাট নগরে।' (গৃহস্থবিলাপ)। এইসব মানুষের প্রতি সহানুভূতিতে কবির খামতি নেই। তাঁর সর্বাত্মক চেষ্টা তাই শ্রেণী-উত্তরণের ব্যাপারে। তাঁকে বলতে হয় 'শ্রেণীত্যাগে তবু কিছু আশা আছে বাঁচবার।' বলতে হয়ঃ 'যারা মাঠে খাটে,/উদয়াস্ত মাটিতে জান কেটে/মাছ ধরে যারা আনে হাটে,/ধান জল বিদ্যুত

কয়লা/আনে যারা বস্তিয়া ঘরে ঘরে,/সরায় ময়লা, দুধ দেয় যে গয়লা/তাদের মিতালি খুঁজি।' (প্রথম বিলাপ)। সমর সেন এই মিতালিরই সন্ধান করেছেন তাঁর স্বল্পকালীন কাব্যসাধনায় (১৯৩৭ থেকে ১৯৪৬ খ্রীষ্টাব্দ অবধি)। তবুও এই সন্ধানে কোন কোন সমালোচকের ব্যর্থ মনে হয়েছে, এই ব্যর্থতা সম্পূর্ণ তাত্ত্বিক কারণ সম্ভূত। প্রশ্ন তুলেছেন মঙ্গলাচরণ চট্টোপাধ্যায়: ...'শ্রেণীত্যাগ তো জীর্ণ কাপড় পরিত্যাগের মতো কোনো একটি বিশেষ কাজ নয়, সেটি একটি আয়াসসাধ্য কর্মপদ্ধতির সঙ্গে নিবিড়ভাবে সংশ্লিষ্ট। যুগসঞ্চিত শ্রেণীসংস্কারের বিরুদ্ধে সংগ্রামের পেছনে দীর্ঘকালের যে সক্রিয় ইতিহাস থাকে, সমসাময়িক কালের সঙ্গে ব্যক্তিচেতনার একাত্মতা উপলব্ধির পদ্ধতির যা অনুষঙ্গী, সমরবাবুর বর্ণিত এই মনুষ্যত্ব ও মারীগ্রস্ত ভগ্নমন মধ্যবিত্ত-জীবনে তার স্বীকৃতি কোথায়?'[৩২] ঠিক কথাই, সমর সেন তা স্বীকারও করেছেন 'বাবুবৃত্তান্তে'---কেন তাঁর মানসিক বিকাশ ব্যাহত হয়েছে, তবু প্রশ্ন থাকে, ক্যাডার-কর্মী না হয়েও যদি কোন শিল্পী-সাহিত্যিক গণ-অনুভূতির সার্বিকতাকে স্বীকরণ করতে চান এবং তা করতে যদি সমর্থও হন, তাহলে সে-শিল্প বা সাহিত্যের বিচার নন্দনতত্ত্বের কোন্ মানদন্ডে হবে? আমরা তাঁর শিল্পতত্ত্বের আলোচনায় এ কথা বলেছিলাম যে, তাঁর শিল্পতত্ত্বে বুদ্ধিবাদের একটি দিক আছে, সমর সেন শিক্ষিত মধ্যবিত্তশ্রেণীর মানুষ হিসেবে বুদ্ধির দ্বারা শ্রেণী-চেতনার উত্তরণ ঘটাতে চেয়েছেন, বাস্তব কার্যকারিতা হয়ত-বা তার বিপরীত, তথাপি তাঁর এবংপ্রকার অতি-সচেতনতা অন্তর্দ্বন্দ্বের পরিণাম হিসেবে কতখানি শিল্পসম্মত সে প্রসঙ্গই আমাদের আলোচ্য হওয়া উচিত। অনেক সময় আমরা দেখেছি যে, মানবিকগুণসম্পন্ন কাব্যকে শিল্পগুণসম্পন্ন করে দেখা হয়েছে। রবীন্দ্রনাথের কবিতা 'এবার ফিরাও মোরে'-এর মধ্যে মানবিকগুণ অত্যন্ত প্রকট:

> 'ওই যে দাঁড়ায়ে নতশির
> মূক সবে, ম্লানমুখে লেখা শুধু শত শতাব্দীর
> বেদনার করুণ কাহিনী, ...
> ... ...
> ...এইসব মূঢ় ম্লান মূক মুখে
> দিতে হবে ভাষা, এই সব শ্রান্ত শুষ্ক ভগ্ন বুকে
> ধ্বনিয়া তুলিতে হবে আশা, ডাকিয়া বলিতে হবে--
> 'মুহূর্তে তুলিয়া শির একত্র দাঁড়াও দেখি সবে,
> যার ভয়ে তুমি ভীত সে অন্যায় ভীরু তোমা-চেয়ে,
> যখনি জাগিবে তুমি তখনি সে পলাইবে ধেয়ে।'
>
> ('এবার ফিরাও মোরে', চিত্রা)

রবীন্দ্রনাথের দরদ শোষিত মানুষের প্রতি, অপমানিতের প্রতি প্রকাশ পেয়েছে---শ্রেণী-চেতনার এই

যুক্তিযুক্ত পরিণতির কথা মনে রাখলে সমর সেনকেও বোঝার সুবিধে হবে। মঙ্গলাচরণ প্রমুখ অনেক সমালোচক ইঙ্গিত দিয়েছেন ক্যাডার-কর্মীর দায়িত্বের প্রতি, কিন্তু শ্রেণী-দ্বন্দ্বের প্রকাশ শ্রেণীবিভক্ত সমাজে তো নানান আকারে নানান রূপে প্রকাশিত হতে পারে। এ কথা ধরে নিলে বিভিন্ন শ্রেণীতে অবস্থান-জনিত কারণে তাদের মানসিক-চেতনা ভিন্ন ভিন্ন 'টোন' বা সুর নিয়ে উপস্থিত হতেই পারে। ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে এই চেতনার মানও তাই ভিন্নভাবে ধরা পড়তে পারে। শ্রেণীবিভক্ত সমাজের শিল্পসাহিত্যের রূপ-নির্মাণে একজন ক্যাডার-কর্মী যে দায়িত্ববোধ অনুভব করেন, কবিও কি সেই দায়িত্ব অনুভব করবেন ? কবি সেই দায় অনুভব করেছেন একটু ভিন্নভাবে, এর আগে তা আলোচনা করেছি, মানতে হবে, সমর সেনের শ্রমজীবীর মিতালি-অন্বেষার মানবিক-প্রক্রিয়া যে ব্যাপকার্থে প্রগতিশীল উপাদান তা কোন সংশয়ের অপেক্ষা রাখে না। প্রসঙ্গত নেরুদার একটি কবিতার কয়েক পংক্তি উদ্ধার করি:

'আমাকে না জেনেও, যে তোমরা আমার অপেক্ষায় ছিলে,
আমি সেই তোমাদেরই একজন,
আর সেই তোমাদের শোনাব বলেই আমি গান গাই।'[৫৩]
(পলাতক--১২)

যে সমস্ত মানুষেরা দীর্ঘ নদীর দুধারে, আগ্নেয় গিরির পাদদেশে, তামার খনিতে, জেলেপাড়ো, চাষীবাসী আদিবাসী ইন্ডিয়ান কিংবা মুচি প্রভৃতি যে অখ্যাতজনেরা, তাদের সঙ্গে কবির কোন যোগাযোগ নেই, কবি যেমন তাদের জানেন না, তারা তেমনি কবিকেও জানে না। কিন্তু তা সত্ত্বেও, নেরুদা কি করে দৃপ্তের মত উচ্চারণ করেন, 'আর সেই তোমাদের শোনাব বলেই আমি গান গাই' ? নেরুদা'র কবিতায় শ্রমজীবীর সঙ্গে কবির ব্যবধানটা বিশেষ চোখে পড়ে না। সমর সেনের কবিতায় এই ব্যবধান কবির কথাতেই প্রকট। তাসত্ত্বেও তিনি যখন শ্রমজীবীর মিতালি-অন্বেষণকেই জীবনের সার্বিক উৎকর্ষের হেতু হিসেবে দেখতে পান, তখন তা কেবল বুদ্ধিপ্রণালীর বিষয় হিসেবে নয়, জীবনের এক বিশেষ অভিজ্ঞতা কিংবা যুগের এক তীব্র আগ্নেয়-সংকট থেকে উত্তরণের পন্থায় একধরনের আন্তরিক বিশ্বাসবোধেরও জীবন্ত ও স্পর্ধী প্রমাণ হিসেবে তা গ্রাহ্য হবে না কেন ?

যাই হোক, মানুষের চলমানতাকে ঐতিহাসিক অগ্রগতির সঙ্গে মিলিয়েই সমর সেন সারা বিশ্বের সমস্ত প্রকারের মুক্তিসংগ্রামকে সমর্থন জানিয়েছেন। মধ্যবিত্ত জীবনে 'আত্মকরুণার গ্লানি' পার হয়ে 'সহজ জীবনে সহজ বিশ্বাসে' মুক্তিকামী মানুষের মতই তিনি ফিরতে চেয়েছেন আর---

'এ কামনা আছে বলে এখনো বাঁচোয়া,
এ কামনা আছে বলে
এক এক দিন যন্ত্রণাতের নরম স্তব্ধতাকে ছিন্ন করে,

একান্ত সে মুহূর্তে বুঝি,
জীবাণুর আর দুর্ভিক্ষের সঙ্গে লড়ে যারা
বাঙলাদেশে, উড়িষ্যায়, মালাবারে, উত্তর বিহারে,
যারা লড়ে ইউগোস্লাভিয়ার বন্ধুর পাহাড়ি পাহাড়ে
রাশিয়ার রক্তমাটিতে, বেদনাশুদ্ধ চীনে, ফ্রান্সের
কিষিক্ত্ প্রান্তরে,
আমারি আত্মীয় তারা,
(লোকের হাটে)

এই আন্তর্জাতিকতাবাদের সঙ্গে সুকান্তের আন্তর্জাতিকতাবাদেরও এক অবশ্যম্ভাবী মিল। অবশ্য প্রগতি আন্দোলন এই সামূহিক ঐক্যের ওপরেই নির্ভরশীল ছিল। সমর সেন পরাধীন দেশের কথাও ভুলতে পারেন না, তাঁর মনে হয়েছে 'রাম ও রহিমের কণ্ঠে আসমুদ্র-হিমাচল গান' যদি বেজে ওঠে তাহলেই প্রাপ্তি ঘটবে 'স্বাধীন হিন্দুস্থানে আজাদ পাকিস্তান।' (ঐ)। রাম-রহিমের প্রসঙ্গ ওঠার কারণ হল ব্রিটিশ ভাইসরয়ের ডাকা সিমলা-কনফারেন্সে' কংগ্রেস ও লীগের মধ্যে মতৈক্যের প্রস্তুতি বিষয়ক। এই বৈঠক ব্যর্থ হয়। কমিউনিস্ট পার্টির পক্ষ থেকে সাম্প্রদায়িক ঐক্যের প্রচেষ্টা দীর্ঘকাল ধরে চলছিল। ১৯৪২খ্রীষ্টাব্দেও ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির জেনারেল সেক্রেটারী 'কংগ্রেস-লীগ ঐক্যের জন্য কার্যক্ষেত্রে অগ্রসর হউন'[৫৭] বলে আহ্বান জানিয়ে ছিলেন। তাছাড়া মেনে নেওয়া হয়েছিল মুসলমান জাতির জন্যে পাকিস্তান-প্রস্তাব। ১৯৪৫-এর এই ঘটনা যখন ভারতবর্ষের আকাশ-বাতাস মথিত করে তুলছিল তখন নাগাসাকিতে আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের দ্বিতীয়বার এ্যাটম বোমা নিক্ষেপের ঘটনা সাম্রাজ্যবাদের হিংস্রতম রূপটি প্রকাশ করে ফেলল (৯ অগাস্ট, ১৯৪৫)। তার আগের দিন (৮অগাস্ট, ১৯৪৫) রাশিয়া জাপানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে এবং পরদিন মাঞ্চুরিয়া আক্রমণ করে। মহাযুদ্ধ শেষ হওয়ার মুখে এ্যাটম বোমা বিস্ফোরণের ঘটনাকে বিশ্বের কল্যাণকামী মানুষ কোনমতে মেনে নিতে পারেন নি। সমর সেনের কবি-মনও নয়, তিনি লেখেন: 'বিপন্নের রক্তসন্ধ্যা, মেঘে মেঘে ঘোর শঙ্কা।/উত্তরপূর্ব এশিয়ার রুক্ষ প্রান্তরে/বিজন উটের দল মুখ তুলে শোনে,/ মেঘে মেঘে লাল রক্ত, বসন্তের বজ্রধ্বনি মাঞ্চুরিয়ায়'। (৯ই আগস্ট, ১৯৪৫)। বোমা বিস্ফোরণে 'মেঘে মেঘে লাল রক্ত' একদিকে, অন্যদিকে মাঞ্চুরিয়ায় 'বসন্তের বজ্রধ্বনি', এই বৈপরীত্য দুটি বৃহৎ শক্তির সংঘাতগত প্রেক্ষিত। হিন্দুস্থানে সাম্রাজ্যবাদীরা এখনও বহাল তবিয়তে---বরং সিমলা-সম্মেলনের পর 'নেতারা যে যার শিবিরে প্রত্যাগত,/লাটের ভোজ কিতে পরম শত্রু আজ দোস্তে পরিণত,/সুন্দর মসুতে'---এখানে গণ-আন্দোলন বা মুক্তিসংগ্রাম মূল লক্ষ্য থেকে চ্যুত, তার বদলে এক বিকৃত নৈরাজ্যিক পরিবেশ---'এখানে রাজনীতি

শুধু পরনিন্দা, পরচর্চা, খুড়োর আখেরা, / ইজ্জতের পোশাক যারা / একরোখা অন্ধ রাগে আত্মঘাতী যারা / এ দুর্দিনে তাদেরই আসর, রাজনীতি তাদেরই খেলা।' (১৫ই আগস্ট, ১৯৪৫) এইসব নেতিবাচক রাজনৈতিক-আন্দোলনের প্রতিক্রিয়া সহজেই তাই কবি অনুমান করতে পেরেছেন: 'আর দেখে দেখে কালো শঙ্কা জাগে, / নদীর পেছুয়া দেশ আনে না কমলের অগ্নিশিখা।' (ঐ)। কবি এখানে কোন তাৎপর্যময় আলো দেখেন নি। কিন্তু ১৯৪৬ খ্রীষ্টাব্দে ব্রিটিশ ক্যাবিনেট মিশন প্রেরণজনিত প্রতিক্রিয়া এবং অন্যদিকে ইজিপ্ট, প্যালেস্টাইন, বর্মা, মালয় ও ইন্দোনেশিয়ায় গণমুক্তিসংগ্রামের সংবাদ এদেশেও মুক্তির ব্যাকুলতা সৃষ্টি করে যা কবিকে অভিপ্রেত আলোর সন্ধান দেয়। ১৯৪৬ খ্রীষ্টাব্দ বাংলাদেশের এমন এক বিশিষ্ট সময় যখন কারোর পক্ষে ভুলে যাওয়া সম্ভব ছিল না কলকাতার রাজপথে রাজপথে মানুষের মুক্তি-আকাঙ্ক্ষার বিস্ফোরণ-তীব্রতা। কিন্তু পরে পরেই সাম্প্রদায়িক হানাহানি অশুভ অন্ধকারকেই যেন প্রকট করেছে। তবু সমর সেন আলোই চেয়েছেন, এই আলোর অস্পষ্টরেখা প্রেরণার মত দীপ্ত হয়ে উঠতে চেয়েছে বিভিন্ন দেশের মুক্তিসংগ্রামে, দেশের অভ্যন্তরে নানা প্রেরণামূলক গণ-সংগ্রামে, যেমন নৌ-সেনা বিদ্রোহ, ডাক-তার ধর্মঘট, কলকাতা করপোরেশনের ধাঙড়দের ধর্মঘট, ইত্যাদি ইত্যাদি। নৌ-বিদ্রোহের আলোড়ন কবিকে স্পর্শ করে এইভাবে:

'বন্দরে দিন রেখে গেল বারুদের গন্ধ,
রাস্তায় রক্তের ছিটে।'

(জয়হিন্দ)

এই আন্দোলনের সমর্থনে এগিয়ে আসেন কমিউনিস্ট নেতৃবৃন্দ। সর্দার বল্লভ ভাই প্যাটেল এর তীব্র বিরোধিতা করেন, কবি ব্যঙ্গের সুরে বলেন, 'বিপ্লবী নেতারা জমে বক্তৃতার মাঠে, / সর্দারের ধমকে পার্কের রেলিং কাঁপে, / হয়তো কৃত পাপের লজ্জা জাগে / মর্মে জমা দুখো সতরটা লাগে।' (ঐ)। রজনীপাম দত্ত অবশ্য সরকারী হিসেবমত এই মৃতের সংখ্যা বলেছেন ২৫০জন।[৫৫] সম্ভবত যে শুধু আলোর দীপ্তি কবির চোখে মায়াঞ্জন পরিয়েছিল অচিরে তা নিভে গেল ব্রিটিশ ক্যাবিনেট মিশনের আগমনে, কবি জানেন, এরপর শুরু হবে স্বাধীনতা ও দেশ ভাগাভাগির ব্যাপার নিয়ে সাম্রাজ্যবাদী মহলের দর-কষাকষি, কবি বলে ওঠেন: 'আমাদের স্বাধীনতা আসন্নপ্রায়, / মন্ত্রীসভায় বিলিতী দূতেরা আগতপ্রায়, / জয়হিন্দ'---হয়ত কবি নিজেরই অগোচরে এক ভয়ঙ্কর প্রশ্ন ও সংশয়ে কণ্টকিত---এ কোন স্বাধীনতা? শেষ কবিতাটি 'জন্মদিনে' বোধকরি সেই শঙ্কাই সত্য বলে প্রতিভাত হয়। মুসলিম লীগের 'প্রত্যক্ষ সংগ্রাম' পুরোপুরি চালিত হয় হিন্দুদের বিরুদ্ধে, অথচ এই আন্দোলন নিতে পারত ব্রিটিশবিরোধী চেহারা বিশেষ করে সিমলা-সম্মেলন ও ক্যাবিনেট মিশনের ব্যর্থতার কারণে। কবি অতঃপর উপলব্ধি করেন ভারতীয়দের কোন্

দিকে অভিযাত্রা :'বাঙলায় বিহারে গড়মুক্তেশ্বরে/ বিকলাঙ্গ লাশ কাঁধে/লোক চলে গোরস্থানে/ কিম্বা পোড়াবার ঘাটে।' (জন্মদিনে)। কবি বলেন, 'মৃত্যু হয়তো মিতালি আনে:/ভরণীলা শান্ত করে সবাই সমান---/বিহারের হিন্দু আর নোয়াখালির মুসলমান/নোয়াখালির হিন্দু আর বিহারের মুসলমান।' (ঐ)। কবির শেষ উপলব্ধি: 'রোমান্টিক ব্যাধি আর রূপান্তরিত হয় না কবিতায়।' জীবনের বাস্তবতা আরও কঠিন, আরও নির্মম---প্রাত্যহিকের এই বাস্তবতা কবির স্বপ্নকে শেষ পর্যন্ত চুরমার করে দিয়েছে, কবি অতঃপর হয়ে গেছেন এক গভীর সংশয়ে আর দ্বিধায়, যে আলোর দীপ্তি ঘাটে ঘাটে দেখতে পেয়ে আশার সুর তাঁর কণ্ঠে বেজে উঠেছিল, তারই সমাধি ঘটল অচিরে সাম্প্রদায়িক ভেদবুদ্ধির উৎকট প্রকাশে। মানুষের প্রতি মানুষেরই বিশ্বাস এমন অবস্থায় টলে ওঠে। সম্ভবত সমর সেনেরও এই বিশ্বাস আর স্থির-নিশ্চয় ছিল না, বাধ্য হন বলতে---'আমরা শ্মশান ভূমি সুখাত সলিলে।' বলেন, 'মৃত্যু হয়তো মিতালি আনে'। জীবনের এমন পরিণাম যখন জীবনবাদী কোন কবির গলায় ধ্বনিত হয়, বুঝতে হবে তাঁর বেদনার পরিমাণ কতটা। কবি জানেন, মৃত্যু অনিবার্য, কিন্তু যে মৃত্যু উদ্দেশ্যপ্রণোদিত, রাজনৈতিক দুষ্ট স্বার্থের অধীনে পরিচালিত, যার পেছনে অন্ধ উন্মাদনা ও ধর্মীয় গোঁড়ামির প্রেরণাই সর্বাধিক, সেইসব মৃত্যু আত্মহনন ছাড়া আর কী! মানুষের মৃত্যু কবিকে ততটা ব্যথা দেয় না যতটা দেয় মনুষ্যত্বের মৃত্যু। সমর সেন মার্কসবাদী হয়েও ভেঙে পড়েছেন মানুষের এমনতর অপঘাত মৃত্যুর প্রাবল্যে, হয়ত-বা সেই কারণে উচ্চারণ করেছেন---'মৃত্যু হয়তো মিতালি আনে'। এ তাঁর জীবনদর্শন নয়, তাঁর অন্তরের আর্ত দীর্ঘশ্বাস।

সমর সেনের শিল্পপ্রকরণ:

বিষ্ণু দে আরাগঁ-র উক্তির অনুসরণ করে আমাদের স্মরণ করিয়ে দেন যে কাব্যের ইতিহাস হল তার টেকনিকের ইতিহাস। (বিষ্ণু দে-র কবিতা' শীর্ষক আলোচনা দ্রষ্টব্য)। সমর সেনও সম্ভবত এই বিশ্বাসে আস্থা রেখেছেন, বলেন ,' কালক্রমে টেকনীক নিয়ে যাবে নব কাব্যলোকে'। (২২শে জুন)। তথাপি তাঁর অজ্ঞাত নয় যে কাব্য টেকনিকসর্বস্বই নয়, টেকনিক যেহেতু আত্মপ্রকাশের একটি মাধ্যম, সেইহেতু এই মাধ্যমের বিশেষ গুরুত্ব স্বীকার্য, তাই বলে টেকনিকে চূড়ান্ত সিদ্ধি এমন কথা সমর সেন বলেন নি। নইলে রবীন্দ্রনাথকে বিদ্রূপ (২২শে জুন' কবিতাটি দ্রষ্টব্য) করতেন না এই বলে, 'তারপর জল পড়ে, পাতা নড়ে। তারপর/সত্য শিব ও সুন্দর।' বলতেন না এধরনের কথাও, 'আর্টের কৈবল্য শুধু, অখণ্ড চৈতন্য শুধু' ইত্যাদি কথাও। যাই হোক, সব বিশিষ্ট কবিই আত্মপ্রকাশের জন্যে স্বীয় ক্ষমতা অনুযায়ী মাধ্যমটিকে অভিনবত্ব বা বৈচিত্র্য দান করতে উৎসাহী হন। সমর সেন অবশ্য প্রগতিশীল শিবিরে এটা নিয়ে বিতর্কের সম্মুখীন হন।

এসম্পর্কে আগেই আমরা সংক্ষিপ্ত আলোচনা করেছি। এখানে বরং তাঁর শিল্পরূপকরণের বৈশিষ্ট্য ও প্রয়োগ-কুশলতার দিকগুলি অংশত যাচাই করে নেব।

সমর সেনের শিল্পরূপকরণের আলোচনায় অনিবার্যভাবে ছন্দই সবচেয়ে বেশিকরে গুরুত্বপূর্ণ প্রসঙ্গ যার পর্যালোচনা ব্যতিরেকে সমর সেনের কাব্যপ্রতিভার মূল্যায়ন সম্ভব নয়। যে রবীন্দ্রনাথ সমর সেনের রচনায় কাব্যের সাধনা' প্রকাশ পেয়েছে বলে মন্তব্য করেন, তাঁরও সম্ভবত দৃষ্টি এড়ায় নি এই অভিনব ছন্দটি। বিস্ময়ে অভিভূত হয়েছিলেন বুদ্ধদেব বসু, বলেছিলেন, 'আমার ধারণা ছিলো গদ্য রচনায় ভালো দখল থাকলে তবেই গদ্যকবিতায় স্বাচ্ছন্দ্য আসে, কিন্তু সমর সেনের মধ্যে এর ব্যতিক্রম দেখলুম।' [৩৬] তাঁর চোখে পড়েছে আরও একটি বৈশিষ্ট্যঃ রবীন্দ্রপ্রভাবমুক্ত তাঁর গদ্যছন্দ বাংলা ভাষায় সম্পূর্ণ 'অভিনব'। এটি তাঁর অভিমত।

বুদ্ধদেব বসুর কথাগুলির যথার্থ ঐতিহাসিক মূল্য অনস্বীকার্য। সত্যি বলতে, বাংলা ভাষায় যথাযথ গদ্য ছন্দের চর্চা হয়েছে সামান্যই এবং তা রবীন্দ্রনাথের রচনায়। অতিনিয়মিত ও অতিনিরূপিত ছন্দের বাঁধন কেটে রবীন্দ্রনাথ-এর চেষ্টা ছিল সম্পূর্ণ বন্ধনমুক্তির, কিন্তু যে কোন কারণেই হোক, সেই চেষ্টা ফলবতী বা ফলবতী হয় নি তেমন করে। শঙ্খ ঘোষ এর একটা কারণ অনুমান করেছেন, কবির মজ্জায় মজ্জায় ছিল 'মুক্তির সাধনা', খানিকটা ইতস্তত করেও যথার্থ মন্তব্য করেন তিনিঃ 'আর তাই একথা হয়তো বলা দরকার যে রবীন্দ্রনাথের কবিতায় ফ্রী ভার্সের উদাহরণ তেমন নেই।' [৩৭] অতঃপর 'ফ্রী ভার্সের উদাহরণ খুঁজতে তাঁকে ছুটতে হয় রবীন্দ্রনাথের গান বা গীতিনাট্যগুলির দিকে। বুদ্ধদেব বসুর কথাটির গুরুত্ব এইখানে। সমর সেন প্রথম আবির্ভাবেই তাই চমকে দেবার স্পর্ধা রাখেন, গদ্যছন্দে তাঁর এমনই অধিকার।

একথা বলার অপেক্ষা রাখে না যে, একটি যুগের মৌল ও বিশিষ্ট লক্ষণকে আত্মসাৎ করে যুগের কোন কোন দাবি মিটিয়ে দিতে পারে ছন্দও---মধুসূদন দত্ত এ ঘটনার শ্রেষ্ঠ উদাহরণ। মধুসূদন ছন্দের ভেতরে যে বিশেষ বৈশিষ্ট্যটি আবিষ্কার করেন তা হল পয়ারের মধ্যেও বেগবান প্রবাহের সঞ্চার, অমিল বা ভাবগত যতির প্রচলিত বিধিকে অস্বীকার(বিশেষ করে এটি আয়ত্ত করেছিলেন ইংরেজি কাব্যের বা বাক্যবিধির অনুকরণে বা অনুসরণে), নব প্রয়োগের ও বাকরীতির ক্ষেত্রে সচেতন আধিপত্য বিস্তার করে যুগলক্ষণকে চিহ্নিতকরণ ইত্যাদি। সমর সেন যখন কবিতা লিখছেন, সময়টা লক্ষণীয়---তিনের দশকের আর্থ-সামাজিক সংকট ঘনীভূত হয়ে উঠেছে বিশ্বব্যাপী অর্থনৈতিক মন্দার কারণে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের প্রস্তুতিতে মেতে উঠেছে সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলি। ব্রিটিশ-ভারতীয় ঔপনিবেশিক শাসনব্যবস্থায় পুঁজির বিকাশের নিয়মানুসারে বুর্জোয়া সমাজের চারিত্র্যলক্ষণগুলি প্রকটিত হয়েছে। সমর সেন ভেবেছেন, 'বুর্জোয়া টেকনীক কালক্রমে মার্জিত পৃথিবী

মানে'। মুমূর্ষু ধনতন্ত্রের এ দেশের তিমির এবং সমাজতন্ত্রের প্রতিজ্ঞা---একথা সমর সেনের নয়, কার্ল মার্কসের, প্রতিপাদ্য এই বিষয়টিই মূলত তিনি বুর্জোয়া সমাজের বিশ্লেষণের ভেতর দিয়ে তুলে ধরতে চেয়েছেন। এ দেশের কথা, মুমূর্ষু জীবনের কথা, শ্রেণী-মানুষের গ্লানি তথা তাদের অসঙ্গতির কথা বলতে গিয়ে, তৎকালের নিখুঁত পটভূমিকে জীবন্ত করে তোলার দায়িত্ব অনুভব করেছেন কবি, আর তাই গদ্যই হয়ে উঠেছে তাঁর কাব্যভাষা, এই ভাষা জীবনের খুব কাছাকাছি বলে বাকপূর্ব স্বাভাবিক উচ্চারণের সুর লেগেছে তাতে। রবীন্দ্রনাথের গদ্যকবিতায় যা মেলে নি, সমর সেনের কবিতায় সেটাই এসেছে ভাব ও ভাষার সামঞ্জস্যের গভীরতায়। লক্ষ করার, গদ্যধর্মী সমর সেনের কবিতায় বাক্পর্বগুলি প্রায় গদ্য বাক্যাংশের মতই। বুদ্ধদেব বসুর সন্দেহ প্রকাশ পেয়েছে এই গদ্য সম্পর্কে, যে কারণে তিনি একে নিছক গল্প বা প্রবন্ধের গদ্য বলে মেনে নেন নি, বলেছেন, 'এ যেন বিশেষভাবে কবিতারই বাহন।'[৩৮] আবিষ্ট সংকেতের আবহ রচনায় এই 'অভিনব' প্রকরণটির গুরুত্ব অনিবার্য হয়ে উঠেছে। যেমন:

'তুমি কি আসবে আমাদের মধ্যবিত্ত রক্তে
দিগন্তে দুরন্ত মেঘের মতো।
কিম্বা আমাদের ম্লান জীবনে তুমি কি আসবে
হে ক্লান্ত উর্বশী,
চিত্তরঞ্জন সেবাসদনে যেমন বিষণ্ণমুখে
উর্বর মেয়েরা আসে,
কত অসুস্থ রাত্রির তৃষিত ক্লান্তি
কত দীর্ঘশ্বাস,
কত সবুজ সকাল তিক্ত রাত্রির মতো,
আরো কত দিন।'

(উর্বশী)

আর একটি উদাহরণ দিলে বোঝা যাবে, সমর সেন কবিতাকে কলকাতার কথ্যরীতিতে কিভাবে ভেঙে সাজিয়েছেন: 'হায়েনা হায়েনায় সময় কাটাই/দিন আনি দিন খাই।/আজ চলুন, শহরে বেরোই,/এখানকার সন্ধ্যা দেখুন,/কফির রঙ,/কোন দোঁআড়ি দেবতার গাভীর যেন।' (নাগরিক-৪)। এই রীতিতে পরে সুভাষ মুখোপাধ্যায়ও কবিতা লেখেন।

কখনও কখনও সমর সেন ইংরেজি বাক্যাংশের আদলেও কবিতার বাক্যাংশ গড়ে তুলেছেন, কিন্তু শ্রুতিতে তা কটু লাগে না। যেমন: 'বিষণ্ণ বাড়িতে, নিরানন্দ যে যুবক/দিন আনে দিন খায়, সহধর্মিণীকে,/কুড়িতে বুড়ী সে, তাই বাধ্য করে'। (কালের যাত্রা)।

মুকুন্দদের সোনা বানিয়েছেন কবি এভাবে: 'এ ঘোর রজনী, মেঘের ঘটা/কী করে আসবে বাটে,/দূর বাগিচে বঁধুয়া ডিঙিয়ে/বেতারে শুনে পরাণ ফাটে।' (পর্বজনবাহিনী-২)। মাত্রাবৃত্ত ও স্বরবৃত্তকে এইভাবে

একইসঙ্গে বাজিয়ে বাংলাভাষার ক্ষেত্রেও সঞ্চার করতে পেরেছেন তার বিশিষ্ট ধ্বনিমাধুর্যটুকু, এই কৃতিত্ব কম নয় মোটে।

সমর সেনের কবিতায় আরও একটা জিনিস লক্ষ্য করবার। পংক্তিবিন্যাসে কখনও কখনও প্রায় অন্ত্যমিলে মিল ও অমিলের মিশ্রণ ঘটিয়ে, কিংবা কখনও অন্তর্মিল প্রয়োগের মধ্য দিয়ে ধ্বনিবৈচিত্র্য সৃষ্টির চেষ্টা করেছেন। যেমন---

> বিস্তীর্ণ বালি, ধূধু বালি,
> হাতে কাজ নেই, মন খালি,
> শূন্য মেঘের জালি।'

(কয়েকটি মৃত্যু-২)

অথবা, 'তাকে কুমির, কাটে খাল, যদি বলে, স্বাধীনতা তৈরি খাল' কিংবা 'সস্তায় মহুয়া, দুধ দেয় যে গরুরা'---এভাবে অনুপ্রাস তৈরি করে নেওয়াটা, বিশেষ করে অন্তর্মিলের সাহায্যে, কবির লক্ষ্য সাধক লক্ষ্য নয়, তার চেয়ে তাঁর আসল উদ্দেশ্যটা হল হাল্কা ভঙ্গিতে গাম্ভীর্যপূর্ণ পরিবেশটি সহসা বিনষ্ট করে জীবনের অসংলগ্নতাকে তীব্রতায় প্রকট করা। এ ব্যবহার সমর সেনের নিজস্বচিহ্নিত। প্রাক্-সমর সেনপর্বের কবিতায় এই ভঙ্গিটি বিরল। গদ্যছন্দের ক্ষেত্রে ও মিলপ্রয়োগের এই বিশেষ রীতিটি সমর সেনের আবিষ্কার বলতে হবে।

সব কবিতাই যে তিনি গদ্যছন্দে লিখেছেন এমন নয়। অক্ষরবৃত্তের যৎসামান্য চর্চাও করেছেন এবং তাতে বৈচিত্র্য এনেছেন। 'স্মরণ' কবিতাটি প্রাচীনরীতির পয়ার, যতিচিহ্ন হিসেবে এতে একটা দাঁড়ি (প্রথমে) এবং পরবর্তী পংক্তিতে দুটো দাঁড়ি চিহ্ন ব্যবহার করে আধুনিক কবিতায় একটা চমক আনবার চেষ্টা করেছেন যা শুধু সমর সেনকেই মানায়। মিলযুক্ত এই পয়ারটি ১০ পংক্তির, লক্ষণীয় হল তৃতীয়, চতুর্থ ও পঞ্চম পংক্তির মিল (যথা 'আকাশ', 'আশ্বাস', 'আবাস'), অন্যত্র ঠিক পাশে দুটি পংক্তির মিলবিন্যাস। 'আনন্দমঠ' ৭ পংক্তিতে রচিত পয়ার। মিলহীন। কিন্তু শেষতম পংক্তিতে হঠাৎ ৮+৬ মাত্রার বিন্যাসের বদলে ৮+৪+৬ মাত্রার বিন্যাস আনা হয়েছে----'যবনদুর্যোগ শেষে আশা যদি দুলাল সকাল।' লক্ষ্য করার, 'তিনপুরুষ'-এর প্রথম সংস্করণে তৃতীয় পংক্তিটি ছিল 'দুর্দান্ত যৌবনকালে ধরেছি উপনিষদ', আর 'সমর সেনের কবিতা' শীর্ষক সংকলনটিতে হয়েছে 'দুর্দান্ত যৌবনকালে পেয়েছি বৈভব'। 'ধরেছি উপনিষদ' কথাটিতে যে শব্দের ঝোঁক ফুটে উঠতে চেয়েছিল, সমর সেনের কাছে সেটাই ছিল শুভাবহ। নিয়মভঙ্গের নিয়মে সমর সেন যে দক্ষ তা প্রমাণিত হয়েছে। প্রথাবদ্ধ ছন্দ-কাঠামো ভেঙে এই কবি চেষ্টা করেছেন নতুন পথের সন্ধান করতে। 'নাগরিক' কবিতাটির পাঠ লক্ষ্য করলে সমর সেনের নিয়মভঙ্গ করার

মানসিকতা খানিকটা আঁচ করা যাবে। দুটি স্তবকে বিন্যস্ত চোদ্দ পংক্তির কবিতা, প্রথম স্তবক দশ পংক্তির এবং পরেরটি চার পংক্তির। প্রথম স্তবক মিলহীন, পরেরটি মিলযুক্ত। প্রথম স্তবকে ৮+৬ মাত্রার সাম্য সর্বত্র রক্ষিত হয় নি, দ্বিতীয় পংক্তি ৮+৮, ষষ্ঠ পংক্তি ৮, সপ্তম পংক্তিতে ৮+৬ মাত্রা রক্ষার চেষ্টা যুক্ত-ব্যঞ্জন ও মিল সহায়তায় (মহাস্থবির বেশ, বহু বড়ো শাখায়')। দ্বিতীয় বা শেষ স্তবকটি নিটোল পয়ারের রীতিটি মেনে লেখা।--

'রক্তজবা সূর্য ওঠে পর্বত শিখরে
বৃষ্টিবিন্দু দাও মেঘ বটের শিকড়ে।
অনাবৃষ্টির আকাশ শোক অন্যরূপী
চিরকাল ভরে দাও ধনে জনে সুখী।'

(বাচিকেত)

সমর সেন তাঁর শিল্পপ্রকরণকে শুধু ছন্দ দিয়ে সমৃদ্ধ করেছেন তা নয়, বাংলা ভাষার চলিত রীতিটিকে কবিতায় ধরবার প্রয়াস পেয়েছেন গদ্যরূপটিকে আরও উজ্জ্বল করে গড়ে তোলার জন্যে। বাংলা ভাষার এই বিশেষ সম্পদ রয়েছে প্রবাদ আর প্রবচনের মধ্যে। প্রগতি আন্দোলনের শরিক কবিদের চেষ্টা ছিল কবিতাকে গণমুখী করার দিকে। ভাষা ব্যবহারে তাই অনেকে সচেতন ছিলেন, সচেতনভাবেই তাঁরা বাংলা ভাষার নিজস্ব সম্পদ এই প্রবাদ-প্রবচনের ওপরে নির্ভর করেছিলেন, এব্যাপারে উল্লেখযোগ্য সাফল্য দেখিয়েছেন সুভাষ মুখোপাধ্যায়, বিষ্ণু দে, বিমল ঘোষ প্রমুখ কবিরা। জ্যোতিরিন্দ্র মৈত্রের রচনাতেও এগুলির প্রতি আগ্রহ লক্ষ করা গেছে। গদ্যভাষার চর্চায় এর প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য। ব্যবহার্য কয়েকটি প্রবাদের নমুনা--'ইজ্জতের গোলাপ', 'তিলকে তাল', 'ভূতের নাচ', 'সবেধন নীলমণি', 'চোরে চোরে মাসতুতো ভাই', 'কূপমণ্ডূক', 'বকধার্মিক', 'খাজা খাবে খই', 'ঠেকে শেখা', 'আপনি বাঁচলে বাপের নাম' ইত্যাদি ইত্যাদি। এর ব্যবহারিক রূপটি: 'আমাদের পীরিতি বালুর বাঁধ', 'সাড়ে-বত্রিশ-ভাজার আমেজে সময় কাটে', 'ভারি ট্যাঁক ছাড়া কিছুই টেকে না', 'হারানো রতন খোঁজে কেরানী হৃদয়', 'রক্তের কিবা দাম উকিলের কাছে', 'যৌবনে অন্যায় বায়ে বয়সে কাহারী', 'আধ্যাত্মিক মুশকিল আসান তারা করে', 'ভাবের ব্যাপারে তিনি ব্যাপারী, /খবরদারিতে তিনি কারবারী', 'নীরবাজরী নদরাজ আবার অন্তঃশীলা', 'ডাকে কুমির, কাটে খাল', 'নিজের নাক কেটে লোকের যাত্রাভঙ্গ সাধে' ইত্যাদি ইত্যাদি।

যে প্রজ্ঞা ও সমৃদ্ধ অভিজ্ঞতা থাকলে কোন কোন কবির পংক্তি প্রায় প্রবাদস্বরূপ ও জনপ্রিয় হয়ে ওঠে, এই কবির মধ্যে সেই জাতীয় অভিজ্ঞতার পরিমাণটা কম নয়। যেমন: ১)'সে শহর সে সুন্দর শহর। /কালিঘাট ব্রিজের উপরে কখনো কি শুনতে পাও/লম্পটের পদধ্বনি', ২)'একদা আমরা ছিলাম নির্বর বাঁদর, /আর

আস্ফালনে মত্ত যেন বীর হনুমান।', ৩) যৌবনের প্রেম শেষ প্রবীণের কাছে।/বছর দশেক পরে যাব কাশীধামে।' ৪) চাকরি খালির বিজ্ঞাপনে বেকারের সকাল শুরু', ৫) প্রাত্যহিক জীবনের কুম্ভকর্ণ ঘুমে/কে শোনাবে শনি ন্যায়ের বাঁশি', ৬) জীবনধারার ছাপ চেতনাকে গড়ে,/চেতনার ছাপ জীবনধারাকে নয়', ৭) 'টাকা ছাড়া কিছুই টেকে না,/সবার উপরে টাকাই সত্য/তার উপরে নেই', ৮) 'সখি, শেষে কি গেরুয়া বসন অঙ্গেতে প'রে/ব্রহ্মচারী বেশে পণ্ডিচেরী যাব' ইত্যাদি।

বিশেষণ প্রয়োগের ক্ষেত্রেও সমর সেনের বিশেষত্ব হল জীবনের প্রকৃত রূপটিকেই শুধু নয়, নিহিত দ্যোতনা ও প্রকট করা। সমর সেন এক্ষেত্রে আশ্চর্য সজ্ঞ সচেতনতার পরিচয় দিয়েছেন। যেমনঃ 'অনেক দিনের আকাশ, রাত পাখির অলস ইঙ্গিত', 'শুধু জিদের দুর্বার দীপ্তি, কঠিন ইশারা,/জিদের হিংস্র হাহাকার সে চোখে', 'হে ম্লান মেয়ে, প্রেমে কী আনন্দ পাও', 'পীড়িত আকাশের বাতাস', 'তখন পশ্চিমের রুগ্ন আকাশ রক্তকরবীর মতো লাল', ' উজ্জ্বল, লুব্ধিত জাপুমার যেন/এপ্রিলের বসন্ত বায়', 'তিক্তরক্তজ্বল সোনামদনে যেমন বিষণ্ণমুখে/উর্বর মেয়েরা আসে', 'আকাশিনের মতো মিহি একটি মেয়ের প্রেম', 'আর কত লাল শাড়ি আর নরম বুক, আর টেরিকাটা মসৃণ বাবুর', দিগন্তে রুগ্ন চাঁদ', 'বদিকের মাঝমে স্তব্ধ বিজন প্রহর', 'পরশ্রীকাতর চোখে অপাঙ্গে দেখে', 'রক্তজীবী রাজনৈতিক অস্ত্র পাঠায়', 'প্রতিপদের চাঁদে বালু জ্বলে, যেন আদিম সোনা', 'তারার সন্তানকে সন্তোষণে রূপণ কোথায় যাবো আর', 'কাংস্যভাষী কেরানীর অবসর কই', 'বর্বর বন্দরে নমিত প্রাণ', 'শ্রোণীভারানত সুন্দরীর কামিনী সন্ধ্যা', 'হালকা হাতে সবুজ বেছে শ্যামল মেয়েরা', 'ঘন অন্ধকারে অপরূপ প্রেমের বাজার', 'মধুক্ষরী মেয়ে বাজে জীবন গর্জন' ইত্যাদি বিশেষণ প্রয়োগের চেষ্টায় কোন কোন ক্ষেত্রে কৃত্রিমতা আরোপিত হলেও তা যে অব্যর্থ প্রয়োগ, উদাহরণগুলি দেখলে বোঝা যায়। নাগরিক মধ্যবিত্ত জীবনকে ফুটিয়ে তোলায় এইসব বিশেষণের বিকল্প নেই।

সমর সেনের বাক্প্রতিমাগুলিও একটি বিশিষ্ট মেজাজ ও চরিত্রকে তুলে ধরেছে। মহানগরীর বর্ণনা করতে গিয়ে কবি যখন বলেন, 'মহানগরীতে এল বিবর্ণ দিন, তারপর আলকাতরার মতো রাত্রি/আর দিন/সমস্ত দিন ভরে শুনি রোলারের শব্দ,/দূরে, বহুদূরে কৃষ্ণচূড়ার লাল, চকিত ঝলক,/হাওয়ায় ভেসে আসে গলানো পিচের গন্ধ,/আর রাত্রি/রাত্রি শুধু পাথরের উপরে রোলারের/মুখর দুঃস্বপ্ন।' (নাগরিক)। তখন এই রাত্রি আর আভিধানিক শব্দ মাত্রই নয়, শব্দ ছাড়াও তা অন্য কোন অর্থকে প্রতিপন্ন করতে চায়। যেমন অন্যত্র রাত্রির এই ব্যবহার এসেছে এইভাবেঃ 'কত সবুজ সকাল তিক্ত রাত্রির মতো', 'নিঃসঙ্গ পশুর মতো রাত্রি আসে', 'রাত্রির দূষিত রক্তে বিকলাঙ্গ দিনের প্রসবে আমাদের তন্দ্রা ভাঙে', 'দিনের তাপাড়ে নামে রাতের শকুন', বড়নখ উঁচুক রাত্রির কালো পাখে', সামাজিক জীবনে এই বিকৃতি, তিক্ততা, হতাশা

কিংবা নৈরাশ্য কবিকে ব্যথিত করে তুলেছে, কখনও বিষাদে ভারাক্রান্ত করেছে, সেই জীবনদর্শিত অভিজ্ঞতাই এইসব চিত্রকল্পের সাহায্যে পরিস্ফুট হয়েছে। 'ক্লান্তি' শব্দটি একদিক থেকে প্রতীকী, যার অর্থ মানুষের মানসিক বিরক্তি বা অবক্ষয় অথবা এই ক্লান্তি হয়ে ওঠে মানবসভ্যতারই এক অন্ধকার দিক। এভাবেই তাঁর কবিতায় উঠে এসেছে কিছু প্রতীকী ও গূঢ়চারী শব্দ, কিছু চমৎকার চিত্রকল্প বা 'ইমেজ'। বটগাছের চিত্রকল্পটি মধ্যবিত্ত জীবনের, কখনও নাগরিক জীবনের ক্লান্তিকর, বিষণ্ণ ও বিচ্ছিন্ন আবহ রচনা করেছে। যেমন:

ক) 'বুড়ো ওক্, নেড়া বট মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে
শতাব্দীর ক্লান্ত ভঙ্গিতে।'

(জন্মদিনে)

খ) 'দিগন্তে ধূসর মাঠে শতাব্দীর বট
মাথা নাড়ে প্রবীণ ক্লান্তিতে। সে কি জানে
যৌবনে অন্যায় ব্যয়ে বয়সে কাঙালী
দিনগত[৫৯] পাপক্ষয়ে পুষ্ট প্রাক্‌স্মৃতি
শোকাতুর কেন্দ্র থেকে বিচ্ছিন্ন বিধুর
মধ্যবিত্ত মানসের বিড়ম্বিত গ্লানি?'

(বিকল্প)

গ) 'একটি একেলা বট পাখিহারা ছায়া দেয়,
প্রায় পত্রহীন সে প্রৌঢ় বট, বহুদিন মাখে নি সবুজ কলপ,
কিন্তু তার শিকড়েরা ঊর্ধ্বমুখ, আকাশসন্ধানে।'

(জোয়ার ভাঁটা)

পাখির চিত্রকল্পে কখনও শকুন, বাদুড়, কাক, অন্য চিত্রকল্পে বালু, ফণিমনসা, মরুভূমি বা উট কিংবা কখনও জন্তু-জানোয়ার প্রভৃতির প্রতীক ব্যবহৃত হয়েছে।

এই প্রতীকগুলির প্রয়োগে সমর সেনের বিশিষ্টতা, সন্দেহ নেই, কাব্যের ইতিহাসে স্বাতন্ত্র্যে উজ্জ্বল। যখন ফ্যাসিবিরোধী পর্বে স্ট্যালিনগ্রাডের মান রাখার প্রাণপণ সংগ্রাম, তখন ফ্যাসিস্ট শক্তির বিধ্বংসী রূপটিকে এক অতিকায় বন্য জানোয়ারের প্রতীকে দেখতে পান সমর সেন, চিত্রটি এইরকম:

'এক অতিকায় বন্য জানোয়ার
পাশবিক ঘুম থেকে ধীরে ধীরে উঠে
বহু যুগের সাজানো বাগানে লোলগর্বে নামে,'

(স্টালিনগ্রাড)

দুর্ভিক্ষের মর্মন্তুদ পরিবেশে ঐ একই চিত্র আবার কবির মনে আসে, বন্য জন্তুটি এখানে মহিষে রূপান্তরিত। 'মধ্যদিনে সূর্য, মনে হয়/এক অতিকায় ক্ষুধার্ত মহিষের চোখ/শূন্য থেকে একমনে জলাশয় খোঁজে'

ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থায় যে সামাজিক সংকট ঘনিয়ে ওঠে, ঘনিয়ে ওঠে যে সত্তার সংকট ব্যক্তিজীবনের অস্থিরপরিণামবশ হয়ে, তাকে চিহ্নিত করতেও সেই জন্তুর প্রতীকটি সমর সেনের মনে জেগে ওঠে, তখন ইতস্তত উড়ে বেড়ানো মেঘকেও তাঁর মনে হয় আদিম কোন জন্তুর মতো: 'রাত্রির দিগন্তে ঘুরে ফেরে/ আদিম জন্তুর মতো বিরাট মেঘ।' (বহ্নিবর্ণ)। ফ্যাসিবিরোধী যুগে আবার সেই জন্তুটি বন্যপশু হয়ে ফিরে এসেছে কোলকাতায়, এবারে সে ভীত, সন্ত্রস্ত: 'ঘুটঘুটে অন্ধকার, পিচের পথে অশরীরী হাওয়া, /হলুদ ঘোলাটে চোখে মোটর এগোয়/হঠাৎ কোলকাতায় আসত ভীত বন্যপশুর মতো।' (পঞ্চমবাহিনী-১)।

সমর সেনের বিশেষণপ্রবণতা যেমন, তার চেয়ে কোন অংশে কম নয় উপমাপ্রবণতা, উপমা অদ্ভুত-বা কবিতা নয়, কিন্তু কবিতার সবচেয়ে স্পর্শকাতর ক্ষেত্রে বৃহত্তর অর্থে উপমাই প্রধান হয়ে ওঠে, বোধকরি এদিক থেকেই জীবনানন্দ দুঃসাহস দেখিয়ে উপমাকে মেনে নিয়েছিলেন কবিতা বলে। আর্থ-সামাজিক জীবনের প্রেক্ষাপটকে রূপায়িত করতে সমর সেন চয়ন করেছেন সেইসব উপমা যাতে কষ্টকল্পনা নেই। আবার তা সহজও নয় অনেক সময়। যখন বলেন, 'কঠিন আর ভারি চাকা, আর সুন্দর---/অন্ধকারের মতো সুন্দর, /অন্ধকারের মতো ভারি।' (একটি রাত্রের সুর)। তখন বলাই বাহুল্য, বিষম দুটি বস্তুর সৌন্দর্য অথবা ওজন-এর কোন সাদৃশ্য আমাদের চোখের দৃষ্টিতে উদ্ভাসনের অপেক্ষা রাখে না, কেননা, তা কল্পনা ও অনুভবের অবলম্বন ছাড়া অন্য কোন উপায়েই বোঝা সম্ভব নয়। কিন্তু একে কষ্টকল্পনাও বলা যায় না। যন্ত্রসভ্যতার নিষ্করুণ শক্তিভিত্তি বোঝাতে এই অব্যর্থ উপমাটির প্রয়োগসিদ্ধি অতুলনীয়। তবু একে সহজ উপমা বলা যায় না। নির্ভর করছে শুধু কল্পনার ব্যাপ্তির ওপর, এবং ব্যক্তি পাঠকের ওপর। সরল উপমার দৃষ্টান্ত: 'কালো পাথরের মতো মসৃণ শরীর', 'আর দিগন্তে জমে ইস্পাতের মতো ধূসর আকাশ', 'আর হাওয়ায় অসংখ্য ধুলোর কণা জীবন্ত বীজাণুর মতো', 'সে আকাশে ঘন মেঘ জমে আছে শীতের অজগরের মতো', 'তখন পশ্চিমের জ্বলন্ত আকাশ রক্তকরবীর মতো লাল' ইত্যাদি। দুটি বস্তুর স্বভাব যখন কাছাকাছি, উভয়ের সম্বন্ধ যখন অপ্রচলিত, তখন উপমাটি ঠিক ঠিক দ্যোতিত হয় না, অথচ সমর সেন এক্ষেত্রেও তাঁর অবিসংবাদী দক্ষতা দেখিয়েছেন। যেমন: 'হিংস্র পশুর মতো অন্ধকার এল'--- পশু এবং অন্ধকার দুয়ের আগমনের সাদৃশ্যকে স্পষ্ট তুলে ধরতে পেরেছেন। একত্রে দুইকে মেলানো তাঁর দ্বারা সম্ভব হয়েছে। এমনি অজস্র উপমা রচনা করেছেন সমর সেন যাতে করে প্রকৃত বক্তব্যটি আরও অর্থবহ, আরও ইঙ্গিতপূর্ণ হয়ে উঠেছে। কয়েকটি দৃষ্টান্ত দেওয়া যেতে পারে: 'আর অন্ধকারে লাল কাঁকরের পথ/ পড়ে থাকে অলস সুরের মতো।', 'আজ রাতে ঘুমের মতো তোমার কালো চুল/আমার মুখের উপরে নামলো', 'এখানে সন্ধ্যা নামল, /শীতের আকাশে অন্ধকার ঝুলছে শুয়োরের চামড়ার মতো', 'এখানে সন্ধ্যা নামল

শীতের শকুনের মতো', 'আজও ভুলন্ত খড়্গের মতো আকাশে চাঁদ ওঠে', 'আজ দুরন্ত অন্ধকার ডানা ঝাড়ে/ উড়ন্ত পাখির মতো', 'ভিজে ফুলের মতো নর্তকীর নরম শরীর', 'চারদিকে মেখলার মতো শালবনের অন্ধকার', 'সেখানে দুপুরে শ্যাওলায় সবুজ পুকুরে/গরুর মতো করুণ চোখ/বাঙলার বধু নামে', 'হলুদ ঘোলাটে চোখে মোটর এগোয়/হঠাৎ লোকালয়ে আগত ভীত বন্য পশুর মতো' ইত্যাদি। লক্ষ্য করলে দেখা যাবে প্রথম দিকে এই ধরনের তুলনাবাচক শব্দসহ('মতো' ইত্যাদি) যে সরলতাধর্মী উপমা, তা শেষের দিকে কমে এসেছে, তার কারণ, এই পর্বে সমর সেন বিবৃতিধর্মী কবিতার ওপর বেশি জোর দিয়েছেন, ফলে উপমা ব্যবহারের ক্ষেত্রটি একটু সংকুচিত হয়ে পড়েছে। সেক্ষেত্রে উৎপ্রেক্ষা, সমাসোক্তি, বক্রোক্তি, শ্লেষ প্রভৃতির ব্যবহার বেড়েছে। বেড়েছে প্রতীকের ও চিত্রকল্পের ব্যবহার। অনুরূপ কিছু আলঙকারিক বাকপ্রতিমা ও সমাসোক্তি অলঙ্কারের দৃষ্টান্তঃ 'নিঃসঙ্গ, শেষ মিনারে/সূর্যপূজারীর শবের উপরে যেমন, /শূন্য থেকে আজ/একচক্ষু, ছিন্নপাখা জিজ্ঞাসার পাখি/নামে, শুধু নামে।' (গ্রহণ)। ঘনিয়ে ওঠা যুদ্ধ-সংকটের ত্রশনিত-নগ্নকে চমৎকার বাকপ্রতিমায় ফুটিয়ে তুলেছেন কবি। এরই সঙ্গে জড়িয়ে আছে সামাজিক মানুষের ভয়াবহ নৈঃসঙ্গ্যের বোধ। সমাসোক্তির দৃষ্টান্তঃ 'বর্ষার স্তব্ধ ক্লান্তি বেড়ে/গাছেরা গাঢ় রঙ ধরে।', 'চোখে সুর্মা টেনে শৌখিন সন্ধ্যা এল', 'আকাশে চিমনি কালো রক্ত হোঁড়ে' ইত্যাদি। এধরনের অলঙ্কার সমর সেন খুব কম ব্যবহার করেছেন। কিন্তু এ কথা ভুললে চলবে না যে, গদ্যকবিতায় অলঙ্কারের ভার কমে যাওয়ার কথা, অথচ সমর সেন এই ভার স্বেচ্ছায় বহন করেছেন এবং তার পরিমাণ পরিসংখ্যানের দিক থেকে মোটেও কম নয়।

পৌরাণিক মিথ থেকেও সমর সেন তাঁর শিল্পপ্রকরণ গড়ে তুলেছেন। উর্বশী, দধীচি, ধৃতরাষ্ট্র, পান্ডু, ইন্দ্র, মৈনাক, অগ্নিবর্ণ, বিভীষণ, যুধিষ্ঠির, শকুনি, মহাদেব, কালী, কুরুক্ষেত্র, এমনকি মঙ্গলকাব্যের থেকে মনসা, চাঁদু দত্তও তাঁর উপকরণ হয়ে উঠেছে, প্রয়োগ-সার্থকতাও লক্ষ্য করবারঃ 'গলিত ধনতন্ত্রের চতুর বিভীষণ', 'এ বাসরঘর, /শ্মশান কুরুক্ষেত্রে শকুনের কোলাহলে/মোলায়েম বাঁশির মতো', 'কুরুক্ষেত্রে পুরুষবিনাশ', 'তাই ধ্বংসের ক্ষয়রোগে শিক্ষিত নপুংসক মন/সমস্ত ব্যর্থতার মূলে অবিরত খোঁজে / অতৃপ্তরতি উর্বশীর অভিশাপ', 'নুব্জ লোকের ভিড়ে যখন তুমি নাচো/দশ টাকায় কেনা কয়েক প্রহরের হে উর্বশী, তখন শাড়ির আর তাড়ির উল্লাসে, /অমৃতের পুত্রের বুকে চিত্ত আত্মহারা', 'মধ্যরাত্রে/ধাবমান ট্রেনের মন্থর শব্দ, /আমাদের মৃত্যু হবে পান্ডুর মতো' ইত্যাদি ইত্যাদি। ফ্যাসিবিরোধী পর্বে প্রায়শ ব্যবহৃত হয়েছে 'কুরুক্ষেত্র' শব্দটির মিথ। উর্বশী ও শকুনিও ব্যবহৃত হয়েছে, কোথাও শরীরবিলাসিনীরূপে, যুদ্ধের ষড়যন্ত্রের অন্যতম নায়করূপে। সমর সেন-এর স্বাতন্ত্র্য হল যুগোচিত বাকরীতির প্রায়োগিক সার্থকতায়। এইখানে তাঁর সাফল্যেরও চাবিকাঠি।

উল্লেখপঞ্জী

১। দ্রষ্টব্য: ৩,৯,১৯৩৫খ্রীষ্টাব্দে রবীন্দ্রনাথকে লেখা বুদ্ধদেব বসুর ২নং পত্র।--বুদ্ধদেব বসুর রচনাসংগ্রহ, তৃতীয় খণ্ড, গ্রন্থালয় প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, বিশেষ সংস্করণ, ১৯৮০, পৃঃ৬১০

২। তদেব, ৩,১০,১৯৩৫খ্রীষ্টাব্দে বুদ্ধদেব বসুকে লেখা রবীন্দ্রনাথের ২৭নং পত্র, পৃঃ৫৮৩

৩। তদেব, ১৬,১০,১৯৩৫খ্রীষ্টাব্দে রবীন্দ্রনাথকে লেখা বুদ্ধদেব বসুর ৩নং পত্র, পৃঃ৬১১

৪। নন্দরাণী চৌধুরী: জীবন অন্বেষায় কবি সমর সেন, পিপলস্ বুক পাবলিশিং, কলকাতা, ১৯৯২, পৃঃ৮

৫। অরণি, ২য় বর্ষ, ৩সংখ্যা, ৪সেপ্টেম্বর, ১৯৪২

৬। তদেব

৭। ধনঞ্জয় দাশ, সম্পাদিত: 'অতি আধুনিক বাংলা কবিতা'(সমর সেন-কৃত), মার্কসবাদী সাহিত্য-বিতর্ক, তৃতীয় খণ্ড, নতুন পরিবেশ প্রকাশনী, কলকাতা, দ্বিতীয় মুদ্রণ, ১৯৮০, পৃঃ৭১-৭৪

৮। মার্কস, এঙ্গেলসের ভাষ্য অনুযায়ী, প্রথমে প্রগতি চিন্তার কথা বলেন, পরে 'প্রগতিশীল' শব্দটি ব্যবহার করেন।

৯। Marx, Karl and Frederick Engels : Selected Works, Vol. 1, Progress Publishers, Moscow, Fourth printing, 1977, pp. 108-27

১০। বিনয় ঘোষ: 'সাম্প্রতিক বাংলা কবিতা', নূতন সাহিত্য ও সমালোচনা, অরুণা প্রকাশনী, কলকাতা, ১৯৮১, পৃঃ ১০৪

১১। ধনঞ্জয় দাশ, সম্পাদিত: মার্কসবাদী সাহিত্য-বিতর্ক, তৃতীয় খণ্ড, নতুন পরিবেশ প্রকাশনী, কলকাতা, দ্বিতীয় মুদ্রণ, ১৯৮০, পৃঃ ৭০

১২। প্রফুল্ল রায়, অনূদিত: মার্কসবাদ-বিচার প্রসঙ্গে (কার্ল মার্কসের গ্রন্থ 'A Contribution to the Critique of Political Economy'), প্রগতি প্রকাশন, মস্কো, ১৯৮৩, পৃ: ২২৩-২৪

১৩। Candwell, Christopher : Illusion and Reality, People's Publishing House, New Delhi, Reprinted, 1981, pp. 286-7

১৪। Thomson, George : Marxism and Poetry, People's Publishing House, Delhi, 2nd Indian revised edition, 1954, pp 71-2

১৫। Mukherjee, Hiren, Edited : 'On Progressive Criticism by X.Y.Z., US (A People's Symposium), Anti-Fascist Writers' and Artists' Association, Calcutta, 1943, p. 10

১৬। রবীন্দ্রনাথ কিংবা বুদ্ধদেব বসুর দারুণ পক্ষপাত সত্ত্বেও প্রগতিশীলদের শিবিরে তাঁকে নিয়ে প্রবল ঝড় ওঠে আর এর সূত্রপাত সম্ভবত করেন সরোজকুমার দত্ত 'অতি আধুনিক বাংলা কবিতা' শীর্ষক প্রবন্ধটি 'অগ্রণী'র প্রথম বর্ষ, দ্বিতীয় সংখ্যা, ফেব্রুয়ারী ১৯৩৯-এ প্রকাশ করে। বিনয় ঘোষ 'সাম্প্রতিক বাংলা কবিতা' শীর্ষক প্রবন্ধে(দ্রষ্টব্য 'নূতন সাহিত্য ও সমালোচনা', অরুণা প্রকাশনী, কলকাতা, ১৯৮১), মঙ্গলাচরণ চট্টোপাধ্যায় 'পরিচয়', পৌষ, ১৩৪২-এর 'পুস্তক-পরিচয়' বিভাগে

'কাব্যমুক্তি' ও সমর সেনের 'তিনপুরুষ' শীর্ষক প্রবন্ধে, অধ্যাপক শান্তি বসু সুদেষ্ণ বসু ছদ্মনামে 'প্রগতি সাহিত্যের আত্মসমালোচনা' শীর্ষক প্রবন্ধে (দ্রষ্টব্য ঃ ডাক, দ্বিতীয় বর্ষ, শারদীয় সংখ্যা, ১৩৫৬) সমর সেন সম্পর্কে সহানুভূতিবর্জিত কঠোরতর মনোভাব পোষণ করেছেন। কাব্যের চেয়ে তাতে করে বেশি প্রাধান্য পেয়েছে উগ্র তাত্ত্বিক আলোচনা যা সর্বদা সঠিক ধারণা দিতে সক্ষম হয় নি।

১৭। আবু সয়ীদ আইয়ুব ও হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, সম্পাদিতঃ 'ভূমিকা-২', (হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়-কৃত), আধুনিক বাংলা কবিতা, কবিতা ভবন, কলকাতা, ১৯৪০

১৮। ধনঞ্জয় দাশ, সম্পাদিতঃ 'অতি আধুনিক বাংলা কবিতা' (সরোজকুমার দত্ত-কৃত), মার্কসবাদী সাহিত্য-বিতর্ক, তৃতীয় খন্ড, নতুন পরিবেশ প্রকাশনী, কলকাতা, দ্বিতীয় মুদ্রণ, ১৯৮০, পৃঃ৬৫

১৯। তদেব, পৃঃ৭২

২০। তদেব, পৃঃ৭৩

২১। Marx, Karl and Frederick Engels : Selected Works, Vol. 1, Progress Publishers, Moscow, Fourth printing, 1977, p. 52

২২। Mendelson, Edward, Edited : W.H.Anden : Collected Poems, Faber and Faber, London, 1976, p. 201

২৩। সমর সেনঃ বাবু বৃত্তান্ত, প্রমা প্রকাশনী, কলকাতা, ১৯৭৮, পৃঃ৩০

২৪। তদেব, পৃঃ২৮

২৫। Eliot, T.S. : Selected Poems, Faber and Faber, London, 1975, p. 15

২৬। Ibid, p. 78

২৭। বিষ্ণু দে, অনুদিতঃ 'চতুষ্কের গান(১)', এলিয়টের কবিতা, সিগনেট প্রেস, কলকাতা, ১৩৮৭বঙ্গাব্দ, পৃঃ২১

২৮। বুদ্ধদেব বসুঃ শ্রেষ্ঠ কবিতা, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, পঞ্চম সংস্করণ, ১৯৮০, পৃঃ৬০

২৯। Mendelson, Edward, Edited : W.H. Anden : Collected Poems, Faber and Faber, London, 1976, p. 148

৩০। বিষ্ণু দে, অনুদিতঃ 'বর্নট্ নর্টন্', এলিয়টের কবিতা, সিগনেট প্রেস, কলকাতা, ১৩৮৭বঙ্গাব্দ, পৃঃ৬০

৩১। সুধী প্রধান ঃ সংস্কৃতির প্রগতি, পুস্তক বিপণি, কলকাতা, ১৩৮৯বঙ্গাব্দ, পৃঃ৮৯

৩২। সিগনেট প্রেস থেকে ১৩৮৮বঙ্গাব্দে প্রকাশিত 'সমর সেনের কবিতা' সংকলনের পঞ্চম পরিবর্ধিত সংস্করণের পাঠটি 'দীপ' (পৃঃ২৩), সন্দেহ স্বাভাবিক পাঠটি 'দ্বীপ' কিনা। 'নির্জন দ্বীপ' শব্দটি বাংলাকাব্যে বহুব্যবহৃত। নির্জন' বিশেষণটি 'দীপের' সঠিক অভিব্যক্তি প্রকাশে অসমর্থ। কিন্তু 'নির্জন দ্বীপ' বললে তার সুদূরত্ব ও নিঃসঙ্গতা খুব তাৎপর্য পায়। এদিক থেকে 'দীপ' না হয়ে 'দ্বীপ' হওয়াটাই স্বাভাবিক বলে মনে হয়।

৩৩। জীবনানন্দ দাশঃ শ্রেষ্ঠ কবিতা, ভারবি, কলকাতা, তৃতীয় মুদ্রণ, ১৯৭২, পৃঃ ১৮

৩৪। Fraser, G.S. : The Modern Writer And His World, Rupa and Company, Calcutta, 1961, pp. 9-10

৩৫। নীরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়ঃ বিচিত্র কবিতার ভবিষ্যৎ, বাতায়ন, কলকাতা, দ্বিতীয় মুদ্রণ, ১৩৬৮ বঙ্গাব্দ পৃঃ১০৫

৩৬। তদেব, ১৯নং পাদটীকা দ্রষ্টব্য, পৃঃ১০৮-০৯

৩৭। সমর সেনঃ বাবু বৃত্তান্ত, বাণী প্রকাশনী, কলকাতা, ১৯৭৮, পৃঃ৫৫

৩৮। তদেব, পৃঃ৩৩

৩৯। তদেব, পৃঃ৪০, (প্রসঙ্গত স্মর্তব্য তাঁর বক্তব্যঃ 'কম্যুনিস্ট পার্টিতে যোগ দেবার চেষ্টা করবো কি না গভীরভাবে চিন্তা ক'রে ঠিক করলাম আমার দ্বারা সক্রিয় রাজনীতি হবে না। বক্তৃতা আমার একেবারে আসে না, তার চেয়ে মাঝে মাঝে 'বিপ্লবী' কবিতা লিখলে ও পার্টিতে কিছু অর্থ সাহায্য করলে বিবেক সাফ থাকবে। আমাকে কর্মী হিসেবে নিলে পার্টির বিশেষ কোন লাভ হবে না।'--এই সুবিধাবাদি পেটি-বুর্জোয়া চরিত্রের অন্যতম লক্ষণ।)

৪০। শৈলেন্দ্র বিশ্বাস, ডঃ শশিভূষণ দাশগুপ্ত, বীরেন্দ্রচন্দ্র ভট্টাচার্য, সংকলিত ও সংশোধিতঃ সংসদ বাঙ্গালা অভিধান, সাহিত্য সংসদ, কলকাতা, পরিবর্ধিত চতুর্থ সংস্করণ, ১৯৮৪, পৃঃ৩৫৯

৪১। হীরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, অনূদিত: সোভিয়েত [illegible] (কিশোরদের [illegible]), [illegible] লাইব্রেরী, কলকাতা, ১৯৮৫, পৃঃ ৮৪

৪২। Marx, Karl and Frederick Engels : 'The Class Struggles In France', Selected Works, Vol. 1, Progress Publishers, Moscow, Fourth printing, 1977, pp. 213-14

৪৩। সমর সেনঃ বাবু বৃত্তান্ত, বাণী প্রকাশনী, কলকাতা, ১৯৭৮, পৃঃ৪৬

৪৪। তদেব, পৃঃ৪০

৪৫। বুদ্ধদেব বসুঃ কালের পুতুল, নিউ এজ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, ১৯৫৯, পৃঃ৫৮

৪৬। অরণি, ১ম বর্ষ, ৪২সংখ্যা, ১২জুন, ১৯৪২

৪৭। অরণি, সোভিয়েট সংখ্যা, ১ম বর্ষ, ৪৪শ সংখ্যা, ২৬ জুন, ১৯৪২

৪৮। সমর সেনের কবিতা, সিগনেট প্রেস, পঞ্চম পরিবর্ধিত সংস্করণ, ১৩৮৮ বঙ্গাব্দ, পৃঃ১২৪-২৮

৪৯। Marx, Karl and Frederick Engels : 'Preface To A Contribution To The Critique Of Political Economy by Karl Marx', Selected Works, Vol. 1, Progress Publishers, Moscow, Fourth Printing, 1977, p. 503

৫০। Ibid, 'Karl Marx, A Contribution To The Critique Of Political Economy by Frederick Engels', p. 509

৫১। অরণি, শারদীয় সংখ্যা, ৩য় বর্ষ, ১৯৪৩

৫২। দ্রষ্টব্যঃ 'কাব্যদৃষ্টি ও সমর সেনের তিনপুরুষ' পত্র-নিবন্ধ, --পরিচয়, পঞ্চদশ বর্ষ, ১ম খণ্ড, ৫সংখ্যা, অগ্রহায়ণ, ১৩৫২ বঙ্গাব্দ

৫৩। সুভাষ মুখোপাধ্যায়, অনূদিতঃ পাবলো নেরুদার আরো কবিতা, বিশ্ববাণী প্রকাশনী, কলকাতা, ১৩৮৭ বঙ্গাব্দ, পৃঃ৬৪

৫৪। অরণি, ২য় বর্ষ, ১৫সংখ্যা, ১১ডিসেম্বর, ১৯৪২

৫৫। Dutt, R. Palme : India To-day, Manisha, Cal, Reprinted, 1979, p. 581

৫৬। বুদ্ধদেব বসুঃ কালের পুতুল, নিউ এজ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, ১৯৫৯, পৃঃ৫৭

৫৭। শঙ্খ ঘোষ : ছন্দের বারান্দা, অরুণা প্রকাশনী, কলকাতা, তৃতীয় পরিবর্ধিত সংস্করণ, পুনর্মুদ্রণ, ১৩৯১ বঙ্গাব্দ, পৃঃ২৩

৫৮। বুদ্ধদেব বসুঃ কালের পুতুল, নিউ এজ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, ১৯৫৯, পৃঃ৬১

৫৯। শব্দটি সম্ভবত ছাপার ভুল--'দীপ্যত', দ্রষ্টব্য 'সমর সেনের কবিতা'র প্রথম সংস্করণ, পৃঃ১২৩

বিষ্ণু দে-র কবিতা

(জন্মঃ জুলাই ,১৯০৯---মৃত্যুঃ৩ ডিসেম্বর,১৯৮২)

'আমরা ভাগ করে নিয়েছি খুব সরাসরি, জীবনের কাছে অথবা কবিতার কাছে আমাদের অতিনির্দিষ্ট সচেতন দাবির ধরনটা খুব উচ্চারিত। আমরা চাই হৃদয় অথবা মেধা, জাদু অথবা যুক্তি, রহস্য অথবা স্বচ্ছতা, ব্যক্তি অথবা সমাজ, নম্রতা কিংবা ক্রোধ, মগ্নতা বা বিদ্রোহ, আসক্তি বা বিপ্লব। আমরা নির্বাচন করে নিই এর মধ্যে যে-কোনো এক দিক, মনে করতে থাকি সেইটেকেই জীবনের সম্পূর্ণতা, জীবনের থেকে ছিন্ন করে নিজেকে ক্রমশ রুগ্ণ করতে থাকি ব্যক্তির একটা খণ্ডিতে আর সেই খণ্ডির জাল কেটে আমরা ধরতে চাই ওর মধ্যে কবি বা কবিতার জগৎ। ... মানুষের সমগ্রধারা মনকে কি এত সহজেই বন্দী করা চলে নির্ধারিত এক কাঠামোর মধ্যে?'

---শঙ্খ ঘোষ

'রুচির সমগ্রতা', শব্দ আর সত্য, প্যাপিরাস, কলকাতা, ১৯৮২, পৃঃ৭৩

ভূমিকা ও শিল্পতত্ত্বঃ

প্রগতি সাহিত্য আন্দোলনের সঙ্গে বিষ্ণু দে-র ঘনিষ্ঠযোগ গড়ে ওঠার আগেই 'উর্বশী ও আর্টেমিস' কাব্যগ্রন্থের রচয়িতা কোন কোন মহলে কবিত্বের স্বীকৃতি পেয়ে গেছেন। এমনকি রবীন্দ্রনাথও অন্ততঃপক্ষে তাঁর কবিত্বের শক্তিকে স্বীকৃতি দান করেন। তবে এই স্বীকৃতির সঙ্গে মিশেছিল প্রৌঢ় ও প্রাজ্ঞ কবির সতর্কবাণী নিয়ত যে কবি নিজস্ব নির্মাণপরিধিকে অতিক্রম করতে থাকেন, উপনিবেশের জগৎকে বারংবার ভৌগোলিক-সীমানা বদলে দিতে যাঁর জুড়ি নেই, যিনি আধুনিকতার বিরুদ্ধে কিছু উষ্ণ উত্তাপ ছড়ালেও পরক্ষণে আবেগে ও তারুণ্যচকিত অনুরাগে নির্দ্বিধায় বরণ করে নেন যুগ ও কালের আধুনিকোচিত দাবিকে, সেই রবীন্দ্রনাথ

বিষ্ণু দে-র কাব্যকে যুক্তফ্রন্ট প্রথমদিকে স্বীকৃতি জানাতে পারেন নি কেন তার উত্তর আলোচনার আগে বিষ্ণু দে ও প্রগতি সাহিত্য আন্দোলনের সংশ্লিষ্ট সম্পর্কের বিষয়ে কিছু আলোকপাত করা যেতে পারে।

'উর্বশী ও আর্টেমিস'-র রচনাকাল ১৯২৮-৩৩ খ্রীষ্টাব্দ আর প্রকাশকাল হল ১৯৩৩ খ্রীষ্টাব্দ। এই ঘটনার অনেক পরে, অন্তত তিনবছর পরে বাংলাদেশে প্রগতি লেখক আন্দোলনের জন্ম। এই আন্দোলনের সঙ্গে তিনি যুক্ত ছিলেন মোটামুটিভাবে প্রথমাবধিই। ১৯৪২ খ্রীষ্টাব্দে ফ্যাসিস্ট-বিরোধী লেখক ও শিল্পী সংঘের যুগ্ম সম্পাদক নির্বাচিত হন। ১৯৪৩ খ্রীষ্টাব্দে সর্বভারতীয় প্রগতি লেখক সংঘের যুগ্ম সম্পাদকও মনোনীত হন। প্রগতি লেখক সংঘের আদর্শ ও নীতি পার্টির কর্মসূচীর অনুরূপ হলেও তা প্রথমদিকে অন্যতম অঙ্গ হয়ে ওঠে নি। বিষ্ণু দে দলীয় নিয়ন্ত্রণ সর্বদা মানেন নি। ফলে প্রায়শ তাঁকে ঘিরে একটা বিতর্ক রয়েই গেছে। ১৯৪৭ খ্রীষ্টাব্দে রজার গারোদি, পিয়ের এরভে ও নাম দুই আরাগঁ-সমর্থিত পার্টি-উদ্যোগে যে ঘরোয়া বিতর্কসভা হয়, তাতে মুখ্য ভূমিকা নেন বিষ্ণু দে, উদারপন্থী গারোদি'র পক্ষে বিষ্ণু দে তাঁর বক্তব্য রাখেন। তাঁর বিশ্বাস, আর্টের ক্ষেত্রে পার্টি-লাইন বলে কিছু নেই, কমিউনিস্ট নন্দনতত্ত্ব বলেও কোন পদার্থ নেই। এহেন বিষ্ণু দে পার্টির সাংস্কৃতিক ফ্রন্টের অন্যান্য সদস্যদের কাছে সংশয়ের ঊর্ধ্বে উঠতে পারেন নি। কেননা, বিষ্ণু দে-র শিল্পদৃষ্টিতে বাস্তবিক যে জিনিসটি তীব্রভাবে ফুটে ওঠে তা হল তাঁর অত্যন্ত তীব্র ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবোধ। মার্কসবাদী বুদ্ধিজীবীরা রাজনৈতিক অথবা সাংস্কৃতিক কার্যক্রমের কোন পর্যায়েই ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের উগ্রতাকে অসংশয়ে গ্রহণ করতে পারেন নি। ফলে বিরোধ ছিল অবধারিত। এমনি এক সংকটে তদানীন্তন রাজ্যকমিটির সম্পাদক ভবানী সেন হস্তক্ষেপ করেন বলে হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় তাঁর স্মৃতিকথায় উল্লেখ করেছেন।[১] বিষ্ণু দে পার্টির গুরুতর দুর্দিনেও অনমনীয় মনোভাবের পরিচয় দিয়ে সরে আসেন 'একলা চলার নীতি'তে, এর ফলে কমিউনিস্ট পার্টির সঙ্গেও তাঁর উত্তরোত্তর ব্যবধান বেড়ে যায়। প্রায় অঘোষিত যুদ্ধই তিনি ঘোষণা করে বসেন 'সাহিত্যপত্র' পত্রিকার মাধ্যমে কমিউনিস্ট পার্টির বিরুদ্ধে।[২] প্রসঙ্গত স্মরণ করা যেতে পারে যে, বিষ্ণু দে সমর সেনের মতই পার্টি-সদস্যপদ কখনই গ্রহণ করেন নি। তবু তাঁরা দু'জনেই কমিউনিস্ট পার্টির তদানীন্তন চিন্তাধারার ক্ষেত্রে আত্মীয়শ্রেণীর। এই আত্মীয়তার বোধই বিষ্ণু দে-কে লেখক সংঘের বিভিন্ন পদে অধিষ্ঠিত করেছে, তাঁর মতামত গুরুত্ব পেয়েছে পার্টি-সদস্যদের কাছেও। তবু বলা দরকার, সাহিত্যে দলীয়-নিয়ন্ত্রণের প্রশ্নে বিষ্ণু দে প্রথম থেকেই একটু সোচ্চার ছিলেন। সাহিত্যে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের মর্যাদাকে স্বীকৃতি জানিয়েছিলেন, এর প্রমাণ পাওয়া যায় 'অরণি' সম্পাদকের কাছে লেখা পত্রে মনোজ হালদারের কয়েকটি কথার তীব্র সমালোচনায়। মনোজ হালদার লিখেছিলেন,

...এই বিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগের জগতে ব'সে শ্রীযুত তারাশঙ্কর, শ্রীযুত মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি

সেক্সপীয়রীয় দৃষ্টিতে বাংলার জনসাধারণকে নিয়ে ব্রুটাস ও এ্যান্টনীর খেল দেখাচ্ছেন এবং জনসাধারণের যেন কোন সত্তাই নেই, এইটাই বোঝাতে চাইছেন। এমনও I am the State এই বাণীকে অন্তরে পোষণ ক'রে 'সম্রাট'--এর মত কবিতা ছাপার অক্ষরে প্রকাশ করা হচ্ছে। পরোক্ষে এসব ফ্যাসিজমের প্রতিই একটা অজ্ঞাত মোহ।'[৩]

আলোচ্য প্রসঙ্গের সূত্র ধরে বিষ্ণু দে লেখেন, ... 'শুধু বলা দরকার যে শ্রীযুক্ত তারাশঙ্কর ও মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় এবং প্রেমেন্দ্র মিত্র সম্বন্ধে তাঁর মন্তব্য আমাদের স্থূলবুদ্ধিতে হঠোক্তি বলেই মনে হয়েছে। দীর্ঘকাল যাবৎ তাঁদের রচনাবলীর আমরা পাঠক, ব্যক্তিগত পরিচয়ের সৌভাগ্যও আমাদের অল্পবিস্তর আছে। সাহিত্যিক মতামত হয়তো আমাদের মেলে না, রাজনীতির সব জায়গায় হয়তো আমরা সকলে একমত নয়, কিন্তু তাঁরা যে সভ্যতার বিপ্লু ফ্যাসিজম সম্বন্ধে মোহ রাখেন না, সে বিষয়ে আমরা নিশ্চিত।'[৪] ফ্যাসিস্টবিরোধী লেখক ও শিল্পী সংঘের সম্পাদক হিসেবে তিনি এই পত্র লেখেন এবং মনোজ হালদারকে নিষ্ঠুরতার সঙ্গে একথা জানান যে, তারাশঙ্কর, মানিক ও প্রেমেন্দ্র মিত্র তিনজনেই উক্ত সংঘের 'সহচর ও পৃষ্ঠপোষক'। মনোজ হালদার পূর্বোক্ত লেখায় ছাত্রসমাজের সঙ্গে লেখক-শিল্পীর সমন্বয়সাধনের প্রসঙ্গ তোলেন, জবাবে বিষ্ণু দে ছাত্রদের সহযোগিতায় লেখক-শিল্পী-জনসাধারণের যোগ যে সম্ভব তা মেনে নিয়েও বলেন, 'কিন্তু ছাত্র-মধ্যস্থতায় লেখক-শিল্পী দেশকে, জনসাধারণকে সংবেদে জানাবে, এ কথাটা ছাত্রসুলভ short-cut পাঠে-পরীক্ষা পার হওয়ার মতো নয় কি? কারণ, লেখক-শিল্পীর জ্ঞান-চয়ন ও অভিজ্ঞতাবিকাশ নিরন্তরতায় সম্পূর্ণ।'[৫] শেষ বাক্যটি অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। শেষ বাক্যটিতে তিনি মনে নেন লেখক-শিল্পীর জ্ঞান আহরণের পদ্ধতি আর অভিজ্ঞতার জগৎ ব্যক্তিশিল্পীর একান্ত ব্যাপার। এই ক'টি কথার ভেতরেই বিষ্ণু দে-র শিল্পমানস তথা তার অভিব্যক্তির প্রকাশ লক্ষ্য করা যায়।

আমরা জানি, ব্যক্তির সঙ্গে সমাজের সম্পর্ক অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ, সামাজিক জীবনধারা মানুষের চেতনাকে গড়ে তোলে, ব্যক্তির চেতনা তাই সমাজের বাইরের চেতনা নয় কোনমতেই, আর এই চেতনা সমাজসম্পর্কের ভেতর দিয়ে সতত প্রকাশশীল। বিষ্ণু দে যখন বলেন যে ব্যক্তিশিল্পীর একান্ত ব্যাপারই হল এই জ্ঞান অর্জনের পদ্ধতি কিংবা তাঁর অভিজ্ঞতার জগৎ, তখন ব্যক্তিশিল্পীকে বিষ্ণু দে সামাজিক সম্পর্কের থেকে রেখে দেন একটু দূরে। এর কারণ আছে। সম্ভবত তিনি যে ধারায় প্রধানত লালিত-পালিত, যে ইংরেজি শিক্ষায় অভ্যস্ত, তা অতি সূক্ষ্ম ও সচেতন হওয়া সত্ত্বেও, এই চেতনার সঙ্গে যোগ নেই বৃহত্তর জনসাধারণের, যোগ নেই প্রত্যক্ষ গণ-আন্দোলনের অথবা ভারতীয় জীবনের ঘনিষ্ঠ ও নিবিড় আন্তর-বোধ ও উত্তাপও সঞ্চারিত হয় নি তাতে, ফলে ব্যক্তিবাদের বা স্বাতন্ত্র্যবাদের অনভিপ্রেত ও অনতিসূক্ষ্ম ছায়াপাত কবির রচনাকে ঘিরে

যাকেই আকৃষ্ট করে তুলেছে। তাছাড়া, বিষ্ণু দে স্বয়ং মনে করেন, বাংলা সাহিত্য বড় বেশি ইউরোপীয় সান্নিধ্যমুখর। অর্থাৎ বিষ্ণু দে-র ব্যক্তিস্বাধীন ঝোঁকের প্রবলতা প্রথম থেকেই ইংরেজি সাহিত্যের যে রসে নিমগ্ন হতে চেয়েছে, সেই রসের বাইরেকার অনুভূতিতে বাংলাদেশ, বাংলা সাহিত্য, বাঙালির বিশিষ্ট সত্তা খানিকটা অস্বীকৃতি পেয়ে এসেছে। কিন্তু এই অস্বীকার স্বেচ্ছাকৃত, স্বতঃপ্রণোদিত, নতুন কিছু নির্মাণের আগ্রহে, নতুন সৃষ্টির উল্লাসে, হয়ত-বা এই উল্লাসের অনেকটাই বাঙালি-পাঠকের কাছে ট্র্যাজিকও বটে। তথাপি প্রাপ্তিও অনেক। রবীন্দ্রনাথের হাতে বাংলা সাহিত্য বাংলাদেশের ভৌগোলিক পরিমণ্ডল অতিক্রম করে লাভ করেছিল আন্তর্জাতিকতা তথা বৈশ্বিক পটভূমি। বিষ্ণু দে-রও বিশ্ববীক্ষা গড়ে উঠেছে, তবে তা ভিন্ন পথে, মার্কসবাদের ওপর প্রভূত পঠন-পাঠনের মধ্য দিয়ে। তার হিসেবে এর স্বীকৃতি প্রাপ্য। একথা মানতে হবে, মার্কসবাদ নিয়ে পঠন-পাঠনেরও আগে টি. এস. এলিয়টের কাছে তাঁর ঋণ বড় কম নয়। কবি তা কৃতজ্ঞতার সঙ্গে উচ্চারণ করেছেন বারংবার। তিরিশের এই বিশিষ্ট দশকটিই বস্তুতপক্ষে বাংলা সাহিত্যে এলিয়টচর্চার এক গৌরবময় কাল। গৌরবের, কারণ, এলিয়টের গভীর সমাজমনস্কতা, যা আধুনিক মননশীলতা নামে খ্যাত, তার নিবিড় অনুশীলন, সেই সঙ্গে ঐতিহ্যবোধ ও আঙ্গিকচর্চা এই দশকে সুধীন্দ্রনাথ দত্ত থেকে শুরু করে বুদ্ধদেব বসু, জীবনানন্দ দাশ, প্রেমেন্দ্র মিত্র, অমিয় চক্রবর্তী এঁরা তো বটেই প্রগতি সাহিত্যের সমর্থক লেখকগণও অল্পবিস্তর করেছেন। বোঝা যায়, এই প্রভাব এড়ানো তাঁদের পক্ষে শক্ত হয়েছে। প্রথম বিশ্বযুদ্ধোত্তর কাব্য-সাহিত্যে এলিয়ট যে ধারার সূচনা করেন, আসলে সেই ধারারই অনুবর্তন (রূপান্তর ও নানাবিধ বিবর্তনসহ) স্পেনের ফেদেরিকো গার্সিয়া লোরকা, লুই আরাগঁ, পল এলুয়ার, কিংবা ইংরেজি সাহিত্যে অডেন, সি. ডে. লুইস, ম্যাকনিস, স্পেন্ডার প্রমুখের রচনায় আর বাংলায় বিষ্ণু দে, সুভাষ মুখোপাধ্যায়, সমর সেন এঁদের রচনায় ঘটেছে। এই ধারা প্রতীকী ধারার চেয়ে সম্পূর্ণ পৃথক একটি ধারা যা জড়বাদী চিন্তাধারাকে আত্তীকরণে সদাই তৎপর ও উন্মুখ। বিষ্ণু দে এই ধারার সর্বাধিক সার্থক উত্তরাধিকারী। আঙ্গিক ও প্রকরণগত বিস্তর জটিলতার চর্চার সঙ্গে সঙ্গে তিনি কবিতার সীমানাকে বহুদূর অবধি প্রসারিত করেন। তাসত্ত্বেও একথা মানতে হবে, কেবল মৌলিকতা তথা ব্যক্তিস্বতন্ত্রতা আর ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের পরিণামই তাঁর রচনা নয়, প্রগতি আন্দোলন যে সমস্ত শর্ত ও সূত্রকে উপজীব্য করে গড়ে উঠেছিল, সেই সমস্ত উপাদান-উপকরণগুলি অর্থাৎ বিষয়বস্তুগুলি যুগ ও কালের বিস্তীর্ণ পটভূমিতে কেবল ছড়িয়ে ছিটিয়েই ছিল না, এই আন্দোলন লেখক-শিল্পীদের অন্তত নানাভাবে প্রণোদিত, উৎসাহিত ও প্রত্যক্ষ প্রেরণাস্বরূপ হিসেবে সৃষ্টিক্ষেত্রে বন্যার বেগ সঞ্চারে রীতিমত সহায়তা করে চলছিল---বিষ্ণু দে, আমাদের মতে, তারই ফলশ্রুতি বললে অত্যুক্তি হবে না। 'চোরাবালি'র (প্রকাশকাল ১৯৩৭) কয়েকটি কবিতা

থেকে শুরু করে 'অন্বিষ্ট'(প্রকাশকাল ১৯৫০) অবধি বিষ্ণু দে কমিউনিস্ট পার্টির সঙ্গে ঘনিষ্ঠ আত্মীয়-বন্ধনের দায় বহন করেছেন। অবশ্য 'অন্বিষ্টে'র কাল তাণ্ডবের কাল। বিষাদের সুর ধরে আত্মীয়বিচ্ছেদের এক করুণ পরিণামও তাঁর চেতনাকে খানিকটা আঘাত করেছে। কাজেই, দলীয় অন্তঃসংগ্রামের নামে প্রত্যাঘাতের তথা বিদ্রূপের একটি অনুদার বাসনাও দেখা দিয়েছে এই শেষ পর্বে।

দলীয় কর্মী আর কবি-সত্তার বিরোধে সুভাষ মুখোপাধ্যায় ও সুকান্ত ভট্টাচার্য একটি সুনির্দিষ্ট আদর্শসম্পন্ন রাজনৈতিক সংগঠনের কাছে আত্ম সমর্পণের কাছে কোনরকম কুণ্ঠা অথবা সংশয় রাখেন না, অন্যদিকে বিষ্ণু দে ও সমর সেন সর্বদাই একটি সংশয়ের, ব্যক্তিক অনুভবের কেন্দ্রবিন্দুতে স্বাতন্ত্র্যবোধের স্পর্শে অতি-তৎপর, হয়ত-বা, সমর্পণে আত্মগ্লানিও অনুভব করেন যা তাঁদের ব্যক্তিচেতনাকে একটি বিশেষ শ্রেণীমানসিকতা দিয়ে বুঝতে হবে---এর অনেকটাই পেটি-বুর্জোয়াসুলভ মানসিকতা। মনে রাখতে হবে একথাও যে, বিষ্ণু দে ও সমর সেন দুজনেই কমিউনিস্ট পার্টির সদস্যপদ নেন নি, দুজনেই কমিউনিস্ট পার্টির বৃত্ত-পরিধির কাছাকাছি থেকেছেন, সংগঠনে চাঁদা-আদি দিয়েছেন, কিন্তু দেখা গেছে কমিউনিস্ট পার্টির দুঃসময়ে এঁরা উভয়েই ব্যবধান রেখেছে, দূরত্ব রচনা করে, সুবিধাবাদী বুদ্ধিজীবীসুলভ নৈর্ব্যক্তিকতার একটি আড়াল আশ্রয় করেছেন। কর্মীসত্তা আর কবিসত্তার সমন্বয়ে যে শিল্পীসত্তা পেতে পারত এক অফুরান সম্ভাবনাময় তাৎপর্যবহ শিল্প-অভিব্যক্তি, পরিণতির অনেক আগেই তাকে অস্বীকার করে বিষ্ণু দে কবি-সত্তার ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যের ধ্বজা তুলে মার্কসবাদী বস্তুতন্ত্রের কথিত বা ব্যবহারিক প্রয়োগের যৌক্তিকতা সম্পর্কেই সরাসরি একটা চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে দিয়েছেন নিজেদেরই সহকর্মীদের দিকে।

কিন্তু সুখের কথা এই যে, দলীয় ক্ষেত্রে বিষ্ণু দে প্রতিক্রিয়াশীল হিসেবে চিহ্নিত হলেও, সাহিত্যক্ষেত্রে তিনি শিক্ষিত সুধীজনের প্রশংসাই পেয়েছেন। যে প্রতিভার ধর্ম জটিল শিল্পকলার মাধ্যমে বুদ্ধিমেয় শিক্ষিতজনের মুগ্ধপ্রশংসা আদায়, বলাই বাহুল্য, সেইসব শিল্পসাহিত্য জনগণের বৃহত্তর অংশের কাছে পৌঁছতে পারে না, তাই বিষ্ণু দে-রও জোটে নি জনপ্রিয়তা, বরং আধুনিক কালের সবচাইতে দুরূহতম কবির অভিধাই তাঁর প্রাপ্য হয়েছে। প্রগতি সাহিত্য আন্দোলনের অন্যতম একটি উদ্দেশ্য ছিল জনসাধারণের সঙ্গে নিবিড় সম্পর্ক স্থাপনঃ 'আমরা চাই জনসাধারণের জীবনের সঙ্গে সর্ববিধ কলার নিবিড় সংযোগ'[৬]---প্রকৃতপক্ষে এই শর্তের দিকে বিষ্ণু দে-র সতর্কদৃষ্টি পড়ে নি। বহুপাঠী বিষ্ণু দে-র কাছে গণ-সংযোগের প্রতিশ্রুতি কেবল রয়ে গেছে খানিকটা ফরাসী কবি আরাগঁ ও লোরকা(স্পেনের কবি)চর্চায়, আর লোকস্মৃতি তথা বাংলাদেশের লোকসংস্কৃতির অল্পবিস্তর অনুধ্যানে। তবে, বিষ্ণু দে এসবক্ষেত্রে আবেগের সঙ্গে যুক্ত করেছেন মননশীল সংবেদনাকে, মার্কসীয় দৃষ্টিকোণ সেখানে একেবারে উপেক্ষিত হয় নি।

বাস্তবিকপক্ষে বিষ্ণু দে-র শিল্পতত্ত্বের পরিধি ঘিরে জুড়ে আছে এক নিবিড় উদারতাবাদ যা বুর্জোয়া শিল্পতত্ত্বেও অস্বীকৃত নয়। তাছাড়া এই উদারতাবাদ সকালের বাংলা সাহিত্যে ইতিমধ্যেই প্রতিষ্ঠিত হয়ে গেছে রবীন্দ্রনাথের বিশাল মহিমাময় উপস্থিতিতে। রবীন্দ্রোত্তর কাব্যসাহিত্যে প্রতিষ্ঠিত হতে হলে তাই এই উপস্থিতির বিশালত্বকে অনুকরণ করলেই চলে না, তার মধ্যে স্বাতন্ত্র্যপ্রতিষ্ঠার, নতুনত্ব সন্ধানের ও ব্যাপক বৈচিত্র্যের তাৎপর্যময় অনুশীলনও একরকম অপরিহার্য---বিষ্ণু দে-র উদারতাবাদ তাই মার্কসীয় দৃষ্টিভঙ্গির অনুশীলনচর্চায় ও বৈচিত্র্য অন্বেষণের পথে একটি বৈশিষ্ট্য অর্জনে সহায়ক হয়েছে। মার্কসবাদচর্চার মধ্য দিয়ে তিনি যে স্বকীয় শৈলী ও রীতির প্রতিষ্ঠা ঘটিয়েছেন তার সম্পর্কে তাঁর কয়েকটি বক্তব্য অনুধাবনযোগ্য বলে মনে হয়। 'আরাগঁ'[৭] প্রবন্ধে তাঁর আত্মচৈতন্যের দিকনির্ণয় প্রতিফলিত কয়েকটি ভিন্ন অথচ তাত্ত্বিক বক্তব্য বিতর্কের পরিবেশ সূচিত করেছে; যেমন--

ক) আরাগঁ-র অনুসরণে তিনি চান 'জাতীয় সত্তার বোধ, সুদূর অতীত থেকে অভিজ্ঞতার উত্তরাধিকারের চেতনা'---অতীতের ঐতিহ্য থেকে গ্রহণ করতে চান ভবিষ্যতের প্রগতির পাথেয়,

খ) মার্কসবাদের প্রয়োগে সাহিত্যবিচারে ভুল ঘটবার সম্ভাবনা, যেমনটা গোটস্কি-মেহরিং-রলফের ক্ষেত্রে 'ইতিহাসের সংক্ষেপ বিকার' ঘটেছে। এই বিকারের বিরুদ্ধে, 'অসহিষ্ণু আলোচনার' বিরুদ্ধে মার্কস-এঙ্গেলস আর লেনিনের সতত সতর্কতার প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন,

গ) সাহিত্যবিচারে সামাজিক-রাজনৈতিক পটবিচারের সঙ্গে সাহিত্যমূল্য ও পটবিচারের মূল্যের সমন্বয় মানবিকমূল্যের সূচক,

ঘ) বিষ্ণু দে লক্ষ্য করেছেন মার্কসবাদীর তারতম্যভেদ---সঠিক মার্কসবাদী ও নিকৃষ্ট মার্কসবাদী। প্রথমোক্ত 'মার্কসবাদীর আলোচনায় দেখা যাবে কিভাবে লেখক রীতি, লেখক বিন্যাস, বর্তমান বিশ্বব্যাপ্ত চেতনায় হাত মেলাবে, কিভাবে একই শ্রেণী সমাজের মোটামুটি একই শ্রেণী থেকে বিদ্যাসাগর, সুতোষও আসেন, গদাধর বিনয়কৃষ্ণও আসেন, বিরাট বহুধাভক্ত রবীন্দ্রনাথও আসেন---যিনি, মার্কসবাদীর হঠাৎ মনে হতে পারে সাভারকরের গুরু, যিনি আবার ব্যাপকভাবে কখনো বা মার্কসবাদীরও তো গুরু।' অন্যদিকে 'নিকৃষ্ট মার্কসবাদীরা আবার আলোচনায় নেমে, কটুকাটব্য গালিগালাজকে ভাবেন ভুয়া সেকটিকস, বাক্যের অপব্যাখ্যা করেন, প্রতিপক্ষকে অসম্পূর্ণভাবে বা মিথ্যাভাবেই উদ্ধৃত করেন, বোধের ও জ্ঞানের অভাবকে ঢাকেন গদ্যের আত্মম্ভরিতায়।'

ঙ) একটি বিশেষ সামাজিক-পটের ভূমিতে দাঁড়িয়ে সাহিত্যশিল্পের শ্রেণীবিচার, তাঁর মতে, সম্ভব নয়--- উদাহরণত তিনি বলেন যে, বুর্জোয়াসমাজের সামগ্রিক প্রতিফলনের দায় লর্ড বায়রন বা শেলির নয়,

পরিবৃত কীটদেরও।'বুর্জোয়া সমাজের শ্রমিক কাব্যও শ্রেণীহীন সমাজের কাব্য নয়, বুর্জোয়া সমাজেরই একটা বিশেষ প্রতিবাদী প্রতিফলন'।

চ) তাঁর বক্তব্যের সমর্থনে মার্কসের উদ্ধৃতি দিয়ে বলতে চান 'কবিতা ব্যক্তির সত্তাসাপেক্ষ, যন্ত্রপণ্য নয়'---মার্কসের বহুখ্যাত উক্তির প্রতিধ্বনি করেন তিনি---

'You do not demand that a rose should have the same scent as a violet, but the richest of all, the spirit, is to be allowed to exist in only one form?'

শিল্পতত্ত্বের এলাকায় ব্যক্তির ভূমিকার অগ্রচারিতাকে বিষ্ণু দে অন্তরঙ্গ অর্থে গ্রহণ করেছেন। সেইসঙ্গে সামাজিকজীবনের ঐতিহাসিক বিকাশপরম্পরার প্রতিও তাঁর সচেতন আগ্রহ প্রকাশ করেছেন। তাঁর মতে, বাংলাদেশের সমাজজীবনের চেহারাটা নিদারুণভাবে অস্পষ্ট---বাম আর বামেতর শ্রেণী-চেতনার দ্বারা এই চেহারা সুতোপ্রকাশোজ্জ্বল নয়। তাঁর ভাষায়: 'আমাদের দুর্ভাগ্য বশত আমাদের জীবনের সামাজিক সাংস্কৃতিক চেহারাটা আজো স্পষ্ট হয় নি, দক্ষিণে বা বামেতরে স্পষ্ট হবার কথাটা ওঠে না, কারণ স্পষ্ট চেহারা জীবনেই সম্ভব, মৃত্যুতে নয়।' তিনি বিশ্বাস করেন, 'কিন্তু বামের যন্ত্রণাটা জন্মের মতোই সাযুজ্য অনিবার্য, বামপন্থীই এলোমেলো জীবনকে চেহারা দিতে উৎসুক।'[৮] সৎ শিল্পের প্রাণনার মূলে, তাঁর মতে, থাকে বামমার্গীয় মানবিকতার যন্ত্রণাই---এই বিশ্বাসটুকু তিনি গভীর শ্রদ্ধায় অর্জন করেন। বাংলা সাহিত্যে প্রগতির বিশেষ অর্থ-অন্বেষায় তিনি খুঁজে পান দুটি দিক---একটি বৈজ্ঞানিকমনস্যতা, অপরটি 'ঐতিহাসিক দৃষ্টির প্রসার'---এর সঙ্গে অবশ্য যোগ করেন 'সচেতনতা' শব্দটি। প্রগতিশীল সাহিত্যের মধ্যে চিরকালীন লক্ষণ হিসেবে তিনি গণ্য করেন 'চৈতন্য-আনন্দ টান'কে। বিশ্বাস করেন, শিল্পীর নৈর্ব্যক্তিকতায় তথা নিরপেক্ষতায়। কারণ ? 'জীবনের প্রত্যক্ষে আর সর্ব-সংস্কৃতিগত পরোক্ষের দ্বন্দ্ব থেকে-থেকে মাটিতে এসে মেশে প্রচণ্ড মাতোয়ারিতে। তাই প্রয়োজন শিল্পীর অপক্ষপাত, বিজ্ঞানের মতো নৈর্ব্যক্তিকতার শিক্ষাকে যাতে দ্বন্দ্বটা নিয়ন্ত্রিত হতে পারে।' বিজ্ঞানপদ্ধতির সত্যের মতই তাঁর কাছে মনে হয় শিল্পপদ্ধতি---মূলে থাকে শ্রেণীহীনতা, সত্যের যেমন শ্রেণীবিভাজন নেই, তাঁর টেকনিকসম্পর্কে বক্তব্য খণ্ডন করতে চেয়েছেন অতিবামপন্থীদের অপ্রাকৃত যুক্তির অবতারণা---'টেকনিকের সাধনাই শিল্পীকে জিজ্ঞাসার সীমান্তে টেকনিকের উৎসে নিয়ে যেতে পারে। রচনার পদ্ধতি চৈতন্যমার্গ বা বিশ্বাসের বিরোধী, একথা শুধু অতিবামপন্থীদের অপ্রাকৃত মনেই ওঠে।'[৯] একদিকে দক্ষিণপন্থার, অন্যদিকে অতিবামপন্থার বিরুদ্ধে

অন্তরাগত তাঁর শিল্পতত্ত্বের ভিত্তি গড়ে উঠেছে---হয়ত-বা এর মধ্য দিয়ে তিনি তাঁর স্বকীয় বৈশিষ্ট্যের একান্ত পরিমণ্ডল রচনায় প্রয়াসী হয়েছেন। বিষ্ণু দে আধুনিক শিল্পের সারসত্য বলতে বোঝেন, 'আত্ম-পরিচয়ের সত্তা'র পুনর্প্রতিষ্ঠা, সেইসব নির্মাণকর্ম, যা স্বভাবেও মৌলিকতায় গড়ে তোলে একজন প্রকৃত শিল্পীর মানসভূমণ্ডল---'জীবন্ত স্বকীয় সংবেদ্যতায় আর মননপ্রক্রিয়ায়'---তিনি বলেন, 'একমাত্র তাতেই হয় প্রাণময় শক্তিতে গতিশীল তার নৈতিক বা আত্মিকের ও তার বাহন অর্থাৎ বিষয় শরীরের কর্তৃত্ব, তখনই সম্ভব হয় পরবর্তী পদক্ষেপের জন্যে অগ্রগামী কর্মিষ্ঠতা।'[10] প্রকৃত শিল্পীর এরকম সার্বিক রূপান্তর-প্রক্রিয়ায় প্রগতিশীলতাও সুনিশ্চিত হয়। বিষ্ণু দে-র শিল্পচিন্তায় প্রগতিশীলতার অর্থ তখনই একটি নিবিড় তাৎপর্য পায় যখন নৈতিক ও জীবনোৎসারিত বিষয়বস্তু' (কবির মতে---এই দুটিই হল একই ক্রিয়ার অনুভূতি)-র সামগ্রিকতাকে ব্যক্তিগত ও সামাজিক যুগপৎ একই পরিপ্রেক্ষিতায় উপলব্ধির প্রয়াস ঘটে।

* * *

নেতিবাদ থেকে সাম্যবাদ :

বিষ্ণু দে'র 'মননের বিন্দু' একদা 'পরিত্রাণের বীজমন্ত্র' যে নেতিবাদ ছিল না একথা বলা যায় না। 'নেতিতেই আরম্ভ হতে পারে (এই) মানবের প্রগতি'---এই চেতনা, অসম্ভব নয়, 'উর্বশী ও আর্টেমিস' ও 'চোরাবালি'তে খানিকটা অংশ জুড়ে ছিল। এই নেতি চেতনা বিষ্ণু দে-র কাছে কালের দাবি যাচ্ঞা করে নি, বরং মনের 'অরণ্য' (বিষ্ণু দে-ব্যবহৃত শব্দ)-র থেকে নিষ্ক্রমণের এ এক প্রাক্-মুহূর্তের ব্যাপার বলে মনে হয়। বিষ্ণু দে জানেন, আধুনিক জীবনের সমস্যা অত্যন্ত জটিল। 'এই যুগান্তরের সমস্যাকে নিজের সত্তায় সমাধানে জয় করতে' বা 'শুদ্ধতায় আত্মসচেতনতায় আয়ত্ত করতে' পশ্চিমের কোন মনীষী, কবি বা সাহসী সমালোচকও পারেন না---এই দীর্ঘতম বিকাশধারাকে আত্মীকৃত করতে হলে দীর্ঘপথ পাড়ি দেবারও কখনও কখনও প্রয়োজন হয়ে পড়ে---এবং 'সেটা সম্ভব সংঘগতভাবে, পরম্পরার মধ্যে দিয়ে মননের বা জ্ঞানের নানা কর্মক্ষেত্রে, একাধিক মনীষীর সাধনার ও চিরাবেগিক সিদ্ধিতে।'[11] বিষ্ণু দে চির-আবেগিকতার এই জগতে সিদ্ধির দিকে অগ্রসর হতে গিয়ে 'নেতি'-র বোধেও স্বাভাবিকভাবে আচ্ছন্ন হতে পারেন, উচ্চারণ করতে পারেন হেনরি জেমসের মত----'নেতির মৌলিকতায় মগ্ন হও'---কবির মন ও মনন বিকাশের নিয়ম-ক্রিয়ায় বিশেষ একটি চেতনাকে এভাবেই একটি দার্শনিক ভিত্তিও হয়ত-বা দিতে পারেন। যেমন দিয়েছেন সুধীন্দ্রনাথ দত্ত---

'এবং সে-শক্ত বিন্দুর
মধ্যে দ্বৈপায়ন আমরা সকলে, জানি কি না জানি,
নাস্তিরই বিবর্তবাদ।'

('যযাতি', সংবর্ত)

নেতি-বোধের মূলে থাকে যন্ত্রতান্ত্রিক সভ্যতাজাত প্রবল নৈরাশ্যের চেতনা, দূরচারী ব্যক্তি-সত্তার শিকড়হীনতা হয়ে ওঠে প্রকট, জীবনের মূলে তার আশ্রয়-বিচ্ছিন্ন এক প্রগাঢ় অনুভব তাকে ঘিরে সমুচ্ছ্বসিত হতে থাকে----বিষ্ণু দে ১৯২৮-২৯খ্রীষ্টাব্দের কাছাকাছি সময়ে হয়ত-বা এই অনুভবে আলোড়িত হয়ে থাকতে পারেন---'পৃথিবীর জনতার গ্লানি/স্পর্শ তো করে নি আমাদের।/যে সুদেশে আমাদের বাসা,/অতিরিক্ত নেই জনপ্রাণী,/বাঁধি বাসা মানস-লোকের'। ('উদ্যাপন', উর্বশী ও আর্টেমিস)। রাত্রিদিন অবসাদের মধ্যে দিয়ে মানস-লোকের অভিসারী যে, প্রিয়জনের মৃত্যুর মধ্য দিয়ে যে চিত্ত লাভ করে কেবলি অন্ধকার, সে মানস-লোক কতখানি সুস্থির, সে অন্ধকার কতখানিই বা প্রিয় হতে পারে কবির কাছে ?
নেতিবোধের মূল হয়তবা এখানেই প্রোথিত। তাই এপ্রিল বা যৌবনের মূল চলে গেলে কবির জন্যে পড়ে থাকে 'খর রৌদ্র লোক'---আর 'শূন্য হল তীর/রৌদ্রালোকে তীর হল শুষ্ক মরুভূমি।' ('এপ্রিল', উর্বশী ও আর্টেমিস)। ঠিক একই অনুভবের পটভূমিতে ফুটে কবিচিত্তের প্রবল শূন্যতার বোধ---'অন্ধকার পারে/শূন্যতার আকাশ-কিনারে/দ্বিধায় থমকে যায় গতি/মরণের গন্ধ পায় মন।' ('প্রেম', উর্বশী ও আর্টেমিস)।
'অন্ধকার' আর 'শূন্যতা' কবির নেতিবোধের উৎস এখানে। 'চিরতরে ছিন্ন কোথা আশা'---এই প্রশ্নই যেন কবিকে টেনে নিয়েছে অন্ধকার আর শূন্যতার আস্বাদের দিকে। বলছেন: 'রাত্রির বিশাল মুখ বাতায়নে উঁকি দেয় কালো,/ একাকী রয়েছি ব'সে অরণ্যের বাংলোর ঘরে।/আকাশে নেইকো আলো, পৃথিবীর নিচে গেছে আলো/অরণ্যের অন্ধকার ছুটে আসে ঝাঁকে ঝাঁকে ঘরে।/অন্ধকার সমুদ্রের মাঝে আমি ডুবে আছি একা।/কণ্টকিত অন্ধকারে চেতনায় অবসাদ ঝরে।' ('অতিক্রম্য', উর্বশী ও আর্টেমিস)।
এ কবিতায় আর একটি নতুন উপাদান---ব্যক্তিসত্তার নিঃসঙ্গতা-চেতনা, যুক্ত হয়েছে। আরণ্যক অন্ধকারে কবির এই প্রাপ্তিহীন আশাহীন একক বেদনাবোধের আড়ালে আর্থ-সামাজিক জীবনের অ-প্রত্যক্ষ সংস্পর্শ অনস্বীকার্য। যে সমস্ত কারণ থাকলে প্রত্যক্ষ সামাজিক জ্ঞান স্পষ্ট হয়, তার সংক্ষিপ্ততম অথচ সংকেতদ্যোতক উপাদান 'করেছি তোমাকে দূর বিধাতার কল্পিত আশ্বাসে'---শুধুমাত্র এই কারণের ওপর নির্ভর করে প্রেমিক-কবির কাছে বিশ্বভুবন আরণ্যক অন্ধকারে ঢাকা পড়ে যায়। বলাই বাহুল্য, একান্ত ব্যক্তিগত সম্পর্কের বিবর্তনের ওপর ভিত্তি করে বিষ্ণু দে-র এই পর্বের রচনাকর্ম বা শিল্পকর্মটি হয়ে উঠেছে মূলত আত্মতা-বিশিষ্ট। নিহিত সামাজিক মূল্যগুলি এই পর্বে নিতান্ত ক্ষীণ যা বুর্জোয়া শিল্প-ধারণায় এক রকম বিযুক্তি (Disintegrated)-প্রবণতার জন্ম দেয়। ডি. এইচ. লরেন্স সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে কডওয়েল বুর্জোয়া শিল্পীর বিযুক্তিকরণ প্রসঙ্গে দুটি বৈশিষ্ট্যের উল্লেখ করেছেন---বাজারের জন্যে উৎপাদনে ব্যবসায়িকতা, অন্যটি, শিল্পকর্মের স্বতন্ত্র হয়ে যাওয়া এবং শিল্পকর্ম ও ব্যক্তির মধ্যে সৃষ্ট

সম্পর্কটির প্রাধান্যবিস্তার, এর পরিণতি হল---যেসব সামাজিক মূল্যগুলি শিল্পকর্মটিকে একটা সামাজিক সম সম্পর্কে চিহ্নিত করে তোলে সেই সামাজিক মূল্যগুলিরই বিনষ্টি(dissolution)ঘটে যায়। সামাজিক সম্পর্কের বিনষ্টির নতুন শিল্পকর্মটি তাই নিছক ব্যক্তিগত অনিকেতচারণা হয়ে পড়ে।[১২] বিষ্ণু দের প্রথম পর্বের কবিতাগুলি সম্পর্কে বুর্জোয়া-ধারণার কথঞ্চিৎ প্রাদুর্ভাব যে নেই একথা বলা চলে না, যদিও ব্যবসায়-মানসিকতা এর মূলধন নয়, বরং ব্যক্তিগত সম্পর্কের অতৃপ্ত 'অহং'ই এর সামগ্রিক পরিবেষ্টনী। স্মর্তব্য কবির পংক্তি'টিঃ 'মানুষের অরণ্যের মাঝে আমি বিদেশী পথিক,/মুখোমুখি কথা বলি।চোখে লাগে অটল প্রাচীর।/বিদেশী পথিক আমি এসেছি কি বিধাতার ভুলে/পৃথিবীর সভাস্থলে, বুঝি নাকো তারা যে এসের।' ('সোহ বিজেত্র্যাদেশাকী বিজেতি', উর্বশী ও আর্টেমিস)।'চক্রানিকা'য় কবিও অনুরূপ বলেছেন, তিনি মেয়ের ভাষা বোঝেন না।ভাষা তো কেবল সামাজিক শব্দই নয়, ব্যক্তির গভীর অনুভব থেকে সারবত্তা সংগ্রহ করে যখন তারা উঠে আসে, তখন তা দ্বিতীয় মানুষের কাছে সর্বদা অর্থবহ নাও হতে পারে, কেননা, অনুভূতি ও অভিজ্ঞতা এর আসল নিয়ামক, এই একই দাবি কবি ও পাঠকের কাছে আশা করেন। কবি কেন নিজেকে বিদেশী পথিক ভেবেছেন, কেন অগণন মানুষের ভিড়কে অরণ্যের মতো উপমিত করেছেন, কেন নিত্য তৃপ্তিহীন দিন কাটে তাঁর---যে সমস্ত সামাজিক যুক্তি--শৃঙ্খলা ও পারম্পর্যের দ্বারা উত্তরণ লক্ষ্যে পৌঁছনো যায়, তার কোন খবরই তিনি জেনে রাখেন নি---একে সরাসরি কবি ও পাঠকের মধ্যকার যোগাযোগহীনতা বলাটা কি সঙ্গত ?

কবিতা এমনই এক শিল্পমাধ্যম যেখানে সরাসরি সামাজিক-অর্থনৈতিক প্রশ্নের জীবন্ত প্রতিবেদন রচনার বদলে আকার-ইঙ্গিতের নতুন বর্ণপ্রতিভাস-এর আশ্রয় নেন কবিরা। একটি কবিতার অবোধ্যতার জন্য একটি কবিতার অনিবার্য অথচ পরোক্ষ সহায়তা প্রয়োজন হয়ে পড়ে, অন্তত কবি-মনকে বোঝার জন্যে। বিষ্ণু দে 'উর্বশী ও আর্টেমিস'-এর অনেক কবিতাতেই অন্ধকারকে আশ্রয় করতে চান, নৈঃসঙ্গ্যের ভেতরে ঘোর যন্ত্রণায় আলোড়িত হয়ে ওঠেন তার কারণ লক্ষ্য করা যায়---প্রথমত, ধনবাদী সভ্যতার বিকীর্ণ অবক্ষয়ের যন্ত্রণায় কবির ব্যক্তিসত্তার নৈঃসঙ্গ্যবিহার, দ্বিতীয়ত, এই বন্ধ্যা, নিষ্ফলা সভ্যতার আগ্রাসন থেকে মুক্তির আকাঙ্ক্ষা---বস্তুত এই দুয়ের দ্বন্দ্বে কবিচিত্তের ক্রমবিকাশ অভিনব। তিনি বলেন---'সেথা নাই অবসান ব্যর্থতার জ্বালা দুর্বহতার।/সেথা নাই গান্ধিজীর নাটকীয় অনশন অভিযান,/সেথা নাই পুরোতন রূপদক্ষ রবীন্দ্র ঠাকুর।/এখানে আকাশ আর শত শত শালতরু-সার।/এখানে কলকাতা কানে কটুকণ্ঠে করে নাকো গান।/অন্ধকারে মুক্তি তব কত হতে করিয়াছি দূর।'('ছেদ', উর্বশী ও আর্টেমিস)।কবি সমাজের সঙ্গে 'ছেদ' স্বীকার করেছেন, গ্রহণ করেছেন বানপ্রস্থ, কারণ যে-সংসারে অবসান আর ব্যর্থতার জ্বালা সইতে হয়, যেখানে গান্ধিজীর আন্দোলন কোনপ্রকার ইতিবাচক পরিণাম সূচিত করে না, যেখানে রবীন্দ্রনাথের

বিশাল ব্যক্তিত্বের উপস্থিতিও রূপকলার চর্চায় একটা পরিশীলিত আবেগ মাত্র অথবা কলকাতার ভিড়াক্রান্ত কটু কন্ঠের কোলাহল যা কিনা নগর সভ্যতায় অস্তিত্বের সংকটকে করে তোলে আরও প্রকট, যেখানে জীবনের সর্ববিধ বিকাশের পথ রুদ্ধস্রোত, সেখান থেকে পালিয়ে অরণ্যকে আশ্রয় ('বনের কিনারে মোর বাংলোর দুইখানি ঘরে') সন্ধানের মধ্যে, নিরাশ্রয়ের শেকড় সন্ধানের মত এই সন্ধানেও ধরা পড়ে ধনবাদী ব্যবস্থার ভেতরকার বৈনাশিক প্রবণতা, কখনও যা ব্যক্তি-মানবের বা সমষ্টি-মানবের কাছে মঙ্গলপ্রদ নয়, এই অবস্থা যখন কবি প্রত্যক্ষ করেন, তখনই দ্বান্দ্বিক প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে এর থেকে উত্তরণের আকাঙ্ক্ষাও তাঁর মধ্যে জেগে উঠতে থাকে, কিন্তু তা অস্পষ্টতার আকারে বীজাভাস নিয়ে, সংকেতদ্যোতক বড় বেশি--- যেমনঃ ক) 'আজ আমি পরিচ্ছন্ন, বৃন্তচ্যুত অতীত আমার' , খ) 'প্রেম জাগে পৃথিবীর বুকে?' , গ) 'সে মায়ায় ফুটে ওঠে/পৃথিবীর পরম আশ্বাস' , ঘ) 'স্পন্দিত আমার চিত্তে বিধাতার গর্ভ-অন্ধকার' , ঙ) 'ভালো রৌদ্র,/আলোক বন্যাও' ------এই সব দ্যুতিময়তার, এই প্রেমাকাঙ্ক্ষার প্রতি অনন্যনির্ভরতা বিষ্ণু দে সংগোপনে লালনও করেন। যা ছিল অর্ধ-স্ফুট ও আভাসদ্যোতক, 'উর্বশী ও আর্টেমিস' শীর্ষক কবিতায় একটি নিবিড় পরিণতির সূচনায় তার গভীর আত্মপ্রকাশ এই আকাঙ্ক্ষাকে তীব্রভাবে ব্যঞ্জিত করে তোলে। এবার আর অন্ধকার নয়, সূর্যাস্তের দীপ্তি থেকে জেনে নেন তিনি 'বাসনার আশ্চর্য শিখ্ কবি', রাত্রি আর দিন হয়ে যায় একাকার, 'শতসূর্য-বাইনাসে' ভেসে যায় তাঁর বিশ্বচরাচর। 'উর্বশী'র বন্ধ্যা সৌন্দর্যের বদলে কৌমার্যের আর উর্বরতার দেবী 'আর্টেমিসে'র কাছে প্রার্থনার আকুল আর্তি ঝরে পড়ে এইভাবে--- 'আমাকে পাঠিয়ে দাও, আজ তুমি দিয়ে যাও/ দ্রুতগতি তোমার আশ্বাস।/আর্টেমিস্, প্রার্থনা আমার।/চিত্রাপী ঐশ্বর্যের ভার/ আজো হেরি এরূপ-যাত্রায়।' ('উর্বশী ও আর্টেমিস', উর্বশী ও আর্টেমিস)।

উক্ত কবিতাটির রচনাকাল ১৯৩০খ্রীষ্টাব্দ। অন্যদিকে এই আকাঙ্ক্ষা ১৯৩২খ্রীষ্টাব্দের রচিত 'কবি কিশোর' কবিতাতেও একটু অন্যভাবে ব্যক্ত হতে দেখিঃ 'স্মৃতি দেখি আর ভাবি মনে, /কোন্ ক্ষণে/ মনের সমুদ্রমন্থনে/ রূপ নেবে এক নারী/ মনোময় প্রাণপদ্মে সংসারের কারা আর তপ্ত শয্যা ছাড়ি?' ('কবি কিশোর', চোরাবালি)। আসলে কবিচিত্তের মধ্যে দুটি বিপরীতধর্মী বস্তু তথা সত্তার দ্বন্দ্বে যে আলোড়ন সংঘটিত হয়েছে বারংবার 'উর্বশী ও আর্টেমিস' কাব্যে ও 'চোরাবালি'র কয়েকটি কবিতায় প্রকাশ ঘটেছে তারই---এই দ্বন্দ্ব ইতিবাচক পরিণামবাহী নয়, আবার সম্পূর্ণত নেতিবাচকও নয়, বরং এই দুয়ের নিবিড় দ্বন্দ্বসম্পর্কই বিষ্ণু দে-র কবিসত্তার বিকাশের প্রধান শর্ত হিসেবে দেখা দিয়েছে। কিন্তু অন্য সকলেও বিষ্ণু দে-র নেতিবাদ প্রকাশ পেয়েছে, যেমন মধ্যবিত্তজীবনের স্বরূপ-পর্যালোচনায়। ১৯৩১খ্রীষ্টাব্দে রচিত 'সমুদ্র' কবিতায় উপলব্ধি করেন 'আমার হৃদয়ে আজ প্রেম নেই', অথচ এই অবস্থায় ঘটে প্রেমিকার উপস্থিতি, 'বিন্দুর উত্তপ্ত সাহে'র

প্রখরতায় যখন গুমোট হতাশায়, দু'জনের মিলিত যাত্রা থেমে যায়: "অবসন্ন ব'সে দুইজনে।/কর্মহীন অবকাশ কর্কশ কঠিন গুমোট/কাটে রৌদ্রতাপে।' ('গ্রীষ্ম', উর্বশী ও আর্টেমিস)। জীবন পূর্ণতা পায় না, 'ত্রিশঙ্কু' যে-হৃদয়, দোদুল্যমানতাই যার চারিত্র্যধর্ম, প্রতি পদে পদে তাকে আঘাত ও বঞ্চনা, যন্ত্রণা আর প্রলুব্ধতা সইতে হয়---কিন্তু কোন নির্দিষ্ট আনুভূমিক ক্ষেত্রে তার স্থিরতা নেই, ১৯২৬ খ্রীষ্টাব্দে রচিত 'পদ-দেওয়া-নেওয়া' কবিতায় তারই অপূর্ব বর্ণনা পাই নবনীকান্তের চারিত্র্য-বৈশিষ্ট্যে। দু'মাসের মধ্যেই প্রেমের সলিল-সমাধি ঘটে যায় নবনীকান্তের কাছে---ভুরুর 'করুণ চাউনি', 'পান্ডুর গাল' আর 'রহস্যভরা অস্ফুট ভাষা' একদিন যে রোমান্টিক তা সঞ্চার করত, আজ আর তা করে না, এক বিকৃত বৈচিত্র্য-অন্বেষা নবনীকান্তকে ছুটিয়ে নিয়ে বেড়ায় নারী-শরীরের বিচিত্র অলিগলিতে, অথচ একবার সে-রহস্য উন্মোচিত হয়ে গেলে তার অনুভূতির ধার ভোঁতা হয়ে যায়। প্রচলিত প্রেমের আদর্শের পবিত্র-ধারণার প্রতি কলঙ্কলেপন করে কেলে নবনীকান্ত, হয়ত এর দ্বারা সে পিউরিটান-মূল্যবোধ ভাঙে, কিন্তু পরিবর্তে অলস ভোগী জীবনচারণার মধ্য থেকে কোন ইতিবাচক সুস্থ জীবনাদর্শও সে লাভ করতে সক্ষম হয় না। অবক্ষয়ের চূড়োয় এসে তাই তার ক্লান্তি আর ক্লান্তি---অন্য এক প্রেমিকেরই কণ্ঠে পরে হয়ত-বা তার স্মৃতিচারণা শুনি: 'জীবন চলেছিল যখন সফলতার রথে,/দেখেছিলাম তোমাকে ভিড়ে দ্রুত জীবনপথে,/কাজের মাঝে ফিরিয়েছি কি হৃদয়াসক্তে,—/বেসেছিলাম তোমাকে ভালো, পড়েছে আজ মনে।' ('গার্হস্থ্যাশ্রম', চোরাবালি)।

জীবনের জটিলতা প্রেমের আদর্শরূপেও তৈরি করে কণ্টকিত জটিলতা, বিপদসংকুল হয়ে ওঠে প্রেমের সহজ প্রবাহপদ্ধতি, জীবনের সহজ স্বচ্ছপ্রবাহ হয়ে ওঠে অস্বাচ্ছন্দ্যের আকর। প্রেমের ক্ষেত্রে এরই বৈপরীত্য প্রতিভাসিত হয় ইতিবাচকেও---'দৃষ্টি-ইশারা নয়নে তোমার দূরবিস্তৃত মনোবিহার,/শান্তিদুয়ার খুলিলে তোমার, হতাশ বারেক দৃষ্টিপারে।' ('ওফেলিয়া': চোরাবালি)। অথবা--- 'সামান্য যে মন তার? তবু তাকে বেসে থাকে ভালো।/সুপ্ততায় স্পষ্ট আর নিতান্তই সীমাবদ্ধ মন/দুর্বার প্রভাতের জীবনযাত্রা জানে শুধু জানি।/জানি সে স্বীগুণা মাত্র, জানি যে সে সাধারণই মেয়ে,/মহাশ্বেতা নয়, তবু তার কথা মনে লাগে ভালো।' ('পঞ্চমুখ' ১৫, চোরাবালি)।

প্রেমে নেতি-বোধই নয়, ইতি-বোধও পাশাপাশি সমান্তরাল চলনে প্রকাশিত। মধ্যবিত্তশ্রেণীর জীবনচিন্তনে এই বোধও যে প্রগাঢ়তায় নিষ্ঠ এ তথ্যে বিষ্ণু দে বিশ্বস্ত থাকতে চেয়েছেন।

'উর্বশী ও আর্টেমিস' থেকে 'চোরাবালি' অবধি বিষ্ণু দে-র পথ-পরিক্রমার যে সুর পাই, দাম্পত্য-সম্পর্কের নিহিত তত্ত্বানুযায়ী তাতে কখনো বেশি ভাবের সঙ্গে যুক্তির বা মননশীলতার সংশ্লেষণ-প্রাধান্যই বেশি। এই মননশীলতার পথ বেয়ে নিরপেক্ষ ব্যক্তি-প্রাধান্যও বিষ্ণু দে-র আর একটি অন্যতম স্বকীয় বৈশিষ্ট্য। ব্যক্তি-

নিরপেক্ষতার সঙ্গে সঙ্গে বিষ্ণু দে-র সচেতন আত্মিকবোধ কিন্তু উপেক্ষিত নয়,---এই দ্বৈততাও লক্ষ্য করবার। যে আত্মসচেতনতা থাকলে কবির দৃষ্টিভঙ্গিতে মৌলিকতা ফুটে ওঠে, তারও অভাব নেই। বস্তুত ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের এই অভিমত অস্বীকারের উপায় নেই।[১৩]

'উর্বশী ও আর্টেমিস' বা 'চোরাবালি'র বিষয়বস্তুর বৈচিত্র্য আত্মসর্বস্ব কবির রচনা হতে পারে না। নিজের পরিপার্শ্বের বৃত্ত-পরিধিকে এইভাবে অতিক্রম করার দৃষ্টান্ত ইংরেজি সাহিত্যেও খুব কম দেখা গেছে। যাই হোক, বিষ্ণু দে যে চিত্ত-অন্বেষণের মধ্য দিয়ে শেষে প্রত্যয়বাদে পৌঁছোতে চেয়েছেন, এ সত্য অনস্বীকার্য। তিনি স্বীকার করেছেন, আধুনিককালে 'পরিশ্রমী ও আত্মসচেতন কাব্য-সাধনার কথা'। তাঁর মন্তব্যঃ ...'ইতিমধ্যে কমবেশ পরিশ্রমান্ত আর সোনালের রহস্য আমরা নিঃশেষ করে ফেলেছি। আর প্রতীক্ষা করছি তীব্র স্নেহাক্ত প্রত্যয়বাদের।'[১৪] বিষ্ণু দে সম্ভবত কাব্যের মুক্তি চেয়েছিলেন, এই চেতনা অবশ্যই মদিরাবেশ বিনির্ভর নয়, আত্মরতির জড়তায় বিহ্বল নয় অথবা ভাবের ক্ষেত্রে নৈশিবায়ুপুত। মাইকেল ও রবীন্দ্রনাথ যেভাবে 'অত্যাসিক্তার পাঁচিল ভেঙে ছিলেন, অথবা এলিয়ট, যাঁর কাছে ঋণস্বীকারে কবি অকুণ্ঠিতভাবে মুখর: 'এলিয়টের সীমাবদ্ধ সার্থকতা ও ব্যর্থতার করুণ নিদর্শনে বুঝলুম ঐ প্রাচীরের ঐতিহাসিক প্রয়োজনীয়তা, তার সীমা, রূপায়ণের দ্বন্দ্ব, অর্থাৎ শিখলুম ঐ যুক্তিকে ব্যবহার করতে, পারাবত করতে।'[১৫] রামমোহনের ঐতিহ্যপূর্ণ বাংলাদেশের উচ্চবিত্ত ও মধ্যবিত্ত শ্রেণীসম্প্রদায় ইংরেজিশিক্ষার সম্পূর্ণ অপব্যয় করে নি। এর ফলে যে সীমায়িত গণ্ডী বিস্তৃত হয়েছিল ও অভিজ্ঞতার বিকাশসম্ভাবনা দেখা দিয়েছিল, তারই উত্তরাধিকারীগণ বস্তুত এলিয়টের অবদানকে স্বীকরণ করেছেন দুটি দিক থেকে---চৈতন্যকে রূপদান করবার প্রক্রিয়ায় কারুণ্যের বা বীরত্বের ব্যঞ্জনায়, বিষ্ণু দে-র ঝোঁক বীরত্বের দিকে, কেননা, তা 'সন্ধানের, নির্মাণের কর্মিষ্ঠ' দিক। বিষ্ণু দে এলিয়টের মধ্য থেকে পান বাস্তবসচেতনতার অনুভববেদ্য সংবেদনা, প্রথম বিশ্বযুদ্ধোত্তর পৃথিবীর ভাঙনের তথা সমাজ ও ব্যক্তির অবশ্যম্ভাবী অনিবার্যতার জটিল পরিণাম যা কোন মোহের অপেক্ষা রাখে না, মায়ার আবেশ জড়ায় না---বিশ শতকের ধাঁধা যুগে এলিয়ট থেকে বিষ্ণু দে তাই দীক্ষা নেন 'নেতির সংঘাতে' আর 'ঐতিহ্য আর ব্যক্তিত্বে' 'কর্মিষ্ঠ' সমুদ্রে, 'ব্যাপ্তা থেকে পরিবর্তনের, ভেঙে পুনর্গ্রহণের, নির্মাণের'।[১৬] 'গেরোন্শন' থেকে 'ওয়েস্টল্যান্ডের' উপান্তে অথবা 'অ্যাশ ওয়েডনেসডে'র নৈরাশ্যের পটে ভারতবর্ষের অসহযোগের তথা গান্ধী-আন্দোলনের ব্যর্থতা বিষ্ণু দে-র কাছে অত্যন্ত স্পষ্টাকারে উদ্ভাসিত হয়। এই পথেই বিষ্ণু দে-র যন্ত্রণা উৎসারিত হতে থাকে, এই পথেই তাঁর আত্মসচেতনতা উন্মোচিত হয়, যাকে কবি ভাবেন আত্মসচেতনতার যন্ত্রণা হিসেবে, বলেন, 'প্রগতির প্রথম ফেণ' তাঁর মন্তব্যঃ 'আত্মসচেতনতা হয়ে উঠল কবিমার্গে প্রত্যক্ষ সত্তাসম্পন্ন'। এলিয়টের বিশ্বদৃষ্টির পর্যালোচনা

করতে গিয়ে এ. জি. জর্জ প্রথমেই বলেন, 'The works of Eliot provide one of the best examples of how our time has experienced these crises'[১৭] ---- জর্জের ধারণা, এলিয়ট এই যুগ-সংকটের স্বরূপ কী বা কেন, জানতেন না : ... 'his diagnosis of the crises becomes peculiarly difficult to understand' প্রকৃত বুদ্ধিবাদীর কাছে খুব স্বাভাবিকভাবে জর্জের মত এলিয়টের খ্রীষ্টীয় ধর্মাদর্শের প্রতি সংশয় পোষণ অনেকে করতে পারেন, বলতে পারেন ... 'while Eliot has in unmistakable terms expressed his acceptance of Christianity, there are important thinkers who question the genuineness of his Christianity, and some even deny that the fundamentals principles of Christianity are in aggreement with the doctrines of Eliot.'[১৮]

একথা মানতেই হবে আমাদের যে, এলিয়টের কাছ থেকে গৃহীত আত্মসচেতনতা যুক্তবুদ্ধির উদাহরণ নয়, ছিলও না, তবু এলিয়ট পুনর্বার করে তুলে দিলেন ব্যক্তির পৃথকীকৃত সত্তার অভিজ্ঞতাময় উচ্চারণসমূহকে। তাঁর আত্মসচেতনতার প্রকৃতি দ্বৈততায়---'ব্যক্তিস্বরূপ এবং নৈর্ব্যক্তিকতার আদর্শ'---ব্যক্তিস্বরূপের মুক্তি তাঁর কাছে নৈর্ব্যক্তিকতার পথে। এই দৃষ্টিকোণ থেকে এলিয়ট তাঁর বক্তব্য তুলে ধরেন 'Tradition And The Individual Talent'[১৯] প্রবন্ধে। এলিয়ট সমরোত্তর ইউরোপের নৈরাশ্যের প্রেক্ষায় নৈর্ব্যক্তিকতার সেতু সন্ধানে ছুটেছেন, ভেবেছেন, তাঁর ঐতিহ্যবোধ এবিষয়ে তাঁর সহায়ক হবে। এই সন্ধানের পরিণাম ঘটেছে খ্রীষ্টীয় ভাবজীবনের অনুবৃত্তিতে। 'চিন্তা, আবেগ ও দৃষ্টির বিশৃঙ্খলা' বিষয়ে যত না অচেতন, তার চেয়ে কম অচেতনতা ছিল না অর্থনীতি ও যন্ত্রশিল্পের সামূহিক পরিত্রাণে। বিষ্ণু দে এদিক থেকেই সম্ভবত মন্তব্য করেন, 'শিল্প-সাহিত্যে বিষয়ী মনের পক্ষে দ্বন্দ্বের নিরাকরণে প্রয়োজন ঐ প্রাণাত্মচেতনা, অর্থনীতির পুনর্বার ছক নয়।'[২০] তবু এলিয়টের উত্তরাধিকারই শুধু তাঁকে এবিষয়ে সাহায্য করে নি, মার্কসও তাঁর ভাবাদর্শের কেন্দ্রে অনন্য এক স্থান রেখেছেন। তাঁর ভাষায়ঃ 'মার্কসের বিশ্বকৌষিক মনের বিরাট কর্তৃত্বের স্ফূর্তি বোধহয় পৃথিবীতে আর হয় নি, মুষ্টিমেয় বিশ্বমানবদের মধ্যে তিনিই বোধহয় বিজ্ঞানবুদ্ধিতে শ্রেষ্ঠ মননশীল এবং সব চেয়ে নৈর্ব্যক্তিকভাবে মানবিক, অধিকন্তু তাঁর ছিল সুস্থ চিন্তার প্রতিভারই প্রবল যত্ন যার আলোকরশ্মিতে উদ্ভাসিত হয়েছিল যুগের অস্পষ্ট অনেক কিছু, যথা ইংরেজ ঈস্ট-ইণ্ডিয়া কোম্পানির

ভারত-শাসন অথবা আইরিশদের দুর্গতি। সবচেয়ে বড় কথা যে তাঁর চিন্তা ও শিল্পকর্মের কল্যাণে পরবর্তী আমরা সবাই পেয়েছি সর্বমানবের ইতিহাস বিষয়ে কাজ করবার বৈজ্ঞানিক রীতিটি যার পুরোধা তথ্য ও তত্ত্বসন্ধানের উত্তরাধিকার।'[২১] বিষ্ণু দে মার্কসবাদকে যান্ত্রিকভাবে প্রয়োগের বিরোধী, তিনি চান জীবনযাত্রার মধ্য দিয়ে, 'ব্যাপক ও ব্যক্তিগত নিজের কাজের' মধ্য দিয়ে 'এই মননলোকের প্রবল মহিমা' পরিগ্রহণ। সাহিত্যসৃষ্টির কাজে তাই বিষ্ণু দে 'নিজেদের সংস্কৃতির ঐতিহ্যবোধের গভীর উৎসের সন্ধান'-এ তৎপর হতে চান। এ ব্যাপারে তিনি 'বিদেশী ওস্তাদদের গুরু মহাজনদের' পদানুসরণেরও বিরোধী। ভাষা ও বিষয় বা মননতন্ত্রের বৈশ্বিক নিয়মগুলিতে জাতীয় বৈশিষ্ট্যের দাবিদারও তিনি। বিষ্ণু দে সম্ভবত তাঁর কাব্যে এইভাবে নতুন রীতির প্রতিষ্ঠা ঘটাতে চেয়েছিলেন। মাও সে-তুঙ পরবর্তীকালে (১২জানুয়ারী, ১৯৫৭) 'শিঃ কান্' পত্রের সম্পাদককে লেখেন, 'আমাদের কাব্যসাহিত্যে নতুন রীতিই নিঃসন্দেহে প্রধান রীতি হওয়া উচিত। প্রাচীন রীতির জন্য অল্প জায়গা থাকতে পারে, কিন্তু নবীনদের শিক্ষার্থে তা খুব উপযোগী হবে না, কারণ তাতে চিন্তার পরিধি সীমায়িত এবং এ রীতি কষ্টসাধ্য।'[২২] মাও ছিলেন একাধারে কবি ও কর্মী। সাহিত্যের তাত্ত্বিক পর্যালোচনায় তাঁর সিদ্ধান্ত অধুনা মূল্যবান নিঃসন্দেহে যা বিষ্ণু দে আরও আগে ভেবে ছিলেন। এই পথেই তাঁর পরিযাত্রা শুরু হয়েছিল। অধীত বিদ্যা, জীবনের প্রত্যয় আর চলমান জীবনপ্রবাহ থেকে অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করে শেষে ইতিবাচক প্রতীক্ষায় এসে পৌঁছোন কবি। এই যাত্রা শুরু হয় 'পূর্বলেখ' থেকে। প্রগতি সাহিত্য আন্দোলনের মাটিতে 'পূর্বলেখ', 'সাতভাই চম্পা', 'সন্দ্বীপের চর', আর 'অন্বিষ্ট'---এই চারটি কাব্যগ্রন্থের জন্ম ও বিকাশ, বিশেষত গণ-আন্দোলনের বৃহৎ প্রেক্ষায় এর বিস্তৃতি ও বিশালত্ব উপলব্ধির প্রয়োজন।

গণ-আন্দোলন ও বিষ্ণু দে-র কবিতাঃ

আসলে, তিরিশের দশকটাই ছিল আর্থ-রাজনৈতিক সম্পর্কের এক গভীরতম সংকটকাল, আর এই সংকটকে অবলম্বন করে দুটি বিরোধী শক্তির প্রচণ্ড বিস্ফোরণ-পর্ব। রবীন্দ্রনাথ যাকে বলেছেন দানবশক্তির সঙ্গে মানবশক্তির সংঘর্ষ। মার্কসীয় সংজ্ঞায় দুটি বিরোধী গুণান্বিত শক্তির শ্রেণী-দ্বন্দ্ব। ধনতন্ত্রের চূড়ান্ত সংকট-কালে সাম্রাজ্যবাদীশক্তির বহিঃপ্রকাশ ঘটে সমরসজ্জায় আর মারণযজ্ঞে। পল ফাসেলকে অবশ্য যুদ্ধের কারণ খুঁজতে গিয়ে বলতে হয়, 'Every war is ironic because every war is worse than expected,' কিংবা দুটি মহাযুদ্ধ সম্পর্কে তাঁকে এবংবিধ মন্তব্য করতে শুনি ঃ 'Every war constitutes an irony of situation because its means are so melodramatically disproportionate to its presumed ends.'[২৩]

ক্রিস্টোফার গীলির মতে এই সংকট ছিল পুরোপুরি ব্যবসায়ী জগতের সংকট, চূড়ান্ত পরিণতি যার যুদ্ধে, তিনি বলেন,

'a period of economic bankeruptcy and unemployment; of moral bankruptcy among the democracies facing terror and mass hysteria in the dictatorships; a decade of slither from the rather heady excitement of the twenties into apathy and evasiveness.'[২৪]

বিশের দশকে যেমন যুদ্ধোত্তর যুগ সৃষ্টিশীলতায় ভরে উঠেছিল, কী কবিতায়, কী উপন্যাসে কী সমালোচনা সাহিত্যে, তেমনি তিরিশের দশকেও সাহিত্যের নানাদিক সৃজনশীলতায় ভরে উঠেছিল। বিশের দশকে টি. এস. এলিয়ট, জেমস জয়েস প্রমুখ ইংরেজি সাহিত্যে প্রভূত উন্মাদনা এনেছিলেন, তিরিশের দশকে তেমনি অডেন, স্পেন্ডার, ম্যাকনিস প্রমুখেরা প্রবল উদ্দীপনা নিয়ে হাজির হলেন। কিন্তু এবারে নিরপেক্ষতার স্থান নয়, বিশের দশকে যেমন র‍্যাডিক্যালিস্ট একটি ধারার সূচনা হয়েছিল। সমাজের বা রাষ্ট্রের আমূল ভাঙন যেন এই দাবিই করেছিল, একটি পঙক্তি হতে--- 'so now many of them were drawn towards Communism. Right-wing politics, for the young, were not intellectually respectable, or at least did not include a body of opinion acceptable to humane thinking, so that the principal counter-attraction to Communism was Catholicism — not necessarily of the political right.'[২৫]

মার্কসবাদী অথবা মার্কসবাদের প্রতি সহানুভূতিসম্পন্ন যে নতুন একটি ধারার সূচনা হল, তা কেবলমাত্র ইংরেজি সাহিত্যেই নয়, বহু বিদেশি (যেমন ফরাসী, স্পেন, সোভিয়েত ইউনিয়ন, চিলি, লাতিন আমেরিকার কোন কোন দেশ) সাহিত্যেও এই নবতর ধারার একটি প্রত্যক্ষ উপাদান হল ফ্যাসিবাদের আগ্রাসন ও বিশ্ববিবেকের প্রগাঢ় প্রতিফলন। এই সময়কার বাংলা সাহিত্য ধরে রেখেছে সেই আন্তর্জাতিকতা, সেই বিশ্বব্যাপী প্রতিক্রিয়ার নিবিড় উপাদানরাজি, আর বিষ্ণু দে তারই অন্যতম যোগ্য সাধক।

'নগর পুড়িলে দেবালয় কি এড়ায়'--- বিষ্ণু দে-ও এড়াতে পারেন নি, কমিউনিস্ট পার্টি পরিচালিত বিভিন্ন আন্দোলনের, বিশেষত প্রগতি সাহিত্য আন্দোলনের একজন শরিক তাত্ত্বিকভাবে ফ্যাসিবিরোধী মঞ্চে উপস্থিত থেকে ফ্যাসিবিরোধী প্রচারাভিযান-ব্যাপারে জনমত সংগঠিত করার কাজে লিপ্ত হয়েছেন---কাব্যে তার

আয়াশাত পূর্ণতা নিশ্চয়ই হবে না। 'ঊর্বশী ও আর্টেমিস' বা 'চোরাবালি'তে তিনি যে নেতির সন্ধান শুরু করেছিলেন দ্বান্দ্বিক প্রক্রিয়া ও প্রকরণের মাধ্যমে, 'পূর্বলেখ'-এ তার সন্ধান পেলেন কবি। অনিকেত মনোভাবনা থেকে খুলে ফিরে আসা দুরূহ। এলিয়টকে প্রবেশ করতে হয়েছিল ক্যাথলিক চার্চে, নেতিসন্ধানে, বিষ্ণু দে নেমে এলেন মাটিতে, বিবদমান দুটি শ্রেণীর মধ্যে বিবাদীপক্ষে, বিভীষণের রূপকের আড়ালে কবি বলেন, 'আহা! আজ যদি পুষ্পকে হানো অগ্নিবাণ/মস্কিয়া নীল অগ্রচক্রপর্বতে,/লুকাব না কেউ প্রাকারবাহ্যায় শঙ্করে।/সুগত পেয়েছি সুগতে নাচার দীর্ঘকাল,/হে বজ্রপাণি! সুবর্ণে মোড়া সন্নিধান।' ('বিভীষণের গান', পূর্বলেখ)। রাবণ-রাজত্বকে প্রকারান্তরে বলা হয়েছে স্বৈরতান্ত্রিক বা স্বেচ্ছাতান্ত্রিক যা ফ্যাসিবাদীশক্তি, আর বিভীষণ এখানে নির্যাতিত শ্রেণীর প্রতিনিধি। বিভীষণ স্বশ্রেণী থেকে সরে এল, এই পরিবর্তন, সম্ভবত বিষ্ণু দে-রও সরে আসাকে দ্যোতিত করে। 'ঊর্বশী ও আর্টেমিস'-এ বা 'চোরাবালি'তে এই লক্ষণ ছিল না, 'পূর্বলেখ'-এ তা পেল একখণ্ড বিশ্বাসের ভূমি। আগেই আমরা বলেছি যে, দুটি বিরোধী ও বিপরীত গুণসম্পন্ন চৈতন্যের দ্বন্দ্বের ভেতর দিয়ে তাঁর অগ্রগতি, 'পূর্বলেখ'-এ একটি স্থিতিশীল প্রত্যয়ের অভিমুখী হয়েছে। 'সুবর্ণে' সংশয় থেকেই এই গূঢ় প্রত্যয়ের জন্ম। বিষ্ণু দে-র প্রত্যয় জন্ম নেয় পুঁজিবাদী কাঠামোর অবক্ষয়িত পটভূমি থেকে---এই পটভূমি তাঁর ভাষায়: 'চারিধারে সরীসৃপ ধূর্ত নাগরিক/সর্বনাশপূর্ণ-ছিদ্র খোঁজে ঘুরে ফিরে।/সর্বরাজ্য রক্তচক্ষু, সমস্ত সন্ত্রিক।/অধিকার-ভেদে আর ভেঙে নাকো ছিঁড়ে।/দিকে দিকে বনস্পতি উদ্ধত কৌরব/চলে সূর্য-বিতাড়িত অন্ধকার ঘরে।' ('চতুর্দশপদী-২', পূর্বলেখ)। বাস্তবিক, এই পটভূমিতে দ্বন্দ্ব প্রকট হয়---লাগে বুঝি উঠে নিচে সংঘর্ষটঙ্কার!/অনন্তর দ্বন্দ্বে মাতে বাদীপ্রতিবাদী!' বিষ্ণু দে-র মনে হয়েছে একে 'ন্যায়যুদ্ধ' বলে। শহর কিংবা গ্রামব্যাপী বিশাল পটভূমি জুড়ে এই শ্রেণীদ্বন্দ্ব---ইতিহাসের কাল ধরে আজ উপস্থিত। 'বিশ্বব্যাপী দুঃস্বপ্নেরা নিঃশব্দ সঞ্চারে/মানুষ পাখায় নামে আঁধারে প্রবল'---মানুষের ইতিহাস খণ্ডদেশের ভৌগোলিকতা অতিক্রম করে বিশ্বব্যাপী ইতিহাসের সঙ্গে সমধারায় মিশেছে, পেয়েছে আবহমানের প্রেক্ষিত। আর এই প্রেক্ষিতে ব্যক্তি যখন 'নিজব্যক্তিবিন্দু' দেখে, তখন 'ব্যক্তির কৈবল্যই' প্রধান হয়ে ওঠে না, কবির মতে, 'জনগণচিত্তে জীবন তোমার ব্যক্তিও'। সমষ্টির স্বার্থের অধীন হয়ে পড়ে ব্যক্তিস্বার্থও, 'নির্বিকল্প দিবিদের নাগপাশবারে' ব্যক্তিস্বত্বের বিনাশ যে অবশ্যম্ভাবী সত্য, বিষ্ণু দে 'পূর্বলেখ'-এর এই দিকেও দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন নরনারীর প্রেমের জিজ্ঞাসার দিকেও, 'চোরাবালি'তে যে প্রেম বিস্ময় সৃষ্টি করেছিল, বিশেষ করে 'ঘোড়সওয়ার' আর 'ক্রেসিডা'য়, 'পূর্বলেখ'-এ তা অর্জন করেছে আরও বেশি বিজ্ঞতা, প্রেমের সৌন্দর্য ও বিকৃতির দিকে যে অভিনিবেশ দাবি করেছিলেন বিষ্ণু দে, তাতে ছিল বাস্তবিক একটা হাল্কা ভঙ্গি, যেমন---'তাকিয়ে দেখ---এই কি দোষ হায়?/যুগের গাঁট বতিচেমি প্রায়।/প্রেমে পতন

ছাড়া কি কিছু নাই ?' ('শিখণ্ডীর গান', চোরাবালি)। কিংবা, 'সোনালি হাসির ঝরনা তোমার ওষ্ঠাধরে।/ প্রাণকুরঙ্গ নাচে ছড়ায় চপলবায়ু।–/মুখর সে গান থেমে গেল। আজ স্তব্ধ অধর।/হালকা হাসির জীবনে কি এল কান্নার কাল ?' ('ক্রেসিডা', চোরাবালি)। কিংবা, 'তোমাকে দেখিলে রীতি করে মোর প্রতিস্নায়ু-শিরা' অথবা 'শহরের বুকে পাঁচতলায়/নেব সখী এক ছোট্ট ফ্ল্যাট!' ইত্যাদি পংক্তিগুলি হালকা করে দিয়েছে প্রেমের গভীর দিকগুলিকে। অন্যদিকে 'পূর্বলেখ' কাব্যে এল এক ধরনের সীরিয়াসনেস---'বাইরে ঘরে স্বার্থে ভয়ে মেশা/অগ্নিনাশা ঘোড়ারা দৌড়ে ক্ষেপা/---তোমাকে বাঁধি সঙ্গতির মিলে।' ('চতুরঙ্গ', পূর্বলেখ)। কিংবা, 'শূন্যের নীলিমায়/আকাশও মৃত্যুনীল,/ছিঁড়ে গেছে সব মিল,/তবুও খুঁজি তোমায়---/যদিও আয়ু ফুরায়,/মূল সত্য যদি/হয়ে ওঠে সারথি॥' ('সোনালি ঈগল', পূর্বলেখ)। এইসব সীরিয়াসনেসের পাশাপাশি হাল্কা-চালও উপেক্ষিত হয় নি, 'সপ্তপদী' কবিতায় তার দৃষ্টান্ত পাই। তবে 'পূর্বলেখ' কাব্যে যেন কবির এই বোধ পরিষ্কার হয়েছে যে, এ সমাজে প্রেমের পূর্ণ বিকাশ সম্ভব নয়। কারণ---'চুমিনাচে/ঐ মরণ/ছড়ায় বামন চরণ/স্বার্থের ইশারায়/নাচে নাকো ব্যাকরণ/ইতিহাসের ধারায়।' ('সোনালি ঈগল', পূর্বলেখ)। সোনালি ঈগলের প্রতীকে সে ডানা দেয় মানুষের স্বপ্নের ভেতরে। কাজেই এই স্বপ্ন সর্বাঙ্গীণ সুস্থতার পরিবর্তে হয়ে ওঠে আবর্তজটিল। এই জটিলতা দেশ-কালগ্রথিত, সময়সাপেক্ষ। সময়টা ফ্যাসিবাদের ছায়া ঘনিয়ে ওঠা এক দুর্দান্ত সময়। কবিতার নিহিত ব্যঞ্জনার দিক থেকে তার গুরুত্ব না থাক, বিষ্ণু দে-র মানসিক বিবর্তনের দিক থেকে তা অত্যন্ত উল্লেখযোগ্য। তাঁর এই বিবর্তন-প্রয়াসের অন্যতম চিহ্ন 'জন্মাষ্টমী' আর 'পদধ্বনি' কবিতায় তীব্র বিস্তৃতি লাভ করেছে। টের পাওয়া যায় এখানেই যে, বিষ্ণু দে ক্রমে গণ-আন্দোলনের অতি নিকট-প্রতিবেশী হয়ে উঠছেন। 'উর্বশী ও আর্টেমিস'-র পর্বে যে বিষ্ণু দে বলেছিলেন 'মানুষের অরণ্যের মাঝে আমি বিদেশী পথিক'---জনগণের বৃহত্তম অংশের থেকে যিনি বিচ্ছিন্ন ও নিঃসঙ্গ হয়ে দেহমনস্তাপশরীরে অনুভব করেছিলেন 'মনে হয় মৃত আমি', সেই বিষ্ণু দে এই পর্বে লক্ষ্য করেন--

চলে আর চলে টলমল টলমল পদভরে
যত যাত্রী, শত শত যাত্রী
কিষাণ ঈশান
দিবারাত্রি ছিঁড়ে ছিঁড়ে পায়ে পায়ে ফেলে,
আলোর তরঙ্গে ঠেলে নব পদক্ষেপে
ঘোড়া, রথ, মোটর আর লরি,
ভোর হল বিভাবরী, পথ হল অবসান,
জাগো জাগো সীতা,
উত্তাল খবরে পঞ্চভূতের ঐকতানে
নবসাম নব্যসংহিতা।

('আবির্ভাব', পূর্বলেখ)

অথবা,

'বহু বঞ্চনা বহু অনাচারে
অধর প্রাণ
বীরদল চলে হাজারো মজুর
লাখো কৃষাণ।
('বৈকালী', পূর্বলেখ)

বিষ্ণু দে এ পর্বে ব্যক্তিকে সমষ্টির কাছে সমর্পণে উদ্বুদ্ধ করে তুলেছেন---'একলা ভাবি মনে মনে/বীজ-বপনের ছন্দ ধরে কাস্তে চালায় ছন্দে চলে'। আধু সম্প্রদায়ের এই চরিত্র আকস্মিক নয়, তাকে অভিজ্ঞতা ও মার্কসীয় প্রজ্ঞার সমন্বয়ে সৃষ্ট জীবনের যৌথ কাঠামোয়। মার্কস মনে করেন, 'প্রলেতারিয়েতের মুক্তির অন্যতম প্রধান শর্তই হল মিলিত প্রচেষ্টা'[২৬]---ব্যক্তির প্রাধান্যের দিকে তাকিয়ে নয়, সমষ্টির প্রাধান্যে তার অনস্বীকার্য অগ্রগতি নির্ভরশীল। যুগের অন্য এক যুগপর্বে ক্ষয়িষ্ণু বুদ্ধিবাদী সাম্রাজ্যের পৌরাণিক প্রতিনিধি ধনঞ্জয়(অর্জুন) সমষ্টির পদধ্বনি শুনতে পায়---'...তার সেই পদধ্বনি!/ও কি আসে নব অরণ্যের প্রাকপুরাণিক প্রাণী? অসভ্য বন্যের শিঙ্গুল?/মানবজন্মের গান?/সমুদ্র তুফান/প্রাচীন পৃথিবী ওঠে বিক্ষুব্ধ স্থবির'। ('পদধ্বনি', পূর্বলেখ)। এই পদধ্বনির প্রশ্নে সচকিত হতে হয় আগামী দিনগুলির কথা ভেবে---'তার পদধ্বনি আসে? কার?/এ কি হল যুগান্তর! অবতার!/এ যে মন্বন্তর!' (ঐ)। সমাজতান্ত্রিক চিন্তা-চেতনায় অনুপ্রাণিত নব বুদ্ধিবাদী ব্যবস্থায় একটি বিকল্প আর্থ-কাঠামো যাতে সমষ্টিস্বার্থের প্রাধান্য অবিসংবাদিত, একটি পরিকাঠামোর বদলে অন্য পরিকাঠামোর উত্তরণের পক্ষে বস্তুত বৈপ্লবিক ও রূপান্তর-প্রক্রিয়ার অঙ্গ---একেই বলা হয়েছে 'যুগান্তর' বা 'অবতার' এবং এই ব্যবস্থা কবির ভাষায়: 'চায় তারা রুজিনাকে প্রিয়া ও জননী/প্রতিপূর্ণে ধনী,/চায় তারা ফসলের ক্ষেত, দীঘি ও খামার/চায় সোনালুনা খনি। চায় স্থিতি, অবসর।' (ঐ)। যে প্রত্যয় 'পূর্বলেখ' কাব্যগ্রন্থের প্রথম কবিতায় প্রকাশ পেয়েছিল সেই প্রত্যয়ের সহজতর ব্যঞ্জনা 'পদধ্বনি'তে অধিক প্রগাঢ় হয়েছে। অবশ্য কবিতাটিকে কেউ কেউ ফ্রয়েডের মনোবিকলন তত্ত্বের আলোকেও দেখবার চেষ্টা করেছেন।[২৭] বিষ্ণু দে-র পরবর্তী মানসিকতার বিশ্লেষণে ফ্রয়েড নয়, মার্কসই যে প্রধান, এ বিষয়ে আমাদের কোন সন্দেহ নেই। 'জন্মাষ্টমী'তে সমকালের বিশাল সামাজিক প্রেক্ষিত গৃহীত হয়েছে। দীর্ঘ কবিতাটিতে আধুনিক জটিল নগরসভ্যতার যন্ত্রণাজর্জর অবক্ষয়ী উচ্চবিত্ত, মধ্যবিত্ত প্রভৃতি শ্রেণীর প্রতীকী উপস্থাপনায় ও মনোবিশ্লেষণে ধরা পড়েছে। বিষ্ণু দে এই প্রেক্ষিতটি সামনে রেখে এগোতে চেয়েছেন বৈচিত্র্যভঙ্গিম বিবিধ গণ-আন্দোলনের দিকে। চেয়েছেন এই অবস্থার থেকে উত্তরণ।

বিষ্ণু দে-র গণ-আন্দোলনের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট কবিতাগুলি সম্পর্কে কেউ কেউ 'দলীয় প্রচারের'[২৮] অভিযোগ

এনেছেন। বিষ্ণু দে সুকান্তের জীবনজিজ্ঞাসা থেকে ক্রমশ একটি সন্নিষ্ঠ ও কর্মিষ্ঠ দিকের অভিযাত্রী, ঋত্বিক আত্মপ্রত্যয় ও দর্শনের ভাষায় 'আত্মপরিজ্ঞান' যে যাত্রার অন্যতম উপাদান, সেই পরিক্রমার কথা মনে রাখলে এই অভিযোগ অতিভাষণ বলে মনে হবে। কারণ একটি শতক-সত্তাকে সামগ্রিকতার আলোকে বিচার করাই যুক্তিযুক্ত। পরিক্রমার একটি বাঁক হল '২২শে জুন' বা 'সাতভাই চম্পা'র কবিতাগুলি। এখানে উপস্থিত হতে গিয়ে বিষ্ণু দে বহু জিজ্ঞাসা ও সংশয়ের পথ পাড়ি দিয়েছেন। আমরা আগেই গণ-আন্দোলনের পূর্ব প্রেক্ষিতগুলি পর্যালোচনা করেছি, এখানে বিষ্ণু দে-র কাব্যে ব্যবহৃত প্রেক্ষিত নিয়ে কিছু বলা যায়। '২২শে জুন'-এ কাব্যের প্রেক্ষিত নয়, বরং বিশ্বসাম্রাজ্যবাদী স্বৈরাচারী শক্তির প্রকট রূপটি প্রত্যক্ষ সংঘাতের একটি নির্দিষ্ট পটভূমি বিস্তৃত করেছে। ১৯৪১খ্রীষ্টাব্দের ২২ জুন তারিখে আক্রান্ত হয় সারা বিশ্বের একমাত্র সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র। সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধ অতঃপর নতুন মাত্রা লাভ করে মুক্তিকামী মানুষের দিক থেকে এবং এ যুদ্ধ পরিণত হয় জনযুদ্ধে। বলা বাহুল্য, ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধে দায়বদ্ধ শিল্পী-লেখক শুধু বাংলাদেশে নয়, বিশ্বের প্রান্তে প্রান্তে তাঁদের সর্বাত্মক শিল্পশক্তিকে নিয়োজিত করতে চেয়েছিলেন এবং এই শিল্পের প্রধান বৈশিষ্ট্যই ছিল প্রতিবাদ আর সর্বপ্রকারের প্রতিরোধের আহ্বানে উদ্দীপ্ত ও ক্রোধোজ্জ্বল। চরিত্রে ছিল সংগ্রামী দ্যোতনা। অবশ্য কবিতার ব্যাপারে বিষ্ণু দে-রও নিজস্ব কিছু বক্তব্য রয়েছে যা এখানে উল্লেখযোগ্য বলে মনে হয়ঃ

'Poetry is not a mystic ritual that introversion will be an end in itself. It is communication which presupposes community and a sense of the community, and our writers know that what ones sees and knows becomes a part of oneself and they too consequently change. They are not taken in by the mechanist trap and do not pick up a tag or two from an established philosophy of life, least of all, from Marxism. Even apparently non-committing objectivity for the time being, is more fruitful.'[২৯]

প্রসঙ্গত তিনি এলিয়ট-স্পেন্ডার-লুইস আর দুই আত্মার্থীর দৃষ্টিভঙ্গির ব্যক্তি-বিশ্লেষণ সম্পর্কেও কিছু বলেন, এবং এলিয়টের রাষ্ট্র ও সমাজসংগঠন যে দর্শন ও দৃষ্টিভঙ্গি তার বর্তমান উপযোগিতা অস্বীকার করেন। এলিয়টের 'অবজেকটিভ কো-রিলেটিভ' দৃষ্টিভঙ্গি যে তুলনামূলকভাবে ভাল, তাও বলেন। অন্যদিকে পুরেজিস্দের সম্পর্কে তাঁর মতামত হল, 'আরও বেশি বৈজ্ঞানিক, আরও বেশি সম্পূর্ণ ভাষাবিত জীবনদর্শন', বস্তুত এই

ধারণারই একটি প্রবুদ্ধ সমর্থন মেলে জি. এস. ফ্রেশারের কথায়--- 'Auden, Spender, Day Lewis, Mac Neice have been perhaps generally too exclusively considered from the point of view of their common militant anti-Fascist approach to the contemporary situation in the 1930s. অবশ্য ফ্রেশার দীপ্তি ত্রিপাঠীর মত একথাও স্মরণ করিয়ে দিতে ভোলেন না যে, সাহিত্যমূল্য হিসেবে এই দশকের রচনামূল্য গ্রাহ্য নয়, 'Everybody who writes about the 1930s is a partisan one way or the other, nobody has been able to forget the poets and look at the poems. Yet it is a permanent ordering of words, rather than a passing topicality of appeal, which makes poetry last.[৬০] তাঁর প্রদত্ত কয়েকটি দৃষ্টান্ত দিইঃ

1. Lucky, this point in time and space
Is chosen as my working-place,
    Where the sexy airs of summer,
The bathing hours and the bare arms,
The leisured drives through a land of farms
    Are good to the newcomer.

Equal with colleagues in a ring
I sit on each calm evening
    Enchanted as the flowers
The opening light draws out of hiding
With all its gradual dove-like pleading,
    Its logic and its powers.

That later we, though parted then,
May still recall these evenings when
    Fear gave his watch no look;
The lion griefs loped from the shade
And on our knees their muzzles laid
    And Death put down his book ...

2. I think continually of those who were truly great.
Who, from the womb, remembered the soul's history
Through corridors of light where the hours are suns
Endless and singing, whose lovely ambition
Was that their lips, still touched with fire,
Should tell of the spirit clothed from head to foot
in Song
And who hoarded from the Spring branches
The desires falling across their bodies like blossoms.

C.S. Fraser অডেনের উদ্ধৃত (১নং) কবিতায় দেখতে পেয়েছেন--- '... in these lines we are given an atmosphere, a scene, a moral commentary of a very original kind. We are forced to revise our attitudes about several things, first of all admit that there is more sensuality in it than we thought, but then that the sense of comradeship is the main thing : but then what is the use of this sense of comradeship, Auden ask. It is, he replies, to enable us to conquer our fears and neuroses, to share our sorrows.' তাঁর বক্তব্য, অডেনের কবিতায় যা ধরা পড়েছে তা হল 'a concrete fashion, less by abstract statement than by the use of emblematic or allegorical images.'[৩১] অন্যদিকে স্পেনডারের কবিতায় তিনি লক্ষ্য করেন 'the logical rearrangement of the statement is not nearly so poetically moving as the

illogical, or at least fantastic juxtaposition of the images.'[৩২]
স্পেন্ডারের 'poetic emotions'-এর মধ্যে তিনি সন্ধান পান না 'objective correlative'-দৃষ্টিভঙ্গির।

প্রকৃতপক্ষে এহেন সমালোচনার বিপরীতধর্মী জাগতিক সত্যদৃষ্টির ও উদ্ভূত আবেগের সমালোচনাও রয়েছে। দৃষ্টান্ত হিসেবে আমরা স্প্যানিশ গৃহযুদ্ধের ঘটনাকে অবলম্বন করে রচিত কবিতাগুলির কথা তুলতে পারি। এইরকম তুমুল আবেগের কেন্দ্র যখন স্পেন, তখন বিশ্বের কবিতা বেজে ওঠে গভীরতর মানবিকতায়, আর্ত-যন্ত্রণার আর আতুর হাহাকারের উৎস থেকে সৃষ্টিশীল প্রেরণায় কবিরা সহজেই হয়ে ওঠেন দীক্ষিত --- সমালোচক একে কোন্ দৃষ্টিতে দেখবেন ?

... 'human and historical truth is better understood through art than through politics. If we are to understand what happens in the world, not merely intellectually, but also emotionally, poetry can help us reach a higher sense of reality.' মার্কসবাদী কবি অকটেভিয়া পাজ যেমন বলেন, 'there is no voice more faithful to a people than the voice of its poets.' স্পেনযুদ্ধে একটি পক্ষ অবলম্বনের প্রশ্ন ছিল, কিন্তু কোন সংশয় ছিল না, লেখক-শিল্পী-বুদ্ধিজীবীর চিন্তাধারা ও রচনা তাৎপর্য পেতে চেয়েছিল তাৎক্ষণিক মূল্যবোধে, আর যা ছিল তা হল 'how they behaved as human beings'.[৩৩] কবিতার সৃষ্টির ক্ষেত্রে তাই অনেকে এই আন্দোলনকে অভিহিত করতে চেয়েছেন 'New Writing' নামে। জন লেম্যান্ এর উৎস 'স্প্যানিশ-ওয়ার'-এর মধ্যে দেখেছেন :

'The Spanish War is a gloomy milestone for creative writers, marking as it does the second descent of the twentieth century into the violence of international anarchy, a descent made more destructive for them by the confusion of warring ideologies with warring empires.'[৩৪]

মোট কথা, স্পেনের ঘটনা থেকে লেখক-শিল্পীরা কেউই মুক্ত থাকতে পারেন নি, স্পেন্ডার, হেমিংওয়ে কিংবা

আলবেয়ার কাম্যু এবং আরও অনেকে। স্পেন্ডার স্পষ্ট জানান,

'The struggle of the Republic ... seemed a struggle for the conditions without which the writing and reading of poetry are almost impossible in modern society.'[৩৫]

কাম্যুও স্প্যানিশ-ঘটনার মধ্য দিয়ে দেখতে পান ব্যক্তির ট্র্যাজেডি। লিয়ন ফিলিপ, মিগুয়েল হার্নান্দেজ, পাবলো নেরুদা, হার্বার্ট রীড প্রমুখেরা স্পেনের বেদনায় বিচলিত হয়ে অজস্র কবিতা লিখেছেন। লিখেছেন ক্লাইভ ব্রানসন, রিচার্ড চার্চ, জে. সি হল, মিলস টৌমোলিন, এজেল রিকওয়ার্ড নামের আরও খ্যাত-অখ্যাত কবিরা। এই একই আবেগের অনুষঙ্গে বিষ্ণু দে '১৯৩৭--স্পেন' যখন লেখেন তখন তার বৈপ্লবিক আবহ তৈরি হয়ে যায় শত নৈশব্দ্য সত্ত্বেও। এক অমোঘ এবং অনস্বীকার্য বেদনার মুখোমুখি দাঁড়িয়ে পড়তে হয় পাঠককে, চেতনার এই দিকটি তখন বিবেকের প্রহরী, পৃথিবীর যাবতীয় অন্যায়ের মুখোমুখি সে এক জ্বলন্ত প্রতিবাদ। বিষ্ণু দে-র কবিতা অবশ্য প্রতিবাদের উৎসমুখ থেকে না উঠে আত্মবিশ্লেষণের পথে প্রকাশ পেয়েছে:

প্রলয় পাতাল প্রচণ্ড ঘূর তলে
ডুবেছে সাগর-মন্থনে লাখো মুক্তা।
রক্তে ধুয়েছে রুচির হাসির শুচিতা।
অঘোরপন্থী শুধু খোঁজে আজ সঙ্গী।
('১৯৩৭--স্পেন', পূর্বলেখ)

লক্ষ করবার, স্পেন অথবা স্পেনের অনুষঙ্গান্বিত ঘটনাগুলি এখানে অনুপস্থিত। কবিতাটির কোথাও তা উপস্থিত নেই, যেমন স্প্যানিশ কবি মিগুয়েল হার্নান্দেজ বা ইংল্যান্ডের হার্বার্ট রীডও উচ্চারণ করেন নি তাঁদের কোন কোন কবিতায়[৩৬], কিন্তু তথাপি কবিতার রচনাকাল ও কবিতার অন্তঃপ্রবাহ পঙক্তিকে অ-প্রত্যক্ষ হলেও উদ্ভাসিত করে রেখেছে তার প্রতীকী মননগুলিকে আত্মসাৎ করে। কবিতার সেই সামর্থ্য আছে। ফ্রাঙ্কোর সামরিক স্বৈরাচার কিভাবে মানবিক প্রেমকেও আতঙ্কিত করে, কিভাবে নারী-পুরুষের মত মানবিক মূল্যবোধের ধ্বংসকে অমোঘ করে তোলে, কিংবা রক্তের প্লাবনে মানুষের সহজ প্রসন্নতা ভেসে যায় তার একটি অনুমোদিত প্রেক্ষিত তুলে ধরেছেন বিষ্ণু দে। ইতিহাসের তথ্য বাদ দিলেও এখানে সর্বনাশা আবহের কোন ক্ষতি হয় না। পরের স্তবকে অতঃপর শুরু হয়ে যায় এই প্রেক্ষাপটে আত্মবিশ্লেষণপর্ব। গণতন্ত্রের ওপর চূড়ান্ত বর্বর সংকট ঘনিয়ে উঠলে ব্যক্তিনিরপেক্ষতার দোহাই সেখানে অচল। একটি নির্দিষ্ট পক্ষাবলম্বন তাই অত্যন্ত জরুরি হয়ে ওঠে। সংকটই চিনিয়ে দেয় শত্রুমিত্রের ভেদাভেদ, ব্যক্তির অস্তিত্বরক্ষার প্রশ্নেই এই অনিবার্যতা।---যেমন কবি

বলেন, 'ঘর ও বাহির আপন ও পর পক্ষ/আজকে শুধুই শোধন থাকুক প্রশ্নে।/বন্ধনহীন পথ বেঁধে দেয়/প্রশ্নি।/ত্রিশূকন্যা-দলেই ভেঙে সামন্ত/চাচা-র আপন প্রাণ বাঁচানোর ক্ষেত্রে/পিং ভেঙে মেলে সূর্যে পদ্ম দিল।' (ঐ)। স্পেন যেমন একটি রাজনৈতিক মাত্রা গ্রহণ করে, তেমনি ২২শে জুনের সোভিয়েত আক্রমণের ঘটনাটিও সাম্যবাদীদের কাছে অত্যন্ত গভীর ও তাৎপর্যপূর্ণ একটি রাজনৈতিক ঘটনা যা বিচলিত করে তোলে সুস্থদর্শী ও সমাজতন্ত্রকামী মানুষের সমূহ আবেগকে। এই আবেগ বাস্তবিকই মানবিক আবেগ। একে দলীয় আবেগ বলা যায় না। যখন 'অকমিউনিস্ট'[৩৭] রোমাঁ রোলাঁ (ফেব্রুয়ারী, ১৯৩১) বলেন, 'সোভিয়েৎ ইউনিয়নের লক্ষ্য ও কর্মে আমি বিশ্বাসী। যতদিন এ-দেহে জীবন থাকিবে ততদিন সোভিয়েৎ ইউনিয়নকে আমি সমর্থন করিব'[৩৮] তখন কি তা দলীয় ব্যাপার বলেই গণ্য হবে? বিষ্ণু দে দলীয় সদস্য নন, মার্কসবাদের প্রতি তাঁর যা ছিল তা হল সম্ভ্রম অনুরক্তি, এবং সুকান্ত ও সুভাষ যে অর্থে দলীয় প্রচারকার্যকে সাহিত্যে রূপায়িত করতে চেয়েছেন, বিষ্ণু দে সে অর্থে তো নয়ই, বরং স্বভাবত স্বতন্ত্র পথ নির্মাণের চেষ্টায় তাঁর সাহিত্য-সাধনা রূপায়িত। ২২ জুন-এর ঘটনা সর্বকালের কবিকে বিচলিত করেছে। তিনি এই ঘটনার সঙ্গে অবিচ্ছিন্ন তাৎপর্যে উপলব্ধি করতে চেয়েছেন কলকাতা তথা বাংলাদেশের ঘটনাপারম্পর্যকে, বৃহত্তর অর্থে ভারতবর্ষকেও একই উপলব্ধিতে ধরতে চেয়েছেন। ফ্যাসিবাদের ভয়ঙ্কর প্রতাপে ও প্রকোপে মানুষের বিপন্নতা যখন অপ্রতিরুদ্ধ প্রায়, তখন একজন কবি আর কিভাবে সংশ্লিষ্ট সমস্যার মুখোমুখি দাঁড়াবেন? মানুষকে তাঁর চূড়ান্ত পরিণামের দিকে ঠেলে না দিয়ে কবিরা তাদের যথাসময়ে সতর্ক করতে পারেন, যথার্থ জীবনের দিকে সোৎসাহ প্ররোচনা জোগাতে পারেন আর যা পারেন তা হল এই---'প্রাণে চূড়ায়/মৃত্যুর মহিমা চাই, অজ্ঞ অপঘাত নয়, অবিমৃ সময়ে/অসহায় কলকাতার মধ্যবিত্ত কুরুক্ষেত্রে করুণা চূড়ায়।'[৩৯] (২২শে জুন, ১৯৪১', ২২শে জুন)। আর বলতে পারেন 'জনগণমনে অধিনায়কের শূন্য স্থান, পূর্ণ করো বীর', দৃষ্টান্ত হিসেবে সংকেত দিতে পারেন অন্যান্য দেশের বীরদের কার্যকলাপের----

'Yet China and the U.S.S.R

The farmers and workers of all lands pour their manhood,
To redeem the wages of selfishness,
into the foundations of the established
Desperately, restlessly, war stalks on land and water and air ——
Indian too is shaken —— in the dark days of her life !
Calcutta's full moon spreads out her Jatayu
wings over U.S.S.R. and far-off China.'[৪০]

'২২শে জুন' কাব্যগ্রন্থে প্রধানত তিনটি উপকরণ-স্তরবিন্যাস লক্ষিত হয়। ১)প্রথমত ফ্যাসিবাদের দ্বারা আতঙ্ক সৃষ্টির প্রয়াস, ২)বাংলাদেশের তথা ভারতবর্ষের প্রধান বিপদ সম্পর্কে কবির বিশ্লেষণ ও ৩) তৃতীয়ত এর থেকে উত্তরণের বা সমাধানের ইঙ্গিত।

ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি দীর্ঘদিন ধরে ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধে প্রচারাভিযান করে আসছিল, সোভিয়েত ভূমি আক্রমণের পর তা তুঙ্গে ওঠে। প্রগতি সাহিত্য ও সংস্কৃতির মঞ্চে এ ব্যাপারে যে উদ্যোগ দেখা দেয়, তাতে সামিল হয়ে বহু কবি-সাহিত্যিক অত্যন্ত সচেতনভাবে অংশ গ্রহণ করেন ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধে লেখনী ধরতে। ১৯৪২খ্রীষ্টাব্দে গঠিত ফ্যাসিস্ট বিরোধী লেখক ও শিল্পী সংঘের যুগ্ম সম্পাদক হিসেবেও কাজ করেন বিষ্ণু দে এবং এ পর্বের ফলশ্রুতি তাই ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধে গণ-সচেতনতা জাগরণের প্রয়াস। এ পর্বে সবচেয়ে লক্ষ্য করবার কাব্যের ভাষাভিত্তিক কাঠামো, কবিতার বক্তব্য-বিষয়ের সহজতা, রাজনৈতিক-চেতনার প্রগাঢ়তা, ছড়া, রবীন্দ্রনাথ যার ছন্দকে বলেছেন প্রাকৃত ছন্দ, তাকে প্রাকৃতজনের উপযোগী করে প্রকাশ করা, এসবই বিষ্ণু দে-র আগেকার রচনাগুলির থেকে একটি পৃথক পরিমণ্ডল গঠন করেছে। আরও লক্ষণীয় যে, বিষ্ণু দে-র মৌল স্বভাব যে দেশি-বিদেশি পুরাণ-সাহিত্য-ইতিহাস থেকে অজস্র উল্লেখ-উদ্ধৃতির প্রয়োগ-কৌশলে, এই পর্বে তা একেবারে কমে এসেছে, বিশেষ করে '২২শে জুন' পুস্তিকাটিতে বিদেশি সাহিত্য-ঐতিহ্যের একটিও উল্লেখ নেই। কাব্যরচনার এই সরলীকরণচেষ্টা 'উর্বশী ও আর্টেমিস' বা 'চোরাবালি' বা 'পূর্বলেখ' থেকে আদে-পোরে একেবারে আলাদা যাতে স্পষ্টত বলা হয়, বিষ্ণু দে-র একটি স্বভাববিরুদ্ধ কাজ।

ফ্যাসিবাদের প্রকৃতি ও স্বরূপ তাঁর কাছে এইভাবে উদ্ঘাটিত হয়েছে: 'পথে আজ লোক কম, মধ্যবিত্ত ব্যাপ্সপোস্ট প্রাণভয়ে ক্ষীণ, /পলাতক উদরের উনুনের ধোঁয়া নেই শুচ্ছ চন্দ্রালোক।' (২২শে জুন, ১৯৪১)। এটি জাপানি বোমাবর্ষণের সমযুকার কলকাতার অভিজ্ঞতা। বাস্তবের প্রকাশ্য দৃশ্যে প্রকাশ পেয়েছে আতঙ্কিত কলকাতা নগরীর পথছবি। ব্যক্তির অন্তর্লোকেও আতঙ্ক আর ভয় বিস্তৃত হয়েছে: 'হৃদয়ে বাসে না আর ভিড়, / হাজার ভয়ের পায়ে পায়ে/ভোলপাড় অরণ্য নিবিড়/পাঁখার সন্ধ্যন, বাসে যায়, /সত্তার গভীরে নামে ভিড়।' (পলাতক', ২২শে জুন)। কবি উপলব্ধি করেন 'মৃত্যু আজ আত্মঘাতী মুক্তিকা-বিলাসে' (ভারতীয় বিমানবাহিনী) ফ্যাসিবাদের থেকে মুক্ত নয় বাংলাদেশের দূর মফস্বলও, কারণ 'সামনে ছড়ানো রাত্রি, অন্তহীন অন্ধকারে নীল'

('রক্তস্রোতে', ঐ)। কবি আরও জানেন, প্রাণঘাতী যে কোন যুদ্ধে শ্রমজীবী জনসাধারণের কোন স্বার্থ নেই, রাজায় রাজায় যুদ্ধ হয় আর উলুখাগড়ার প্রাণ যায়, এ সত্য তাঁর জানাঃ 'রাজা রাজায় লড়াই চলে,/ মৃত্যু হানে উলুর বনে'[৪১], (('১৯৪১', ২২শে জুন)। আর একটি ছড়ায় দেশীয় ফ্যাসিস্টপন্থীদের উদ্দেশে তাদের স্বরূপ তুলে ধরেছেনঃ 'সুন্দর বনে ভীষণ বাঘ/তাদের চোখে দেশের রাগ/নখে তাদের বেজায় ধার,/ খাঁড়ার মতোই দাঁতের সার।' ('বুড়ো-ভোলানো ছড়া', ঐ)। কলকাতার আকাশে জাপানি বিমানের মহড়া দেখেঃ 'বিমানে বিমানে ছিন্নভিন্ন সূর্যশানক ওড়ে।/আকাশের নীলে শকুনের ভোজ এলোমেলো উল্লাস।/ সুধু পৃথিবী চিড় করে' বাসে অনকার মোড়ে মোড়ে।/কেনি কদয্য নির্মুল করে এ কোন্ পরশুরাম।/('আজকে এসেছি দুর্গ-শিবিরে', ঐ)। গণ-চেতনার সম্প্রসারণও ঘটাতে চেয়েছেন কবি। অতীত ইতিহাসের পৃষ্ঠপট থেকে উদ্ধার করে আনতে চেয়েছেন শ্রেণী সংগ্রামের বস্তুবাদী ঐতিহাসিক প্রেক্ষিত---এই ইতিহাসের প্রয়োজন গণশ্রেণীর চেতনার উদ্বোধনের তাগিদেঃ

'কতোবার এল কতো না দস্যু। কতো না বার
ঠগে ঠগে হল আমাদের কতো গ্রাম উজাড়
কতো বুলবুলি খেল কতো ধান,
কতো ধা গাইল বর্গীর গান,
তবু বেঁচে থাকে অমর প্রাণ
এ জনতার----
কৃষাণ, কুমোর, জেলে, মাঝি, তাঁতি আর কামার।'

('এ জনতার', ২২শে জুন)

বিষ্ণু দে শ্রেণী সংগ্রামের ইতিহাসকে প্রত্যক্ষ গণভাষায় বিবৃত করেন এইভাবেঃ

বহুকাল ধরে' জেনেছি নানা অভাব,
শত্রুকে চেনা বন্ধুদিনের স্বভাব,

* * *

মহাজন, ঠগ, রাজরাজড়া ও গুরুর দল
করেছে স্বদেশী বিদেশীমার্কা অনেক ছল,
পায়ে পরিয়েছে অত্যাচারের বহু শিকল,
দেখেছি অনেক বুদ্ধির খেলা গায়ের জোর॥

('জনযুদ্ধ-২', ২২শে জুন)

সেইসঙ্গে এ কথাও বলতে ভোলেন না যে ভারতবর্ষীয় মানবস্বভাবের মূলে নিরেকত্তার একটি বীজ নিহিত রয়েছে। ভারতবর্ষের ইতিহাস তো পুরাণের গল্প-গাথাও---তাতেও পাশাপাশি দুটি দ্বন্দ্ব, চেতনার দ্বন্দ্ব, বিরাজমান ছিলঃ 'স্বদেশ আমার। আমরা দেখেছি রামের রাজ্য আর/কুরুক্ষেত্রে পৌরুষ জেনে নিয়েছি দু'হাত ভরে'।/অনেক অতিথি বহু অনাহুত এসেছে বারদুয়ার,/শত্রুমিত্র সবাকে নিয়েছি বিরাট বাহুর জোরে।'

('আরুকে এসেছি দুর্গ-শিখরে', ২২শে জুন)। শেষ দুটি পংক্তিতে রবীন্দ্রনাথের 'ভারততীর্থ'র প্রতিধ্বনি শোনা যায়। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ যে দৃষ্টিতে ইতিহাসকে দেখেছেন বিষ্ণু দে ঠিক সেইভাবে দেখতে পারেন না, তাঁর চোখে কালো-সাদার শ্রেণীদ্বন্দ্ব সর্বত্র প্রতীয়মান, এইভাবে তিনি মার্কসের সমীপবর্তীও হন, বলেন, 'আকবরশাহী দীন-এলাহিতে আমাদের ইতিহাসে/একে ও অনেকে কালোয় সাদায় উর্মিময়মান সুর।' (ঐ)। ভারতের ইতিহাসের ধারায় প্রগতিশীল একটি সুর বরাবর ছিল, যে সুর সাম্য ও মৈত্রীর পক্ষে, ভারতবর্ষের চল্লিশকোটি জনতার সপক্ষে ছিল বাস্তবিকই উৎসাহমূলক। রাজা-রাজড়ার ইতিহাসের পাশাপাশি বিশাল লোকজীবন ও তার ইতিহাস একটি সুনির্দিষ্ট বহমান ধারা, এই ধারাপ্রবাহে পুষ্টিলাভ করে এসেছে ভারতবর্ষ আর বাংলাদেশের বিপুল জনসমষ্টি। বিষ্ণু দে সে ইতিহাসকেও এক সমগ্র ও এক বিশিষ্ট দৃষ্টিতে কবিতায় তুলে ধরার কৃতিত্ব দেখিয়েছেন, উচ্চবিত্তশ্রেণীর জটিল সংস্কৃতির ধারার সঙ্গে নিম্নশ্রেণীর সংস্কৃতির ধারার সম্মিলন ও সংঘর্ষজনিত উত্তাপই ভারতের ইতিহাসকে সঠিক ভিত্তি দিতে পারে---এই ধারণা বিষ্ণু দে-র উপলব্ধিতে ঠাঁই পেয়েছে এবং রূপকথার বা উপকথার আশ্রয় নিয়ে তা প্রকাশিত হয়েছে, এ বিষয়ে কবির নির্দিষ্ট বক্তব্য অনুধাবনযোগ্য বলে মনে করি: ...'লেখকের পক্ষে ছিল আরেক সমস্যা, সীমাবদ্ধ সমস্যার এক গোলকধাঁধা---মোটা কথায় যা বলা যায় সাংস্কৃতিক ও নির্দিষ্ট সাহিত্যিক ঐতিহ্যময় অতীত ও বর্তমান, যে সমস্যার নিরসনে ডুব দিতে হয় সুস্থ বাংলা ভাষারই লৌকিক ও সৃষ্টিশীল ইতিহাসচর্চায়। কারণ সাহিত্যসৃষ্টির কাজ সম্ভব নয় যদি না কার্যত নিজেদের সংস্কৃতির ঐতিহ্যবোধের গভীর উৎসের সন্ধান চেষ্টা করা যায়, বিদেশী ওস্তাদদের শুধু মহাজনদের অনুসরণ করে বিকাশের বড় রাস্তায় পৌঁছনো যায় না, তা সে তাদের ভাব ভাবনা প্রতিক্রিয়াশীলই হোক বা প্রগতিশীলই হোক।'[৪২]

কাজেই বিষ্ণু দে-র ইতিহাস-চেতনার সঙ্গে মূলেই রবীন্দ্রনাথের পার্থক্য। বিষ্ণু দে-র কাছে যেন এক বিশাল দায়িত্ব অর্পিত হয়েছে অতীতের ইতিহাসকে অবলম্বন করে সাহিত্যিক ঐতিহ্য নির্মাণের। রবীন্দ্রচেতনা এই ধারার ইতিবৃত্তের সন্ধানে মন দিয়েছিল 'ছেলে-ভুলানো ছড়া'য়, কিন্তু এই উৎসকে অবলম্বন করে সাহিত্যিক নির্মাণের প্রয়াসকে গ্রহণ করা হয় নি। বিষ্ণু দে-র নির্মাণে যথার্থ শিল্প হয়ে ওঠে এই ইতিহাসচেতনা: 'চম্পা, তোমার প্রেমেই বাংলাদেশ/কত না সাতন রক্ষী খোয়ালো বলো।/গৌরীশৃঙ্গ যারা হেঁটে টপোলো,/নিষিদ্ধ দেশে দীপঙ্করের শিখা/চীনে জ্বলে, হয় মঙ্গোলিয়ায় লেখা,/চম্পা, তোমার চিনেছিল সিংহলও।/তোমাকে খুঁজেছে আলো কি রূপকে রূপে/অশ্রুর সুরে, নাওয়ের রুশা টেনে,/সাতুড়ির বাড়ে, কাস্তের বাঁকা শানে,/ভাটিয়ালী গানে, কবিরধুনির পুঁথে,/কলিজে আর কজলে গুর্জরে/চম্পা, তোমার সাত ভাই গান করে।' ('সাতভাই চম্পা', সাত ভাই চম্পা)। এই বিশাল সংযোগ জনগণ শ্যাম-কম্বোজে দাঁড় টানে, 'নীল কমলের দেশে' 'বসু চাঁদ বসু

শ্রমিক সমাজের' তাদের 'হাড়' রেখে যাবে। আমরা এখানে লক্ষ্য করেছি নিশ্চয়ই, দুটি বহমান সংস্কৃতির ধারা কিভাবে এসে সম্মিলিত হয়েছে জনজীবনের ঘনিষ্ঠতায়। একে অস্বীকার করা যায় না। প্রসঙ্গত লেনিনের একটি মন্তব্য এখানে উদ্ধার করা অবান্তর হবে না: 'Marxism has won its historic significance as the ideology of the revolutionary proletariat because, far from rejecting the most valuable achievements of the bourgeois epoch, it has, on the contrary, assimilated and refashioned everything of value in the more than two thousand years of the development of human thought and culture. Only further work on this basis and in this direction, inspired by the practical experience of the proletarian dictatorship as the final stage in the struggle against every form of exploitation, can be recognised as the development of a genuine proletarian culture.'[৪৩]

শ্রেণীবিভক্ত সমাজের সাহিত্যে দর্শনে সংস্কৃতিতে চিন্তায় মননে ইতিহাসের এই খণ্ড চেতনার একটা ধারাবাহিক রূপ রয়েছে। বিষ্ণু দে তাই বারংবার সামগ্রিকতার প্রতি জোর দিয়েছেন। এই খণ্ড চেতনার সূত্রেই বিষ্ণু দে বিস্তৃত কালের প্রেক্ষায় উপলব্ধি করতে পারেন---'ইতিহাসে উচ্চারিত ক্রোধ/বাংলায়, গ্রীসে, রোমে, ফ্রান্সে, চীনে আংকোরে, জাভায়'---এই ক্রোধ শ্রেণীদ্বন্দ্বের পরিণামবশ। অতএব তা শ্রেণীদ্বন্দ্বেরই একটি ইতিহাস। ছোট ছোট ঘটনাও এক সময় রূপান্তরিত হয় কালের ইতিহাসে: 'সেকালে শুনেছি গল্প বৃদ্ধ শিখ সিপাহীবিদ্রোহ,/আতঙ্ক উল্লাস আর উত্তেজনা---জন্ নিকলসন।/সুদূর গঞ্জের রেল, মনে পড়ে বুওর সমর,/অসহায় পক্ষপাত, তারপরে আবার আহব', ('আইসায়ার দেশ' : সন্দ্বীপের চর)। পুরোনো ইতিহাসের সঙ্গে একালের ইতিহাসও মিলিত হয়---বৃদ্ধের উক্তিতে: 'শুনেছি অসাধ্য যক্ষ, তবু তো সে অসাধ্য উৎসবে/আমার ঘরেও সাড়া পড়েছিল, পেনসনের ঘরে।/চাষীরা চালায় কাস্তে, মজুরেরা মুষ্টিবদ্ধ হাতে।/তারপরে কালযুদ্ধ মৃত্যু আর মৃত্যু মন্বন্তর/জন্মান্তরে মহামারী নরকের নবান্ন উৎসবে।' (ঐ)। ইতিহাসে এইভাবে দুটি পক্ষ বা দুটি শ্রেণী এসে উপস্থিত হয়। আধুনিক ইতিহাস সম্পর্কে বিষ্ণু দে-র এই অন্বেষণ ও মূল্যায়ন একটি সুস্পষ্ট পরিমণ্ডল গঠন করেছে তাঁর কাব্যে। ঘটে যাওয়া গণ-আন্দোলনগুলি তাই কাব্যের উপকরণ হিসেবে যখন এসেছে, তখন লক্ষিত রয়ে গেছে সেই শ্রেণীবিভাজিত অবস্থা ও অবস্থান।

এই পর্বে তাই বিষ্ণু দে-র কবিতায় পেয়ে যাই সেইসব বিষয়-উপকরণ যা সমাজের উপরিতলে স্পষ্ট প্রকাশ

পেয়ে যাচ্ছে, পেয়ে যাই সুকান্তের সেইসব উপাদান যা কবিকে প্রতিনিয়ত নতুন নতুন অভিজ্ঞতার সম্মুখীন করে, বিক্ষুব্ধ করে, হয়ত-বা খানিকটা বিধ্বস্ত, তার পর তা ফেটে পড়ে ক্ষোভের আকারে, ক্রোধের আকারে, কিংবা এই ক্রোধের থেকে জ্বালিয়ে নিতে চেয়েছেন তাঁর 'মুক্তির প্রদীপ' যার শিখা থেকে বিচ্ছুরিত হয়েছে নির্মল সত্যের জ্যোতি, যে জ্যোতিচ্ছটায় প্লাবিত হয়ে যায় দেশ-কাল-সমাজ-ইতিহাস-সংস্কৃতি-অধ্যুষিত বিশাল বিচিত্র জনমিছিল, প্রতিবাদ আর প্রতিরোধের অদম্য শক্তিতে আর প্রাণপূর্ণে-ভরপুর অজ্ঞাত অখ্যাত অবহেলিত হিন্দু-মুসলমান-বৌদ্ধ-ওঁরাও-সাঁওতালবেষ্টিত বিপুল জীবনধারা। বিষ্ণু দে ২২শে জুন' 'সাতভাই চম্পা', 'সন্দ্বীপের চর' পর্বে যখন তীব্র অভিশাপ-অন্যায়-অবিচারের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে যেন গড়ে তুলতে চান এক সংকুল বিদ্রোহের পরিবেশ, একদা স্পেনের অবহেলিত জনগণের এক বৃহত্তর অংশকে যেমনভাবে আহ্বান জানিয়ে বলেছিলেন

'Oh Comrades, step beautifully from the
solid wall advance to rebuild and
sleep with friend on hill
advance to rebel and remember what you have
no ghost ever had, immured in his hall.'

তেমনি এক অবিকল প্রত্যয়দীপ্ত উচ্চারণে বিষ্ণু দে-ও স্মরণ করিয়ে দিতে চান উজ্জ্বল উদারের মত এক নিবিড় মুক্তিসংগ্রামকে---

'Remember, O Comrade ! when Freedom's shut
door is opened apart,
A handful of cowardly ashes will seem the small
strife in your heart !
Forlo, our dear land through the long centuries
What marvellous cultures hath drained to the lees,
What swor-sharp ways it has trod, with what ease,
What dangerous tracks !
Today it is wielding in conscious resistance a
fiery axe ! [38]

('The People for Ever,' US)

কবিতাটির তৃতীয় ও চতুর্থ পংক্তি বাংলায় 'দেখে যায় দলে দেখাবেন শুধু তীব্রতা তার', কিংবা সপ্তম, অষ্টম ও নবম পংক্তিটি বাংলায় 'অনির্দুর্দম বন্যে প্রবাহ/কত না বার/করেছে, থামতে বয়েছে চেতনাহর কুঠার' ইত্যাদি, এর ফলে মূল ভাবসম্পদ নষ্ট হয় নি যদিও, বরং ইংরেজি বাক্যবন্ধে যার ও স্পষ্ট হয়ে উঠেছে প্রতিরোধাত্মক বাক্‌বিধিতি ও অন্তর্গত আস্বাদের উত্তাপ, তবুও এ পর্বে লক্ষণীয় হল তাঁর মানসবিবর্তন। বিষ্ণু দে আবেগের প্লাবনে একেবারে গা ছেড়ে দেন নি, অদ্ভুত হতে হতেও তাঁর বিশিষ্ট মননশীলতা ও বুদ্ধি-প্রকর্ষের স্বরচেতনাকে সম্পূর্ণ বিস্মৃত হন নি।

সোভিয়েত-আক্রমণের পরের বছরে লেখা ('অরণি'র সোভিয়েট-সংখ্যায় প্রকাশিত) '২২শে জুন' কবিতায় বিষ্ণু দে নবীন সভ্যতার জাগরণ লক্ষ্য করেন যার ভেতরে ভেতরে প্রেরণা পেয়ে যান জীবনের তথা সুতীব্র জয়াশার---

'চোখে জাগে নবীন সভ্যতা,
অজেয় প্রাণের বহ্নি, রক্তস্রোতে জনতার হাতে
মুক্তিকামনার যাত্রা, মৃত্যুহীন, যুগান্তসাধনে
নির্ভীক, কর্মিষ্ঠ যাত্রা।'

('২২শে জুন, ১৯৪২', ২২শে জুন)

সোভিয়েতভূমি রক্ষার জন্যে তখন মরণপণ লড়াই করে চলেছিল সোভিয়েত জনগণ, স্তালিন তাদের উদ্দেশে বলতে বাধ্য হয়েছিলেন (কবিতাটির শীর্ষে তা উদ্ধৃত), ' They, like Antaeus, are strong because they maintain connection with their mother, the masses, who gave birth to them, suckled them and reared them.'

জাপানি আক্রমণের ভয়- দিশাহারা কলকাতার মধ্যজীবী শ্রেণীর প্রতি তাঁর বিদ্রূপ ধ্বনিত হয়: 'কলকাতায়ও জাপানী বোমা জাগে।/হায় বিধাতা, এ কি তোমার রোষ। / "...মধ্যদেশে বাঁধব চলো বাসা,/ব্যাঙ্কে জমা করি দেশান্তরী।/ভারতের মাটিতেই আশা---/শক্তির জন বাঁচাবেন শ্রীহরি।' ('এ ভরা বাদরে স্বদেশীপ্রেম, সাতভাই চম্পা)

১৯৪১খ্রীষ্টাব্দের ২৪অক্টোবর জার্মানদের দখলে চলে যায় খারকোভ, প্রচণ্ড লড়াইয়ের পর তা ১৯৪৩খ্রীষ্টাব্দের ৮-১৬ফেব্রুয়ারীর মধ্যে তা রুশীরা পুনর্দখল করে, ১৫মার্চ আবার তা জার্মানদের অধীন হয়। খারকভ কবিদের সংগ্রামী প্রেরণা সঞ্চারে মূল্যবান সহযোগিতা করেছিল। সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের আলোচনায় আমরা তা উল্লেখ

করেছি। বিষ্ণু দে-ও এ ঘটনায় প্রভাবিত হয়ে লেখেন 'মার্কিত' কবিতাটি। সংগ্রামের প্রতি গভীর আস্থা, মানুষের অবিনশ্বরত্বের প্রতি বিশ্বাসবোধ এ কবিতায় ব্যক্ত হয়েছে:'তবু অবিনশ্বর আয়ু,/সূর্যের রক্তাক্ত আকাশে/ডুবে যায় বিবর্ণ শকুন/প্রাণের সমুদ্র থেকে ভাসে/প্রথম রাতের তারা।/কমলের সোনালি প্রহরে।' ('মার্কিত', সাতভাই চম্পা)। বিষ্ণু দে এখানে 'জীবনের চরম বিশ্বাসে' আস্থা স্থাপন করেছেন, এই বিশ্বাসের প্রতিষ্ঠা যে 'স্বাধিকারে', 'ন্যায়যুক্তি-প্রতিষ্ঠ' জীবনে অথবা 'মনুষ্যত্বে প্রাণের মনের/ক্ষুরধার সুস্থ আর সমাধা-সাধনা'য় আর 'শ্রেণীহীন/সমাজের বিশ্বব্যাপী ভূমিকায়'[৩৫]---এই নিশ্চিত প্রত্যয়ে বিমুক্ত থাকতে চেয়েছেন তিনি। তাঁর চোখে পড়েছে----'আসন্ন সমাজে কাঁপে ঘুমন্ত জনতা', বিশ্বব্যাপী দারুণযজ্ঞে সমষ্টির বিপন্নতা অনুভব করে উজ্জীবনের রীতিতে 'আত্মদানের ইশারা' ছড়াবার পরামর্শ দিতে গিয়ে বলেন, 'তবু এ জীবন শুধু হানাহানি নয়।/তবে কেন আজ শেষ শ্রেণীসংঘর্ষে/নেতি-প্রতিষ্ঠ সন্দেহ আর ভয় ?/লোকায়তে দাও লোকোত্তরের তীর্থ/প্রসাদ, গোষ্ঠীদম্ভ যেখানে দীর্ণ।' ('কোতা', সাতভাই চম্পা)। 'লোকোত্তরের তীর্থ প্রসাদ' জোটার আগে যুদ্ধের পরিণাম হিসেবে বাংলাবাসীর ভাগ্যে জোটে দুর্ভিক্ষ, অনাহার আর 'পথে পথে মরে পড়ে থাকবার' পৈশাচিক অভিশাপ। ১৯৪৩খ্রীষ্টাব্দ থেকেই শুরু হয়। চম্পাবতীকে দুঃস্থ ছদ্মবেশ পাবার আহ্বান জানিয়ে কবি বলে ছিলেন, 'চক্ষিতে দেখাও জনগণেরমনে মুখ'----তার সাতভাই সেই মুখদর্শনে লাভ করবে মুক্তির তীব্র উল্লাস, তার বদলে আকাল ঘনিয়ে ওঠে---

'শহরে অকাল বর্ষা, আকাশের নীল কণ্ঠরোধ,
সকাল না হতে কাঁপে জনপদী; ও চাদের আড়তে
অনাহারে অসহায়, কাতারে কাতারে, কোনোমতে
কুইনিনহীন দেহ ঢেকে কাঁপে ক্ষুধায় নির্বোধ
ভিখারী, দেশের লোক আমাদেরই, সভ্যতার তার
যারা নয় নির্বিচারে, যারা মরে' জীবিকা জোগায়
আমাদের, শ্রেণীস্বার্থে বঞ্চিত সে ভিখারীর সার
বাংলার পথে পথে, বুঝি সারা হিন্দুস্থান হায়'[৩৬]--
('চাদের কাতারে')

বিশ্বব্যাপী যুদ্ধ আর যুদ্ধজনিত পরিস্থিতিকে উপমিত করেছেন বিষাক্ত সাপের সঙ্গে, তার গতির সঙ্কেত: 'বিশ্বব্যাপী সাপ যেন, প্রাণের সর্পিল গতিতরে/যৈনাকে বিদ্রূপে খোঁজে, যুগান্তের বিষজালা বরে।'(ঐ)। এই প্রিয়ের শিকার হয়েছেন লক্ষ লক্ষ মানুষ, বিষ্ণু দে এ যন্ত্রণাকে কেবল যন্ত্রণা হিসেবে দেখতে চান নি, মেনে নিয়েছেন সেই অমোঘ সত্যের পরিণাম---বাংলাদেশ থেকে শুরু করে এথেন্স, স্লোভেন্স, ফ্রান্স, চীন, বর্মী, আঙ্কোর আর জাভার সর্বত্র যে স্বতঃস্ফূর্ত সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী, উপনিবেশবাদ-বিরোধী, যুদ্ধ-বিরোধী,

শান্তি, প্রগতি ও সমাজতন্ত্রের সপক্ষে যে গণ-সচেতনতা দেখা দিয়েছে তা একদা বর্বর মানুষের বৈনাশিক প্রচেষ্টাকে প্রতিহত করবে। এই আশার বাণী তিনি শুনিয়েছেন। মানুষের প্রতি তাঁর এই ভালবাসার উচ্চারণ এই পর্বের আরও বহু কবিতায় প্রকাশ পেয়েছে। কলকাতার বুকে ছুটে আসা অগণিত দুর্ভিক্ষের কঙ্কাল দু'চোখে ব্যাপ্ত বাংলাদেশের ছায়া নিয়ে লঙ্গরখানায় দাঁড়ায়---

'লঙ্গরখানায় সার-বাঁধানো ভিড়ে
দেখিরে ভাই কলকাতার কেতা,
রাস্তা উধাও টাকশালের ভিড়ে,
কোথায় বীর মহাসভার নেতা।

লঙ্গরখানায় উলঙ্গ সব ছেলে
ভাঙা ঘরের নোঙর-ছেঁড়া মেয়ে
দোকানঘরের কাঁচের বাহার ফেলে
সভ্য দেশের খাবার ঘুমে চেয়ে

থাকে যে, তা অনেক দিনের ফল,
অনেক কালের অনেক সভ্যতায়
মাটির মানুষ উগরে হলাহল
কোন অমৃতের কি সম্ভাব্যতায় ?'

('এক পৌষের শীত',[37] সাতভাই চম্পা)

এই মানুষকে প্রতিরোধের ভাষা শেখাতে হয় না, আদিমকাল থেকেই দেবদেবী আর ভূতপ্রেতের নামে, বেদ-বেদান্তের বলে মারী আর দুর্ভিক্ষের পীড়নে এইসব মানুষ শিখে গেছে অমৃতের উৎস কোথায়। বিষ্ণু দে-র এই প্রীতি, মনে হয় না যে এই পর্বে বর্ণিত হয়েছে নির্দিষ্ট দূরত্ব থেকে, বরং লিথুয়ানিয়ার বিশিষ্ট কবি এদুয়ার্দাস মেজেলাইতিস যেভাবে বলেন---'মাটির পৃথিবীতে মানুষই সবচেয়ে মূল্যবান। মানুষই আমার প্রথম ও সর্বশেষ ভালোবাসা'---একই সমধর্মী চিন্তার একটি উৎসস্রোতে নিমজ্জমান বিষ্ণু দে। কিংবা তাঁরই মত উচ্চারণ করতে পারেন,

'শেষ যুদ্ধ এ, আমরা নেবোই জিতে'---
বন্ধুর সাথে গলা মিলিয়েছি বলে'[38]

(চোঁট)

দুর্ভিক্ষের অভিজ্ঞতা কবির মানবিক-প্রীতিকে গাঢ়তা দিয়েছে। এত মৃত্যুর শোক, এত অপচয় তাঁকে ব্যথিত ও প্রশ্নাতুর করে তোলে বলেই তিনি দেখতে পান জাপানি-আক্রমণের পরবর্তী অবস্থা---'মহাজন মজুতদারেরই জয়', কেননা 'বিস্তর লোক, বেচে দেয় বটে কাস্তে হাতুড়ি হাল/জাল দড়ি দাঁড়, বিস্তর লোক ভিখারী সেজেছে

বেদ'---কবি দৃশ্য দেখেই শুধু ক্ষান্ত নন, হাত মেলাতে এগিয়ে আসেন তাদের পাশেঃ 'দুর্ভিক্ষের বঞ্চিত হাতে বানাব বিজয়ী বেদ/নব দুঃখ মুমূর্ষু হাড়ে নরকের ভিত ভেঙে,/আমাদেরই ক্ষীণ হাতে বলবান বাড়াব কালের চাকা,/অমৃতের চাকা ঘুরবে যুক্ত হিরন্ময় সুদেশ।' ('চতুর্দশপদী', সাতভাই চম্পা)। 'বৈশাখী' কবিতাতেও দুর্ভিক্ষের প্রসঙ্গ আছে---'বাংলায় মারীর কবল,/অনাহার, মানুষের দল/চীরবাস, মরণের ঢল/আড়তে আড়তে খোঁজে তারা।' ঘটনাটিকে কল্কি অবতারের সঙ্গে তুলনা করে বিদ্রূপের ভঙ্গিতে বলেন, 'কল্কি আর পৌরাণিক ঘোড়া/চড়ে না, ক্যাপিটাল সাজে আসে/দুর্ভিক্ষবাহন গোরাঘোড়া।' (বৈশাখী', সন্দ্বীপের চর)। অন্যত্রও এই বেদনা সঞ্চারিত--- 'নরক কি এ রকম ?বাংলার গ্রাম ও শহরে/লক্ষ জন দগ্ধমুখ, কারো বুদ্ধি ওপারে বহরে,/নরকে জানে না শুনি আছে তারা দুরন্ত নরকে,/রৌরব প্রাসাদে হাসে সাদাকালো গৌরব-প্রহরে।/দধীচির হাড় ছুঁলে, কী দেয়ালি বিবস্ত্র মড়কে।' ('আইসায়ার বেদ', সন্দ্বীপের চর)। বিষ্ণু দে-র কাব্যে দুর্ভিক্ষ-প্রসঙ্গ হয়ে উঠেছে 'নরকের নবান্ন উৎসব'---শব্দচয়নের দিক থেকে এ কথার গুরুত্ব অনেক, অন্তর্লীন বিদ্রূপের আবহে মানুষের যন্ত্রণাকে আরও ট্র্যাজিক করে আঁকা হয়েছে এর দ্বারা। কিন্তু এ যন্ত্রণা সত্য হলেও চরম নয়, চূড়ান্তও নয়। আইসায়ার চোখে তিনিও দেখতে পান---'দেখি নয়নে অঙ্কুর/তার নীল নদী বয়, দুই তট সবুজ উর্বর।' অথবা যুদ্ধের বাজনারোলে শুনতে পান পাঞ্চজন্যের গম্ভীর নির্ঘোষ যাতে জড়িয়ে আছে মুক্তির প্রতীক্ষা। পৌরাণিক রামচন্দ্রকে দেখতে পান 'উত্তোলিত বাহু হাতজোড়া'---এ রামচন্দ্র 'আজ জনতায় ভাসে', যদিও 'রামরাজত্ব বহুদূরে', এ রামচন্দ্র সহজে মরেন না, না-অত্যাচারে, না-অবিচারে, না-রোগে, না-মহামারীতে---'কত শতবার/মরিয়া না মরে রাম নামহীন এই সব চাষী ও মজুর---/উত্থানে ও পতনে বন্ধুর চূড়ায় প্রতিষ্ঠ আজ বর্ণাঢ্য কনার মতো/আশ্চর্য জীবন।' ('জোড়া', সাতভাই চম্পা)।
সমাজতাত্ত্বিকেরা রামচন্দ্রকে কৃষিভিত্তিক জীবনব্যবস্থার স্বরূপে দেখেছেন। বিষ্ণু দে-র অবলোকন তারই বিস্তৃততর আধুনিক অভিজ্ঞতাঋদ্ধ প্রজ্ঞায়।

১৯৪৩খ্রীষ্টাব্দের অভিজ্ঞতা ১৯৪৬খ্রীষ্টাব্দে এসে একটি প্রচণ্ড ধাক্কার সম্মুখীন হয়। গণ-আন্দোলনের তীব্রতায় এ পর্ব আবিশ্ব প্রকম্পিত। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শেষ হয়েছে, এমনকি হিরোশিমা-নাগাসাকির বীভৎস নারকীয়তাও যখন মানুষের মন থেকে মুছে যেতে বসেছে, প্রাচ্য দেশগুলিতে জাতীয় মুক্তি-আন্দোলন পেয়ে যাচ্ছে যখন তার বেগবান সংরক্ত আবেগ, তখন ভারতবর্ষে প্রবল উদ্বেগ এক মর্মান্তিক অভিজ্ঞতায় মানুষের শুভবুদ্ধির আলোগুলিকে একে একে নিভিয়ে ফেলতে অর্জন করছে অত্যন্ত শক্তিশালী উৎসাহ---কী করে এটা সম্ভব হল ?কী করে সম্ভব হল সাম্প্রদায়িক ভেদবুদ্ধির মধ্য দিয়ে ভ্রাতৃঘাতী জিঘাংসার ভেতর দিয়ে মানবিকসত্তার আসুরিক বিনাশের ঘৃণিত চক্রান্ত ? বিষ্ণু দে-ও এর কোন জবাব পান নি।'এ মরণে প্রাণ নেই, এ তো নেশা উন্মাদের,/শক্তিমদমত্ত

অন্ধ শাসনের অপ্রাকৃত আঁখি।'---বিষ্ণু দে এই অন্ধ শাসনাধিতে বিস্মিত হয়েছেন আর সকলের মতই। প্রগতি আন্দোলনের শুভ প্রচেষ্টার মুখে এ যেন চুর্ণ-কালি মাখিয়ে দেবার মতনই বর্বর ঘটনা। অথবা প্রগতির বদলে পশ্চাদ্‌ গতির বিপরীত টান।

প্রসঙ্গটি অবশ্যই স্পর্শকাতর। তবু লক্ষ্য করতে হয় যে, এই বিষয় নিয়ে একদা নজরুল ইসলাম যে সমস্ত উদ্দীপক কবিতা লিখে ছিলেন, তোলপাড় করে তুলেছিলেন সমস্ত রকমের ভেদবুদ্ধির ও মানবতাবিরোধী সত্তা ও কৃত্রিম সেন্টিমেন্টকে, ঠিক তেমনি করে তিরিশের ও চল্লিশের দশকের সেইসব প্রত্যক্ষ ঘটনার প্রতিঘাতে- ও কবিদের ততটা উতলা করে নি, সুকান্ত আর সুভাষ---প্রগতি আন্দোলনের অন্যতম দুই দিকপাল(বিশেষ করে কবিতার ক্ষেত্রে)- ও বিষয়টি যথেষ্ট নাড়াচাড়া করেন নি, সামান্য দু'একটি কবিতা লেখা ছাড়া, এদিক থেকে বিষ্ণু দে সেই আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত থেকে সেই মহতী কর্তব্য সম্পাদন করেছেন যথেষ্ট আত্ম বিশ্বাস ও প্রত্যয়কে খুব বলত্র করে। 'সন্দ্বীপের চর' সেই অসাম্প্রদায়িক মানুষের আত্ম দর্শনের সামগান। ঘটনার বাস্তবতা যখন প্রেরণার আকারে সত্তার মর্মমূল অধিকার করে বসে, তখন সে-সৃষ্টি হয়ে ওঠে মৌলরূপে বিশিষ্ট। এই কাব্যের 'সন্দ্বীপের চর','কচকাশীতলা', 'চেতে-বৈশাখে', '১৫ই আগস্ট','মৌভোগ' প্রভৃতি কবিতায় পারস্পরিক সংঘাত ও সংঘর্ষের ভেতর দিয়ে বিষ্ণু দে যেন সেই প্রতিক্রিয়াই ব্যক্ত করতে চান যা সমগ্রতার বিপরীতে মানবতার বিপরীতে এক দুর্মর কাপুরুষী শক্তির বিবেকী হন্তারক। এভাবেই বিষ্ণু দে পৌঁছে যান একটি সুনির্দিষ্টতায়, নিঃসন্দিগ্ধ কমিটমেন্টে। যার সূচনা হয়েছিল 'চোরাবালি'র পর্বে, দ্বান্দ্বিক-ক্রিয়ার বিকাশধর্মী প্রবণতার সূত্রে উত্তরণ ঘটে যায় তাঁরই 'সন্দ্বীপের চরে'। সম্ভবত এদিকে তাকিয়েই এ পর্বে বিষ্ণু দে-র আত্ম-আবিষ্কারের সম্পূর্ণতার কথা বলেছেন অরুণ সেন।[৪৯] কথাটি কিন্তু ব্যাপকার্থে অভ্রান্ত নয় একেবারে। বিষ্ণু দে-র আলোচনায় আমরা দেখেছি কোন্ প্রক্রিয়া-প্রকরণের ভেতর দিয়ে, ভাঙচুরের ভেতর দিয়ে ক্রমাগত একটি পরিণতির দিকে যাত্রা করে চলেছে বিষ্ণু দে-র কবিসত্তা আর বিষয়গত উপাদান হিসেবে যুগপরিবেশ কীভাবে তাঁর সংকট-সমস্যাকীর্ণ জীবনে প্রবেশ করে বারংবার প্রভাবিত করে চলেছে কবির সত্তা ও মর্মমূল, এমন কি 'সাতভাই চম্পা'তেও তিনি উত্তরণের বিবিধ প্রভাবে পৌঁছোতে গিয়ে ঘুরে গেছেন কীভাবে মুহূর্তের দ্বিধায় ও সংশয়ে, তার প্রমাণ আমরা পেয়ে যাই গোটা কয় কবিতায়:

ক)...একএক কামানের গানে
শুধু বুঝি হতভম্ব পাখার বাতেক।
(জনী)

খ) ভাবি আজ বাঁর এই যে ভিড়
কারো মনে দেখা নেই কি চিড় ?
নড়চেড়ের সন্ধানে
জিজ্ঞাসা কারো মন টানে
ও দিক দ্বিধার বন্ধনে ?
(আত্ম জিজ্ঞাসা)

গ) গোষ্ঠীর গর্বের ঘাড়ে ঘাড়ে দড়ি বেঁধে
উন্নাসিক তোমাদের গলা রাখি দূরে।
নূতন ব্রহ্মণ্যতেজ বিপ্লবমুকুরে
আত্মসাৎ ক'রে বসো করে দেবে টান॥

(এক রাজনৈতিক গোষ্ঠীপতি-কে)

কিন্তু 'সন্দ্বীপের চরে' আর সংশয় নেই, দ্বিধা নেই, তার বদলে বিশ্বব্যাপী যে প্রাণাবেগ আর ভারতবর্ষব্যাপী যে 'মানুষের কাল' ঘনিয়ে উঠেছে, তারই ভেতর থেকে অন্বেষণ করে নিতে চেয়েছেন 'জীবনের উল্লাসের সঙ্ঘবদ্ধ সুস্থ সমারোহ', এ পর্বেই তিনি সহজ গলায় উচ্চারণ করে উঠতে পারেন 'একাগ্রতাই সত্য, জীবনটা/ বয়ে যায় দেখি তোমারই সে মহানদী'---ছোট নদী বড় নদী মিলে যায় যেমন সাগরসঙ্গমের বিশালত্বে, বিষ্ণু দে-ও মিলে যেতে চেয়েছেন এইভাবে। বস্তুত এটা উত্তরণেরই একটি ধাপ, কিন্তু তখনই এ পর্বে আত্ম-আবিষ্কারের সম্পূর্ণতা সাধিত হয় নি। 'অন্বিষ্টে' আমরা দেখব তিনি কেমন করে আর একটি নতুন বৃত্ত রচনা করলেন, সে-পর্ব অবশ্য আলাদা, এবং এক জগৎ নির্মাণের চেষ্টা চলেছে সেখানে। সে প্রসঙ্গ পরে।

আমরা লক্ষ করেছি যে, 'সাতভাই চম্পা' কাব্যে যে দুর্গত 'মুক্তি'কে সাত ভাই খুঁজতে চেয়েছিল আর অন্তরে-বাহিরে অনুভব করেছিল 'সে তীব্র সুখ', অথবা বাংলাদেশ থেকে শুরু করে চীন-মঙ্গোলিয়া-সিংহল-শ্যাম-কম্বোজ-জাভা-বালি-গ্রীস-রোম-ফ্রান্স-চীন-আংকোরব্যাপী বিশ্বমানচিত্রের প্রতিটি ভূখণ্ডকে মেলাতে চেয়েছিল গণমুক্তি-আন্দোলনের একটিমাত্র সূত্রে, সেই সূত্র, হঠাৎই ছিন্ন হয়ে গেল 'মানুষের মাংস খাওয়া হিংস্র-শ্বাপদ/বন্যের চেয়ে ঢের ভীষণ আঁধার'-এ কী করে, কী করে সাতভাইয়েরা লক্ষ্যবিচ্যুত হয়ে ভেঙে গেল ভ্রাতৃহননে---এ সমস্যা বিষ্ণু দে-কে বিস্মিত হতাশ বোধকরি বিমূঢ় করে দিয়ে থাকবে। ১৬ আগস্ট, ১৯৪৬ খ্রীষ্টাব্দের সেই কলঙ্কিত তারিখটি ছিল প্রত্যক্ষ সংগ্রামের, কিন্তু তা ব্রিটিশবিরোধী না হয়ে হিন্দুবিরোধী এক বিকৃত ও অসুস্থ চেহারা অর্জন করেছিল। ২০ অক্টোবর, ১৯৪৬ খ্রীষ্টাব্দে সন্দ্বীপের চরে কমিউনিস্ট কর্মী লালমোহন সেন সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা প্রতিরোধ করতে গিয়ে নিহত হন। অথচ ঐ বছরই, সে মাসে (মাত্র এক মাস আগে) খুলনা জেলার মৌভোগ গ্রামে বঙ্গীয় কৃষকসভার নবম সম্মেলনে প্রস্তাবিত হয় সারা বাংলাব্যাপী তেভাগা-আন্দোলন, যে-আন্দোলনে মূলত অর্থনৈতিক দাবিই পেয়েছিল বিশেষ অগ্রাধিকার। এই সময়ের উপাদান ও অনুভূতি বিধৃতি লাভ করেছে এই কাব্যে।

চরের বর্ণনা করতে গিয়ে কবি যখন বলেন, 'প্রকৃতির মায়া/আহা বনরাজিনীলা।/সে তমালিবন।/সমুদ্র-বীজনস্নিগ্ধ সফেন কল্লোল।/বালিয়াড়ি সীমা জুড়ে ছোট ছোট টিলা,/শান্ত মৃদু খাড়ি---যেন তনুকায়া/ অষ্টাদশী।' (সন্দ্বীপের চর', সন্দ্বীপের চর)। তখনও আমরা বুঝতে পারি না কবির উদ্দেশ্য কী। প্রকৃতি শুধু

প্রকৃতি হয়ে নেই বিষ্ণু দে-র কাছে, প্রকৃতি তাঁর কাছে মানবজাতির ইতিহাসও বটে। আদি মানুষ প্রকৃতির বিরুদ্ধে লড়াই করতে করতে একসময় যখন ক্লান্তিতে ভেঙে পড়ে অবকাশময় জীবনযাপনের স্বল্পায়ু সুখ পেয়েছিল, তখনও সম্পদের লোভ আর সম্পত্তির পাপ তাকে স্পর্শ করে নি, লোভ আর সঞ্চয়ের মধ্য দিয়ে ঘটে গেল সেই ইতিহাসকালীন নয় এমন ঘটনা, যা আদি সাম্যবাদী সমাজব্যবস্থার মৃত্যুকে চিহ্নিত করল। 'জীবনের হার' হয়ে গেল সেদিন। এই পরাজয় নতুন করে আরও তীব্রতায় বেজে উঠল মানুষে মানুষে, বিভেদে, বিচ্ছেদে, বিচ্ছিন্নতায় আর সংশয়ে:

কবে চুপে চুপে
হয়ে গেছে জীবনের হার--
আজকে সবাই প্রতিবেশী তাই, হে প্রকৃতি, ভুলে যাই
জীবনের মরণের হারে বাঁধা জীবনের ছবি
আজ শুধু মাটি, দড়ি, ঘুড়ি ও লড়াই, সে কি আর মুক্তি।'
(ঐ)

সাম্প্রদায়িক বিভেদবুদ্ধিতো রোগবিশেষ, এতে প্রাণ কই ?'এই রোগে এ মরণে প্রাণ নেই, প্রাণ বাঁচে, সমান সুযোগে'---এই উপলব্ধি কেবলমাত্র কবির ভাবালুতাজাত নয়, প্রত্যক্ষ দৃষ্টান্ত হিসেবে তাই তিনি স্মরণ করিয়ে দিতে চান কাশ্মীর আর ত্রিবাঙ্কুর আর গোচেন বুক কিংবা হাসনাবাদের কথা। এসব অঞ্চলে জেগে উঠেছে স সহস্র মানুষ, একতাবদ্ধ হয়েছে তারা অন্যায় আর অসমব্যবস্থার বিরুদ্ধে। নালমোহন সেন আত্মাহুতি দেন হিন্দু-মুসলিম ঐক্যের প্রাণবায়ু, হাসনাবাদে এই ঐক্যবিধায়ক কিষানই সংঘবুদ্ধে আত্মপ্রকাশ, অন্যদিকে কাশ্মীর-ত্রিবাঙ্কুর-গোচেনবুকে গড়ে উঠেছে জাতীয় মুক্তি আন্দোলনের প্রয়াস। তেভাগা আন্দোলন যেসব অঞ্চলে প্রাধান্য বিস্তার করেছিল, ইতিহাসই সাক্ষী, সেসব অঞ্চলে দাঙ্গার বহ্নিতাপ স্পর্শ করবার আগেই প্রতিরোধের ব্যাপক প্রস্তুতি ও প্রচারকার্য সম্পন্ন হয় এবং এতে অংশ গ্রহণ করে উভয় সম্প্রদায়। কবিতাগুচ্ছে তাই এই সমস্যার অনুভূতিগুলি প্রকাশ পেয়েছে। এই সাম্প্রদায়িক উত্তেজনা যে বণিক-রাজের আর একটি কৌশল এ সত্য জেনেছেন কবি: 'বণিকরাজের বিষে/নীল হল দেশ, কাল-সাপ উজ্জীবে'। (জন্মা-২ , সন্দ্বীপের চর)। মানুষের দৈনন্দিন জীবনের গভীরে এই পাপের বীজ সে-কথাও কবি জানেন: 'জীবনের পাপ চলে না জীবিকা বিনা,/তাই দস্যুর মুক্তায় তাই কেউ,/তাই তো ইতর, তাই নির্বোধ কেউ/অনেক জনতা প্রতিযোগিতায় কিনা।' ('সহিষ্ণুতা', ঐ)। মানুষের এই দুর্বলতাগুলিকে পুঁজিবাদের সুবিধাভোগী রাজনীতিকেরা কাজে লাগায়, সাম্প্রদায়িক বিষবাষ্পে ছেয়ে ফেলে সাধারণ মানুষের মন, লক্ষ্য থেকে চ্যুত করে ভ্রষ্ট করে তাদের। কলকাতার রাজপথে এইসব 'জঙ্গলবনের চিত্র' থেকে 'চোরাকারবারী কড়ে আমীর ওমরা মজুতদারেরা' লুটে নিতে থাকে সর্বস্ব। শোষণের বিরুদ্ধে নৈতিক লড়াইয়ের বিপর্যয়ে যখন মানুষে মানুষে বিভেদ বাড়ানোর অপচেষ্টা চলে তখন

অজস্র প্রাণের অপচয় হতে থাকে এক মুহূর্ত পরে। এ অপরাধ প্রাকৃতিক নয়, এ অপরাধ মানুষের। 'এ তো শুধু গ্রামছাড়া অসহ্য অরণ্যের মরণ-উল্লাসে আর মুমূর্ষু রোদন/ছিন্নমস্তা জীর্ণ পুত্রবধ/থাকব নাকো, নয় বন কেটে জমির সন্ধান'---সাম্প্রদায়িক উন্মাদনার পরবর্তী দৃশ্য তো শ্মশানের স্মৃতিই জাগ্রত করে, বিষ্ণু দে প্রকৃতির ভেতরেও এ দৃশ্য দেখতে পান, কিন্তু লক্ষ করবার, তিনি একে পার্থক্য-লাঞ্ছন করেন নি, এই মরণ-উল্লাসে মানুষের আদিম প্রবৃত্তি যে বন কেটে বসত বানানো, তাও নেই, বরং আছে সৃজনশীলতার, বিকৃতির, আর অস্বাভাবিকতার একটি দিক---'শ্বাপদসঙ্কুল বনে বৃকী ও দন্তুর মত মরণ-মাতাল/ বনে বনে মাথায় মাথায় কঙ্কালে কঙ্কালে ঠোকে।/সে হিংসায় জিঘাংসায় যুক্তি নেই বোধ নেই/আবাদের আশা নেই অরণ্যপ্রান্তের/গ্রামে গ্রামে গ্রামান্তের, তাতে নেই জীবনের রক্তের আবেগ'। ('কঙ্কালীতলা', সন্দ্বীপের চর)। বিষ্ণু দে সঠিকভাবেই লক্ষ করেছেন, অন্ধ উন্মাদ হিংসায় মানুষের পশুপ্রবৃত্তিরই প্রকাশ পায়, সৃজনশীলতার একেবারে বিপরীত তা। কিন্তু বিপ্লবী হিংসা বা 'রেভোলিউশনারি ভায়োলেন্স' বলতে বোঝায় যা ভেঙে আবার নতুন করে গড়ে তোলবার প্রতিশ্রুতি রাখে, এর সঙ্গে জড়িয়ে থাকে সামাজিক ইতিবাচকতা, যার মধ্যে মহত্তর প্রেরণার আর সম্পূর্ণের সংশ্লিষ্ট গুণগুলির একত্র সন্নিবেশ এক অপরিহার্য শর্ত। বিষ্ণু দে ঠিকই লক্ষ করেছেন, যে-হিংসায় অনুভূত হয় না 'জীবনের রক্তের আবেগ' তা বোধহীন যুক্তিহীন আর আবাদের আশাহীন অথচ এই উন্মাদনাই ছড়িয়ে পড়েছে গ্রামে আর শহরে। 'মরিয়া শহরে জাগে পৃথিবীর মুমূর্ষু বাতাসে/মরা বাড়ি, মরা পথ,/কোন নরকের প্রাণে জেগে থাকে ছাদে/ছাদে/বারান্দায়, জানালায় বিনিদ্র প্রহরে টহলায় পাড়ায় পাড়ায়/মহল্লায় ইশারায় ইটে বাঁধে তোড়া তাকে নকল সেনার ছিপকাপে/তবু তার সাপেদের জিঘাংসু হৃদয়।'('কঙ্কালীতলা', ঐ)। এখন কি 'রাতকানা কানাগলি কলকাতার' গলিতে গলিতেও 'নরকের গায়ের হাওয়ায়' আর 'হিম দীর্ঘশ্বাসে' ভারি হয়ে ওঠে সবুজ আকাশ। গ্রামেও একই অবস্থা---সেখানকার 'নদীতে ওঠে না স্রোত, ইছামতী/জীবনের বেগে বর্ষলোপ্য ঘুম থেকে ওঠে নাকো জেগে/মানবের বিপুল ইঙ্গিতে/গ্রামান্তের বিপুল-হাওয়ায়।' (ঐ)। উদ্ভূত পরিস্থিতিতে শাসকশ্রেণীর চরিত্র আরও প্রকটিত হয়ে পড়ে। এই পরিস্থিতিকে তারা সামাল দিতে চায়, মেতে ওঠা টৈপস নদীর মাতাপ্রবাহকে 'রাজার সেপাই কাদা দিয়ে তাকে রোখে', কিন্তু ইতিহাস বরাবর সেই সত্যের দিকে ইঙ্গিত দেয়---'ভেঙে যায় বান', অথবা 'মুক্তি তো দিই। মুক্তির নেই শেষ,/তবুও যায় না রাজার উপরে দ্বেষ।' তাদের ভাবনা রূপ পায় এইভাবে: 'সাজার নামে ঘুম-পাড়ানির দল/কেটে যাবে নাকি? ধর্মঘটের জ্বালা/কবে যে চুকবে। মালিকানা-বিদ্বেষ।/এর চেয়ে সাদা সাজাই ভালো বেশ।/সাধনারা সাধে, সবাই ধরেছি সাদা---/সদিচ্ছান্, তবু হাতছাড়া হবে দেশ।' ('ওঁরা ও এরা', ঐ)। বিষ্ণু দে কোন অস্পষ্টতার আভাস রাখেন নি, সরাসরি ব্রিটিশ-ভারতের প্রশাসনকে

অভিযুক্ত করেছেন সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার জন্যে। মিঃ জিন্নাহ লাহোরে(১৯৪০) যে পাকিস্তান-প্রস্তাব দেন, সেই ঘটনার আগে এবং পরে জাতীয় কংগ্রেসের সঙ্গে আপোষ-আলোচনার সমস্ত দরজা-বন্ধের মূলে ব্রিটিশশাসকবর্গের দায় কোন অংশে কম ছিল না। (দ্বিতীয় অধ্যায়ে বিশদ তথ্য দ্রষ্টব্য)। বিষ্ণু দে এ পর্বে আক্রমণ করেছেন মধ্যবিত্তশ্রেণীর ভূমিকাকেও, দেখেন, 'ভদ্রলোকের নরকেই থাকো'। তাদের নির্বিকার ঔদাসীন্যকে ব্যঙ্গ করে বলেন, 'পাকিস্তানে ও বঙ্গভঙ্গে/শানিয়েছো নাকো পিশাচরঙ্গে/যেয়ো নাকো গাঁয়ে তেভাগাকুহকে/চেপে থাকো ট্রামে, যেয়ো নাকো জলে।' (জালিয়ানওয়ালাবাগ দিবস)। জীবনসমস্যার জটিলতা থেকে এইসব শান্তিপূর্ণ নিরীহ নাগরিকেরা পালাতে চায়, ব্যঙ্গভরে তাদের উদ্দেশে কবি বলেন, 'পুড়ে ছাই সব হল, যাও কোথা/কোথাও পালাও? চারিদিকে ধুঁয়া,/এদিকে চোরাইবাজার, চোর যে/নিয়ে যাবে লুটে ঘর যে দোর যে।' (ঐ)। এ প্রসঙ্গে পাঠকের মনে পড়ে যাওয়া স্বাভাবিক সুধীন্দ্রনাথ দত্তের বিখ্যাত কবিতা 'উটপাখি'। এ পর্বে আতঙ্কের অনুভূতি প্রকাশ করতে, অসহায়তা সঞ্চার করতে কিংবা ব্যক্তির নৈঃসঙ্গ্যের যন্ত্রণাকে তীব্র অভিব্যক্তি দান করতে অথবা নৈঃশব্দ্যের হিমশীতল প্রেক্ষিত সৃজন করতে কবিদের অনেকেই শকুন অথবা একটি পাখির চিত্রকল্পকে বিশেষভাবে প্রয়োগ করেছেন। আকাশজুড়ে বিরাট পাখির ডানা-ঝাপটানোর শব্দ শুনেছেন এঁরা(অবশ্যই মনে রাখতে হবে, রবীন্দ্রনাথও এর থেকে বাদ যান নি, 'প্রান্তিক' কাব্যের ১৭-সংখ্যক কবিতায় বোমারু বিমানের সঙ্গে তুলিত হয়েছে শকুনের ইমেজ)। বিষ্ণু দে লেখেন---

ক) 'হাজার শকুন ওড়ে ঘরে-ঘাটে
ধরিত্রী ব্যথায় শত খাখাটে
ঢাকে নাকি ঝোড়ো মেঘ।'
('সে-দিন', সন্দ্বীপের চর)

খ) 'মাঠে মাঠে মহাশূন্য ডানা নাড়ে শকুনের মতো
মধ্যরাত্রে যখন তীব্র বাঁশি বাজে।'[৫০]
('ক্রান্তি-৪'---সমর সেন

গ) 'জঙ্গলে জঙ্গলে পাহাড়ের কোলে
ঝটপট করে প্রতিহিংসার পাখা।'[৫১]
'অগ্নিকোণ'----সুভাষ মুখোপাধ্যায়

ঘ) 'দিগন্ত শবের রাজ্য হতে
ক্লান্ত চোখে তাকান শকুনি।
... ...
অথবা শাখায় কালো পাখি
দুশ্চিন্তা ছড়ায় অবিরত।'[৫২]
'সহসা'----সুকান্ত ভট্টাচার্য

৬) 'থাকে-থাকে গোটা দেশটাকে ঢাকি
বাদুড়-ডানায়
কী অন্ধকার
কী অন্ধকার ...
...   .
রাতের ঘোমটা-কুয়াশা ছিঁড়ে কে
আসে দলে-দলে, মাঠ-ঘাট ছেয়ে আসে, বাঁয়ে চাঁদ
ঢলে পড়ে, আসে, ডাইনে অজানা ডানা-ঝটপট'---[৩৩]

'হিমাচল আসমুদ্রবুদ্ধ'---মঙ্গলাচরণ চট্টোপাধ্যায়

বিষ্ণু দে কি এ অধ্যায়ে সমাজ-সংসার-সভ্যতার বিবেকহীনতায় মানুষের প্রতি আস্থা হারিয়ে ফেলেছেন? নাকি যুগ-সংকটের প্রচন্ডতায় সমাজ-সংলগ্ন প্রতিটি মানুষের মুখে-চোখে কেবলি সংশয়, কেবলি দ্বিধা, কেবলি সন্ত্রাসের কালো ছায়াই দেখেছেন? খুব অসঙ্গত মনে হবে না, শেষজীবনে রবীন্দ্রনাথের কণ্ঠোচ্চারিত বাণীমন্ত্র 'মানুষের প্রতি বিশ্বাস হারানো পাপ' স্মরণ করলে। বিষ্ণু দে-র মনে কি বিশ্বাসের, মানুষের প্রতি গভীরতম আস্থার প্রবলতম বিশ্বাসযোগ্য উপাদান ছিল? 'চোরাবালি'র শেষদিকের দু-একটি কবিতায় বিশ্বাসের চেয়ে সংশয়, প্রত্যয়ের চেয়ে একরকমের অন্তর্লীন কৌতূহল ছিল, যেমনঃ 'অস্তি-নেতির সেতুর পারে অন্ধকারের কোথায় সীমা? নীরবতার/কোথায় টানবে দাঁড়ি? এ অশেষ সহিষ্ণুতায় চলবে কতকাল?' ('দ্বিধা-দম্পতি', চোরাবালি)। কিংবা 'অস্তাচলের আঁধারেই কিবা আশা?/এ মরা শহরে নীড়-সন্ধানী মন/হারাল চতুর উত্তর দিশা তার।' ('বেকারবিহঙ্গ', চোরাবালি))। সময়ের ভেতর থেকে যে উত্তাপ উত্থিত হয়েছে, বিষ্ণু দে সে উত্তাপে কল্যাণের দিক লক্ষ্য করেন নি সে-পর্বে। তার শুরু 'পূর্বলেখ' ও 'সাতভাই চম্পা'য়, জনযুদ্ধের সময়ে, ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধে সাহিত্যিক-সংগ্রামে, যা ছিল বীজাকারে তার প্রস্ফুটিত বিকশিত রূপ 'সন্দ্বীপের চরে'---এ বিশ্বাস 'আলো-বাতির হাল্কা হাওয়ায়' গড়ে ওঠা নয়, বরং জন্মে জন্মে 'হয়ে ওঠা'য়। মার্কসীয় তত্ত্বজ্ঞানের প্রাধান্যে নয়, বরং গণ-আন্দোলনের প্রত্যক্ষ ভূমিকায় থেকে বিষ্ণু দে তাঁর উপলব্ধির চূড়োয় পৌঁছে এই বিশ্বাস ব্যক্ত করেছেনঃ ...'মুদ্রারাক্ষসের অভীপ্স রসের/রক্তাসক্ত নেই এই দিগন্তে প্রবালে নীলে আর লালে/সূর্যের চোখের মতো বুদ্ধের চোখের মতো মৈত্রীতে করুণ/প্রজ্ঞাপারমিতা/দিলে যার ছিটা এই বিরাট সকালে/উর্ধ্বজিৎ কাশীপুরে পাটনায় আলোর অঙ্কুশে/সে আদিগন্তবী সিন্ধু অগ্নি শুচিস্মিতা/তোমার চোখের আলো কাস্তিরে ও ভিমাঙ্কুরে/তেভাগাবা বাংলায় কত গাঁয়ে দূর দূরে/বেলঘুরেতে প্যারিসে প্রাণে রক্তপ্রাণে প্রাণে জাগে/সে মৈত্রেয়ী প্রজ্ঞাপারমিতা।' ('সন্দ্বীপের চর', ঐ)। ছোট 'চর' এখানে এসে পেয়ে যায় এক বিরাট বিশালত্ব, যার দিগ্বিদিক চারিত্র্য আন্তর্জাতিকতায় জন্ম ও বর্ধিত।

জীবনের মহিমা প্রকাশ পেয়ে যায় বৈপ্লবিকতায়---'মনের মহিমা যদি একাধারে যদি এ নম্বর শীতা/রহস্যবিশ্বের স্রোতে আমাদের ঘরে ঘরে/এ সমাজে আমাদের একজাতি চরে তাই মনের মুক্তিতে/শেষহীন জীবনের স্রোতে নিমি প্রাণের অন্তরে প্রেমের সুন্দরে/জীবিকার ভিতে গড়ি মানুষের প্রত্যহ মহিমা।/ফেব্রুয়ারী ছুঁয়ে যায় নভেম্বরে সীমা।'(ঐ)। মনুষ্যধর্মের বেষ্টনটায় বিশ্বাসের স্থিরকেন্দ্র তৈরি হয়ে যায়, সেখানেই 'মৃত্যুর জাল ছিঁড়ি,/ ফেলে দিই সত্তার খোলসটা'-বোধের উপলব্ধি। ('বৈশাখী', সন্দীপের চর)। এই উপলব্ধিই মানুষকে জাগিয়ে তোলে, আর সঞ্জীবনী সুস্থ সমারোহের ফল হিসেবে 'সাম্রাজ্যের সন্ধ্যায় প্রত্যহ/জীবিকার মুক্তি তোলে দেশে দেশে মুক্তিসংগ্রাম'। ('লালবন', ঐ)। মুক্তিসংগ্রাম, এরা তেভাগারও সন্ততি। এইসব সন্ততিদের নিয়ে মায়েরা স্বপ্ন দেখেন, 'মনে হয় যত খোকার সামনে/বর্গীরাজার ঠাং ভেঙে ভেঙে/বহু ঢুলুঢুলু ঘুমা/বুলবুলি শেষ হোক, তবে খোকা ঘুমা।'('ছড়া-২' ঐ)। 'মৌতোগ' তারই প্রস্তুতি কি? কবিতাটি শুরু হয়েছে একেবারে দক্ষিণারঞ্জন মিত্রমজুমদারের রূপকথার আদলে থেকে।[৫৪] লালকমল আর নীলকমল বহু পুরোনো গল্পের সেই রাজকুমার, লাল আর নীল ডিমের খোলস ভেঙে বেরিয়ে আসা রাজপুত্র লালকমল আর নীলকমল তলোয়ার হাতে বেরিয়ে পড়ে রাজ্য ছেড়ে, কৃষাণ দেশে, পড়ে থাকে লাল ডিমের খোলস সোনা হয়ে, আর নীল ডিমের খোলস লোহা হয়ে। লোহা দিয়ে কাস্তে বানায় কৃষক আর সোনা দিয়ে মেয়ের বঁইচে বাজু বানায় কৃষাণী। প্রগতি সাহিত্য আন্দোলন লোকজ সংস্কৃতির ওপর গুরুত্ব দিয়েছিল, বিষ্ণু দে তাঁর শিল্পের উপাদান এর থেকে প্রচুর পরিমাণে সংগ্রহ করেছেন, অন্তত এ ব্যাপারে তাঁর কার্পণ্য নেই। বিষ্ণু দে লেখেন, 'মারা তাদের কঠিনপণে রাখীবাঁধা কিশোর হাতে---/রাক্ষসেরা কৃষাই রে বধ পাবায়।' লালকমল ও নীলকমল সাম্প্রদায়িক বিভেদকামী শক্তির বিরুদ্ধে এক অনির্বাণ ঐক্যের প্রতিশ্রুতিতে পরিণত হয় কবির হাতে। তাদের লড়াই কায়েমী শক্তির বিরুদ্ধে---'চোরডাকাতে মুখোশ পরে, রাক্ষসেরা আড়ে/চোরাই মাল, ঢাকে কালো কাবায়।/মড়িয়া যত প্রাণীর জাতি কঙ্কালী পাহাড়ে/মড়ক-পুজা নতুন নিতে জানায়।'('মৌতোগ', ঐ)। এই শক্তির বিরুদ্ধে লালকমল আর নীলকমল এই দু'জনের লড়াই---'লাল তিলকে ললাট রাঙা' রাজকুমারেরা পরস্পরে বেঁধে নেয় হাতে 'ভায়ের মিলে প্রাণের লাল নিশান'। ভারতের ইতিহাস অর্জন করে এক নতুন মাত্রা, 'মৃত্যুর পাশে জীবনের ভিড় বদ্ধমুষ্টি সঙ্ঘ নিবিড়/মৃত্যুবিহীন আমাদের এই ভারতের ইতিহাসে।' ('ভিড়', ঐ)। বিষ্ণু দে তারুণ্যের এই উদ্দীপক শক্তিকে অভিনন্দন জানান আর সেইসঙ্গে সতর্কীকরণের দায়িত্বে তাঁর অনুপম ভাষায় বলেন: 'তোমাকে বন্দিত করি, হে কিশোর, তুমি তো ভোলো নি/ মত্ততায় বীর্য নেই, মত্ততার অকালে রাতায়।' জানিয়ে দেন প্রাজ্ঞ অভিজ্ঞতায় 'মানুষের সর্বার্থ সাধনা/স্বার্থে তোলে'। এদের চোখেই কবি তাঁর বিশ্বাসের আলো জ্বলে উঠতে দেখেন---'মনুষ্যত্ব চোখে জ্বলে, একমাত্র ধনী দরিদ্রের/ভেদাভেদ মানুষের মনু

যে তা তুমি তো জোনো নি---/তুমি জ্বালো দীপাবলী অন্ধকারে তীব্র বিদ্রোহ।' ('কঙ্কালীতলা', ঐ)। কবির অবিচল আন্তরিকতায় দীপ্ত হয়ে ওঠে বিশ্বাসের বিশেষ জায়গাটি: 'তবু শুকতারা/তোমাকে জেনেছি চিরে পৃথিবীর মর্ত্য পাথিরাতে/বেঁধেছি হৃদয়ে দুইহাতে/ বিভেদের পাহাড়ে নদীতে আমাদের মিল দীনকেতু/ আপন আপন সত্তা আনে কড়ি-কোমলের গানে/আমাদের সেতু এপারে ওপারে/দুইতটে আমাদের স্রোত জলে স্থলে আকাশে উচ্ছিদে/সহস্র বিবিধে জলে জলে পুষ্টই উৎসারে/প্রাণের জোয়ারে।' (ঐ)। শেষ পংক্তিতে সাংবাদিকের গলায় কবি জানিয়ে দেন---'আমরা উভয়ে বারেবারে দেখেছি সে সম্মিলিত বাদ প্রতিবাদ'। কারণ, হাসনাবাদে প্রমাণ হয়ে গেছে নীলকমল আর লালকমলের মিলিত শক্তির মূর্ত প্রতিবাদ। হাকিমগঞ্জ-কালীগঞ্জ-রামগঞ্জ-নোয়াখালি-ত্রিপুরার আকালকবলিত অঞ্চলে গাঁ-গঞ্জে যেসব রাক্ষসীরা এতকাল 'মায়া' আর 'দুধ' ছড়াতো, সেখানেই 'ভক্তারে ভক্তারে জাগে কলরব'। সেখানেই 'লালকমলের হাতে নীলকমলের/ রাখী বেঁধে অতন্দ্র রাম ও রহিম'---সম্প্রদায় নির্বিশেষে সম্মিলিত বিপুল শক্তির জাগরণের অর্থই হল 'রাক্ষসী রানী'-শক্তির পরাজয় : 'মানুষের মাংসখাওয়া হিংস্রপশুর/হন্যের চেয়ে ঢের ভীষণ আঁধার/ অস্থিরা সে মায়া হানে করে দেয় চুর/শতশতকের ঘর, অনেক সাধার/জাগ্রত মুক্তির আভাস পেয়েই/রাক্ষসী রানী বুঝি ওরে হল হিম---/মরণ কাঠি যে তার হাসনাবাদেই/এক হাতে ভাঙে শত রাম ও রহিমে॥' ('হাসনাবাদেই', সন্দীপের চর)। একই প্রতিবাদ ধ্বনিত হয় অন্যত্রও: 'ভাসালো রে কাশ্মীরের রাণের রেশ/পৌঁছায় দেখি, ত্রিবাঙ্কুরের পার/বিলাসেও কাঁদে, হাসনাবাদের তার/গাঁয়ে গাঁয়ে যায়, চেঁচায় খবরদার।' ('ওঁরা ও ওরা', ঐ)। বুধবার রাজকুমারেরা বীরের রক্তস্রোত মাতায় অঙ্গুল যোগাতে নেমে আসে যখন বাস্তবের প্রকাশ্য রাস্তায়, তখনও সে শক্তির স্ফুরণ ও বিস্ফোরণ-ক্ষমতা সমুদ্রে অস্ত যেতে যায় শাসকবর্গ, ভুলে যায় তারা যে, লালকমল আর নীলকমলের জন্মদিনেও 'উঠেছিল লাল তারা'---মানুষের মহান পরিত্রাতা যীশুর জন্মমুহূর্তেও এভাবে তারায় তারায় চিহ্নিত হয়েছিল পূর্বাকাশ, হয়ত-বা মেরী-মায়ের ভূমিকায় 'মাটি ভুলেছিল পৃথিবী অম্লান'---অভিষিক্ত মানুষের অভিপূর্ব নির্দিষ্ট হয়েছিল বাহুর শক্তিতে আর প্রেমের শক্তিতে, কবির ভাষায়: 'বুদ্ধের শান্তি প্রেমের শক্তি উদার/তোমার বাহুতে মুদ্রায় উঠোমরো' ('বড়দিন: লাল তারা', ঐ)----এই অপরাজেয় বীর্যের শক্তিতেই সমস্ত বিপর্যয় থেকে মানুষের আর মানুষের সভ্যতার পরিত্রাণ ঘটে: 'মাথাক্ মালা, রাতাক্ রক্তে মাটি,/সর্দার দিক গাঁয়ে গাঁয়ে ঘাটে হাটে,/সহরে পাহাড়ে বাঁধুক না শত ঘাঁটি/ধূমকেতু যত তারার লালেই কাটে।' (ঐ)। এই বিশ্বাসে কি কোনপ্রকার খাদ আছে বলে মনে হয়? 'আকাশে বাতাসে দুষ্ট পুষ্কচর/তাই কি পক্ষীরাজের ডানাবে ওড়া?' এ প্রশ্ন প্রত্যয়ের সংশয়প্রকাশক তো নয়ই, বরং অধিকতর নিশ্চিতির বোধ এ-কবিতার

সবটাতে লিপ্ত। অথবা মিলটনের অনুসরণে লেখা 'স্বর্গ হইতে বিদায়' কবিতায় : 'শেষ হওয়া হল শুরু, এদিকে ওদিকে দুচারটি/গুঞ্জন, হাওয়ায় ওড়ে দেবতাদের/সে খবরে তিনকে বাবায় তান, ভুল বেগে যাবে/শহরের মোড়ে মোড়ে, উদভ্রান্ত দেবতা যত/গন্ধর্ব কিন্নর ভিড় ক'রে চেয়ে থাকে আশঙ্কায়/অসহায় শিশুর মতন, পরস্পর বিক্ষুব্ধ সন্দেহে'---এখানেও সন্দেহের অবকাশ থাকা উচিত নয়, কেননা, কবি এখানেও মানুষের জাগরণের দিকটিই চিহ্নিত করতে চেয়েছেন দেবতাবাদের বিরুদ্ধে: 'তেত্রিশ কোটির এত স্বর্গ, দেবতারা আসনে থেকে/অসহ্য সাহস।'---দেবতাবাদীরা প্রকারান্তরে বিরোধীশক্তিকে যোগ্য স্বীকৃতিই দিয়েছে। এ কাব্যের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবিতা 'সমুদ্র-স্বাধীন'। এ কাব্যের আন্তরিক বিশ্বাস এতেই প্রথিত---তালকমল-নীলকমলেরা কবির প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতায় ও কবিচেতোচিত স্বপ্নকল্পনার সঙ্গে মিশে গেছে, তেভাগার প্রেরণায় এরা সঞ্জীবিত ও উজ্জীবিত। তাঁর স্বপ্নের ভুবন রচিত হয়েছে জীবনের সঙ্গে কবিতাকে অথবা কবিতার সঙ্গে জীবনকে মিলিয়ে----'শতশত তালদীঘি, লাল নদী, দুপাশে সোনালি খেত,/হাজারে হাজারে দেখ জমির মালিক/কৃষাণ, কৃষাণবউ ভূস্বামিনী যারা/সুস্থ বাল্যে, সচ্ছল যৌবনে, বার্ধক্যপ্রসাদে আহা রূপসীরা/প্রত্যহের সুচির লীলায় কর্মে অবসরে/যে যার সংসার করে', ("সমুদ্র-স্বাধীন', ঐ)---বলাই বাহুল্য, এ স্বপ্ন ইউটোপিয়ান-দর্শনের কল্পস্তুতি নয়। এ স্বপ্নরচনার ভিত্তি যে অর্থনৈতিক-কাঠামো, তার বাস্তব উদাহরণ রাশিয়ার সমাজব্যবস্থায় লক্ষিত হয়েছে। বাংলাদেশে তেভাগার কৃষক-সংগ্রামকে অবলম্বন করে কেনই-বা তা প্রত্যক্ষতায় প্রতিভাসিত হবে না? কবির মনে ও মননে এই অনিবার্য আবেগই সে সময় ক্রিয়াশীল ছিল বলে তিনি এ কথা অসংশয়ে বলতে পারেন: 'এখানে ঠাকুরগাঁয়ে,/ওখানে বালুরঘাটে, কাকদ্বীপে, সুসং পাহাড়ে, সারা বাংলায়,/দেশ জুড়ে দুই তটে, মেতে মেতে খামারে খামারে, রৌদ্রে জলে/দীপ্ত বাহু, দৃপ্ত ঊরু, পূর্ণসাধ মানুষ মানুষ/সত্য যারা সবার উপরে।' লিখতে পারেন, 'তবু জাগর জীবন সত্য শুধু সবাই যে রাজা সেই রাজত্বেই/স্বপ্নরাগে, স্বপ্নে ও জীবনে, দুই তটে উর্মি' উর্মি'/নিয়ে চলো জীবনের নিয়ে চলি উত্তাল উর্মিল/প্রতিশ্রুত স্বপ্নবীজ অবিশ্রাম ভাঙনের সাগরসঙ্গমে/সফিল্ড ঘটনাস্রোতে, যুদ্ধ সমুদ্রের, সংগঠন, স্বাধীন সমাজে/স্বাধীন মানুষ স্বচ্ছ জীবনের, জীবনের উন্মুক্ত গঠনে/সমুদ্র স্বাধীন।' (ঐ)। ঠাকুরগাঁয়ের দম্পতির প্রেমকে ত[illegible] মনে হয়েছে দৈবী, কেননা, তিনি তাতে দেখতে পেয়েছেন---'আমি যে শুনেছি সেই ঠাকুরগাঁয়ের ছোট কুটিরপ্রাঙ্গণে/দম্পতির মৃত্যুহীন দৈবী প্রেমে তীব্র আলোচনা/যে প্রেমে প্রাণ সে ইন্দ্র ইন্দ্রাণীরা জীবন-মৃত্যুর ব্যবধান /ঘুচে দেয় জীবনের ঢেউ' আর তাঁকে প্রাণসীর চোখে চোখ রেখে দেখতে পান 'উন্মুক্ত মৈত্রীর ভাষা' ---কবি এর থেকে সংগ্রহ করে নেন তাঁর স্বপ্নরচনার গোপন প্রেরণা: 'তাদের আমার শুধু আমার আশায়'। অথবা 'আমার ভাবনা বাঁচে জীবমৃত্যুকে দুইতটে বঙ্গীয়ান'। ('চৈতে-বৈশাখে', সন্দ্বীপের চর)। এই প্রেরণাতেই

কবি বলতে পারেন, 'বঙ্গোপসাগরে/মৃত্যুহীন সন্দ্বীপের চরে আরবসাগরে চলো মামল্লপুরমে/কোনার্ক করে/কিংবা চিল্কা সরোবরে কোকনদে রামেশ্বরে/ত্রিবাঙ্কুরে হস্তীগুম্ফা কাছে কিংবা বঙ্গোপসাগরে/জাভায় বালিতে মার্তাবানে ওদেসায় অস্ত্রাখানে /বাটুম বা বারনাসে পাহাড়ে বা কারাকোরমে কেউ/একই একই সব বাংলার ভারতের গাঁয়ে গাঁয়ে শহরে শহরে/চল্লিশকোটির প্রাণে মোড়ে/(দশকশ চল্লিশকোটির নরকবর্জনে) জীবনের নীড়ে/সংহত মিছিলে/ব্রহ্মপুত্র হিমাচল সমতল সমুদ্রের গঙ্গার পদ্মার সিন্ধুর এলাকার/স্বাধীন স্বাধীন চলে জীবনের ঢেউ।' (ঐ)। লালকমল-নীলকমল কবির বলিষ্ঠ প্রত্যয়ের প্রতীকরূপে আবার আবির্ভূত হয়: 'সে পৃথিবী যারা নীল পাহাড়কে/বিদ্যুৎ বাজে পুড়ে খাক হলে/সে লালকমল সে নীলকমল/পোড়া চোখ সবুজ/...দুইহাতে তাকে সুগত সুগত/গড়ে মাটি দিয়ে গাঁয়ে গাঁয়ে সত/উর্বর অঙ্কুর/...মিলিত হাতের মে-দিনের মেঘ/ভাঙিয়া আকাশ নুন উজবেগ/সে লালকমল সে নীলকমল/সারার কপাল মেঘ'---('মে-দিন', ঐ) ---'প্রাণসন্ধানে' লালকমল-নীলকমল বাপসাম জিতবার প্রতিজ্ঞায় এখন অটল দৃঢ়, এই বিশ্বাসে কোন দ্বিধা নেই, সংশয় নেই। ১৫ই আগস্ট' কবিতায় দেখি বড়কের দেশে স্বাধীনতার সূচনা, জর্জরিত জনতার মিছিল, আর 'আশ্বিনের পুজা মেলে ঈশ্বরবাবুকে', আর 'আকাশে আকাশে বঞ্চনা/কলকাতার ঠকবাজ/খুলে দেয় রাত্রি শেষে সকালের প্রখর আগুন'---'স্বাধীনতার সজল আকাশ' ততঃপর বিষিত হতে থাকে। 'জানো না কি আমরা আসলে তোমারও রাজা/আমরাই সাতভাই।' ('পারুলের ছড়া', ঐ)। সুতরাং এখানে সিদ্ধ আর সিদ্ধ বলেই এখন দৃঢ় আবেগ, 'এ আবেগ বন্যার আবেগে বন্যার সমান।' ('১৫ই আগস্ট', ঐ)।

'অন্বিষ্ট' কাব্যরচনার কাল ১৯৪৬-৪৭-৪৯ অবধি আর প্রকাশকাল ১৯৫০খ্রীষ্টাব্দ। এ পর্ব, আগেই বলেছি, আলাদা ও অনন্য, এবং বিতর্কিতও। প্রগতি সাহিত্য আন্দোলন নিয়ে প্রগতি সাহিত্যিকদের মধ্যে যে দ্বিধা-সংশয়-বিরোধ—বাদ-বিসংবাদ গোষ্ঠী-কোন্দলের আকারে উদ্ভিত হয়েছিল, তারই কথঞ্চিৎ প্রতিক্রিয়া এ কাব্যের অন্তরঙ্গ লক্ষণ হিসেবে চিহ্নিত হতে পারে। ১৯৪৭খ্রীষ্টাব্দে রুশার গারোদি-থিয়োর এবং নবাব দুই আর্যাণী-র কর্মাশীদেশের কমিউনিস্ট পার্টির সাংস্কৃতিক-বিতর্ককে টেনে আনা হয়েছিল বাংলাদেশেও। ভারতের এই পার্টির কালচারাল সেল এটির দেখাশোনা ও পরিচালনার ব্যাপারে বড়োই যত্ন জোগাতো। রাজ্যকমিটির সম্পাদক মাঝে মাঝে নানাবিষয়ে হস্তক্ষেপ করতে হয়েছে এই সংগঠনের ক্ষেত্রে। যাই হোক, বিষ্ণু দে সম্পর্কে সংগঠনে একটা স্পষ্ট বিরূপতা ছিলই। মাঝেই মাঝেই তা প্রকাশ পেয়েছে, লেখায় অথবা মৌখিক বিতর্কে। ১৯৪৮খ্রীষ্টাব্দে রাজনৈতিক কীর্তিকলাপ(বিশেষ করে রণদিভের কলকাতা কংগ্রেসের নেতৃত্ব দখলের পর)উগ্র আকারে প্রকাশ পায়। নন্দনশিল্পের অঙ্গনেও তা আন্তঃসংগ্রামের নামে ব্যবহৃত হতে থাকে। 'অন্বিষ্ট' তজ্জাত প্রতিক্রিয়া। এ পর্বে যে 'নৈশব্দ্যমূলক আচারতা এবং রাজনৈতিক রণধ্বনির যান্ত্রিক অনুকরণ' প্রগতি সাহিত্য আন্দোলনে 'সমাজি

ও অসুস্থতা' সৃষ্টি করেছিল সে-কথা স্বীকার করে নিয়ে ভবানী সেন বলেন, 'কিন্তু কোনো যুগের কোনো সৃষ্টিশীল ইতিহাসই এই আদিম স্তর অতিক্রম না করে কখনও পরিণত বয়সে পৌঁছয় নি'[৫৫]---এই মন্তব্য যুগ-প্রেক্ষিতের বিচারে একেবারে অসমীচীনও নয়।

বিষ্ণু দে-র জটিল কলাবিন্যাস, বিশেষ করে 'উর্বশী ও আর্টেমিস' ও 'চোরাবালি'তে যে স্বাক্ষর রেখেছিল, এবং পরবর্তী কাব্যগ্রন্থগুলিতে তার থেকে সরে আসার যে সমস্ত লক্ষণ প্রকাশ পেয়েছিল তাতেও বিষ্ণু দে-র সহযোগী সাথীদের আস্থা অর্জিত হয় নি। অভিযোগ মিথ্যা ছিল এমনও নয়। রবীন্দ্রনাথও তাঁর বিরুদ্ধে প্রথম অবস্থাতেই একটি অভিযোগ উত্থাপন করে বলেন, 'বিষ্ণু দের কবিত্বশক্তি আছে কিন্তু তাকে মুদ্রাদোষে পেয়েছে সেটা দুর্বলতা। বিদেশী পৌরাণিক বা ভৌগোলিক উপমা কোনো বিশেষ কবিতার অনিবার্য প্রাসঙ্গিকতায় আসতেও পারে কিন্তু এগুলি প্রায়ই যদি তার রচনায় পরিকীর্ণ হয়ে আচমকা হোঁচট লাগাতে থাকে তবে বলতেই হবে এটা অবরদস্তি।'[৫৬] খ্যাতিমান অন্যতম সমালোচকেরাও প্রায় অনুরূপ ভঙ্গিতে এ কথা জানিয়ে দিতে কুণ্ঠা বোধ করেন নি---'আপনার কোনো-কোনো কবিতা আমি ভালো বুঝতে পারি না'[৫৭], অথবা 'অন্তত আমার মন, সম্পূর্ণরূপে সাড়া দিতে অক্ষম'[৫৮]---মানতেই হবে এ এইসব সমালোচনা অথবা এইসব দ্বিধাহীন তাৎপর্যময় মন্তব্যগুলি সরাসরি 'সাম্যবাদী শিবির' থেকে উঠে আসে নি, যদিও অরুণ সেনের অভিযোগ যে বিষ্ণু দে-কে 'সাম্যবাদের শত্রু হিসেবেই'[৫৯] দিনের পর দিন চিহ্নিত করা হয়েছিল। বিষ্ণু দে-র কবিতাগুলি যথা---'ক্রেসিডা', 'ওফেলিয়া', 'ঘোড়সওয়ার', 'অগস্ত্য' প্রভৃতি প্রসঙ্গেই এইসব অভিযোগ এবং তা উত্থিত হয়েছিল ১৯৩৩খ্রীষ্টাব্দের পর(প্রথম কাব্য 'উর্বশী ও আর্টেমিস', প্রকাশকাল ১৯৩৩খ্রীষ্টাব্দ) থেকেই। অরুণ সেন আরও উল্লেখ করেছেন যে ১৯৪৮খ্রীষ্টাব্দ, অক্টোবর, ১ম মার্কসবাদী সংকলনে প্রকাশিত বীরেন পাল-এর প্রবন্ধ 'বাংলা সাহিত্যের কয়েকটি ধারা' থেকে[৬০] বিষ্ণু দে-র ওপর আক্রমণের শুরু। আমাদের মতে, এ তথ্যও ঠিক নয়। সম্ভবত বিষ্ণু দে-কে আক্রমণের শুরু প্রবন্ধ দিয়ে নয়, কবিতা দিয়ে। আপাতত তথ্যটি যাচাইয়ের সুযোগ নেই, তবু তা উদ্ধার করবার আগে একটি প্রবন্ধের দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করা যেতে পারে: সুশীল বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'শিল্প ও শিল্পীর দায়িত্ব' প্রবন্ধটি 'অরণি'তে প্রকাশিত হয়েছিল ১৯৪০খ্রীষ্টাব্দের ডিসেম্বর সংখ্যায় যাতে স্পষ্টত বলা হয়েছিল সাহিত্যের জনসান্নিধ্যের কথা, বলা হয়েছিল 'শিল্প ও সাহিত্য-সৃষ্টির সময় জটিল ভাষা ও উৎকট কল্পনা ও প্রকাশভঙ্গি বাদ দিয়ে আজ থেকেই আমাদের সহজ হতে হবে, সরল হতে হবে'[৬১] ১৯৪২খ্রীষ্টাব্দের মে সংখ্যার 'অরণি'তেও অনুরূপ সংশয় প্রকাশ করে শ্রী অনামী (সম্ভবত প্রগতি লেখক সংঘের দিল্লী সম্মেলনের প্রসঙ্গ মনে রেখে) তাঁর কলমে লেখেন, 'তাঁদের লেখা সাধারণের কানে ঢুকলেও মনে গিয়ে পৌঁছবে তো?'[৬২] এরকম বক্তব্যের পাশাপাশি বিষ্ণু দে-র কথা মনে রেখে বীরেন্দ্রনাথ

চট্টোপাধ্যায়ের 'অরণি'তে প্রকাশিত কয়েকটি কবিতার অংশবিশেষ উদ্ধার করি:

'হালকা হাওয়ায় বল্লম উঁচু ধরো।
সাতসমুদ্র চৌদ্দ নদীর পার---
হালকা হাওয়ায় হৃদয় দু'হাতে ভরো,
হঠকারিতায় ভেঙে দাও ভীরু দ্বার।

'ঘোড়সওয়ার'---বিষ্ণু দে

খানিকটা বিদ্রূপ মিশিয়ে বীরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় লিখছেন---

'পৃথিবী তোমার চরণ চেয়েছে, হে দুর্বাসা।
হে ঘোড়সওয়ার। আবার চলো---
কত দেশ কত কাল নিশানের আবিরে গলা,
সেখানে তোমার কাহিনী বলো।

... ...

হে ঘোড়সওয়ার। চকিতে ঘোড়ার লাগাম ধরো,
ভেঙে দাও ভীরু পথের ভয়।
মরা পৃথিবীর মাটির কবর রক্তে ভরো,
সে মাটি কখনো বন্ধ্যা নয়।' [৬৩]

'রূপকথা'---বীরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়

'অমর প্রাণের অবজ্ঞা হেনে আমাদের অট্টহাস্য,
ভাঙা বুদ্ধি জানি অকর্মণ্য, অসহায় হাতিয়ার,
তবু জানি এই দধীচির হাড়ে এই ভাঙা হাতিয়ারে
ইতিহাসে আজ পাতা কেটে দেব, নিজস্ব প্রাণের ভাষ্য।।'

'প্রতিরোধ', টিখোনভের ১৯২২ নামক কবিতা---বিষ্ণু দে

'তুমি তো বলছো দধীচির হাড়ে এবার দধীচি মুক্তি পাবে---
ইজিচেয়ারের হাতল কি তবে হবে মোর হাতিয়ার ?...
ইন্দ্রপ্রস্থে সূর্য্য তো কই এখনো যায় নি অস্তপাটে। --
তবে কি তোমায় একথা বলার কে দিয়েছে অধিকার।' [৬৪]

'শিখণ্ডীর প্রার্থনা'---বীরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়

প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যেতে পারে যে, 'চোরাবালি'র একটি কবিতার নাম 'শিখণ্ডীর গান'। তারও কিছু ছাপ এতে পরোক্ষত থাকতে পারে। বিষ্ণু দে-র অপর একটি কবিতা---

'পদধ্বনি ?
কার পদধ্বনি
শোনা যায় ?
মদির হাওয়ায় রজনীগন্ধার মতো
কেঁপে ওঠে রোমাঞ্চিত রাত্রির ধমনী।
ও কে আসে নীল জ্যোৎস্নাতে
অমৃতপাথার হাতে ও কে আসে আমার দুয়ারে,
বার্দ্ধক্যবাসরে ?'

'পদধ্বনি'---বিষ্ণু দে

'পদধ্বনি, কার পদধ্বনি ?
তুমি
অন্ধকারে রুদ্ধ হতাশার
তার
পায়ে পায়ে দিগন্তে মিলায়।

...   .

পদধ্বনি, কার পদধ্বনি ?
অকস্মাৎ মধ্যরাতে ব্যর্থ করে রাত্রির যৌবন,
জীর্ণ ঘর, ছিন্ন দেহ, একদা নিঃশঙ্ক ক্রীতদাস
বারোমাস
সূচীভেদ্য অন্ধকারে তাকে ঘুম। কান পেতে তুমি
কোথা হ'তে অকস্মাৎ অতিক্রান্ত রাতে পদধ্বনি।'[৬৪]

'পদধ্বনি'---বীরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়

১৯৪২-৪৩ খ্রীষ্টাব্দে বিষ্ণু দে সম্পর্কে প্রগতিশীল সমালোচকদের ধারণা কী ছিল? বীরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়ে যে তির্যক মনোভঙ্গিটিকে বিষ্ণু দে-র কবিতার উপকরণ হিসেবে কাজে লাগিয়েছেন, তার প্রকাশ সমালোচনার ক্ষেত্রেও অবর্তমান ছিল না। এ প্রসঙ্গে জনৈক সত্যেন্দ্রনাথ রায়ের প্রবন্ধ 'বাংলা কাব্যে প্রগতি'তে লেখা হয়েছে---বিষ্ণু দে যে ঐতিহ্য-পঠনের প্রতি জোর দিয়েছেন, 'সে ঐতিহ্য বৈদগ্ধ্যের পৃষ্ঠপোষকী, ফিউডাল আদর্শ-পুরুষদের উচ্চ-শিখরে সমারূঢ়। বিশুদ্ধবুদ্ধিজাত একটা আদর্শ অতিজাত অতীতে আবাহন শুধু ব্যর্থ নয়, কাব্যের প্রকৃত প্রগতির অন্তরায়ও বটে। তাছাড়া ব্যক্তি-অভিমান-জড়িত আভিজাত্যে তা সার্বজনীনতার পথ নয়, প্রতিক্রিয়ার পথ।'[৬৬] এ সমালোচনা ১৯৪৩ খ্রীষ্টাব্দের। বীরেন্দ্রনাথ প্রমুখেরা যে এই মতাবলম্বী, এতে কোন সন্দেহ নেই, তিনি স্বয়ং ঘোষণা করেছিলেন, সিম্বলিজম প্রগতির বিরোধী, এর জবাবে ১৯৪৬ খ্রীষ্টাব্দে লেখা 'কাব্যের প্রসঙ্গে' প্রবন্ধে অরুণ মিত্র উল্লেখ করেন, 'বীরেন্দ্রবাবু সিম্বলিজমকে প্রগতি-বিরোধী বলেছেন। এ কথা আমি মানি না। সিম্বলিজম্‌ শুধু আর্টের একটা রীতি'[৬৭] ইত্যাদি। অর্থাৎ বিষ্ণু দে প্রমুখের কাব্যরীতি নিয়ে প্রগতি সাহিত্যিক মহলে একটা বরাবরকার বিরোধী মতবাদগত লড়াই ছিলই, এবং তা প্রবল বিস্ফোরণের আকারে ফেটে পড়ে ১৯৪৮ খ্রীষ্টাব্দের ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির সমস্ত সংগ্রামের দিনগুলিতে। সাহিত্য তথা সমগ্র শিল্প এই বৈপ্লবিক-অভ্যুত্থানপর্বের আবহাওয়ায় বহুচর্চিত ও বিশ্লেষিত হওয়ার যে অবকাশ পায়, তাকে কোনক্রমে সুখপ্রদ বলা চলে না। বিষ্ণু দে-র আঘাত-অভিমান এ পর্বে তাই অব্যাহত থাকে 'সাহিত্য-পত্র'কে অবলম্বন করে সরাসরি কমিউনিস্ট পার্টির বিরোধিতায়।

প্রশ্ন ওঠে, একজন বিপ্লবী লেখককে কি দলীয় লেখক হতেই হবে? র‍্যালফ ফক্স যেভাবে প্রশ্ন তোলেন, তাতে

উত্তর অবশ্য একটাই---দলীয় সমস্যা হওয়াটা প্রধান। লেনিনের বক্তব্যও অনুরূপ। প্রসঙ্গত তাঁর একটি বিখ্যাত প্রবন্ধ 'পার্টি সংগঠন ও পার্টিসাহিত্য' সম্পর্কে একটি সংবাদ প্রকাশ পেয়েছে। ১৯৯০ খ্রীষ্টাব্দে একটি পত্রিকায় (Drushba Narodov), চতুর্থ সংখ্যায় লেনিনজায়ার একটি চিঠি প্রকাশিত হয়। লেনিনের এই প্রবন্ধের নব্য তত্ত্বটা উপন্যাস-কবিতা ইত্যাদি সাহিত্যসম্পর্কিত নয়, তার বদলে পার্টির প্রচার ও প্রকাশনা সংক্রান্ত রচনা সম্পর্কে।[৬৮] এই দৃষ্টিভঙ্গির পাশাপাশি আরও একটি প্রশ্ন ওঠার সম্ভাবনা, বিশেষ করে যে দৃষ্টিভঙ্গি বুদ্ধিজীবী সংগ্রামী শ্রেণীর দৃষ্টিভঙ্গির বিরোধী নয়, যে চৈতন্যশক্তি ও বোধের ব্যাপকতার সূত্রে হয়ে ওঠে এক অখণ্ড সার্বিকতার সহায়ক, মানবসত্তায় অন্তর সংহতিতে পূর্ণ হয়ে ওঠে যে সমস্ত লক্ষণ, তা কখনও মানবচিন্তা ও মানবসংস্কৃতির তথা মানব-বিকাশের বিরোধী হয়ে উঠতে পারে কি না---অমীমাংসিত নয় এই প্রশ্নও। মার্কস ও লেনিনের তাত্ত্বিক ও বিপ্লবী প্রতিভা গণজীবনের নতুন মাত্রাযুক্ত বৈশিষ্ট্যগুলিকে তুলে ধরেছে। শিল্পগত বৈচিত্র্যের সঙ্গে মিলিয়েই, বিচ্ছিন্ন বা চ্যুত করে নয়, বক্তব্যের এমন সারবত্তা গ্রহণ করেই সোভিয়েত সমালোচক কনস্তান্তিন ফেদিন যখন মন্তব্য করেন 'সব বস্তুতাই ইতিবাচক এবং নেতিবাচক বৈশিষ্ট্যের যোগফল'[৬৯] অথবা আই. এস. কারিতোভ মার্কসবাদী-লেনিনবাদী তাত্ত্বিকপ্রজ্ঞায় মানব-শিল্পের আবহমান ধারাকে সূত্রবদ্ধ করে সিদ্ধান্ত টানেন এইভাবে: 'The way towards achieving all-round manifestation of man's essential powers, and a new enrichment of the human being, is also connected in Marxism with the aesthetic abilities of the individual and their development. Marx argued that the objects of the external world — for example, plants, animals, stones, light – are perceived by the human consciousness 'partly as objects of art; i.e., human perception always contains an aesthetic element. Seeing human activity as universal activity, Marx noted that 'man knows how to produce in accordance with the standard of every species, and knows how to apply everywhere the inherent standard to the object. Man therefore also forms objects in accordance with the laws of beauty.' ... He (Marx) defined creativity as 'the absolute development of man's creative abilities, the only precondition being the preceding historical development, which makes this total development, i.e., the development of all human forces as such, not measured against some pre-established yardstick, an aim in itself.'[৭০]

পর এলুয়ারও শেষ পর্যন্ত এই সিদ্ধান্তে পৌঁছেছেন, প্রত্যেক মানুষ প্রমেথিউসের সোদর, 'কবির পরম স্বাধীনতার বিরুদ্ধে ব্যবহারিক যুক্তির নামে' যে 'সদাঘোষিত নিষেধ বিধি' তা 'মানব-ঐক্য'কে করে তোলে বিপন্ন।[৭৬] তাঁর মতে, তুচ্ছ-অসম্পূর্ণ বা নতুন যাই হোক না কেন, জীবন এবং পৃথিবীর, দুঃখ এবং প্রেমের, প্রেম এবং প্রয়োজনের পারস্পরিক সম্পর্কের আশ্লেষবন্ধনেই রচিত হতে পারে ঐক্যানির্ভর কবিতা। এলুয়ারের 'পরম স্বাধীনতার' দাবির সঙ্গে সঙ্গে চীনা-সাহিত্যিক লু সুনের মন্তব্যও আমরা পেয়ে যাই তাৎপর্যপূর্ণ সতর্কীকরণের সচেতন সুপরামর্শও যা তাঁকে একথা বলতে বাধ্য করায়: ...'বিপ্লবী সাহিত্যিকগণ সাহিত্য ও বিপ্লবের মধ্যে এক অচ্ছেদ্য সম্পর্কের কথা চেঁচিয়ে বলে পরম তৃপ্তি পান' কিন্তু সাহিত্য তো বিপ্লবের সহায়ক ও পরিপূরক আবহ তৈরি করে মাত্র, তার মানে 'উত্তেজনা সৃষ্টি করে, প্রচারের মধ্য দিয়ে উচ্চকণ্ঠে আকাশ বাতাস কাঁপিয়ে বিপ্লবের কাজকে' এগিয়ে নিয়ে যাওয়া এক অসম্ভব ব্যাপার, তিনি বলেন, 'এ ধরনের সাহিত্যের কোন শক্তি নেই', বলেন, 'মহৎ সৃষ্টি কারও আদেশের অপেক্ষা রাখে না।'[৭২] খুব স্বাভাবিকভাবে অন্তরের অন্তরতম স্থান থেকে অনুভূতিপুঞ্জ বেরিয়ে আসে তার বিশুদ্ধ সত্তায় আর তা রূপান্তরিত হয় লেখায়। তাছাড়া বিপ্লবের কালে তো সাহিত্যের জগতেও থাকে ঘন ঘন রঙ বদলের বিশেষ সম্ভাবনা। বিষ্ণু দে কি এমন কোন সিদ্ধান্তে এসে পৌঁছেছিলেন ১৯৩৮ খ্রীষ্টাব্দের উত্তপ্ত দিনগুলিতে? 'আধুনিক কাব্য'-এর আলোচনায় (পরিচয়, ১৩৪০ বঙ্গাব্দ) তিনি প্রশ্ন তুলেছিলেন, ...'কম্যুনিজমের জয়গান যখন মানবজীবনের বেড়ার বাইরে একঘেয়ে সুরে চলে, তখন সে কাব্যে কবির বিকাশের সম্ভাবনাই বা কোথায় আর বস্তুনিষ্ঠ জীবনানুগত্যই বা কৈ?' ডে লুইস, স্পেন্ডার প্রমুখ বামপন্থী কবি কিশোরদের সমালোচনায় জাক মারিতাঁর ভাষা উদ্ধার করে তাঁদের দুর্দশা বর্ণনা করেন 'And for this reason human production is in its normal state an artisan's production and therefore necessitates a strict individual appropriation. For the artist as such can share nothing in common ; in the line of moral aspirations, there must be a communal use of goods, whereas in the line of production the same goods must be objects of particular ownership. Between the two horns of this antinomy St. Thomas places the social problem.

The instruments of labour, — land, agricultural implements the workshops, the tool — were the instruments of labour of single

individuals, adapted for the use of one worker and therefore of necessity, small, dwarfish, circumscribed. But for this very reason they belonged as a rule, to the producer.'[৭৩]

বিষ্ণু দে একপ্রকার শিল্পতত্ত্বে স্থিত থেকেছেন ১৯৪৮ খ্রীষ্টাব্দেও এবং সমানে বিতর্কে অংশ নিয়েছেন। সাহিত্য-সংস্কৃতির ইতিহাসে বিতর্কের এই দিকটি নন্দনতত্ত্বসম্পর্কে যে ধারণা দিয়েছে তা পাঠকবর্গের কাছে সর্বাংশে গৃহীত হয়েছে এমন নয়, তবে বিতর্কটি আরও একটা গুরুত্ব পেয়েছে।

'অন্বিষ্ট' এই কারণেই বিশেষ অভিনিবেশ দাবি করে আমাদের কাছে। কেননা, এখানে তাঁর সন্ধানকে সর্বতোমুখ তাৎপর্যের ঘোষণায় আবদ্ধ থাকতে হয়েছে। 'অন্বিষ্টে'র মধ্যে কবি-সমালোচক মণীন্দ্র রায় তাই বোধকরি দেখতে পান দ্বিধাগ্রস্ততা, সংশয়াচ্ছন্নতা ও প্রচ্ছন্নতা।[৭৪] বহির্জাগতিক কার্যকারণপরম্পরাই এজন্যে দায়ী। বিষ্ণু দে প্রথম থেকেই তাঁর কণ্ঠস্বরকে উচ্চগ্রামে বাঁধেন নি, '২২শে জুন' বা 'সন্দ্বীপের চরে' যদিও উঁচু পর্দার খানিকটা আওয়াজ পাওয়া যায়, তথাপি তাঁর মৌল বৈশিষ্ট্য স্থিতধীসুলভ ধীরতায়, 'অন্বিষ্টে' শোনা গেল সেই পুরোনো বৈশিষ্ট্যই। হয়ত-বা আরও কিছুটা মননীয়তা এবং এর সঙ্গে সম্পর্কিত আবেগের সংযমে। স্বগতোক্তির ধরনটা এতে কিছু অধিক প্রকট। এই ভঙ্গিতেই তাঁর বিষাদ ফুটে উঠেছে, আগে যা আমরা দেখি নি। অবশ্য মানতেই হবে যে বিষাদের সঙ্গে হতাশারও যোগ আছে, না থাকে, বিষ্ণু দে-র হতাশা কিন্তু রূপ নিয়েছে প্রত্যয়ে, একেবারে ভেঙে পড়ায় নয়। এই লক্ষণগুলি সেই যুগের নানান টানাপোড়েনের অভিঘাতকে খানিকটা চিনিয়ে দেয়। যেমন:

১) 'এক মেয়ে দিন
স্নায়ুর জ্বালায় তবু নেতির আস্তিক আবির্ভাবে
দিনের প্রতীক্ষা তবু কি এ অবসাদ
মধুরের সম্ভাবনা প্রত্যক্ষ মধুর তবু কি বিস্বাদ'

('অন্বিষ্ট', অন্বিষ্ট)

২) 'আমার প্রাণে মুখর করতাল
তোমার ভাষা রচনা করি ধনী। ...
বিজ্ঞ বলে বলুক্, না মানাল।'

(ঐ)

৩) 'কিবা লাভ কুৎসা হেনে আত্মম্ভরী মস্তকতাবোর
তত্ত্বকথা কিংবা মুগ্ধ তাৎপর্যের বর্জননীতিতে
অভিযান লক্ষ্যহীন, এ অন্ধতা সত্তারই হাস্যের
খোরাক। আকাশ ছোঁটে নীড় চাও শুধুই মাটিতে।'

ঐ)

৪) ... ভিন্ন আজ দুঃখের সংবাদ
আর বুঝি আশ্চর্যের পোঁছে নামে কালের গরুড়

ছন্দের বিপ্লবী পর্বে।'

(ঐ)

৫) 'যদি এ হঠাৎ গ্রীষ্ম বিপ্লবীর উৎস ধারাজলে
ও দিক বদল ?'

(ঐ)

৬) ... 'বিপ্লবীর চিত্ত
দুরন্ত ঘূর্ণিতে ছিন্ন, বেপথুমান, হানে শত চিত্ত
তরল প্রগতি তার,'

('বিহঙ্গ সামুদ্রিক', ঐ)

৭) 'বহুরূপী তারা, তারা জানে শুধু রংবেরঙিনীর খেলা।'

('রামধনু', ঐ)

'অন্বিষ্ট' অতঃপর হয়ে উঠতে চেয়েছে উত্তরণের কাব্য। তিনি এপর্বে এক বিস্ময়কর প্রজ্ঞায় সেই ভারসাম্য বজায়ও রেখেছেন। মানসিকতার এই সাধর্ম্যে যেন এলুয়ারও বোধকরি কবির কাছাকাছি এসে পড়েছেন: 'তিনি (এলুয়ার) ধরতে চাইতেন সেই কেন্দ্রবিন্দু যেখানে রক্তমাংস আর স্বপ্নভুবন, বাস্তব আর আদর্শে পরস্পর-বিরোধী অর্থ নেই। কিন্তু এই বসন্তের প্রয়াসে হতাশা আসে এক-এক সময়, সামগ্রিক যন্ত্রণায় মুক্তির মানসীকে উদ্দেশ করে বলতে হয়:

'আমার যৌবনকালের মতো এখনও কেন
আমাকে তোমার মিথ্যা বলে ঘোষণা করতে পারি না,
এখনও কেন তোমার সঙ্গে একমত হয়ে বলতে
পারি না তুমি যা কাটে তার মধ্যে রয়েছে
সম্পূর্ণ মিল। বিপ্লবে আর নিস্তব্ধতা, দিগন্ত
আর দূরবিস্তার।'[৭৫]

এলুয়ার তাঁর চেতনাকে জাগ্রত রেখেই জগতের খণ্ড খণ্ড চেতনাকে বৈচিত্র্য ও বিরোধিতায় আত্মস্থ করেন যখন, তখনও তা বাস্তববিরোধী হয়ে ওঠে না, ভারসাম্যের সন্ধানে তাঁর নিরন্তর যাত্রা প্রসারিত সমাজ-চেতনার বিরোধী হয়ে ওঠে না বিপ্লবের পটভূমিতেও, মানুষের জীবনের দৈব-মানস-প্রকৃতি আর শিল্পের প্রশ্নে তাঁর সমন্বয়-সংগতি প্রকাশ পায় সুচিন্তনায়---

'Fear and the courage to live and to die
Death so difficult and so easy'[৭৬]

('The Victory of Guernica,' Paul Eluard)

বস্তুর ভেতরকার দ্বৈততার দ্বান্দ্বিক-প্রক্রিয়া তো একদেহেরই প্রকাশক। জীবনে আলোর প্রয়োজন কি অন্ধকার ছাড়াই ? এলুয়ার আলো-ছায়ায়, নিদ্রা-জাগরণে, জীবন-মৃত্যুতে মিলিয়ে মিশিয়ে নিতে চেয়েছেন, দ্বৈতের

ভেতর একের পৌঁছে। অথবা 'দু'জন থেকে এলুয়ার বহুতে পৌঁছেছেন এবং সেই বহুর সঙ্গে নিজেদের অভিন্ন দু-জনকে মিলিয়েছেন'[৭৭]---এই ব্যাপকতা পরিবর্তন নয়, অরুণ মিত্র একে বলেছেন 'সম্প্রসারণ'। এলুয়ারের এই সম্প্রসারণধর্মিতা অনুরূপভাবে বিষ্ণু দে-র মধ্যেও সঞ্চারিত হয়েছে বিপরীত গুণসম্পন্ন বস্তুর ভেতরকার নিহিত দ্বান্দ্বিক প্রক্রিয়ায়---সূর্যাস্ত-সূর্যোদয়, গতি-স্থিতি, আলোক-আঁধার, শ্রাবণ-আশ্বিন, দিনরাত্রি, জন্ম-মৃত্যুদিন, আশা-নৈরাশ, আগুন-তুষার, নীরস-সরস, সুয়োরাণী-দুয়োরাণী, নশ্বর-অমর, পুত্র-পিতা, গহন-সঘন চিন্তা, আকাশ-মাটি, প্রসাদ-অবসাদ, শরীর-মন, চেতন-অবচেতন, কাঁদা-হাসা, মুক্ত-কারা-বন্ধ, শ্রমিক-ধনিক, দ্বৈতাদ্বৈত, যোগ-বিয়োগ, অভিধা-ব্যঞ্জনা, সুর-অসুর, প্রত্যক্ষ-অগোচর, পূর্ব-পশ্চিম, মৃত্যু-অকালবৃষ্টি, ঘৃণা-প্রেম প্রভৃতি পরস্পর বিরোধযুক্ত শব্দ ব্যবহারে মানবিক-বৈদূর্যের ধারাই অভিব্যক্ত হয়েছে এক অখণ্ডিত চেতনা প্রবাহের সূত্রে। তাই এই পর্বে বিষ্ণু দে-র অন্বেষণ হয়ে ওঠে জীবনের খণ্ড রূপ নয়, অতীত থেকে বর্তমান, বর্তমান থেকে ভবিষ্যৎ অবধি প্রসারিত এক বিশাল ভৌগোলিকতা, যার সঙ্গে সমাজ-সভ্যতা এবং জীবনের সংযোগ কেবল বৈষয়িকতায় নয়, উপস্থিতগত মানসিক-অনুভবের ব্যাপ্তিতেও। এই বৈদূর্য কিভাবে প্রকাশ পেতে পারে? 'এক কবির কাছে আরেক কবির রচনারীতি দাবি' করেই কি? বিষ্ণু দে-র উচ্চারণ এক্ষেত্রে খুব স্পষ্ট: 'কবিতা ব্যক্তির সত্তানিরপেক্ষ, মন্তব্য নয়' আর সেইসঙ্গে মার্কসের বহুখ্যাত উক্তির পুনরুদ্ধার করেন তিনি, শুধু মার্কস নয়, আরাগঁ-র প্রশংসায় লিখিত এলুয়ারের কবিতাও---'তাদের সীমার মধ্যে/এবং তাদের সীমার বাইরে/তাদের শক্তির মধ্যে/আর তাদের শক্তি ছাড়িয়ে/শক্তি কথাটা একচোখো কথা/মানুষের তো দুই চোখ সারা বিশ্বে খোলা।'[৭৮] শক্তি-অতিক্রমের পর্বেই বিষ্ণু দে মার্কসের প্রতিধ্বনি করে বলে ওঠেন: 'আমারও অন্বিষ্ট তাই', বলেন, 'আমি চাই সূর্যাস্তে ও সূর্যোদয়ে/প্রত্যহের ইন্দ্রধনু ভেঙে যাক স্তরে স্তরে/বাঁচার বিস্ময়ে অজ্ঞাত রঙের বর্ণ/সহাস জীবনে এনে দিক/সহজ আনন্দ দিক মানবিক দুঃখের করুণা।' ('অন্বিষ্ট', অন্বিষ্ট)। তাঁর অন্বিষ্ট তাই অপূর্ব সংগতি' যা জীবনের রঙে মানবিক আর বিস্ময়ে আনন্দে বিষাদে সপ্তমে মেলানো আকাশ ও অবকাশের সেতুবন্ধরূপ। রূপনারানের কূলে জেগেওঠাই তাঁর এবংবিধ জাগরণ। ব্যক্তিসত্তা সমাজেরই ইউনিট, এই ইউনিটের বিকশিত রূপ কি সমাজস্বরূপের বাধাবিশেষ? 'আমি একা একা ভাবি ছোট ছোট সুখে/বিস্তৃত হৃদয় মেলি তোমার হৃদয়ে/আমি চাই বিশ্বরূপ দেখার কৌতুকে/আপন হাতের মাঝে আপন সময়ে'---এখানে দ্বৈত-জীবন বিশ্বরূপের সন্ধানে তৎপর, কিন্তু এই দ্বৈততা কী? ব্যক্তিস্বরূপেরই দ্বৈততা, যা ভিন্ন ভিন্ন গুণসম্পন্ন, অর্থাৎ বিরোধী গুণসম্পন্ন, এই যে ব্যক্তিস্বরূপ, তারই সামষ্টিকস্বরূপ সমাজের সারাৎসারে। 'তুমি', 'তোমার' ইত্যাদি সর্বনামগুলি এখানে কেবল 'প্রেয়সী-জননী-সখী-সহচরী' নয়, বৈজ্ঞানিক বস্তুবীক্ষার আলোকে তা বস্তুস্বরূপের দ্যোতক

বা প্রতীকও বটে। 'ওরা' সর্বনামও ব্যবহৃত হয়েছে, কিন্তু রবীন্দ্র-ব্যবহার 'ওরা'('ওরা কাজ করে') ছিল দূরত্ববাচক, আত্মীয়সম্বন্ধ তাতে নির্ধারিত হয় নি। এ বিষয়ে 'ঐকতান' কবিতায় রবীন্দ্রনাথের নিজেরই স্বীকৃতি আছে। বিষ্ণু দে 'ওরা'কে নামিয়ে আনেন 'আমাদের' সমতলে। 'ওরাই কি নিত্যে দিন একঘেয়ে রাজপথে' আর তারপরেই পাওয়া যায় এই পংক্তিগুচ্ছ: 'আমাদের বসুন্ধরা সুরে সুছন্দ প্রচুর/ঘরে ঘরে ও'রে দেখে আকাশের বাতাসের পৃথিবীর সুর' ইত্যাদি---এভাবেই 'ওরা' 'আমাদের' হয়ে যায় বিষ্ণু দে-র কাছে নিবিড় আন্তরিকতায়। 'অন্বিষ্ট'র কবিতাগুলিতে ব্যক্তি-কবি, কবির দ্বৈতসত্তার আত্মপ্রকাশে 'প্রিয়া', আর 'জনগণ'--এর প্রকার ব্যক্তিসম্পর্কের উন্মোচন দেখতে পাওয়া যায়। এলুয়ার দু-জন থেকে পৌঁছোতে চেয়েছিলেন বহুতে, বিষ্ণু দে-র যাত্রা এক থেকে দ্বৈতে, তারপর বহুতে---এই বহু তো এক-এরই পরিপূরক শক্তি---এলুয়ার 'সংহতি' যাকে বলে। 'আজ শুধু রাখি তোমাকে দুবাহু ঘিরে/পায়ে পায়ে চলি হাওয়ার মতন ছেড়ে/মেঘের মতন তোমার গন্ধ মেখে'---এই তুমি কবির প্রিয়া বা কবির দ্বৈতসত্তা, যে সত্তা বহু অভিজ্ঞতা ও প্রজ্ঞায় বিধৃত---'ঘরে ও বাইরে তুমি জ্বেলে দাও আলো অনির্বাণ' অথবা 'দুর্মর প্রাণের বহ্নি জ্বেলে দাও তুমি/আমার এ অন্ধকারে উদ্যত প্রদীপে'---অর্থাৎ এই সত্তা সচেতন মনন-ক্রিয়ারই একটি দিক যে বারংবার উদ্ভাসিত আলোকিত করে, কখনও 'প্রতিযোগী জীবনের জীবিকার কুটিল বিন্যাসে', 'পাপ অনাচার দুষ্কৃতি দুঃখ অত্যাচার'-এ, 'নির্বিষ নির্বোধ চক্রশক্ত অজ্ঞানে', নরকযাত্রায়, 'ও দিক পড়ুন' বা 'নিঃস্ব মানসের হ্রদে', বা 'ইন্দ্রপ্রস্থে/তুঘলকাবাদের ধ্বংসে শাহজাহানাবাদের/নূতন দিল্লীর হৃদয়হীন বিরাট বহরে/মৃত্যুহীন মহেঞ্জোদারোর বণিকপুত্রের সেই মড়ক মৃত্যুতে'----অথবা 'আত্মঘাতী মত্ততায়' কোনভাবেই জীবনবিরোধী করে তোলে না, কেননা, এই 'তুমি' সেই সতর্ক প্রহরীর মত, হৃদয় এবং মননকে সদা জাগ্রত করে রাখে, আর বিশ্বময় আত্মঘাতী অন্যায়-মত্ততায় বিচলিত করে তোলে---(হৃদয়) আমাদের বিচলিত হয় আমাদেরই / আমাদের পৌরুষের গান/মানুষেরও, মানুষেরই/জীবনের আমাদের ব্যথার ব্যাপী যে/আমরা সবাই মিলে সকল মানুষ সারা মানুষেরই বিরাট জগত'। স্পষ্টত এখানে দু-জন পরিণত হয়েছেন বহুজনে। 'মানুষ দুটির নিশ্চিত সুরে সাধা/হৃদয় মানে না কোনো শাসনের বাধা/তাদের ঐক্যে নেই কোনো সংশয়/মুক্তি তাদের নিশ্চয় নিশ্চিত জয়'---এই জয়ের আকাঙ্ক্ষা ছিল দুটি অন্তরের অভিপ্রায় মাত্র, কিন্তু মানুষের বিরাট জগতে দুটি মানুষের মুক্তি কিভাবে সম্ভব? দুটি হৃদয়ের মুক্তির অর্থই হল বিশ্বেরও মুক্তি, বাস্তবকার্যে তো তা-ই। বিশ্বের সঙ্গে যোগে ব্যক্তিরও মুক্তি জড়িত, তাই কবিকে এ কথা বলতেই হয়, 'দেহমনে প্রেম ও প্রণয়ে মিতালিতে দ্বৈতের বন্ধনে বেঁধে দিই ধুয়া/আমরাই কবি/আমরা সোনাই করি গান করি আমরা পটুয়া,/প্রেমিক, দোসর, মানুষের ছবি, মিল, সাজার বিন্যাস, তালে তাল/মুক্তির সম্মুখপাতে অনিকেত স্বাধীন/সুকঠিনময়'...মুক্তি

তাই দুজনের নয়, মুক্তি বিশ্বময় জনতার, 'আমরা জনতা, জনসাধারণ, সাধারণ লোক/চাষী ও মজুর কবি শিল্পী স্রষ্টা'---'মাটির সন্তান সব অমৃত সন্তান',---মুক্তি তাই সর্বমানবের, রবীন্দ্রভাষ্যে 'বিশ্বমানবের', তাই এমন উচ্চারণ বিজ্ঞানবুদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে দৈনন্দিন অর্থেও বাঙ্ময় হয়ে ওঠে: 'শোনো বিশ্বে শোনো/কোটি কোটি মৃত্যুহীন তড়িৎ অণুর মতো বিরাট আকাশে/উদার আকাশে তাই প্রাণকম্পনটিতে গ্রহনক্ষত্রের ভিড়ে/আমরা স্বাধীন।' (১৩ই আগস্ট)। ব্যক্তির প্রেম কেবল ব্যক্তিকেন্দ্রিক হলে তা সংশয় সন্দেহের বাইরে যেতে পারে না। কিন্তু ব্যক্তির ঊর্ধ্বমুখ প্রেম যখন দেশ-কাল-সন্ততিকে ঘিরে এক বিশাল ব্যাপ্তি খোঁজে, অন্তরে অন্তরে যখন তা শতধারায় সমুচ্ছ্বসিত হয়ে ওঠে অথবা উঠতে চায় আর তা যদি আন্তরিকভাবে সচেতন কোন কবির ক্ষেত্রে ঘটে, তাহলে সেই কবিকর্মকে আমরা কি সংশয়ে আচ্ছন্নতায় মিশিয়ে দেখব? বৃহৎ প্রেমের তাৎপর্য তো কোন নির্দিষ্ট স্থান-কাল-সীমার মধ্যে নিজেকে আবদ্ধ করে না, বরং বিস্তৃত করে, ছড়িয়ে দেয়, 'রবি-কিরণে'র মত এই প্রেম, 'জ্যোতির্ময় মুক্তি দিয়ে' তাকে ঘিরে ধরে, অর্থাৎ এর একটি বৈশ্বিক আবেদন আছে। বিষ্ণু দে-র প্রেম প্রিয়া-দেশ-বিশ্বকে বাদ দিয়ে কখনও আত্মকেন্দ্রিকতায় নির্ভর করে নি, 'অন্বিষ্ট' কাব্যে তাঁর সানুরাগ সংসক্তির প্রকাশে এই প্রেম বৃহত্তর বৃত্তই বোধকরি সম্পূর্ণ করেছে। ব্যক্তিপ্রেম আর দেশপ্রেম হয়ে উঠেছে একাকার, সমার্থক, কিংবা পরিপূরক: 'তোমার দেশ আমার দেশ এই'---এই বোধে তাঁর উচ্চারণ: 'সোনার দেশ কোনো-ই ক্লেশ নেই/মরণপণ প্রেমের জয় হয়/রাতের বুকে ঊষার আশা বয়/সকাল আলো, কোনো-ই নেই ভয়/আমাদের যে অবাক দেশ এই।' (১৪ই অগস্টে, অন্বিষ্ট)। কিন্তু এ তো স্বপ্নের দেশ, জন্মভূমি, এ দেশ ভবিষ্যতের স্বপ্নের নির্মাণ---তার আলেখ্যর অতীত পটভূমি: 'আকালের ভিড়, মালার ভিড়, বজবজে স্বাধীনভারত হেডপার্ক ভিড়/আর প্রতিবাদী বাজের ভিড়, ছাঁটাইয়ের ভিড় ধর্মঘটের/ধর্মধ্বজের প্রতিবাদে ভিড়, দুঃখের ভিড়'----এই ভিড় থেকে অভিজ্ঞানের ব্যাখ্যাটা স্পষ্ট হয়, কেননা ভিড়াক্রান্ত নগরগ্রামব্যাপী যে দেশ, তৃষ্ণার্ত, প্রেম সেক্ষেত্রে কাজ করে অনুঘটকের, এই প্রেমই বিস্তৃত হয়ে উজ্জীবনের আর মুক্তির স্বপ্ন দেখতে শেখায় কবিকে। 'ঘর ও বাহির এক, তুমি তাই ঘরণী'---এই প্রেম ব্যক্তিগত, কিন্তু যখন বলা হয়, 'বাসা বাঁধো প্রিয়া বিশ্বব্যাপ্ত ব্যারাকে,/তোমার বাহুর পটভূমি গ্রীক ফাঁসিকাঠ,/নয়নে সবার ছায়া, স্বদেশের জনগণ,/আমি একজন সেই আসন্ন কবিদের'--('অবিচ্ছিন্ন কাব্য', স্মরণীয় কবিতাটি পল এলুয়ারের জন্য')---তখন তা আর ব্যক্তিগত নয়, অবিচ্ছিন্ন প্রবাহের মত তা বাহিত হয় বিশ্বমানব-চেতনায়। বলাই বাহুল্য, এই বৈশ্বিকতা যতটা আবেগনির্ভর, তার বেশি মননির্ভর। এলুয়ারের ব্যক্তিপ্রেম নিষ্ক্রান্ত হয়েছিল নারীর বাহুপ্রেম থেকে সমষ্টির বোধে---'যেহেতু আমরা পরস্পরকে ভালোবাসি/আমরা অন্যদের মুক্ত করতে চাই/তাদের ঠান্ডা-কঠিন নিঃসঙ্গতা থেকে'---এই চেতনার সঙ্গেই মিলে গেছে গণস্বার্থবোধের

দিকগুলি, যার অন্যতম দেশপ্রেম। বিষ্ণু দে-ও এর সহযাত্রী, দোসর। তাঁর প্রেম ব্যাপ্তিতে দেশ-কাল পেরোনো। 'তোমার স্রোতের বুঝি শেষ নেই, জোয়ার ভাঁটায়/এদেশে ওদেশে নিত্য ঊর্মি কল্লোলে/ পাড় গড়ে পাড় ভেঙে মিছিলে ভাঁটায়/ . . . আমি দূরে কখনও বা কাছে পাশে পাশে কখনও বা হালে/তোমার স্রোতের সহযাত্রী চলি তোলো তুমি পালে/তাই চলি সর্বদাই।' (জল দাও, অন্বিষ্ট)। প্রেম তো প্রবাহই, মুক্তধারা, 'সন্ধির সীমানা'য় 'তবু অফুরান তোরা সেই সাধনার সীমা'---অতএব তার চলা মোহানার দিকে, সে সমুদ্রগামী, বৃহত্তর দ্যোতক। অতঃপর: 'আমার প্রেম জ্বালো, আঁধার দেশ/আঁধার পৃথিবীতে জেলে কলে/আমাদের কারখানায় এ-অমাবস্যা/মিলাও দেয়ালিতে মিলাও শেষ।' (প্রতীক', অন্বিষ্ট)। প্রেমের ব্যাপ্তির এই অনুষঙ্গ পাবলো নেরুদার মধ্যেও পাওয়া যায়: . . . 'সর্বময়ী হে সাগরিকা, তুমি ছাড়া /আর কেউই আমার হৃদয়ে নোঙর ফেলে নি/ ...আমি তোমাকে আমার ভালবাসা জানাতে চাই, ভালপারাইসো,/ পরে আবার আমাদের দুজনেরই বন্ধন ঘুচলে/তোমার সন্নিধানে আমি ফিরে আসব থাকতে।/তুমি থাকবে তোমার হাওয়া আর ঢেউয়ের সিংহাসনে,/আমি আমার আর্দ্র, অন্তর্লীনের মাটিতে।/সমুদ্র আর হিমরেখার মাঝখানে/আমরা দেখব স্বাধীনতার উত্তরণ'---এই উত্তরণ-আকাঙ্ক্ষা কিন্তু স্বদেশভূমি চিলির মুক্তির সঙ্গে একাকার: 'আমার মুক্তি অনুসরণ ক'রে দেখ,/দেখবে আমার দেশের গলায় ঝোলানো/পরিত্যক্ত এ সোনালেখ/ পুষ্পরক্তের যেন কণ্ঠহার, যেন সোনা-ঝরানো বৃষ্টি।/হে পথিক, ভালপারাইসোর আকাশ থেকে/অজেয়দ্য, আমার প্রতিরুদ্ধ চাহনি/তোমার সঙ্গ নিক।'[৭৮] (পলাতক)। বিষ্ণু দে-র কবিতা শুরু হয়েছিল এলিয়টের ঊষর-যুগের প্রেক্ষিতে। সেই যাত্রা নিরন্তর অভিজ্ঞতা-প্রজ্ঞা-মননের ক্রিয়ায় বারংবার বদলেছে, রূপ নিয়েছে স্বকালের ভূমিতে স্থিত থেকে। কিন্তু ঊষর-যুগে যে আস্থা জেগে ওঠার কোন সম্ভাবনা নেই, যুগের সংকটে ও কালের দাবিতে জেগে উঠেছে সেই আস্থা ও বিশ্বাস, প্রগতি সাহিত্য আন্দোলন মানুষের বিশ্বাসবোধকে দিয়েছে সেই রকম গভীরতাধর্মী যাত্রা যা বিষ্ণু দে-কেও 'অন্বিষ্ট'-এর পর কোনক্রমে বিচ্যুত হতে দেয় নি। যদিও এই পর্বে হতাশা ও বিষাদ একটু-আধটু জেগেছে, যেমন, 'হয়তো বা যন্ত্রণাই সার', 'যখন আকাশে নামে নির্জন বিষাদ', 'এ প্রেতলোকের দুর্গন্ধে কি আমি শুধু দিশাহারা' ইত্যাদি বাক্যবন্ধে, তখন তা শোনায় অনেকটা স্বগতোক্তির মতই, কেননা, তাঁর বিশ্বাসের ধ্রুবকেন্দ্র তৈরি হয়ে গেছে আগেই, এ পর্বে তাকেই একটি পরিণতিতে তুলে ধরার প্রয়াস প্রকাশ পেয়েছে সংশয়-সন্দেহ-দ্বিধার সার্বিক অবসান ঘোষণা করে। এই স্থৈর্য আকস্মিক নয়, বরং বিবর্তনক্রিয়ার অনুভূতি। বলেন, 'সে কাল যে মহাকাল। তাই চাই/ আনন্দবর্ধনে সাধারণের দুঃখী সুখী দিনে/দৈনন্দিন তোমাকেই। ভবিষ্যৎ উৎস স্থির,/অতীত তো বনভূমি, মুখরিত জীবনের মূলে/তাই না সোনাই ভর্তা সুরসুন্দরীর নৃত্যে।/কি বা চাই, মূর্ত ইতিহাসে

ত্রিকালেশ্বরীর/পতির' ত্রিভঙ্গ তীব্র পঞ্চবটী এই চিত্রে।'('পঞ্চবটী', অন্বিষ্ট)। অথবা---

'পিতৃপুরুষ আমিই বইব জীবনের দায়ভার
বন্ধু আমার মানবতা তার স্মরণে দীর্ঘকাল মানবসভ্যতায়।
আর আছ তুমি হে তন্বী সংস্কৃতি
যেমনও অতনু-রতিকে।'

('এক মিনোতরে', অন্বিষ্ট)

মানবতার মুক্তধর্মের পঞ্চবটী-ছায়াতলে এ পর্বে তিনি পুর্ণত দীক্ষিত।

অতঃপর যে-কোন শিল্প-সমালোচকের অনিবার্য জিজ্ঞাস্য সেই অমোঘ প্রশ্নটি, শঙ্খ ঘোষ যা করেছেন, 'মানুষের সহস্রধারা মনকে কি অত সহজেই বন্দী করা চলে নির্ধারিত এক কাঠামোর মধ্যে?' যে রুচিবদলের ভিন্নতায় আমরা সুকান্ত-সুভাষ-সমর সেন-মঙ্গলাচরণের কাছে যাই, সেই রুচি নিয়ে কি বিষ্ণু দে-রও কাছে যাব? শ্রী ঘোষ ঠিকই বলেছেন যে, 'অনেক সময় চলে যায় এই সত্য মর্মে নিতে যে হৃদয় আর মেধা জাদু আর যুক্তি, রহস্য আর স্বচ্ছতা, ব্যক্তি আর সমাজ, সমতা আর ক্ষোভ, নম্রতা আর বিদ্রোহ, আসক্তি আর নির্বেদের মধ্যে নিরন্তর যাওয়া-আসা করেই বেঁচে আছে আমাদের নানা মুহূর্তের সত্যতা, এই সত্যতা-গুলি পরস্পর সম্পৃক্ত হয়ে বেঁচে উঠতে চায় কোনো এক সমগ্রের দিকে।'[৮০] আপাতবিপরীত এইসব সত্যের মধ্যেই হয়ত-বা আমাদের অন্বিষ্ট বর্তমান।

বিষ্ণু দে-র শিল্প-প্রকরণ:

আমাদের আলোচনায় এটা স্পষ্ট হয়েছে যে, বিষ্ণু দে-র শিল্প-নির্মাণ শুধু ভিন্ন গোত্রেরই নয়, একটু জটিলও বটে। বহুপাঠী বিষ্ণু দে তাঁর কবিতাকে 'মন্ত্রবন্য' না করার শর্তে অবিচল থেকেও প্রয়াস চালিয়েছেন কিভাবে কবিতার শরীরী-অবয়বে নতুন রূপকর্ম বা শৈলী নির্মাণ সম্ভব। এজন্যে তাঁকে যথেষ্ট শ্রমশীল হতে হয়েছে ইতিহাস অধ্যয়নে, দেশীয় লোকজ-সংস্কৃতির অন্বেষণে, সঙ্গীতে ও চিত্র-বিদ্যায়, বিচরণ করতে হয়েছে তাঁকে মানববিদ্যার বহুবিধ শাখায়। জীবনজাত অভিজ্ঞতার বৈচিত্র্যও তাঁর অন্বেষণ-পরিধির একটি দিক। এর সঙ্গে যুক্ত করা যায় তাঁর সচেতনতা। তাঁর মতে, আত্মসচেতনতাই আধুনিকতার প্রধান লক্ষণ। তাঁর এই সচেতনতা কেবলি মননে সমৃদ্ধ নয়, মানবিক আবেগের সুস্থতা-সঞ্চারীও বটে। প্রাত্যহিকের অভিজ্ঞতা থেকেই তাঁর চিত্রকল্পগুলি উঠে আসে, উঠে আসে প্রতীক অথবা প্রতীকোপম প্রতিভাস। একদিকে তীব্র তাপসঞ্চারী অদ্ভুত অলঙ্কাররাজি, অন্যদিকে সহজতাসম্পন্ন শব্দচয়ন, সেইসঙ্গে কাব্যভাষা নির্মাণের নিজস্ব এক রীতির উদ্ভাবন যা সহজেই বিষ্ণু দে-কে চিনিয়ে দেয়। যেভাবে

আমরা চিনে নিই সুধীন্দ্রনাথ দত্তের কাব্যরীতি, যেভাবে চিনে নিই জীবনানন্দের রীতি অথবা সমর-সুভাষ-সুকান্তের রীতি, বিষ্ণু দে-কেও আমরা চিনে নিতে পারি তাঁর পূর্বপূর্বী বিশেষ দ্যোতক বৈশিষ্ট্যগুলি কে যেভাবে কাব্যে ব্যবহার করা হয়েছে, তার দ্বারা।

এই বৈশিষ্ট্যগুলি অ-মার্কসবাদী সমালোচকদেরও দৃষ্টি এড়িয়ে যায় নি। প্রসঙ্গত বুদ্ধদেব বসুর মন্তব্য মনে পড়ে যায়: 'Bishnu Dey's poetry is a record of development. ... with a keen sense of form and a feeling for the texture of words, he made a conspicuous beginning with triolets, ballads and light verse, soon transformed himself to an interpreter of contemporary social life, and finally came out as a singular, serious and difficult poet. He is polished, accompolished, dazzling; a daring innovator in technique; self-conscious and hard-working. বুদ্ধদেব বসু আরও একটি গুরুত্বপূর্ণ কথা বলেছেন: 'His poetic character is seen in the way he is constantly revising his work, rearranging earlier verses so as to give them an import not intended at the time of composition, joining fragments and occasional pieces in a wider significance'[৮১]...; অবশ্য তিনি সুনির্দিষ্ট কয়েকটি অভিযোগও তুলেছেন: 'What is really disconcerting is that his grammar is careless, and sometimes, though not often, he indulges in an incoherence which makes one wonder why the lines and stanzas are placed in the order they are, and not in some other, for juxtaposition does not appear to make any difference. But even then, the lines are luminous and the stanzas echoing; and the great virtue of Bishnu Dey's poetry is, I think, a haunting music which can come only from one who writes poetry because he must.'[৮২]

প্রথম দিকে বিষ্ণু দে তাঁর শিল্প প্রকরণকে সজ্জিত করতে বিদেশি শব্দ, বিদেশি অনুষঙ্গ, বিদেশি ভাব বা 'আইডিয়া' আকছার ব্যবহার করেছেন। প্রকরণের ক্ষেত্রে এর অভিনবত্ব একদা বাঙালি পাঠককে, এমনকি রবীন্দ্রনাথকেও তা ধাক্কা দিয়েছিল, যার ফলে রবীন্দ্রনাথ 'ভবরসদস্তির' অভিযোগ এনেছিলেন। খ্যাতিমান কবিরাও কেউ কেউ দুরূহতার দায় চাপিয়েছিলেন তাঁর ওপর। 'ঊর্বশী ও আর্টেমিস'-এ অন্তত একত্রিশবার বিদেশি ভাবানুষঙ্গজাত শব্দের প্রাধান্য এসেছে, যেমনঃ 'তোমার নেবুলা চোখ', 'ফুলেরা শ্যাম জ্যানায়ের মতো প্রতীক-দেহে-মনে', 'নেয়াডের লীলা হল শেষ', 'ছোটে যত মদমত্ত নেমাক্তরতার', 'শতপুত্র-বাইবেলে', 'লাবণ্যের মুখে আজ অভিচেত্রি এঁকেছে ভিনাস' ইত্যাদির ব্যবহার বাংলাকাব্যে হয় নি বললেই চলে। 'চোরাবালি'র একুশটি কবিতার অধিকাংশতেই হয় শব্দে, নয় ভাবানুষঙ্গে বিদেশি আবহ তুলে ধরবার সযত্ন প্রয়াস দেখা যায়। 'কামনার টানে সংহত গ্লেসিয়ার' বলবার সঙ্গে সঙ্গেই, আমাদের কাছে ভারতবর্ষ বা বাংলাদেশ-এর চেহারা অস্পষ্ট আদল পায়, কখনও কখনও শব্দ-ও এইভাবে ব্যবহৃত হয়ে চেনা ভৌগোলিকতা সহসা সম্পূর্ণ অচেনা করে দেয়। 'ওফেলিয়া' শিরোনামেই বিদেশি অনুষঙ্গ প্রত্যক্ষ ছড়ানো। অবশ্য কবি এ ব্যাপারে বেশ সচেতন, বিদেশির দ্বারে তীর্থযাত্রীর মতন তাঁর এই উপকরণ-অন্বেষণের স্পৃহা রীতিমত কুণ্ঠা-বর্জিত, বলেন, 'তীর্থযাত্রী খুঁজেছি ভাবচ্ছবি।/সঙ্গী করেছি দেশবিদেশের কবি।' ('পঞ্চমুখ-৪', চোরাবালি)। বোধকরি এ-বিষয়ে মধুসূদন দত্তই তাঁর সাহিত্যিক-ঐতিহ্যের পূর্বসূরী। কিন্তু মধুসূদন বহিরঙ্গে দেশীয় পুরাণ-ইতিহাসকে গ্রহণ করে অন্তরে-অন্তরে লালন করেছিলেন বিদেশি ঐতিহ্য। বিষ্ণু দে গুরুকেও মানেন নি এ ব্যাপারে। অন্তরে-বাহিরে বিষ্ণু দে একাকার। তাঁর কবিতার অন্তর-বাহির দেশি এবং বিদেশি ঐতিহ্যের অনুসরণে ও গ্রহণে অতি-তৎপর। অবশ্য এই গ্রহণ-প্রক্রিয়া বিমিশ্র অনুভূতিসঞ্জাত, যাকে বলা চলে 'সিনথেসিস' প্রক্রিয়া, ফলে দুটি ভিন্নধর্মী উপাদানের সন্নিবেশের জন্যে সৃষ্টি হয়েছে তৃতীয় -আধুনিক মাত্রা বা 'থার্ড-ডাইমেনশন' -এর। 'ঊর্বশী ও আর্টেমিস' এবং 'চোরাবালি'তে সর্বাধিক প্রকট হয়েছে এই মাত্রা।---'মনে মনে বলি,/ হে মোনালিসা!/সাইনারা/এসো মলিন আলোয়।/শহরের মুখে ধূসর সন্ধ্যা নামে।/হৃদয়ে আমায় ঘরছাড়া যে গো ডাকে।/ ...হে মোনালিসা, শুধু হাসো তুমি মধুরহাসিনী অপরিচিতা,/এখনই শুধাই, ওগো বিদেশিনী, হে মোনালিসা, দিনের চিতা/ক্লান্ত মনের নীরবতা দেখ তোমাকে ডাকে।/পেটারের মেয়ে,/কুমারের মন ঘরছাড়া হল তোমার খোঁজে/কবিতার বাঁকা ইন্দ্রধনুর দুরূহ পথে,/হে সাইনারা, কালো রাত্রির ক্লান্ত ঘুমে,/পরিশ্রান্ত সুপ্তে তোমার/কুমারের মন কামনাহটায় তোমার আশা/ধমনীর তালে শুধু পদপাত, অকারণ পদপাতে।' ('কবি কিশোর', চোরাবালি)। ওয়াল্টার পেটারের 'মোনালিসা', আর্নেস্ট ডাউসনের 'সাইনারা', রবীন্দ্রনাথের 'অপরিচিতা', 'বিদেশিনী', এমনকি 'উর্বশী'ও (ধমনীর তালে শুধু পদপাত, অকারণ

পদপাতে' ইত্যাদি কথার সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের 'উর্বশী' কবিতার একটা সাদৃশ্য মেলে। এসে মিশে গেছে বিষ্ণু দে-র 'নায়িকা'য়, অবশ্যই বিদ্রূপাত্মক ভাবেই বিচারসাপেক্ষ তা, ---এই সম্ভাবনা জন্ম দেয় তৃতীয় মাত্রা সংযোজনার। বস্তুত অনেক কবিতাতেই বিষ্ণু দে-র এই প্রকার সংশ্লেষণধর্মিতা প্রকাশ পেয়েছে, বিভিন্ন অনুষঙ্গের ব্যবহারে। 'চাঁদমারি', 'দ্বিধা-সম্পত্তি' 'প্রথম পার্টি', প্রভৃতি কবিতায় এর দৃষ্টান্ত মিলবে।

বিদেশি শব্দ ও ভাবানুষঙ্গের ব্যবহারের সঙ্গে সঙ্গে সংস্কৃত শব্দ বা তজ্জাত অনুষঙ্গ ব্যবহারেও বিষ্ণু দে স্বকীয়তা দেখিয়েছেন। যেমনঃ 'সমুদ্রবীচিবঙ্কিম', 'কঠিন উদ্ধত শ্যাম শুভ্রাগ্রচূড়ায়', 'লবণাক্ত বায়ুস্নিগ্ধ খররৌদ্রালোকে নিবৃত্তির তপোভঙ্গ ক'রে', 'দৃষ্টিপথে দুর্লঙ্ঘ্য প্রাচীর', 'সমুৎকর্ণ অরণ্যানী ঊর্ধ্বগ্রীব পর্বতের মালা', 'প্রায়োপবেশনে সমকবিষাণ গোলা', 'হতোহস্মি হবে জয়গান', 'তুবরে অশ্ব্ কশ্চিৎ', 'অবস্থারেরই বিপ্লব', 'আবেশকম্প্র মিহি মন্দ মেঘমন্দ্ররবে', 'অলাতচক্রে চক্রমণ', 'তোমার বাহুতে অনন্ত-স্মৃতি রক্তকুরুবের শেষ', 'মদনের মোহবায়ু ন যযৌ ন তস্থৌ খেলা', 'ছিন্ন কৃষ্ণ ব্যাঘ্র রোমে, স্ফীতোদর হলধর শিশু ধাবমান', 'অয়মিতে মনসা মন' ইত্যাদি ইত্যাদি। এছাড়া দেশি ও বিদেশি সাহিত্য থেকে বিচিত্র অথচ উপযোগী উল্লেখ-উদ্ধৃতির সাহায্যে বিষ্ণু দে তাঁর সাহিত্যকে বৈচিত্র্যমণ্ডিত করবার প্রয়াস পেয়েছেন। এ সম্পর্কে বিস্তৃত বক্তব্য নিষ্প্রয়োজন মনে হয়।

কবিতার ক্ষেত্রে বিশেষণ প্রয়োগের ক্ষেত্রেও তাঁর কিছু কিছু বৈশিষ্ট্যের প্রকাশ ঘটেছে যা উল্লেখের দাবি রাখে। যেমনঃ 'কোমল নীল ঘুমের আবাহন', 'অনন্য চাতুরী', 'চামেলি হাওয়া সুরভি হাওয়া সারদাকাশ তলে', 'আদিমকালের সোনার স্বপ্নে, ভবিষ্যতের ধবল প্রাচীরে', 'সুরেশের সুবর্ণের অম্লান নিঃশ্বাসে তারাভরা হাওয়া দেখ', 'বিদ্যাদ্বেষী আত্মম্ভরী স্থূল অধ্যাপক', 'মৃতমুক্তিকা স্ফীত ধাতু', '... মানবতা নাকে দেয়া ছাঁটকাট হৃদয়ের স্যান্ডো-ব্যায়াম', 'চৌরঙ্গীর উদ্বাস্তু ট্র্যাফিকে', 'বৃষ্টির নূতন জলে নবোন্মদী নদীর তরল দুন্দুর', 'কপালভাঙানো বন্যা' ইত্যাদি ইত্যাদি। লক্ষণীয়, বিশেষ্যকেও বিশেষণরূপে ব্যবহার করেছেন তিনি---'নীলকণ্ঠ ইতিহাস', 'চামেলি হাওয়া', 'কপিলা বসুধা', 'জটায়ু পাখা' ইত্যাদি। আরও বড় কথা, একটি মাত্র বিশেষ্য অবলম্বন করে একাধিক বিশেষণের ব্যবহারও তিনি করেছেন, পুনরাবৃত্তির প্রয়াসে বিশেষ্য ও বিশেষণের প্রাধান্য কোথাও ক্ষুণ্ণ হয় নি। যেমনঃ পথের মানুষ/পথের পুরুষ, মেয়েরা, শিশুরা/পথে পথে চলে অসহায় চোখ/মত্তাসুখে খুলে সাদা কালো চোখ/বিভক্ত চোখ, জীবনযুদ্ধে ক্লান্ত চোখ, মরিয়ার চোখ/সুপ্তের চোখ প্রহরীর চোখ/. . . ভিখারীর চোখ, গ্রামছাড়া রাঙামাটির পথের বৃদ্ধের আর বৌমানুষের বিধবার আর ত্রিকালদর্শী শিশুদের চোখ/ঘরহারাদের, কারখানাছাড়া ছেলেদের আর মেয়ে-দের/যেন লাখো লাখো চোখ অগ্নিবর্ষী জলদ পর্বত। ('অবিচ্ছিন্ন কাব্য', অন্বিষ্ট)।

এই রীতি অবশ্য বিদেশি সাহিত্যেও ইতিপূর্বে দেখা গেছে। যেমন:

Eyes of men running, falling, Screaming
Eyes of men shouting, Sweating, bleeding
The eyes of the fearful, those of the sad
The eyes of exhaustion, and those of the mad.

Eyes of men thinking, hoping, waiting
Eyes of men loving, cursing, hating
The eyes of the wounded sodden in red
The eyes of the dying and those of the dead.[১৮৩]

('A Movement of War' — Laurie Lee)

বলাই বাহুল্য, রীতির দিক থেকে বিষ্ণু দে-র সার্থকতা এখানে অনেক বেশি।

বিষ্ণু দে পদ্য-রীতির ক্ষেত্রে যে বাক্‌ভঙ্গি গ্রহণ করেছেন, তা কথ্যভাষার খুব কাছাকাছি, এমন নয়, তবে কখনও কখনও তাঁর উচ্চারণ এইদিকে মোড় নিয়েছে। ছন্দ রক্ষা করেও মুখের ভাষাকে কাব্যে ব্যবহার করার রীতিটি আধুনিক কবিরা কেবল পরীক্ষা হিসেবে নেন নি, কেউ কেউ এতে চমৎকার সার্থকতাও দেখিয়েছেন। বলা চলে, বিষ্ণু দে-ও এই পরীক্ষায় সসম্মানে উত্তীর্ণ। দুটি দৃষ্টান্ত দিই:

ক) কোথায় লুকাবে চাবি

কোন্ স্বর্ণশিমুলের নিচে? কোন্ চটকলে বলো কয়লাখ নিতে?

কিসের খোয়ায়? কোন্ খুন্তি, কোন্ খতে? কিসের গদিতে?

('১৪ই আগস্ট', অন্বিষ্ট)

খ) সুখে নেই, তাই সুখে ফিরানোর সাধ।

ফক্কির দেরি আছে আসতে।

অনাচার অনাহার চলুক্ অবাধ

টিয়ুপেকো চলে যাক্ নীলিমা অগাধ,

আজ আছি, কাল নেই, কেন সাধি বাদ

নগদ বিদায়ে আজ হাসতে?

('বেকারী-১', পূর্বলেখ)

আর একটি উদ্ধৃতি দিইঃ

'যদিবা হতুম ফুল, বইতুম দক্ষিণের হাওয়া
রইতুম নিশ্চল রূপান্তরে ধ্রুব নিত্য চাঁদ
কিন্তু আমরা যে পৃথিবীর আমরা মানুষ
আমাদেরই অতীতের স্রোতে পড়ি ভবিষ্যৎ
একূলে ওকূলে আমাদেরই বর্তমানে
কিছুটা উদ্ধৃত সত্ত্বেও---সৃষ্টি কিংবা আর্তেমীয় জলে।

('জল দাও', অন্বিষ্ট)

এই উদ্ধৃতিতে লক্ষ করার, 'যদিবা', কিন্তু', 'সত্ত্বেও', 'কিংবা' ইত্যাদির ব্যবহার গদ্যের ব্যবহার, সেই সঙ্গে ক্রিয়াপদ 'হতুম', 'বইতুম', 'রইতুম' ইত্যাদিও গদ্যের দিকটাকে চিহ্নিত করেছে আরও স্পষ্ট করে। কলকাতার বিশিষ্ট কথ্যরীতিটি তার ফলে কাব্যে একটা নতুন মেজাজ এনে দিয়েছে।

উল্লম্ফন-রীতির ব্যবহার আধুনিক রীতি হিসেবে খুবই জনপ্রিয়। বিষ্ণু দে প্রথম দিককার কবিতায় এই রীতির অজস্র ব্যবহার করেছেন। অন্যতম দৃষ্টান্ত তার 'ঘোড়সওয়ার', 'ক্রেসিডা', 'উর্বশী ও আর্টেমিস', 'পদধ্বনি', 'ওফেলিয়া' প্রভৃতি। পরে এই রীতি বর্জন করেন তিনি, '২২শে জুন', 'সন্দ্বীপের চর', সাতভাই চম্পা', এমনকি 'অন্বিষ্ট'তেও এই রীতির ওপর আগের মত ততটা জোর নেই। প্রগতি সাহিত্য আন্দোলনের ফল হিসেবে একে গ্রহণ করতে হবে। কেননা, এই আন্দোলন জটিল কলা-কৌশলের ব্যবহারকে ততটা গুরুত্ব দিতে চায় নি, বিষ্ণু দে এই পর্বে অনেকটাই সহজ হয়ে এসেছেন এই কারণে। এই রীতির সঙ্গেই যুক্ত পদবিন্যাসের মধ্যে একটা বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করা, কবিদের কাছে এই রীতিটিও বেশ প্রিয় রীতি হয়ে উঠেছিল, বিষ্ণু দে এই পর্বে সেটাও কমিয়ে এনেছেন। পৌরাণিক প্রভাবের কথাও এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে। বিষ্ণু দে-র আলোচনায় সেসম্পর্কে একটু ইঙ্গিতও দিয়েছি আমরা, হিন্দু-পুরাণ, গ্রীক-পুরাণ, বা অন্যান্য গ্রন্থের থেকে বিভিন্ন 'মিথ' তিনি অকাতরে ব্যবহার করেছেন, শিল্পের ঐশ্বর্যশালী সম্ভার হিসেবে তা বিবেচ্য। প্রতীক ও চিত্রকল্পের ব্যবহারেও [illegible] অত্যন্ত উজ্জ্বলতর স্বকীয়তা প্রদর্শন করেছেন বিষ্ণু দে। দুঃসহ যন্ত্রণা-চিহ্নিত শ্মশানের চেহারা 'কঙ্কাবতীতলা'য় (সন্দ্বীপের চর) শ্মশান-প্রতীকে দেখা দেয়, দুর্ভিক্ষ-এর প্রেক্ষিতকে তুলে ধরতে এই প্রতীকের তুলনা নেই। 'অন্বিষ্ট' কাব্যে জল' অথবা নদী'ও প্রতীকায়িত হয়ে ওঠে, কমিউনিস্ট-পার্টির ভেতরে অন্তঃসংগ্রামের সময় যে মানবিক-তৃষ্ণা ব্যাকুল করে তোলে কবিকে, তার ছাপ সত্ত্বেও তা শুধু ব্যক্তিগত থাকে নি। বরং উত্তরণের ব্যাকুলতাই ঐ প্রতীকে তীব্র হয়ে ওঠে। জীবন ও যৌবনের দুর্দম শক্তিসম্পন্ন 'ঘোড়া'র প্রতীকটিও চমৎকার। লোকজ-সংস্কৃতির থেকে এভাবেই উঠে আসে লালকমল আর নীলকমলেরা। মাঝে মাঝে তাঁর কবিতায় পুনরুক্তির বাকপ্রতিমা---একই অনুষঙ্গ নিয়ে বারংবার ফিরে আসে, 'সিনেসসে সিয়া'র ধরনে, যেমনঃ

১। ...'প্রাণের নির্দেশে
কলকাতার পূর্ণিমাও জটায়ুর পাখা নাড়ে দূর দেশে দেশে'

('২২শে জুন', সাতভাই চম্পা)

২। 'শতাব্দীরা উর্ধ্বশ্বাস জটায়ুর শক্তপাতবীন
আকাশে মুখর হল,'

('২২শে জুন, ১৯৪২', সাতভাই চম্পা)

৩। ---'যদিনা জটায়ুভাগ্যে একদিন নেমে যায়
শক্ত বিধুনন আর অকস্মাৎ নেমে যায়
উর্ধ্বগ্রীব আশা।'

('যামিনী রায়ের একটি ছবি', পূর্বলেখ)

৪। 'বেদনায় জুবুথুবু
জটায়ুর পাখা বাড়ে
মরীয়া মর্মাহত

('সোনালি ঈগল', পূর্বলেখ)

'সিনেমাকে সিন্থার' এই ধরনের ব্যবহার বিষ্ণু দে-র একটা প্রিয় রীতি, একই ভাবানুষঙ্গ জড়ানো এইরকম একাধিক শব্দ রয়েছে তাঁর কবিতায়-----'নরক', 'অন্ধকার', 'শকুন/পৃথিবী/গৃধ্র', 'পূর্ণিমা/চাঁদ/জ্যোৎস্না/কোজাগরী/বসন্তপূর্ণিমা', 'জল/নদী/সমুদ্র/বর্ণা/তরলতা' ইত্যাদি ইত্যাদি। এইসব শব্দ কখনও প্রতীকী রূপে এসেছে, কখনও কখনও 'ইমেজ' বা চিত্রকল্প' হিসেবে এসেছে, আবার কখনও তাৎপর্যপূর্ণ ব্যবহারে তার অর্থ অভিধাকে ছাড়িয়ে গেছে।

বাংলা কবিতার প্রধান তিন ছন্দই বিষ্ণু দে ব্যবহার করেছেন। বিদেশি ছন্দ বলতে 'ভিলানেল', 'ট্রিয়োলেট', ব্যালাড', এমন কি 'সেসটিনা'ও ব্যবহার করেছেন তিনি। বুদ্ধদেব বসু অভিযোগ করেছেন যে বিষ্ণু দে পয়ারে বা অক্ষরবৃত্তে স্বচ্ছন্দ নন।[৮৪] এ মন্তব্য 'উর্বশী ও আর্টেমিস' ও 'চোরাবালি' পর্বে অংশত যে সত্য সে কথা অস্বীকার করা যায় না। তবে এই বাধা তিনি পরবর্তীকালে যথেষ্ট সাহসিকতার সঙ্গে অতিক্রম করার চেষ্টা করেছেন। 'পূর্বলেখ', 'সাতভাই চম্পা', 'সন্দ্বীপের চর', 'অন্বিষ্ট' প্রভৃতি কাব্যে বিষ্ণু দে দীর্ঘ পয়ারে বা অক্ষরবৃত্তে অনেক কবিতা লিখেছেন। সমমাত্রায় 'পারবন', অসমমাত্রায় 'কক্কাবতীতলা', 'টেকে-বৈশাখে', 'জল দাও' প্রভৃতি এর ভাল দৃষ্টান্ত। তবে এ কথা বলাই বাহুল্য যে, বিষ্ণু দে-এর প্রধান কৃতিত্ব হল মাত্রাবৃত্তের বিশিষ্ট ব্যবহারে। বুদ্ধদেব বসু প্রমুখরা এই ছন্দকে তিনমাত্রার ছন্দ বলতেন। বিষ্ণু দে এই ছন্দে বিশেষ বৈচিত্র্য সৃষ্টি করেছেন।

ক) 'কাঁপে তনুবায়ু/কামনায় থরো/থরো।
কামনার টানে /সংহত গ্লেসি/য়ার।
হালকা হাওয়ায়/হৃদয় আমার / ধরো,
হে দুরদেশের/ বিদুষি জয়ী/ দীপ্ত ঘোড়সও/য়ার।'

(ঘোড়সওয়ার', চোরাবালি)

ছয় মাত্রার দুটি পর্ব, শেষ পর্ব দুই মাত্রার। পাঁচ মাত্রার পর্বও রচনা করেছেন এবং অত্যন্ত দক্ষতায়ঃ

সোনালি হাসি,/ সোনালি গানে/ ভরি =৫+৫+২
তাই বিভল/ সন্ধ্যা, সহ/চরী, =৫+৫+২
কাছে অকাছে/ তোমাকে আজ ? স্মরি, = ৫+৫+২
মরণজয়ী/ প্রাণের মম/তায় =৫+৫২

('শেষ রোমান্টিক', সাতভাই চম্পা)

মাত্রাবৃত্তের মধ্যে তাঁর বৈশিষ্ট্য হল, এই ছন্দেও বিষ্ণু দে-কে, তাঁর বিশিষ্ট মনোধর্মকে চেনা যায়, এই ছন্দের অবিস্মরণীয় প্রণেতা রবীন্দ্রনাথকে অতিক্রম করবার দুঃসাহসটুকু দেখাবার স্পর্ধা রেখেছেন তিনি। যেমনঃ 'সত্য তো বটে, শরীরধর্ম লোপাট আজ।/আদিম স্নায়ুর প্রতিক্রিয়ায় মুক্তি নেই।/তবুও তোমাকে খুঁজে চিঠি দেব কলকাতায়।/ক্ষিপ্তার্ত ব্যাঙ্কে কেন যে তোমার চুক্তি নেই।' ('বিবরের পুত্তলা', চোরাবালি)। ১৮মাত্রা ও ২২মাত্রার দীর্ঘ পয়ারে সনেট রচনাতেও বিষ্ণু দে কৃতিত্ব দেখিয়েছেন। '২২শে জুন, ১৯৪১', 'তোমাদের সনেট', 'ফেদেরিকো গারসিয়া লোরকার ছায়ায়' প্রভৃতি কবিতায় এই শক্তি প্রকাশ পেয়েছে। সনেট রচনায় কোন নির্দিষ্ট রীতি তিনি অনুসরণ করেছেন বলে মনে হয় না। কারণ, কেবল বৈচিত্র্যের দিক থেকেই দেখি পেত্রার্ক, শেকসপীয়ার বা অন্য কোন স্থির আদর্শ তাঁর নেই, তার বদলে তিনি স্তবক বিন্যাস বা মিলের ব্যাপারে তাঁর পরীক্ষাকার্য চালিয়েছেন। বিদেশি ছন্দের মধ্যে ভিলানেল, সেসটিনা বা ব্যালাড-এর ব্যবহার করেছেন অনেক পরবর্তীতে, যা আমাদের সময়সীমার অনেক পরেকার ব্যাপার। বরং এই শেষদিকে তিনি কখনও এজরার ও নেরুদার সান্নিধ্যকে বড় বেশি ঠাঁই দিতে চেয়েছেন। বলে ফেলেছেন সকৃতজ্ঞতায় সেই কথাটিও---'দীপাবলী শোক পরিত্রাণী শ্রেণীবিহীন দীর্ঘকণ্ঠ সুর নেরুদার/দীর্ঘমাত্র অমিত্রাক্ষরের'---এ ছন্দ অক্ষরবৃত্ত, অসমমাত্রার, কিন্তু মুক্তছন্দ নয় তা, যেমন রবীন্দ্রনাথের 'বলাকা'র ছন্দকে কেউ কেউ মুক্তক বললেও তা মুক্তছন্দ নয়। বড়জোর তা অমিত্রাক্ষর। প্রবহমানতার বিশিষ্ট ধর্মই এর অবলম্বন। নেরুদা-র মধ্যেও এই ধরন দেখা গেছে ---

'It was the afflicted time in which women
were sustaining an absence like a terrible coal,
and Spanish death, more acid and sharp than other
deaths
filled the fields until then honored by wheat.'

(Arrival In Madrid Of The International Brigade)

জেবুন্দা-র এই রীতিটি বিষ্ণু দে একেবারে আত্মসাৎ করেছেন এমন নয়, কোন কোন কবিতায় তার প্রভাব লক্ষ্য করা যায়।

প্রসঙ্গত আরও দু-একটি বৈশিষ্ট্যের কথা উল্লেখ করা যায়। একটি সংগীতধর্ম, অন্যটি চিত্রশিল্প বিষয়ে। গীতিকবিতার অন্যতম অন্তঃপ্রেরণাই হল সংগীত। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য উভয় সংগীতের সঙ্গে বিষ্ণু দে-র গভীর পরিচয় ছিল। এই পরিচয়ের সঙ্গে জড়িয়ে আছেন খ্যাতিমান কবি ও সংগীতরসিক চঞ্চল চট্টোপাধ্যায় ও নীরোদ সি চৌধুরী। বিঠোফেন, মোৎসার্ট, বাখ,, রবীন্দ্রসংগীত ও ভারতীয় রাগসংগীত সম্পর্কে এদেরই সাহচর্যে গড়ে উঠেছিল তাঁর তীব্র আসক্তি।[৮০] অনেকেই বিষ্ণু দে-র 'ক্রন্দসী' কবিতায় জার্মানির কম্পোজার বিঠোফেন (Ludwing Van Beethoven: 1770-1827)-এর নবম সিম্ফনির প্রভাবের কথা উল্লেখ করেছেন। শিলারের কবিতাকে বিঠোফেন সুরে বিন্যস্ত করেন 'O Friends, no more these sounds continue' নিজের মত সাজিয়ে। বিঠোফেনের 'কোয়ার্টেট ওয়ার্কস', 'চেম্বার মিউজিক' বা 'পিয়ানোর' (32 Sonatas; 21 sets of variations; Bagatellen) তুলনায় বিষ্ণু দে সবচেয়ে বেশি আকর্ষণ বোধ করেন অর্কেস্ট্রায়। 'ক্রন্দসী' ও অন্যান্য কিছু দীর্ঘ কবিতায় সাংগীতিক বিন্যাস বিবেচ্য। সেই সব ক্ষেত্রে দেখা যায় কবিতায় স্তবকগুলি বা ভিন্ন ভিন্ন অংশ সিম্ফনি সংগীতের বিভিন্ন 'মুভমেন্ট'-র ধরনে বিন্যস্ত। নবম সিম্ফনির শেষাংশ যে চরম মুহূর্ত সৃষ্টি করে, তার মূলে রয়েছে যুগপৎ একক ও সম্মিলিত উচ্চারণ। লক্ষ্য করার, বিঠোফেন ও বিষ্ণু দে-র জিজ্ঞাসার বিশাল পার্থক্য, এই পার্থক্য বৈপরীত্যগত সংঘাতের। কবিতার প্রথমে ভিত্তাশঙ্ক নগরীর বর্ণনা 'নামে আর নিমুনের ক্লিন্নপ্রাবী উদ্‌গারের উচ্ছিষ্ট হাওয়ায়' সুরু, আর শেষে 'আনন্দের যে ভৈরবী সিঁড়ে সিঁড়ে মুহুর্মুহু নিচে নিচে সাযুজ্যসংগীতে'-র এক তীব্র ভাস্থিক প্রাচুর্যায় কবিতার শরীরী সত্তা ও অন্তর আলোড়িত হয়ে ওঠে। বাংলা কবিতায় এ দৃষ্টান্ত বিরল। ব্যতিক্রম সুধীন্দ্রনাথ, তাঁর 'অর্কেস্ট্রা' কবিতায় সংগীতগুণ সঞ্চার করে কবিতার আঙ্গিকে এক অভিনব বৈচিত্র্য আনেন। সে যাই হোক, বাদী-বিবাদী সুরের ভিন্ন ভিন্ন অভিঘাত ঘটিয়ে বিষ্ণু দে যে সাংগীতিক-ব্যঞ্জনার আভাস এনেছেন এই কবিতায়, তা তাঁর মুখ্য করণ-কৌশলেরই একটি দিক। বিষ্ণু দে সংগীতের বিশেষ বিশেষ রাগ-রাগিনীর ও সুরের যে উল্লেখ করেছেন কবিতায় তাও পেয়েছে নতুন বৈশিষ্ট্য। যেমনঃ 'বিরাট ছিছির রোটে সংগীতের সংখ্যিতি নিবিড়', 'অন্ধকারে উষার ভৈরবী', 'গন্ধের আবেশ তার বাজে/পাশ ফিরে পাশ ফিরে তার শরাণের শালোয়াজে' ইত্যাদি।

বিষ্ণু দে গানের পরিভাষাকে ও অনুষঙ্গজাত শব্দকে কবিতায় যেমন প্রচুর ব্যবহার করেছেন, চিত্রশিল্পের জগৎ থেকেও সেইরকম অভিজ্ঞতা আহরণ করে কবিতায় ব্যবহার করেছেন। এই অভিজ্ঞতা থেকেই বারবার

তাঁর কবিতায় কতগুলি নাম উঠে আসে---মাতিস, পিকাসো, যামিনী রায়, গোপাল ঘোষ, নীরোদ মজুমদার প্রমুখ খ্যাতিমান চিত্রশিল্পীরা। যামিনী রায় বিষ্ণু দে-র পাশ্চাত্য অভিজ্ঞতার দ্বারা ঋদ্ধ হয়েছেন বলে স্বীকার করেছেন।[৮৬] বোঝা যায়, এবিষয়ে তাঁর লব্ধ অভিজ্ঞতা কোন অংশে কম নয়। যখন পিকাসোর কথা উল্লেখ করেন, তখন শুধু তা কেবলমাত্র উল্লেখ হিসেবে নয়, কবিতার উপকরণ ও ভাবব্যঞ্জনা একাকার হয়ে আসে। যেমন: 'দৃষ্টি বুঝি পিকাসোর? আলতামিরার জ্যোৎস্নাও সেজাঁকার দখলে তাম্বুর,/ আর সেই বাসর।/পিকাসো কি মহানদী প্রতিটি মুহূর্ত তাঁর বারবার সমুদ্রের নিত্য অভিযান/নৈর্ব্যক্তিক সত্তা অনির্বাণ?' ('অন্বিষ্ট'-৭', অন্বিষ্ট)। বিখ্যাত চিত্র এই 'গ্যোয়েরনিকা', ফ্যাসিবাদের স্বৈরাচারকে মূর্ত করে তুলেছে এই চিত্র। এর সঙ্গে বিষ্ণু দে-র বক্তব্য ও বিষয়বস্তুও জড়িয়ে যায় অবিচ্ছিন্ন প্রসঙ্গের সূত্রে: 'একই হাতে কি দুর্জয় তাজা ও তাপিয়ে যাওয়া, তুলে তুলে পরির প্রান্তর/দু পাশে কবরে এ কী গেঁথে যাওয়া মৃত্যুহীন সাতনরী প্রাণ/যুদ্ধে যুদ্ধে ঘর বাঁধা করুণায় মাধুর্যে নির্মাণ/বিপ্লবীর চির রূপান্তর।' (ঐ)। মাতিসও তাঁর কবিতায় উঠে আসেন একইভাবে---'শ্রাবণ সন্ধ্যার সেই মাতিস্ আকাশ' (১৪ই আগস্ট', অন্বিষ্ট)---মাতিসের আঁকা 'আকাশ' ছবিটিও এই অনুষঙ্গে জড়িয়ে পড়েছে। বত্তিচেল্লির 'ভেনাস' লিওনার্দো দা ভিঞ্চির 'মোনালিসা' ইত্যাদির প্রসঙ্গ ও এসেছে। এসেছে মাইকেল এঞ্জেলোর প্রসঙ্গও 'প্রথম পার্টি' কবিতায়। 'নীরোদ মজুমদারের জন্য', 'গোপাল ঘোষের জন্য', 'স্কেচ' (সন্দ্বীপের চর), 'যামিনী রায়ের একটি ছবি'(পূর্বলেখ) প্রভৃতি কবিতায় ব্যক্তিগত প্রসঙ্গাদিবেদন ও স্মৃতিচারণার সঙ্গে সঙ্গে চিত্রশিল্পের নানা অভিজ্ঞতাও এসে হাজির হয়েছে। তার আবারণ: দুচোখ ধাঁধায় বাঁধ জুড়ে যায় লাল চলে জুলে হীরা,/দুটি ছোট বোন ছবি আঁকে, তারা হীরা।/ছিপছিপা পুতুল বুকে হাত হল ব্যাসাল্ট শিলাক্রিয়া/সবুজে ও নীলে সুরের তন্বী প্রিয়া। (স্কেচ)। গোপাল ঘোষ জল, ক্রেয়ঁরা ও প্যাস্টেলের মাধ্যমে দিয়ে নদী, মাঠ, কৃষিক্ষেত্র ইত্যাদির চিত্র বর্ণনায় সিদ্ধহস্ত, হয়ত-বা সেইদিকে তাকিয়ে বিষ্ণু দে লেখেন---'উৎরাই আর চড়াই অশেষ তরঙ্গঘন বেগ---/ক্ষণে ক্ষণে সংসারে কল্যাণী ক্ষণেকে বা উন্মনা/ ... চপল হাস্যে লাস্যে মুখর কখনো বা স্নেহচ্ছায়/সংহত সতী পাহাড়ের নীল, তরঙ্গঘন বেগ' (গোপাল ঘোষের জন্য)---শিল্পীর একটি বিখ্যাত ছবি 'তরঙ্গ', হয়ত-বা সে-কথারও এতে প্রভাব পড়েছে। রঙের পদ্ধতি-বিষয়ে বিষ্ণু দে-র অভিজ্ঞতা স্মরণীয়---'আজকাল শিল্পীরা জানেন যে চোখের নেতিবাচক প্রতিচ্ছবির নিয়মানুসারে নীলের পরিপূরক হচ্ছে হলদে, বেগনির পালটা সবুজ, লালের সবুজশ্যাম, কমলার আকাশনীল বা ফিরোজা।'[৮৭] তাঁর কবিতায় সংকেত এর ছায়া পড়েছে: 'পূর্ণরতি চেয়ে থাকে জীবনের আকাশের নীলে'(চৈতে-বৈশাখে), 'লাল পথে যাতে দেউড়ির সবুজে ক্রিকেটের নীল হতে'(নীরদ মজুমদারের জন্য), 'সবুজ সবুজ নদী আজ প্রায়

নীলিমার রক্তাম্বুজ'(বাইশায়ার দেশ) ইত্যাদি।

নৃত্যশিল্পের বিষয়ও তাঁর বিষয়বস্তুর গভীরতা সম্পাদন করেছে ও আঙ্গিকে বৈচিত্র্য এনে দিয়েছে। 'জল দাও' (অন্বিষ্ট) কবিতায় রবীন্দ্রনৃত্য 'চণ্ডালিকা'র প্রভাব অনুমান করা যায়। বালা সরস্বতী কিংবা রুক্মিণী দেবীর নৃত্যের অনুষঙ্গ এসে পড়েছে----'অন্ধকার প্রেক্ষাগৃহে প্রদর্শিত নৃত্যমঞ্চের বোল্ ছড়াবার/নাচের মুহূর্তে আতঙ্কাবৃত/বালা সরস্বতী কিংবা রুক্মিণী দেবীর মতো---/আনন্দমণ্ডবা অন্তর্মুখী তন্বীর মতো/বৈশাখীর বৃষ্টির আগের স্তব্ধতায় সতর্ক গম্ভীর---কিংবা যেন বন্যা ধরে তাতার সওয়ার একাগ্র সংহত/... খরশর স্রোত/কল্লোলে মুখর/সমুদ্রে সমুদ্রে ওঠে তালে তালে/সমুদ্রে নদীতে নীল মহাসমুদ্রের কান্নায় হাসিতে/ সাগর উচ্ছ্বসিত সেই অভিসারী সন্নারীর আবির্ভাব আভাসে/ঊর্মিল জোয়ার' । ('জল দাও')।

সুকুমার শিল্পের নানান শাখাপ্রশাখাকে অবলম্বন করে কাব্যশরীর নির্মাণের এই প্রয়াস বিষ্ণু দে-র অসাধারণ কৃতিত্বের সাক্ষ্য বহন করে।

উল্লেখপঞ্জী

১। হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়: তরী হতে তীর, মনীষা, কলকাতা, ১৯৭৪, পৃঃ৪৪৯-৫২

২। সাহিত্যপত্র' পত্রিকাটি বিষ্ণু দে ও চঞ্চল চট্টোপাধ্যায়ের যুগ্ম প্রচেষ্টায় বঙ্গাব্দ ১৩৫৫-এর শ্রাবণ মাসে প্রকাশিত হয়। ভুলে গেলে চলবে না, এর আগেই পার্টির সাংস্কৃতিক ফ্রন্টের কিছু সদস্যের সঙ্গে বিষ্ণু দে-র মত-বিরোধ প্রকাশ পায়। 'সোভিয়েত' পত্রিকা প্রকাশের ব্যাপার নিয়ে একটা ঝড় তুলে ওঠে। সেদিন তাঁর সপক্ষে ছিলেন হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, স্নেহাংশুকান্ত আচার্য, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখ আর বিপক্ষে ছিলেন সোমনাথ লাহিড়ী। এর যৌক্তিকতা নিয়ে প্রশ্ন তোলেন সুধী প্রধান, চিন্মোহন সেহানবীশ ও সুভাষ মুখোপাধ্যায়। এরকম বিরোধ ও বিতর্কে বিষ্ণু দে-র ভূমিকা তুচ্ছ কিংবা উপেক্ষণীয় ছিল না একেবারেই, বরং প্রগতি সাহিত্য আন্দোলনের দৃষ্টিভঙ্গি, উপকরণ ও প্রকরণগত বিবিধ অসংগতি তথা যান্ত্রিক-জটিলতার ক্ষেত্রে এক ভিন্ন মৌলিকতা দৃষ্টির মধ্য দিয়ে বিষ্ণু দে-র শিল্প-দিগ্দর্শিতার অবকাশ ঘটেছে এবং বলাই বাহুল্য, আজকের দিনে সেই বিরোধ কিংবা উত্তাপ অনেকটাই কমে এসেছে।

৩। অরণি, ১ম বর্ষ, ৪৫সংখ্যা, ৩জুলাই, ১৯৪২

৪। প্রেরিত পত্রটির তারিখ ১৭,৭,৪২,---অরণি, ১ম বর্ষ, ৪৯সংখ্যা, ৩১জুলাই, ১৯৪২

৫। প্রাগুক্ত পত্র।

৬। সুরেন্দ্রনাথ গোস্বামী ও হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, সম্পাদিত:'পরিচিতি-ক', প্রগতি(সংকলন), প্রগতি লেখক সংঘ, কলকাতা, ১৩৪৪বঙ্গাব্দ

৭। বিষ্ণু দে: 'আরাগঁ', জনসাধারণের রুচি, বিশ্ববাণী প্রকাশনী, কলকাতা, ১৯৭৫, পৃঃ৯৫-১০৭

৮। বিষ্ণু দে: 'এলোমেলো জীবন ও শিল্পসাহিত্য', মাইকেল রবীন্দ্রনাথ ও অন্যান্য জিজ্ঞাসা, মনীষা গ্রন্থালয় প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, ১৯৬৭, পৃঃ৬৪

৯। বিষ্ণু দে: 'বাংলাসাহিত্যে প্রগতি', জনসাধারণের রুচি, বিশ্ববাণী প্রকাশনী, কলকাতা, ১৯৭৫, পৃঃ২১-২২

১০। বিষ্ণু দে: 'সাহিত্যের দেশকাল থেকে সার্বভৌম কাল', সেকাল থেকে একাল, বিশ্ববাণী প্রকাশনী, কলকাতা, ১৯৮০, পৃঃ১৪

১১। বিষ্ণু দে: 'শেষকথা', এলিয়টের কবিতা, সিগনেট প্রেস, কলকাতা, ১৩৮৭বঙ্গাব্দ, পৃঃ৭০

১২। রণেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, অনূদিত: কালচার, পপুলার পাবলিশার্স, কলকাতা, ১৯৮৫, পৃঃ৫৯

১৩। পরিচয়(বিষ্ণু দে-র সপ্ততি বর্ষ পূর্তি সংখ্যা), ৪৮বর্ষ, ১০-১২সংখ্যা, বৈশাখ-আষাঢ়১৩৮৫, মে-জুলাই১৯৭৯, পৃঃ৩৯

১৪। বিষ্ণু দে: 'এলিয়ট প্রসঙ্গে', জনসাধারণের রুচি, বিশ্ববাণী প্রকাশনী, কলকাতা, ১৯৭৫, পৃঃ১৭৮-৭৯

১৫। তদেব, পৃঃ১৭৮

১৬। তদেব, পৃঃ১৭০

১৭। George, A.G. : T.S. Eliot : His Mind And Art, Asia Publishing House, India, 1962, p. 17.

১৮। Ibid.

১৯। Kermode, Frank, Edited : Selected Prose of T.S. Eliot, Faber and Faber, London, 1975.

২০। বিষ্ণু দে: 'এলিয়ট প্রসঙ্গে', জনসাধারণের রুচি, বিশ্ববাণী প্রকাশনী, কলকাতা, ১৯৭৫, পৃঃ১৩৪

২১। বিষ্ণু দে: 'সাহিত্যের সেকাল থেকে সার্বভৌম একাল', সেকাল থেকে একাল, বিশ্ববাণী প্রকাশনী, কলকাতা, ১৯৮০, পৃঃ১৩

২২। বিষ্ণু দে, অনূদিত: 'ভূমিকা', মাও ৎসে তুঙের কবিতা, বিশ্ববাণী প্রকাশনী, কলকাতা, ১৩৮০ বঙ্গাব্দ, পৃঃ৮

২৩। Fussell, Paul : The Great War And Modern Memory, Oxford University Press, London, 1975, pp. 7-8.

২৪। Gillie, Christopher : Movements In English Literature (1900-1940), Cambridge University Press, Cambridge, Reprinted, 1978, p. 122.

২৫। Ibid, p. 123.

২৬। Marx, Karl and Frederick Engels : 'Manifesto of the Communist Party', Selected Works, Vol. 1, Progress Publishers, Moscow, Fourth printing, 1977, p. 125.

২৭। বাসন্তীকুমার মুখোপাধ্যায়: 'আধুনিক বাংলা কবিতার রূপরেখা', প্রকাশভবন, কলকাতা, ১৯৬৯, পৃঃ৩৬২-৬৬

২৮। দীপ্তি ত্রিপাঠী: আধুনিক বাংলা কাব্যপরিচয়, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, দ্বিতীয় দে'জ সংস্করণ, ১৯৭৭, পৃঃ২৭২

২৯। Mukherjee, Hiren, Edited : 'Notes on Progressive Writing in Bengal By Bishnu Dey', US (A People's Symposium), Anti-Fascist Writer's And Artist's Association, Calcutta, 1943, p. 64.

৩০। Fraser, G.S. : The Modern Writer And His World, Rupa and Company, Calcutta, 1961, p. 218.

৩১। Ibid, p. 222.

৩২। Ibid, p. 224.

৩৩। Rosenthal, Marilyn : 'Preface', Poetry Of The Spanish Civil War, New York University Press, New York, 1975.

৩৪। Lehmann, John, Forewordеd : ''For word, Poems : From New Writing (1936-1946), John Lehmann, London, 1946, pp. 5-6.

৩৫। Rosenthal, Marilyn : 'Introduction', Poetry of the Spanish Civil War, New York University Press, New York, 1975, p. 1.

৩৬। মিগুয়েল তাঁর কবিতায় লিখেছেন,

'The winds of my people carry me,
the winds of my people move me,
they scalter my heart,
and infate my throat.'
('The Winds Of My People Carry Me')

হার্বার্ট রীড ঘটনাটির বর্ণনায় এভাবে বলেছেন,

'The golden lemon is not made
but grows on a green tree :
A strong man and his crystol eyes
is a man born free.

And men are men who till the land
and women are women who weave :
Fifty men own the lemon grove
and no man is a slave.'
('A Song For The Spanish Anarchists)

৩৭। সরোজকুমার দত্ত, অনূদিতঃ শিল্পীর নবজন্ম (রোমাঁ রোলাঁ-কৃত 'আমি থামিব না'), অরুণা বুক ক্লাব, কলকাতা, ষষ্ঠ মুদ্রণ, ১৯৮০, পৃঃ ১৮৭।--
প্রসঙ্গত বলা দরকার যে রোমাঁ নিজেকে কমিউনিস্ট মতাদর্শের বিরোধী বলেছেন, তার বলেছেন তিনি স্বতন্ত্রবাদী।

৩৮। তদেব, পৃঃ২০৭

৩৯। বিষ্ণু দেঃ ২২শে জুন, ফ্যাসিস্ট বিরোধী লেখক ও শিল্পী সংঘ, কলকাতা, (প্রকাশকাল অনুল্লিখিত), পৃঃ ৩

৪০। Mukherjee, Hiren, Edited : US (A People's Symposium), Anti-Fascist Writers' And Artist's Association, Calcutta, 1943, p. 53

৪১। কবিতাটির তিনটি ভিন্ন শিরোনাম লক্ষণীয়ঃ ফ্যাসিস্ট বিরোধী লেখক ও শিল্পী সংঘ কর্তৃক প্রকাশিত '২২শে জুন' কবিতা সংকলনে '১৯৪১', বিশ্ববাণী প্রকাশনী, কলকাতা, বঙ্গাব্দ ১৩৮০-তে প্রকাশিত 'বহুর বৈচিত্র' কাব্য সংকলনে '১৯৪২' (পৃঃ৪২৬), এবং 'অরণি', ১ম বর্ষ, ২৮ সংখ্যা, ৬ মার্চ, ১৯৪২-এ প্রকাশিত হয় 'জুনের চাঁদে' শিরোনামে। তাছাড়া ভিন্ন ভিন্ন শিরোনামযুক্ত কবিতাগুলির ভিন্ন পাঠান্তরও প্রকটিত।

৪২। বিষ্ণু দেঃ সেকাল থেকে একাল, বিশ্ববাণী প্রকাশনী, কলকাতা, ১৩৮০, পৃঃ১৩-১৪

৪৩। Lenin : On Litesature and Art, Progress Publishers, Moscow, Third printing, 1975, p. 142

৪৪। Mukherjee, Hiren, Edited : US (A People's Symposium), Anti-Fascist Writers' And Artist's Association, Calcutta, 1943, p. 54

৪৫। কবিতাটির শিরোনাম '৭ই নভেম্বর'।---অরণি, ২য়বর্ষ, ১২সংখ্যা, ২০নভেম্বর, ১৯৪২, পৃঃ২০১

৪৬। উদ্ধৃতাংশটি 'অরণি', ২য় বর্ষ, ৪৬সংখ্যা, ২৩জুলাই, ১৯৪৩, পৃঃ৭৮৯ থেকে গৃহীত। 'বছর পঁচিশ' সংকলনে(বিশ্ববাণী প্রকাশনী, কলকাতা, ১৩৮৩বঙ্গাব্দ, পৃঃ৩৫৭) কবিতাটির ভিন্নপাঠ রয়েছে। দৃষ্টান্ত হিসেবে শেষ চার পংক্তির পাঠান্তর নিচে দেওয়া হল:

'অরণি'র পাঠ

বাংলার কাব্যখ্যাত বর্ষার আকাশ যে আভায়
অম্লান, সেই শুভ্র উচ্ছলিতে নীল কর্কশ রোদ।
সেই রৌদ্র বাংলায়, সারা দেশে ছড়ায়---বিরোধি
এথেন্স, ব্রুসেল্স, প্রাগ, চীন, রুশী, আংকোর, জাভায়॥

(চাদের কাতারে)

'বছর পঁচিশ'-এর পাঠ

কাব্যখ্যাত বাংলার বর্ষার আকাশ যে আভায়
ভবিষ্যতে অম্লান, সেই রৌদ্রে নীল কর্কশ রোদ
প্রচণ্ড কালের হাস্যে, ইতিহাসে উদ্বেলিত বোধ
বাংলায় গ্রীসে, রোমে, ফ্রান্সে, চীনে, আংকোরে, জাভায়॥

(১৯৪৩ অকাল বর্ষা)

৪৭। 'অরণি'তে প্রকাশিত কবিতাটির শিরোনাম 'এক পৌষে শীত পালায় না'। এর সঙ্গে উদ্ধৃত কবিতাটির স্তবকবিন্যাস, শব্দবন্ধ, এমনকি ভাবগত সাদৃশ্যও খুব কম, ফলে তা হয়ে উঠেছে সম্পূর্ণ পৃথক একটি কবিতা। এখানে প্রথম দুটি স্তবক উদ্ধার করছি:

ওপারে চলেছে মন্ত্রণা,
এপারে রেলের বাঁধ ভাঙে,
আকাশে মেঘের রক্ত চোখ রাঙে,
মাটিতে নেইকো সান্ত্বনা।
শ্মশানে ক্ষুধার দাম বাড়ে ?
ঘরে চলা বিষম যন্ত্রণা।

দিনরাত কাতারে কাতারে
মাটি বুঝি এ বিষ উগারে।
আদিম ক্ষুধার হাড়ে হাড়ে
বেজে ওঠে শৌখীন উৎসব।
চলিষ্ণু অচল শত শব
গলিতে গলিতে দুয়ারে দুয়ারে।

('এক পৌষে শীত পালায় না', অরণি, শারদীয়া সংখ্যা, ১৯৪৩)

৪৮। হায়াৎ মামুদ, অনূদিত(মূল রুশ থেকে): 'ঠোঁট', পঞ্চাশ জন সোভিয়েত কবি, প্রগতি প্রকাশন, ১৯৭৮, পৃঃ ২৪৩

৪৯। অরুণ সেনঃ বিষ্ণু দে, এ যুগযাত্রায়, অরুণা প্রকাশনী, কলকাতা, ১৩৯০বঙ্গাব্দ, পৃঃ ১৪২
৫০। সমর সেনের কবিতা, সিগনেট প্রেস, কলকাতা, পঞ্চম পরিবর্তিত সংস্করণ, ১৩৮৮বঙ্গাব্দ, পৃঃ১১০
৫১। সুভাষ মুখোপাধ্যায়ঃ শ্রেষ্ঠ কবিতা, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, তৃতীয় পরিবর্তিত সংস্করণ, ১৯৮২, পৃঃ৪৬
৫২। সুকান্ত ভট্টাচার্যঃ সুকান্ত-সমগ্র, সারস্বত লাইব্রেরী, কলকাতা, পঞ্চদশ মুদ্রণ, ১৩৮৯বঙ্গাব্দ, পৃঃ১০৯
৫৩। মঙ্গলাচরণ চট্টোপাধ্যায়ঃ শ্রেষ্ঠ কবিতা, ভারবি, কলকাতা, ১৯৮৩, পৃঃ১৯, ২২
৫৪। দক্ষিণারঞ্জন মিত্রমজুমদারঃ দক্ষিণারঞ্জন রচনাসমগ্র, মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স, কলকাতা, ১৩৮৮ বঙ্গাব্দ, পৃঃ৭০
৫৫। দ্রষ্টব্য ভবানী সেন-এর প্রবন্ধ 'পরিচয়ের পৃষ্ঠপট'।-পরিচয়, সুবর্ণজয়ন্তী-সংকলন, ৫০বর্ষ, মে-জুলাই, ১৯৮১, জ্যৈষ্ঠ-আষাঢ়, ১৩৮৮, পৃঃ২৫৯
৫৬। বুদ্ধদেব বসুকে লেখা রবীন্দ্রনাথের পত্র।-৪সংখ্যক পত্র, বুদ্ধদেব বসুর রচনাসংগ্রহ, তৃতীয় খণ্ড, গ্রন্থালয় প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, বিশেষ সংস্করণ, ১৯৮০, পৃঃ৫৮৩
৫৭। বুদ্ধদেব বসুঃ কালের পুতুল, নিউ এজ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, ১৯৫৯, পৃঃ৭৭
৫৮। আবুসয়ীদ আইয়ুবঃ পথের শেষ কোথায়, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, দ্বিতীয় সংস্করণ, ১৯৮০, পৃঃ৬৪
৫৯। অরুণ সেনঃ বিষ্ণু দে, এ যুগযাত্রায়, অরুণা প্রকাশনী, কলকাতা, ১৩৯০বঙ্গাব্দ, পৃঃ১৫৯
৬০। তদেব, পাদটীকা দ্রষ্টব্য, পৃঃ১৭৫
৬১। অরণি, ৩য় বর্ষ, ১৪সংখ্যা, ১০ ডিসেম্বর, ১৯৪০, পৃঃ
৬২। অরণি, ১ম বর্ষ, ৪০সংখ্যা, ২৯মে, ১৯৪২
৬৩। অরণি, ১ম বর্ষ, ৪৫সংখ্যা, ৩জুলাই, ১৯৪২
৬৪। অরণি, ২য় বর্ষ, ৯সংখ্যা, ২৫সেপ্টেম্বর, ১৯৪২
৬৫। অরণি, ৪র্থবর্ষ, ০২সংখ্যা, ১৩এপ্রিল, ১৯৪৫ , বিশেষ দ্রষ্টব্যঃ'রবীন্দ্রনাথ' বানান ভুল ছাপা, এখানে সংশোধিত বানান দেওয়া হল।
৬৬। অরণি, ২য় বর্ষ, ৩৭সংখ্যা, ২১মে, ১৯৪৩
৬৭। অরণি, ৬ষ্ঠ বর্ষ, ১০সংখ্যা, ১৫নভেম্বর, ১৯৪৬
৬৮। দ্রষ্টব্য জ্যোতি ভট্টাচার্যের প্রবন্ধ 'মার্কসবাদী পার্টি, সাহিত্য ও সাহিত্যিক'।-অগ্রণী, নবপর্যায়, ১ম বর্ষ, ২সংখ্যা, ১৯৮৬
৬৯। অরবিন্দ পোদ্দার, সম্পাদিতঃ শিল্পীর মানুষঃ সমাজতান্ত্রিক বাস্তবতা, বুকমার্ক, কলকাতা, ১৯৮২, পৃঃ১২৪
৭০। Roxburg, Angus, Translated (from the Russian): Marxist-Leninist Aesthetics And The Arts, Progress Publishers, Moscow, 1980, pp.66-7
৭১। অরবিন্দ পোদ্দার, সম্পাদিতঃ শিল্পীর মানুষঃ সমাজতান্ত্রিক বাস্তবতা, বুকমার্ক, কলকাতা, ১৯৮২, পৃঃ৯৪

৭২। তদেব, পৃঃ৬৯-৭০

৭৩। বিষ্ণু দেঃ'আধুনিক কাব্য', সেকাল থেকে একাল, বিশ্ববাণী প্রকাশনী, কলকাতা, ১৯৮০, পৃঃ১২৪-২৫

৭৪। পরিচয় (বিষ্ণু দে-র সত্তর বর্ষ পূর্তি সংখ্যা) ৪৮বর্ষ, ১০-১২সংখ্যা, বৈশাখ-আষাঢ় ১৩৮৫, মে-জুলাই১৯৭৯

৭৫। দ্রষ্টব্য অরুণ মিত্রের প্রবন্ধ 'পথ এবং পার'।-পরিচয়, সুবর্ণজয়ন্তী সংকলন, মে-জুলাই ১৯৮১, জ্যৈষ্ঠ-আষাঢ় ১৩৮৮

৭৬। Marilyn, Rosenthal : Poetry of the Spanish Civil War, New York University Press, New York, 1975, p. 305

৭৭। দ্রষ্টব্য অরুণ মিত্রের প্রবন্ধ 'পথ এবং পার'।-পরিচয় সুবর্ণজয়ন্তী সংকলন, মে-জুলাই১৯৮১, জ্যৈষ্ঠ-আষাঢ় ১৩৮৮

৭৮। বিষ্ণু দেঃ জনসাধারণের রুচি, বিশ্ববাণী প্রকাশনী, কলকাতা, ১৯৭৫, পৃঃ১০৬-০৭

৭৯। সুভাষ মুখোপাধ্যায়, অনুদিতঃ পাবলো নেরুদার বারো কবিতা, বিশ্ববাণী প্রকাশনী, কলকাতা, ১৩৮৭ বঙ্গাব্দ, পৃঃ৫৯,৫৬

৮০। শঙ্খ ঘোষঃ 'রুচির সমগ্রতা', শব্দ আর সত্য, প্যাপিরাস, কলকাতা, ১৯৮২, পৃঃ৭৪

৮১। Bose, Buddhadeva : An Acre of Green Grass, Papyrus, Calcutta, Papyrus Reprint Series II, 1982, p. 63

৮২। Ibid, p. 64

৮৩। Ford, Hugh D : 'A Poets' War : British Poets And The Spanish Civil War,' University of Pensylvania Press, Philadelphia, 1965, pp. 101-02

৮৪। বুদ্ধদেব বসুঃ কালের পুতুল, নিউ এজ পাবলিশার্স, কলকাতা, ১৯৫৯, পৃঃ৭৮

৮৫। অরুণ সেনঃ 'অরুণ সেনকে লেখা চঞ্চল চট্টোপাধ্যায়ের পত্র', ১৩ ও ১৪সং পাদটীকা, বিষ্ণু দে, এ প্রত্যাবায়, অরুণা প্রকাশনী, কলকাতা, ১৩৯০বঙ্গাব্দ, পৃঃ১৯০

৮৬। বিষ্ণু দেঃ যামিনী রায়, আশা প্রকাশনী, কলকাতা, ১৩৮৪বঙ্গাব্দ, পৃঃ১৪১

৮৭। তদেব, পৃঃ৩৮

সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের কবিতা

(জন্ম: ১৯১৯খ্রীষ্টাব্দ)

...'রবীন্দ্রনাথের উপনিষদে বিশ্বাসের বা এলিয়টের বিশিষ্ট খ্রীষ্টীয় ধর্মমতে বিশ্বাসের অংশীদার না হয়েও যদি তাঁদের কবিতার কোনো রসে আমাদের বাধা না হয়ে থাকে, তাহলে সাম্যবাদী দলের রাজনীতিতে অবিশ্বাসী হয়ে সেই মতে বিশ্বাসী কবির কাব্যাস্বাদনে বাধা কোথায় ? ধর্মমত বা দর্শন যদি কবিতার প্রেরণা যোগাতে পারে, তাহলে রাজনৈতিক মতবাদ বা নয় কেন ?'

---অশ্রুকুমার সিকদার

আধুনিক কবিতার দিগ্বলয়, সিগনেট বুকশপ, কলকাতা, দ্বিতীয় সংস্করণ, ১৩৮৬বঙ্গাব্দ, পৃঃ২৪৯

নেপথ্য পটভূমি ও সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের শিল্পতত্ত্ব:

প্রগতি সাহিত্য আন্দোলনে সুকুমার শিল্পকলার যে ক'টি দিক নিশ্চিত প্রতিশ্রুতি ও উজ্জ্বল উদ্ভাসনে ব্যাপ্তির দিগন্ত স্পর্শ করেছে, কবিতা অবশ্যই তার অন্যতম। আর সুভাষ মুখোপাধ্যায়ই সেই ব্যক্তি যাঁর অনন্য কবি-ব্যক্তিত্ব এই আন্দোলনকে প্রথম থেকেই একটি সুস্পষ্ট লক্ষ্যের দিকে অগ্রচারী করে তোলবার প্রয়াসে এবং নিষ্ঠাভরে ব্রতী হয়েছে। তিরিশের ও চল্লিশের দশকজুড়ে কবিতার নতুন সম্ভাবনা যাঁরা আবিষ্কার করতে চেয়েছিলেন, সুভাষ ছিলেন তাঁদেরও সহযোদ্ধা। তাঁর বিপ্লবী জীবন-দর্শন, বৈপ্লবিক-আদর্শ, জন-সংলগ্ন অকৃত্রিম ভাবাবেগ---বলতে গেলে তাঁর কবিতার সূত্রে বাংলা আধুনিক কবিতারই চরিত্র বদলে দিয়েছে। এই বদল খানিকটা আকস্মিক মনে হতে পারে। কারণ, বাংলা সাহিত্যে আধুনিকতার জন্মই হয়েছিল কয়েকটি স্থিতিশীল ধ্রুব আদর্শকে সামনে রেখে। সনাতন মূল্যবোধের প্রতি একই সঙ্গে আস্থা ও সংশয়, যৌনগন্ধী প্রেম ও বিশুদ্ধ প্রেম, সামাজিক-জীবনে অবক্ষয় ও হতাশা, ব্যক্তির আত্মগ্লানি ও কুণ্ঠা, কোথাও উল্লাস ও অতৃপ্ততা---ভারতীয় জীবনে এনে দিয়েছিল সর্বব্যাপক দ্বিধা-দ্বন্দ্ব, এ রকম আধুনিকতার, কিন্তু এর মূল কারণ অনুসন্ধানের বা এষণার

অভিপ্রায় কখনও সুস্পষ্টভাবে থাকে নি তাদের কণ্ঠস্বরে, অথবা বিশ্বের বিভিন্ন পটভূমিতে জন-কোলাহলের তরঙ্গবিক্ষেপ আন্দোলিত করে তোলে নি এদেশের সাহিত্যিক আর শিল্পীর ভূমি-জনপদকে, অন্তত একটা বিশেষ সময় পর্যন্ত। একা রবীন্দ্রনাথই ব্যতিক্রম: 'আমি পৃথিবীর কবি, যেথা তার যত উঠে ধ্বনি/ আমার বাঁশির সুরে সাড়া তার জাগিবে তখনি।' (ঐকতান)। এই বিশ্ববোধ ও ব্যাপকভাবে গড়ে ওঠে নি আমাদের দেশের মনে ও মননে। আমাদের দেশের অগ্রণী আধুনিক কবিরা মূলত ইঙ্গ-মার্কিন আধুনিকবাদের দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিলেন---সে আধুনিকতাবাদের জন্ম প্রধানত ধনতন্ত্রের সংকট থেকে। কিন্তু অন্যত্র যে বিপ্লবী আধুনিকবাদ প্রতিষ্ঠা পেয়েছিল রুশ দেশে, জার্মানিতে, ফরাসী ও ল্যাটিন আমেরিকায়, সে বিষয়ে বাঙালি কবিরা সচেতন ছিলেন না। মায়াকোভস্কি, এলুয়ার, আরাগঁ, নেরুদা লোরকা বা নাজিম হিকমত (তুর্কি) প্রমুখরা স্বতন্ত্র আধুনিকবাদের জন্ম দিয়েছিলেন অথচ বাঙালি আধুনিক কবিদের অনেকেই ছিলেন এ বিষয়ে অ-সচেতন, ব্যতিক্রম সম্ভবত বিষ্ণু দে। এই বিপ্লবী আধুনিকতার ধারা বাংলায় তার যোগ্য প্রবক্তা পেল সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের মধ্যে। বাস্তবিক, এদেশে প্রগতি লেখক সংঘ গড়ে ওঠার পর মার্কসবাদী চিন্তা-চেতনা বুদ্ধিজীবীদের নানাভাবে আকৃষ্ট করে এক নতুন সমাজ গড়ে তোলবার সম্ভাবনা ও স্বপ্নকে রূপায়ণের দিকে নিয়ে যায়---নিয়ে যায় নিজের হাতে নিজের ভবিষ্যৎ নির্মাণের দিকে, ফলে এতদিনের প্রসাদসিদ্ধ সাহিত্যিক প্রাসাদের চীনা-প্রাচীর আর দুর্ভেদ্য থাকে না, ভেঙে পড়ে, আগুন-শোণিত চিত্ত অবধি নড়ে ওঠে চকিত ভূমিকম্পের দুরন্তপনায়। আসলে এতদিনের ঘুমন্তের মূলে আঘাত হানবার সুচতুর প্রবৃত্তি এইভাবে ছুঁড়ে দেওয়া হয়---সাহিত্যিক-শিল্পীর সামাজিক কোন দায় আছে কি না? সুভাষ মুখোপাধ্যায়কে মূলত এ প্রশ্ন করতেই হয় নি, ভাবের সংসারে পা দিতে-না-দিতেই তাঁকে সেই বিশেষ দায়িত্বটি কাঁধে নিয়ে ঘোষণা করতে হয়েছে--- 'শতাব্দী-লাঞ্ছিত আর্তের কান্না', অতএব 'মৃত্যুর ভয়ে ভীরু ব'সে থাকা আর না'---তাহলে কবির এখন করণীয় কি? একজন মধ্যবিত্ত ঘরের ছেলে, যিনি কলম ছাড়া আর কিছু হাতে ধরেন নি, তিনি কী করতে পারেন? সুভাষ ইতিমধ্যেই এসব প্রশ্নের উত্তর জেনেছেন, জেনেছেন যে একজন কবিও সামাজিক সদস্য, বিপদের দিনে তাঁরও কিছু করণীয় রয়েছে, আর সেইজন্যেই তাঁর নির্দ্বিধ আহ্বান: 'পরো পরো যুদ্ধের সজ্জা'। এই আহ্বান পাঠকের দিকেই শুধু ছুঁড়ে দেওয়া হয় নি, এই প্রস্তুতিতে কবিরও সক্রিয় ভূমিকা। আর এভাবেই সামাজিক দায় কাঁধে নিয়ে সামরিক কায়দায় হেঁটে যাবেন কবি সমূহ বিপর্যয়ের হাত থেকে জনগণকে মুক্ত করতে, মানুষকে ভরসার কথা শোনাতে। নিছক কর্তব্যবোধে নয়, জনগণের প্রতি অপরিমেয় ভালবাসায়।

ভালবাসার সঙ্গে জড়িয়ে কর্তব্যবোধ যেসব কবিতার জন্ম দেয়, দায়বদ্ধতাই যেসব কবিতার প্রেরণা-স্থল, সেইসব কবিতা কি শ্রেষ্ঠ শিল্পসৃষ্টি হিসেবে গণ্য হয় নি? বস্তুত এই প্রশ্নের সামনাসামনি দাঁড়িয়ে প্রগতিশীল কবিরা তার যথা-উত্তর খোঁজার চেষ্টা করেছেন। 'আফ্রিকা' কবিতা কি দায়বদ্ধতার কবিতা নয়?[১] রবীন্দ্রনাথের এই কবিতাই প্রমাণ করে দায়বদ্ধতার কবিতা মানে উৎকর্ষগুণ বিবর্জিত অপচেষ্টা নয়, নয় শ্লোগানসর্বস্বতা। ব্যক্তির অন্তর্জগতের দিকে প্রগতিশীল কবিরা তাকান নি, বহির্মুখী সমাজব্যবস্থার বাইরে এবং ভেতরে সর্বক্ষণ যে দুটি শ্রেণীর আধিপত্য সংরক্ষণের জন্যে সংঘর্ষ চলছে -- তারই ক্রিয়াশীল অভিব্যক্তিগুলি কবিকে অবিরাম আঘাত ও প্রত্যাঘাত করে চলে, ফলে সৃষ্টির উৎসমুখ যায় খুলে, আর প্রগতিশীল কবির সহানুভূতি ও সমর্থন স্বতধারায় বর্ষিত হতে থাকে তাদেরই প্রতি যারা এই সমাজব্যবস্থার ভারবহনকারী অথচ ভারবহনের যোগ্য সম্মান থেকে বঞ্চিত। সংখ্যার দিক থেকে পরিমাণের দিক থেকে তারাই বেশি। বলা বাহুল্য, সুভাষ মুখোপাধ্যায় প্রথম থেকেই এই জীবনদর্শনে অনুরাগী ও উৎসুক। জনগণ আর জনগণের সংগ্রামই তাঁর কাব্য-কবিতার মৌলিক প্রেরণা। তাঁর কাব্যের উপকরণ। কাজেই সুভাষের বক্তব্যেও মিলবে মাও সে-তুঙের বক্তব্যের সাদৃশ্য ও প্রতিধ্বনি:

'The problem of class stand. Our stand is that of the proletariat and of the masses.'[২]

প্রলেতারিয়েত শ্রেণী আর জনগণের শ্রেণী-সংগ্রামই এক্ষেত্রে সুভাষের মুখ্য বিষয়-উপকরণ হওয়ায় তার উদ্দেশ্য, তার আদর্শ, তার অন্তর্নিহিত তাৎপর্য একটি সুনির্দিষ্ট কেন্দ্রে রূপরচনা করবে, এ কথাও স্বীকার্য। এজন্যে কেউ কেউ একদেশদর্শিতার অভিযোগ আনবেন এ কথাও ঠিক। তা সত্ত্বেও সুভাষের একটি বৈশিষ্ট্য হল বক্তব্য একদেশদর্শিতার মধ্যেও সুনিপুণ দক্ষতায় বিষয়-উপকরণে বৈচিত্র্য সন্নিবেশের ও আঙ্গিককলার চর্চায় একনিষ্ঠ অভিনিবেশ প্রদর্শনের। মার্কসবাদীদের কাছে যিনি নিজেকে 'reactionary'[৩] হিসেবে গণ্য করেন সেই বুদ্ধদেব বসু সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের কাব্যপ্রতিভার প্রতি রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টি আকর্ষণ করে লেখেন "আমি নিজে সুভাষের কবিতার বিশেষ অনুরাগী, এত অল্প বয়সে এতখানি শক্তির প্রকাশ আমার তো বিস্ময়কর মনে হয়।'[৪] বুদ্ধদেব বসু এই শক্তির প্রকাশ লক্ষ্য করেছিলেন বিষয়ের ভেতরে নয়, বক্তব্যে নয়, শুধু রচনাগত চাতুর্যে, ছন্দ ও প্রকরণের আঙ্গিক কাঠামোয়। কারণ, তিনি কবিতায় রাজনীতি পছন্দ করেন না, মানেন না, তাঁর ভাষায়: 'আমি স্থিতি চাই, শান্তি চাই, জীবনের ধ্রুব আদর্শ চাই', অবশ্য নরেশ গুহকে লেখা এই পত্রে এও স্বীকার করেন, 'আমার মন ঠিক তত্ত্বদর্শীর নয়'[৫]---একজন বুদ্ধিজীবী সমালোচকের আঘাত-বিরোধী উক্তি সঠিক সমালোচনার মানদণ্ড

নির্ধারণের পক্ষে অত্যন্ত অনুপযোগী। এই খণ্ডিত দৃষ্টিভঙ্গির আলোকে তাই সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের কাব্য-বিচার অসমীচীন। প্রগতি সাহিত্য আন্দোলনের অন্যতম সক্রিয় সদস্য হিসেবে তাঁর কাব্য-বিচার তাই আমাদের কাছে অত্যন্ত সতর্কতা দাবি করে।

প্রথমেই মনে রাখতে হয়, তিনি কমিউনিস্ট পার্টির সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত এবং সক্রিয় রাজনীতিতে বিশ্বাসী। কেবল লেনিন নন, পার্টি-কর্মী মাত্রেই বিশ্বাস করেন যে, সাহিত্যকে হতে হবে পার্টি-সাহিত্য। মনে করেন, বুর্জোয়া রীতি-নীতির বিপরীতে সমাজতান্ত্রিক প্রলেতারিয়েতকে পেশ করতে হবে এই পার্টি-সাহিত্যের নীতি। প্রলেতারিয়েতের সামগ্রিক কর্মকাণ্ডের অংশরূপে সাহিত্যকে দেখাই হল একজন কমিউনিস্ট কর্মীর লক্ষ্য। লেনিনীয় এই প্রত্যয়[৬] সম্পর্কে সুভাষের মধ্যেও কোন দ্বিধা নেই। শিল্পের ক্ষেত্রে পার্টি-নীতির প্রবক্তা হিসেবে বারাবাশ(Barabash)-এর বক্তব্য এখানে উদ্ধৃত করা অবান্তর হবে না: The principles of Party guidance of art are not at all merely a list of recipes and instructions to be applied to every case (as our ideological opponents try to assert), for this guidance itself is alive, developing and creative.

The Leninist Party guidance of art consists above all in methods of persuation and ideological education. The Party organisations see the point of their activity not in the creation of a self-contained system of various prohibitions and limitations — anti-communists and opportunists of various shades of opinion would have us believe — but first and foremost in trying to carry the artist with us and help his talent develop in a fruitful direction.

শিল্পের ক্ষেত্রে পার্টি-নির্দেশনা কেমন হবে ? বলছেন : 'to draw artists into the very thick of social life, to make them full and deeply interested participants in the common cause, to inspire them with the noble goal of serving the people and transforming the world, and to ensure wide scope for bold innovations on the basis of socialist realism and the Leninist principles of the Party spirit and closeness to the people in art.'[৭]

এই তাত্ত্বিক ভিত্তির ওপরে দাঁড়িয়ে আছে সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের কবিতা।

গণমুখিতা ও সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের কবিতাঃ

১৯৫০খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে তাঁর তিনটি উল্লেখযোগ্য কাব্যগ্রন্থ, যথাক্রমে 'পদাতিক' (১৯৪০), 'চিরকুট' (১৯৫০) ও 'অগ্নিকোণ' (১৯৪৮) প্রকাশিত হয় যাতে সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের বিপ্লবী মনন আশ্চর্যরকম ঝলসে উঠেছে। জনগণের কবি হয়ে ওঠার সবরকমের উপাদান তাঁর ভান্ডারে মজুত। সমর সেন কিংবা বিষ্ণু দে-র গলায় থেকে-থেকেই হতাশা ও বিষাদের, এমনকি নৈঃসঙ্গ্যের সুর ধরে পড়েছে, কিন্তু সুভাষের বেলায় প্রথম থেকেই এ বিষয়ে যথেষ্ট সতর্কতা দেখা যায়। সুকান্তের প্রথম দিককার কবিতাতেও (কমিউনিস্ট পার্টির সঙ্গে যুক্ত হওয়ার আগে) কমবেশি নৈরাশ্যের একটা অন্ধকার দিক আছে। সুভাষ মুখোপাধ্যায় প্রথম থেকেই নতুন সূর্যের সন্ধানী, জনগণকে টেনে আনতে চেয়েছেন সমাজতান্ত্রিক চিন্তার আলোর বৃত্তে, জাগিয়ে তুলতে চেয়েছেন পুঁজিবাদী ব্যবস্থার সার্বিক অবক্ষয়ের বিরুদ্ধে, সমষ্টির স্বার্থকে প্রতিপাদ্য করে সামাজিক-রাজনৈতিক সমূহ অন্যায়ের বিরুদ্ধে লড়াই করার একটি প্রেক্ষাপট পূর্বনির্দিষ্ট করে দিয়েছেন। সুভাষ মুখোপাধ্যায় শ্রমজীবী মানুষের আন্দোলনের অংশীদার হিসেবে আর্ত মানুষের খুব কাছাকাছি আসতে পেরেছিলেন, তাঁদের দুঃখ ও বেদনা, অপমান ও লাঞ্ছনা উপলব্ধি করতে সমর্থ হয়েছিলেন, আর সেইজন্যে তাঁর আহ্বান বরাবর জনগণের সপক্ষে ধ্বনিত হয়ে গিয়ে কখনও দ্বিধা-থরোথরো হয় নি---

শতাব্দী লাঞ্ছিত আর্তের কান্না
প্রতি নিঃশ্বাসে আনে লজ্জা,
মৃত্যুর ভয়ে ভীরু ব'সে থাকা, আর না---
পরো পরো যুদ্ধের সজ্জা।

(মে-দিনের কবিতা)

সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গে জনগণের দূরত্ব এ-কবিতায় একটু রয়েই গেছে, কিন্তু অনতিবিলম্বে তিনি জনগণের সঙ্গে একাত্ম হয়ে উঠেছেন 'আমরা' সর্বনামটি ব্যবহারের মধ্য দিয়েঃ 'অগ্নিবর্ণ সংগ্রামের পরে প্রতীক্ষায় /এক দ্বিতীয় বসন্ত। আর/পতিতজন পৃথিবীতে আমরা রেখে যাবো/সংক্রামক স্বাস্থ্যের উল্লাস।' (পদাতিক)। সংগ্রামের কথার চেয়েও সকলবর্গের ও জনগণের সঙ্গে একাত্মতার আকাঙ্ক্ষা এ কবিতায় বিশিষ্ট সম্পদ। মৃত্যুভয় থেকে উদ্ধার করে সংগ্রামের পথে চালনাই শুধু নয়, পৃথিবীতে রেখে

যেতে হবে 'প্রাণের উল্লাস'। সমষ্টিগত স্বার্থই এর প্রধান কথা। রবীন্দ্রনাথ এই গণশ্রেণীর একটি চরিত্রাবয়ব দিয়েছিলেন 'এবারে ফিরাও মোরে' কবিতায়---

ওই-যে দাঁড়ায়ে নতশির
মূক সবে, ম্লানমুখে লেখা শুধু শত শতাব্দীর
বেদনার করুণ কাহিনী, স্কন্ধে যত চাপে ভার
বহি চলে মন্দগতি যতক্ষণ থাকে প্রাণ তার---
তার পরে সন্তানেরে দিয়ে যায় বংশ বংশ ধরি,
নাহি ভর্ৎসে অদৃষ্টেরে, নাহি নিন্দে দেবতারে স্মরি,
মানবেরে নাহি দেয় দোষ, নাহি জানে অভিমান,
শুধু দুটি অন্ন খুঁটি কোনোমতে কষ্টক্লিষ্ট প্রাণ
রেখে দেয় বাঁচাইয়া। সে অন্ন যখন কেহ কাড়ে,
সে প্রাণে আঘাত দেয় গর্বান্ধ নিষ্ঠুর অত্যাচারে,
নাহি জানে কার দ্বারে দাঁড়াইবে বিচারের আশে,
দরিদ্রের ভগবানে বারেক ডাকিয়া দীর্ঘশ্বাসে
মরে সে নীরবে।

('এবারে ফিরাও মোরে', চিত্রা)

রবীন্দ্র-কাব্যে এইসব চরিত্র বিদ্রোহে-সংঘর্ষে-দ্বন্দ্বে বিক্ষত হয়েছে, কিন্তু সংগ্রামের কঠিন শপথ এরা গ্রহণ করে নি, সমাজতান্ত্রিক পৃথিবীর সুন্দর স্বপ্নও এদের চোখে আঁকা হয় নি, অত্যাচারীর বিরুদ্ধে অত্যাচারিতের সংগ্রামও যে ন্যায়সঙ্গত, সে কথাও তারা ভাল করে উপলব্ধি করতে পেরে নি। এই বৈপরীত্যে দাঁড়িয়ে প্রগতিশীল সাহিত্যিকদের ক্রিয়াশীল মন ও নয়ন খুঁজে ফিরেছে জনগণের সেই শপথমুখর সংগ্রামশীল চারিত্র্য-অবয়ব, সুভাষ এই সক্রিয়মূর্তির সন্ধানে তাই বারংবার ফিরেছেন। কিন্তু কবিতা হচ্ছে সেই শিল্প যাতে নাটক বা উপন্যাসের মত কাহিনীসংস্থানের, ঘটনাধারাস্পর্শের ক্রি চরিত্র-বিকাশের প্রত্যক্ষতাকে স্পর্শের খুব কাছাকাছি টেনে আনা যায় না, বরং ইঙ্গিত, সংকেত, দু'একটি ছবি বা চিত্রকল্প বা উজ্জ্বল সংক্ষিপ্ততার মধ্য দিয়ে অনুভূতিতে পরোক্ষভাবে সঞ্চার করতে হয় একটি ভাবের বা 'আইডিয়া'র বিবিক্ত ঐক্যকে। কিন্তু বক্তব্যধর্মী কবিতায় রূপনির্মিতির অবকাশ কম থাকায় এই ভাব বা 'আইডিয়া'কে প্রগতিশীল কবিরা সরাসরি উপস্থাপন করেছেন সরল বাচনভঙ্গিতে।

এরকম উপস্থাপনায় কৌশলসর্বস্ব কারুকার্যের বালাই নেই, অতএব আবেদন জোরালো না হলে পাঠকের একটা দ্বিধা থেকেই যায়। যখন সুভাষ মুখোপাধ্যায় কৃষক ও মজুরকে সঙ্গে নিয়ে এগিয়ে যেতে চান, তখন তাতে সৃষ্টির সূক্ষ্মতা প্রকাশ পায় না, বরং তা আরও প্রত্যক্ষ ভাষণের দ্বারা বক্তব্যের বলিষ্ঠ দিকেই প্রকাশ করে। যেমন--- 'কৃষক, মজুর! আজকে তোমার পাশাপাশি/মিলিত মন আমরা। বন্ধু, সামনে চলো--/সবাই আমরা নিজবাসভূমে পরবাসী,/এই পোড়াচর মনকে কেবল শপথ বলো।' (কানামাছির গান)। কৃষক ও মজুরের স্বার্থের সঙ্গে মধ্যবিত্তশ্রেণী ও পেটি-বুর্জোয়াদেরও স্বার্থ জড়িয়ে আছে, কৃষক ও মজুরের নেতৃত্বই এই শ্রেণীবিভক্ত সমাজব্যবস্থার বদল ঘটিয়ে নতুন সমাজের পত্তন করতে পারে, তাদেরই যোগ্য নেতৃত্ব সমস্তরকমের দ্বিধা ও দ্বন্দ্বের অবসান ঘটিয়ে 'নিজবাসভূমে' প্রবাসীর যন্ত্রণা লাঘব করতে পারে-- এই বক্তব্যটুকুতে নিরেট সদ্যপনা যতটা, কাব্যের ভাগ তার চেয়ে কম। প্রগতি সাহিত্য আন্দোলনে এসব ভাবনা যথেষ্ট ভাবা হয়েছে, প্রশ্ন উঠেছে, সংশয় ও বিতর্কও প্রকাশ পেয়েছে। তবুও লক্ষ করা গেছে যে, এই আন্দোলনে সহজ বিবৃতি-ধর্মিতাকে কেউ অস্বীকার করতে পারেন নি। বিষ্ণু দে কিংবা সমর সেনের রচনায় এই পর্বের ছাপ আরও স্পষ্ট। আসলে জনগণের কাছে কবিরা তাঁদের বক্তব্য পৌঁছে দিতে গিয়ে এমন সরলধর্মী রচনার আশ্রয় নিয়েছেন যা রবীন্দ্রনাথের মধ্যেও দেখা গেছে। সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের কাছে এই জনগণ একটু নতুনভাবেই উপস্থিত, যেমনঃ 'ভাড়িখানা খোলা, রাস্তায় বাতি/লোকের মেলা।/মুখর ঠাঁয়ে।/কারো অন্তরে নেশা কাড়ে শেষ/কপর্দকও।/বহুদিনকার ভুলে-যাওয়া প্রাণ,/পুরানো ভিটে/স্মরণে আসে।' (এখানে)। ধনবাদী ব্যবস্থায় শোষণকর্তার শ্রমজীবী মানুষ এই ভিতে অঙ্কিত দেওয়ালে পিঠ ঠেকেছে, সব কিছু হারিয়ে এই মানুষ এখন আশা-ভরসাহীন অবস্থায় নেশার আশ্রয় নিয়েছে। যুব-সম্প্রদায়ের মধ্যেও জনগণের এই একই মুখচ্ছবি এঁকেছেন সুভাষঃ 'আমরা বেকার, ঘর নেই, এই দুর্যোগে/মন বিষণ্ণ, শরীর টিকছে উপবাসে।/নিরস্ত্র হাত, অসহায় মুষ্টি তুলি ক্রোধে---/নিরুপায়ে চাই আকাশে, দৈবে নেই আশা।' (ঘরে বাইরে)। জনগণের বৃহত্তম অংশই হল কৃষক, কবির চোখে তার চিত্রঃ 'অনগ্রস্ত চাষীদের ঘরে ঘরে দুর্ভিক্ষ ঘোষণা/বিষম বিক্ষোভ, তাই/বাড়ে কাটে না মাটি দুর্বল দুহাতে শুধু খুঁড়ি।/বস্তির পতিত প্রান্তে ওঠে হাঁই---/অসহায় জীর্ণ ঘরে উপবাসী মৃত্যুর ভ্রুকুটি।' (আহ্বান)। গ্রামীণ জীবনে সাধারণ বৃত্তিজীবীর অবস্থাঃ 'তাঁতি তাঁত বোনে নাকো,/কভু আর কোথায় মা বাবি,/কুমোরের ঘরে চাবি,/তাঁত বন্ধ, নিরুদ্দেশ হয়েছে দোকানী,/হাতুড়ি বিকিয়ে হাটে/ভস্ম মেখে পড়ে থাকে বেকার মানুষ।' (সুগত)। এই সব শোষণকর্তার মূর্তি তুলে জনগণের সামনে

চেহারা। জনগণের এমন চেহারা কেবল ভারতবর্ষ জুড়েই তো নয়, বিশ্বের নানা দেশজুড়েই তাদের চেহারা প্রায় একইরকম। সমস্যাটির মূলে আর্থ-সামাজিক ও আর্থ-রাজনৈতিক কারণগুলি বিদ্যমান। শোষিত মানুষের কাছে বিশ্বের অন্যপ্রান্তের শোষিত মানুষে কোন ভেদ নেই। তাই একের বিপদে অন্যের সহানুভূতি ও দরদ, আর এভাবেই সুভাষের দেশীয় জনগণ রবারের বনে কিংবা মশলার দ্বীপে সংগ্রামরত জনগণের সঙ্গে একাত্মবোধ করে, প্রেরণা সংগ্রহ করে মুক্তির লক্ষ্যে এগিয়ে যায়। প্রগতি সাহিত্য আন্দোলন আন্তর্জাতিক চিন্তার এমন প্রসারিত পরিমণ্ডল গড়ে তুলে দিয়ে বাংলা কাব্যে সংযোজিত করে একটি নতুন গুণগত মাত্রা যা এই দশকের অধিকাংশ কবির মধ্যেই লক্ষ করা যায়। সুভাষ বলেছেন: 'বনেজঙ্গলে খটখট করে প্রতিধ্বনি শোনার পাখা।/কাঁধের জোয়াল ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে/ধনুকের মত বাঁকা পিঠগুলো/টান ক'রে খাড়া দাঁড়ায়/পেরাকে সেমাঙে টিনের খনিতে/রবারের বনে/মশলার দ্বীপে/সোনালি ইরাবতীর দু'ধারে/উপত্যকায়/বদ্বীপে নীলকান্ত মণির/ঝিকিমিকি দেশে/শ্যামে, কম্বোজে/আনামী পাহাড়ে/মেকং নদীর বানভাসা জলে/ঘুম-ভেঙে-ওঠা অগ্নিকোণের মানুষ।' (অগ্নিকোণ)। আগেই আমরা উল্লেখ করেছি যে, রবীন্দ্রনাথের হাতে জনগণের যে মূর্তি অঙ্কিত হয়েছে, সুভাষের চিত্রণ তার চেয়ে আলাদা এবং এর বৈশিষ্ট্যই হল সংগ্রামশীলতা, ভয়-ভাঙা ভয়-হারা মানুষের অধিকার-সচেতনতা, সংহতি ও সংঘবদ্ধতার প্রতি নিবিড় আসক্তি।

নাজিম হিকমতের সঙ্গে সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের জনতা'র একটা মৌলিক মিল খুঁজে পাওয়া দুষ্কর নয়। হিকমতের জনগণ ও দুঃখে দীর্ণ কিন্তু প্রতিবাদে মুখর: '...যারা মাটির পিঁপড়ের মত/সমুদ্রের মাছের মত, আকাশের পাখির মত অগণিত,/যারা ভীরু, যারা বীর/যারা নিরক্ষর, যারা শিক্ষিত/যারা শিশুর মত সরল/যারা ধ্বংস করে/যারা সৃষ্টি করে'[৮] (আমি জেলে যাবার পর)---এই জনগণ, হিকমতের কাছে, সভ্যতার উৎস-শক্তির ধারক-বাহক। হিকমতের জনতার আর এক মূর্তি:

> 'Our men are dying in the struggle
> - Yet how they deserved to live ——
> Our men ary dying
> —— So many of them
> As if with their songs and flags
> they were out for a parade on a holiday
> So young
> So reckless...'[৯]
> (About Victory)

নাজিম হিকমতের সঙ্গে সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের মিল শুধু জনতার সাদৃশ্য-উপলব্ধিতেই নয়, মিল দেখতে পাই সুভাষের কবিসত্তা আর রাজনৈতিক কর্মীসত্তার অভূতপূর্ব মিলনের সাদৃশ্যেও---স্যামুয়েল সাইলেন হিকমতসম্পর্কে বলতে গিয়ে বলেছিলেন, 'There is no division between Hikmet, the political poet and Hikmet the lyrical poet. আরও বলেছিলেন ,'With consummate artistry he has achieved that synthesis of the fighter and the creator, the distinct individual and the representative man of the masses, which is the hall mark of greatness in our time.'[১০]

প্রসঙ্গত বলা দরকার, হিকমতের সঙ্গে একরকম সাধর্ম্য কবি সুকান্ত ও সুভাষের সত্তার সঙ্গে যতখানি, প্রগতি সাহিত্য আন্দোলনের অংশীদার অন্যান্য কবিদের সঙ্গে ততটা নয়। হিকমতের মধ্যে দুটি সত্তার সমন্বয়ই হল প্রধান কথা। সুভাষের মধ্যেও তাই, কিন্তু তাঁর স্বকীয়তা বিশিষ্ট বাচনভঙ্গিতে ও কবিতার রচনাশৈলী নির্মাণের ক্ষেত্রে অত্যন্ত স্পষ্ট। তুরস্কের হিকমত সেসব কৌশলের ধার ধারেন নি, বেছে নিয়েছিলেন রুশ কবি মায়াকভস্কির মত 'directness' এবং 'strong accent' যা তাঁদের জনগণকে নেতৃত্ব দিতে সক্ষম করে তুলেছে। বলা বাহুল্য যে, নেতৃত্ব ও জনপ্রিয়তার দিক থেকে নাজিম হিকমতের যে আন্তর্জাতিক গুরুত্ব রয়েছে, সুভাষের সঙ্গে তার তুলনাই অবান্তর। তবু, বাংলাদেশের মত এক অনতিবিশাল পটভূমিকায় সুভাষের কবিতা ও গান যেভাবে সাড়া জাগিয়েছে, বৈপ্লবিক যে প্রেরণা সঞ্চার করেছে গ্রামে বা শহরে, আমাদের সাহিত্যের ইতিহাসে তা বিরলদৃষ্টান্ত। 'অরণি', 'জনযুদ্ধ', 'পরিচয়'---কমিউনিস্ট পার্টির দ্বারা পরিচালিত এইসব পত্র-পত্রিকার সঙ্গে তিনি নিবিড়সংশ্লিষ্ট ছিলেন, 'জনযুদ্ধে'র 'রিপোর্টিং' লেখার কাজেও তাঁকে অংশগ্রহণ করে গাঁয়ে-গঞ্জে ঘুরতে হয়েছে, ঘুরতে হয়েছে ছাত্রআন্দোলনের মিছিলে ও সমাবেশে, যোগদান করতে হয়েছে মাঠে ও ময়দানের সভায়, প্রগতি লেখক সংঘকে উজ্জীবিত করবার কাজে আত্মনিয়োগ করতে হয়েছে---এসবই সুভাষের কর্মীজীবনের দৈনন্দিন ঘটনা।

এতসব সত্ত্বেও আমাদের মনে হয়, সুভাষের কবিতা নাগরিক বৈদগ্ধ্যের আড়াল সম্পূর্ণ সরিয়ে ফেলতে পারে নি, তাই গ্রামীণ সারল্যের পাশাপাশি তাঁর কাব্যে নগর এসে উঁকি দিয়েছে। এটা হয়েছে সম্ভবত

তিনি নিজে কলকাতার মধ্যবিত্তশ্রেণীর মানুষ বলেই।

সমর সেনও কলকাতাকেন্দ্রিক জীবনকে আশ্রয় করে কাব্যরচনা করেছেন। এই মহানগরীর বাইরে বড় একটা যান নি তিনি, মাঝে মাঝে অবশ্য সাঁওতাল পল্লীর বাতাসে মহুয়া ফুলের গন্ধে নস্টালজিয়ার অনুভূতিতে আক্রান্ত হয়েছেন। তার বেশি নয়। কিন্তু সুভাষ গোড়ার দিক থেকে ভিন্ন ধরনের অনুভূতি নিয়ে গ্রামবাংলাকে প্রত্যক্ষ করেছেন। গ্রামের কথা যেখানে বলেছেন সুভাষ, সেখানে গ্রাম কথা কয়ে উঠেছে ঠিকই, কিন্তু আড়ালে নাগরিকতার ছাপও অস্পষ্ট থাকে নি। তবু, নগরজীবন ও গ্রামজীবনের বৈদগ্ধ্য ও সারল্যের সমন্বয়ই তাঁর কাব্যের এলাকা জুড়ে আছে। সমর সেনকে যে অর্থে নগরের কবি বলা যায়, সুভাষকে সেভাবে চিহ্নিত করা একটু মুশকিল। বোঝা যায়, প্রান্তবর্তী দুটি সত্তাই তাঁর অনুসন্ধানী বুকের পরিধিতে এসে পড়েছে। শহর আর শহরতলীর মধ্যবিত্ত জীবনের অতল গহন রোমান্টিকতাকে ব্যঙ্গ-বিদ্রূপে কশাঘাত করতে চেয়ে কবি বলেন: 'নিরাপদ এই নীড়ে বাঁধলাম নিজেকে/জানলায় নীল আকাশ দিলাম টাঙিয়ে,/মনের ঘোড়াকে ঘরের দেয়াল ডিঙিয়ে/ডিঙিয়ে দিলাম সীমানাহীনের ঠিকানা।/ ...শুধু বিছানায় ডেকেছি স্বপ্নের হাওয়াকে/নীল আলোটায় নীলিমার নীল সুর,/হৃদয়ে উধাও বেগুনী রঙের ঝাপটা/কালো কুয়াশায় দিকবধূ কুল হারালো।' (বিদ্রোহ)।

সুভাষের 'বধূ' কবিতাটি রবীন্দ্রনাথের 'বধূ' কবিতাটির অনুকরণ মনে হতে পারে। তবেও, ভাবের দিক থেকে, যুগ-যন্ত্রণার দিক থেকে, গভীর ইঙ্গিত ও সুদূর সংকেতের দিক থেকে তার আলাদা এবং মৌলিক গুরুত্ব সচেতন পাঠকের নজর এড়াবে না। রবীন্দ্রনাথ 'বধূ'র যন্ত্রণাকে শহরের পটভূমিতে রূপ দিতে গিয়ে লেখেন:

হায় রে রাজধানী পাষাণ কায়া।
বিরাট মুঠিতলে চাপিছে দৃঢ়বলে
ব্যাকুল বালিকারে, নাহিকো মায়া।
কোথা সে খোলা মাঠ, উদার পথঘাট--
পাখির গান কই, বনের ছায়া॥

* * *

সবার মাঝে আমি ফিরি একেলা।
কেমন করে কাটে সারাটা বেলা।
ইঁটের 'পরে ইঁট, মাঝে মানুষ-কীট--
নাইকো ভালোবাসা, নাইকো খেলা॥ ('বধূ', মানসী)

রবীন্দ্রনাথের 'বধূ' সর্বসন্তাপহর নিবিড় শীতল কালো জলের মরণকেই বেছে নিতে চেয়েছিল। তার দুঃখের উৎস ছিল 'মানুষরূপী কীট' আর 'শাসনরূপী ভ্রুকুটি'। তার বন্দিনী জীবনের বেদনা গ্রামের মর্ত্য-প্রকৃতির উদার বিস্তৃতিতে মুক্তি চেয়ে ফিরেছিল। সেখানে গৌণ কারণ হিসেবে দেখা দিয়েছিল পুঁজিবাদী শহুরে সভ্যতার উদ্ধত দৌরাত্ম্য। সুভাষের কবিতায় ধনতন্ত্রের ব্যাপকতা মানুষের জীবনকে কিভাবে দুঃসহ করে তুলছে, বিশেষত নগরজীবনে, তারই ট্র্যাজিক কিন্তু ব্যঙ্গাত্মক কথনে তীব্র ও মর্মভেদী রূপ প্রকাশ পেয়েছে। কবিতাটিতে সুভাষের সততা প্রশংসনীয়। 'গলির মোড়ে বেলা যে প'ড়ে এলো/পুরানো সুর ফেরিওলার ডাকে,/দূরে বেতার বিথায় কোন মায়া/গ্যাসের আলো-জ্বালা এ দিনশেষে।/কাছেই পথে জলের কলে, সখা/কলসি কাঁখে চলছি মৃদু চালে/হঠাৎ প্রাণ দুলিয়ে দিল হাওয়া/পড়ল মনে, সাদা জীবন সেথা---/ * * * 'পাষাণ-কায়া, হায় রে, রাজধানী/মাশুল বিনা দূরদেশে দাও ছেড়ে,/ঠেকারতির মতন কিছু পুঁজি/সঙ্গে দাও, পাবে দ্বিগুণ ফিরে।/যাদের পাড়ে যেথাও চাঁদ ওঠে---/দূরের টাঁকে দেখতে পাই যেন/সামনে নাড়ি উঁচিয়ে দেখোয়ারি/---ব্যাকুল ছিল সজোরে সিঁই তুলে।' (বধূ)। কবিতাটি রবীন্দ্রনাথের প্যারোডি হতে পারত কিন্তু হয় নি। তার কারণ কবিতাটির রূপ ট্র্যাজিক, এই ট্র্যাজিডিকে আরও ঘনীভূত করা হয়েছে সুভাষের নিজস্ব বাকশৈলীর প্রভাবে। সাম্প্রতিকমনস্কতাও কবিতাটির অন্যতম উপকরণ। হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় বলেছেন,....'একথা সুতঃসিদ্ধ হওয়া উচিত যে বর্তমান যুগে ধনতন্ত্রের মুমূর্ষু অবস্থায় পুরোনো রাস্তায় সংস্কৃতিবিকাশের আশা নেই বুঝলে, যে অভিজ্ঞতা হচ্ছে আর্টিস্টের উপকরণ, সে অভিজ্ঞতার রং আর প্রকৃতিও বদলাতে বাধ্য'[১১]----ধনতন্ত্রের মুমূর্ষু অবস্থাকে সহজে অনুভব করা গেছে শহরের পটভূমিতে মধ্যবিত্ত পুরনারীর তৃতীয় স্তবকের উক্তিতে। কাবুলিওয়ালার মহাজনী পুঁজি, ঠেকারতি-পুঁজি ইত্যাদির বিনিময়ে গড়ে উঠেছে যে জটিল অর্থ-সামাজিক পরিকাঠামো, সেই কাঠামোয় মধ্যশ্রেণীর যে দুর্দশাগ্রস্ত অবস্থা তারই ভয়াবহতা ফুটে উঠেছে---'ঈশ্বর থাকে কখন প্রিয়তম উধাও', 'জোড়লোচন উড়ি যাবে', 'সবার মাঝে একলা ফিরি আমি', 'লেকের কোণে মরণ যেন ভালো' ইত্যাদি কথায়। তার সমস্ত পরিপার্শ্ব একটি নিবিড় অথচ শূন্য আবহসঙ্গীতের মত বারংবার অনুরণিত হয়েছে একটি কথায় 'গলির মোড়ে বেলা যে প'ড়ে এলো'। ধনতন্ত্র মুমূর্ষু, তার মৃত্যুর অনিবার্যতা সাম্প্রতিক জীবনের সংকটে পরিস্ফুট। এই সংকটে মধ্যবিত্ত ও নিম্নবিত্ত শ্রেণীর সনাতন মূল্যবোধ তীব্র চাপ অনুভব করে। সংকটের পূর্বাভাস নগরজীবনে ধ্বনিত হয়েছে শিল্পপ্রসারের আয়োজনে। শহর অন্যান্য কবিতাতেও উপস্থিত হয়েছে। বলা বাহুল্য, এ শহর মহানগরী কলকাতা। যেমন: ক)'সবুজ ঘাসের প্রান্তে ট্রামের নিষ্ফল সুর দীর্ঘশ্বাস ছাড়ে', (পদাতিক)। খ)'বিকালে মসৃণ সূর্য মূর্ছা যাবে লেকে প্রত্যহ।/অকাতরে

বার্মিজোনা রেস্তোরাঁতে মন লাগবে না।' (ঝিকিমিকি)। গ) 'ডায়মণ্ডহারবার থেকে ধুরন্ধর গোয়েন্দা হাওয়ারা/ইতিমধ্যে কলকাতায়', (বারুদের আগুন)। ঘ)'প্রতিদ্বন্দ্বী সব্যসাচী ডবল-ডেকারে/(চাবুক মারার দেখো) কালনাগী কবিরা/অর্ধেক চাঁদের মত কী করুণ চ্যাপ্টা হয়ে গেছে', (আলাপ)।'সামাজিক' কাব্যেই শহর আর তার পটভূমি বেশি করে উপস্থিত।'চিত্রকূট' বা 'অগ্নিকোণ'-এ গ্রামই প্রধান হয়ে উঠেছে। গ্রামের বর্ণনায় লক্ষ্য করা যায় কবির সুগভীর মমতা। সামন্ততান্ত্রিক মূল্যবোধ নয়, আদিম সাম্যবাদী সমাজের প্রতি আসক্তি থেকেই এই মমতাময় দুর্বলতা লক্ষ্য করা যায়। মহানগর তার জাল একটু একটু ছড়িয়ে দিয়েছে সারা গ্রামে। সামগ্রিক ঘটনা আলোড়িত করে তুলেছে গ্রামের শান্ত সরল জীবন, ছোট ছোট নীড়গুলি আর তাদের শান্তিসুনিবিড় নয়, দুর্ভিক্ষ, দ্রব্যমূল্যের বৃদ্ধি গ্রামীণ জীবনে যে আঘাত হেনেছে তাতে ছোট ছোট বৃত্তিনির্ভর মানুষের জীবনের দৈনন্দিনের সাংসারিকতা ভেঙে টুকরো টুকরো হয়ে গেছে। সুভাষের দৃষ্টি এড়ায় নি, দুর্ভিক্ষের সময় গ্রামীণজীবন কিভাবে কতটা বিপর্যয়ের সম্মুখীন, এই ভেঙে পড়ার কথা বলতে গিয়ে সুভাষের মমতা বোধ ক্রিয়ায় আরও গাঢ় হয়ে উঠেছে। তাঁর নগরজীবনের সেই 'বধূ'টির হৃদয়ে যে গ্রাম ছায়া দিয়েছিল সে গ্রাম ছিল---'খাসা জীবন সেথা', এ কথা বলবার আর কোন উপায় নেই। এই গ্রামেও রয়েছে জমিদার ও মহাজনদের অবিচার-অন্যায়, শোষণের সামন্ততান্ত্রিক পদ্ধতি। কৃষক, কামার, কুমোর, তাঁতির অবস্থা মর্মান্তিক, শোষণের বিশেষ 'প্রতিভা' একই কায়দায় শহরে ও গ্রামে তার লোলুপতা বিস্তার করে। গ্রামীণজীবনে তাই সনাতন সংস্কারে ভাঙন ধরেছে, মূল্যবোধের রূপান্তর হয়েছে। 'ধাঁধা' কবিতাটিতে 'মিতে'র কাছে কৃষকের জিজ্ঞাসা, বার বার ধান বুনে ভাবে, এবারে ভালভাবে আরামে বাঁচতে পারবে অথচ ফসল পেকে উঠলে সেই কাস্তে হাতে নিতে যায়, অমনি---

> 'লাঠির আগায় পাগড়া জুড়োতে
> তারপর আসে বাসে পেয়াদা'

এমনটা কেন হয় ? এ ধাঁধাঁর উত্তরটা কী ?'এখানে' কবিতাতেও আছে গাঁয়ের বর্ণনা। এ গ্রাম ঠিক সনাতন গ্রাম নয়, পুঁজিবাদী বিকাশের ফল হিসেবে এ গ্রামেও লেগেছে তার আঁচড়, শিল্প-কারখানা গড়ে উঠেছে আসানসোলের গ্রামীণ এলাকায়। গ্রামের বর্ণনাটি এখানে চমৎকার গীতিময়তা লাভ করেছে: 'এখানে আকাশ পাহাড়ের গায়/পড়েছে ভেঙে,/পাহাড়ের গায় সারি সারি সব/চিমনি চুড়ো।/ধানের জমিরা পাশাপাশি শুয়ে/দিগ্বিদিকে--। (এখানে)। এ গ্রাম কানে কানে শুনতে পায় কাস্তের আওয়াজ। এ গ্রামের মাঠের বুক চিরে চলে গেছে বিদ্যুতের তার আর 'সর্পিল পথে চলে রেলপথ/ ধনুক-

আঁকা'। এ গ্রামে সূর্য তার 'প্রতিজ্ঞায়' 'কালো ডানা' মেলে দিয়েছে। যেখানে সেখানে গজিয়ে উঠেছে তাড়ির দোকান, নেশা তাদের কাউকে কাউকে সর্বস্বান্ত করে ছেড়েছে। 'কিংবদন্তী' কবিতায় গ্রাম্য হাট-বাজারের গুজব ছড়ায়---এই 'গ্রাম-দেশ' আর নিরাপদ নয়। 'গ্রাম্য' কবিতায় অনুভূত হয় 'কোথাও প্রলোভনের নেই নিশানা/উদ্বাসী চাষা, ধান উধাও'। গ্রামে গ্রামে এখন ভিক্ষে ছাড়া গতি নেই, গ্রামে থেকে তাই শহরকে মনে হয়---'চোখে চিত্রিত দূর শহর।' মহাজনের বিরুদ্ধে এরপর এসে পড়ে লড়াই করার দিন, হাতে হাতে তাই 'কুঠার' ধরবার পালা। দুর্ভিক্ষগ্রস্ত অন্নহীন চাষী তার বাগে নিবেদন করে মহাজনসমীপে---'পেট জ্বলছে, ক্ষেত জ্বলছে/কে খাজনা শুধবে?/হুজুর, এবার না বাঁচালে/আগুন জ্বলে উঠবে।' (চিত্রকূট)। 'গ্রামে' কবিতায় চাষী-কৃষকের অবস্থা দুর্বিসহ। জমিজমা নেই, থালা-বাসন বন্ধক গেছে, এখন অনাহারে উপবেশন চলছে। 'এই আশ্বিনে' কবিতায় চাষী-কৃষকেরা বুঝতে পেরেছে তাদের আসল শত্রু কে---'পরাক্রান্ত শত্রু আছে,/ঝোপের অন্তরালে পাখায় সে বশ'। এদের প্রতি কথা নেই। নবান্নবোধনের দিন সমাগত। 'স্বাগত' কবিতায় কী করুণ বর্ণনা। দুর্ভিক্ষের কালো ছায়া সেখানে গ্রামকে আর গ্রাস করে রাখে নি,'গ্রাম উঠে গিয়েছে শহরে'। কেন? একটু ভাতের প্রত্যাশায়, একটু উদরপূর্তির প্রত্যাশায়। এ এক অদ্ভুত গ্রাম---'নিষ্প্রদীপ অন্ধকার'-এ ব্যাপ্ত। উঠোনভরা আগাছা, শূন্য গোয়াল, রাখালের দেখা নেই, গোরুর পাল ধরে ধুলো ওড়ায় না, ঢেঁকিতে পাড় পড়ে না গৃহস্থ বধূর, শাঁখ বাজে না সন্ধ্যায়, তাঁতি তাঁত বোনা ছেড়েছে, কলু আর ঘানি ঘোরায় না, কুমোরের ঘরে চাবি, দোকানী নিরুদ্দেশ, চন্ডীমণ্ডপ নির্জন, মোড়লে মোড়লে ঝগড়া নেই, নিশীথ রাতে কুকুরও আর ডেকে ওঠে না---এক মহাশ্মশানের তিমিরাচ্ছন্নতা ঘিরে ধরেছে বাংলাদেশের গ্রামজীবনকে। কবি কি এর ভেতরেও কোন ভবিষ্যতের প্রতিশ্রুতি পেয়েছেন ?

'পিছনে মূর্ছিত পথ।
সম্মুখে দাঁড়াবো কোন্ ভবিষ্যৎ,
কোন্ প্রতিশ্রুতি ?' (বর্ষশেষ)

সুভাষ মুখোপাধ্যায় সেই ধরনের কবি যিনি সহজে হতাশ হন না। অবশ্য এই বৈশিষ্ট্য প্রায় প্রত্যেক প্রগতিশীল কবিরই রয়েছে। সুভাষ নব সূর্যোদয়'র সুরে বিভোর হতে গিয়ে সহজেই লক্ষ্য করেন, 'দিগন্তে দিগন্তে দেখি/বিস্ফারিত আসন্ন বিপ্লব'। (ঘোষণা)। আরও লক্ষ্য করার বিষয়, সুভাষের গ্রাম-বাংলা সামন্ততান্ত্রিক কৃষিনির্ভর আর রইল না, রইল না তা রবীন্দ্রনাথের দেখা শান্ত সুন্দর নিস্তরঙ্গ

গ্রামবাংলাও অথবা রূপসী বাংলার রূপকার জীবনানন্দ দাশের স্মৃতিবিধুর রোমান্টিক আবেগের শৈশবগ্রামও নয় তা, এ গ্রাম এখন প্রতিবাদী, বিদ্রোহী, বিপ্লবী গ্রামবাংলা। দুর্ভিক্ষের রেশ থাকতেই জীবনানন্দ গ্রামবাংলার আর এক ধরনের ছবি দেখেছিলেন, সে ছবি বস্তুত হতাশার, যেমন:

'সূর্য নীড় নির্দেশ সকলি হারায়ে গেলে ওরা
জানে না কোথায় গেলে মানুষের সমাজের পারিশ্রমিকের
মতন নির্দিষ্ট কোনো শ্রমের বিধান পাওয়া যাবে,
জানে না কোথায় গেলে জল তেল খাদ্য পাওয়া যাবে,
অথবা কোথায় মুক্ত পরিচ্ছন্ন বাতাসের সিন্ধুতীর আছে।'[১২] (এই সব নিরন্নদের)

দুঃখ-যন্ত্রণার রূপ সুভাষ কিংবা জীবনানন্দে সমতুল্য হয়ত-বা, কিন্তু সুভাষের সৃষ্টি অভিনবত্ব পায় তার প্রতিবাদী অভিব্যক্তিতে। এইসব কবিতার সুরে কমনীয়তার আভাস লাগে না, উচ্চঘোষণার সুভাষসম্মত সুরই তার প্রধান বৈশিষ্ট্য। 'উঁচু গলায় কথা বলবার ভাষায়' (নেরুদা সম্পর্কে সুভাষের উক্তি) কবিতা নেমে এল জনজীবনের কাছাকাছি। আসলে বাংলা কবিতায় সুরের এই বদল, এই রূপান্তর ঘটিয়ে তোলার মূলেই ছিল প্রগতি সাহিত্য আন্দোলনের প্রত্যক্ষ প্রভাব। সামাজিক পরিবর্তনের আকাঙ্ক্ষা থেকে জাত এই কবিতাগুলি সচেতনতার অবদান, আর্থ-সামাজিক ও আর্থ-রাজনৈতিক পরিমণ্ডলের বাইরে থেকে তার বিচার সমীচীন নয়। সুভাষ মুখোপাধ্যায় তাঁর কবিতায় দেশ-কাল-সমাজসম্পর্কে সর্বদা নিজেও সচেতন থেকেছেন। মাও সে-তুঙ ইয়েনান রিপোর্টে স্মরণ করিয়ে দেন এই বলে যে, লেখক-শিল্পীদের পাঠকদের কাছে পৌঁছতে হলে যথেষ্ট রকমের সামাজিক-জ্ঞান চাই, সে বিষয়ে যথেষ্ট অধ্যয়ন চাই, তা না হলে উভয়ের মধ্যে থেকে যাবে এক ধরনের যোগাযোগহীন দূরত্ব। তিনি বলেন,

'Writers and artists must also study our society — they must study the various classes composing the society, their relation to each other, their conditions, attitudes, and psychology. Only when they have thoroughly understood all these factors can they give our literature and art a rich content and a correct orientation.'[১৩]

লেখক কিংবা পাঠক উভয়েরই কাছে প্রত্যাশিত সহৃদয়হৃদয়সংবাদী অভিনিবেশ, তা যে কেবলি আর্থ-সামাজিক বা আর্থ-রাজনৈতিক জ্ঞান, এমনটা নয়, 'যুগচৈতন্যের'ও অন্তরঙ্গ স্পর্শলাভ দরকার। নইলে যে অসুবিধে হয়, সমালোচকের ভাষায় তা হল: 'যুগচৈতন্যকে অন্তরঙ্গ করতে না পারলে সেই যুগের

কবিতা বোঝা যেমন কঠিন হয়, তেমনি কবির জীবন ও জীবনাদর্শ না জানলেও সেই অজ্ঞতা কবিতার আস্বাদে বাধা হতে পারে।'[১৪] সুভাষের কবিতায় যুগের চিহ্নগুলি যে কোন পাঠকের সহজে নজর কাড়বে। বলা দরকার, যুগসচেতনতাই হল প্রগতি সাহিত্য আন্দোলনের আর একটি বৈশিষ্ট্য যা এই পর্বের কবিরা অনুসরণ করতে কখনও ভোলেন নি।

প্রগতিশীল কবিরা প্রায় প্রত্যেকেই প্রচলিত সমাজতন্ত্রের বিরোধিতা করেছেন। সুভাষ মুখোপাধ্যায় এঁদের সবাইকে সম্ভবত ছাড়িয়ে গেছেন। আধুনিক কবিদের যাঁরা নিজের জন্যে শিল্প বলে অথবা শিল্পীর স্বাধীনতা বলে প্রায়শ দাবি করেন, তাঁদের উদ্দেশে অব্যর্থ আক্রমণে তাঁর তূণের সমস্ত তীরে বিষ মাখিয়ে রেখেছেন প্রথমাবধি। 'পদাতিকে'র প্রথম কবিতা থেকেই তাঁর এই তীব্র বিদ্বেষ শুরু হয়েছে:

১) প্রিয়, ফুল খেলবার দিন নয় অদ্য
ধ্বংসের মুখোমুখি আমরা,
চোখে আর স্বপ্নের নেই নীল মদ্য
কাঠফাটা রোদ সেঁকে চামড়া।

('মে দিনের গান', পদাতিক)

২) আকাশের চাঁদ দেয় বুঝি হাতছানি ?
ও-সব কেবল বুর্জোয়াদের মায়া---
আমরা তো নই প্রজাপতি-সন্ধানী,
অন্তত, আজ মাড়াই না তার ছায়া।

('সকলের গান', পদাতিক)

৩) মানি অহিংসা, মেনেছি অসহযোগিতা,
নাচুক অধুনা, কংগ্রেসি মনোময়ূরে---
সাহিত্যে সৎ, শক্তি না মুক্ত কবিতা,
শিব, সুন্দর সত্য বিশীর্ণ নূপুরে।

('আদর্শ', পদাতিক)

৪) যেখানে মিলের গাঁথুনি আকাশে হাত বাড়ায়--
সেখানে ফুরালো গরীব গ্রামজনের কথা।

('গ্রাম', চিরকূট)

ফাল্গুনবিলাসী কবিরা যৌবনের মত্ততা ও উন্মাদনাকেই শ্রেয়জ্ঞানে এতদিন কাব্যলক্ষ্মীর পায়ে নিবেদন করে এসেছেন। 'কল্লোলের যুগে' এই উন্মাদনা আরও তীব্র হয়ে ওঠে এবং যৌনতা ও রিরংসাসংক্রমিত অবদমিত মূল্যবোধকে আধুনিকতা বলে আখ্যায়িত করার চেষ্টা দেখা যায়। মোহিতলাল থেকে শুরু করে অচিন্ত্য-বুদ্ধদেব-অজিত প্রমুখ এই ধারাকে বর্ধিত ও পুষ্ট করে তোলেন। সুভাষের ক্রোধ ও ব্যঙ্গোক্তি এই ধারার বিরুদ্ধে একটা বলিষ্ঠ প্রতিবাদ। প্রগতি সাহিত্য আন্দোলনের ভেতর দিয়ে বুদ্ধিবাদের

অবক্ষয়কে নস্যাৎ করে দেবার সুগভীর প্রবণতা ছিল, কবিরা সামাজিকক্ষেত্রে এই দায়বদ্ধতা থেকে নিয়ে বুর্জোয়া শিল্পতত্ত্বের বিরুদ্ধে অত্যন্ত কঠোর মনোভাব গ্রহণ করেন। চাঁদ আর ফুল সুভাষের বিদ্রূপের কেন্দ্র হয়েছে, কারণ এগুলি নিয়ে শ্রমজীবী মানুষের ভাববার অবকাশ নেই। যাঁরা জীবনোপভোগের প্রাচুর্যের মধ্যে লালিত, অবকাশ যাঁদের অফুরান, চাঁদ আর ফুল নিয়ে তাঁরাই কবিতা রচনা করতে পারেন--- সর্বহারাশ্রেণীর কাব্যে এসমস্ত উপাদান-উপকরণ হবে নিছক বিলাসিতা মাত্র। প্রগাঢ় রোমান্টিকতার বদলে সর্বহারাশ্রেণীর সাহিত্যে বাস্তবতার দাবিই উচ্চকিত। তাই সুভাষকে বলতে শুনি, ফুল খেলবার দিন আর আর নেই, আকাশের চাঁদ হল বুর্জোয়াদের মোহজাগানো বিভ্রম, ফুলের ঘায়ে মূর্ছা যাওয়ার মত ভাববিলাসিতা আজকার নয়, হাতুড়ির আঘাতের মত বাস্তবতাই সাহিত্যের প্রধান আশ্রয়। নিছক শিব আর সুন্দরের অনুরক্ততা নয়, দৈনন্দিন জীবনের কঠিন সংগ্রামই শ্রেষ্ঠ কবিতার একমাত্র বস্তু, বিশ শতকে তাই ফুলের বেসাতি অচল---এরকম মন্তব্য করতে হয়েছে সুভাষকে বুর্জোয়া শিল্পতত্ত্বের ভ্রান্তি অপনোদনের জন্যে। বুর্জোয়া শিল্পতত্ত্ব সামাজিক দায় অস্বীকারের কথা বলে, সুভাষকে তাই বলতে হয়: 'প্রভুও যদি আচমকা দৌড়ে পালান--/বলব, বৎস! সভ্যতা যেন থাকে বজায়।' আর এই অবস্থায় 'চোখ বুঁজে কোনো কোকিলের দিকে ফেরাব কান'। এমন তীব্র বিদ্রূপ কশাঘাতে সুভাষ যেন বুর্জোয়া ধ্যান-ধারণাকে ছিন্নভিন্ন করে দিতে চেয়েছেন, প্রত্যাশা, যদি মানুষের চেতনা বাস্তবতাসম্পর্কে সজাগ হয়। এধরনের মনোভাবের পেছনে থাকে ইতিবাচক প্রেরণা---সংশোধনের বা সংস্কারের অভিপ্রায়। সমাজতন্ত্রের প্রবক্তারা কেউই নঞর্থক দৃষ্টিকোণে ইতিহাসের পরিরেখা পর্যবেক্ষণ করেন না, বরং মহত্তর উদ্দেশ্যসাধনের জন্যে তাঁদের প্রয়াস থাকে অব্যাহত। সুভাষ বুর্জোয়া শিল্পতত্ত্বের বিরোধিতা করেছেন, প্রচণ্ড বিদ্রূপে প্রতিপক্ষকে [illegible] জর্জরিত করেছেন, খুবই সত্য কথা, তবে তার পাশাপাশি সাম্যবাদী নতুন মূল্যবোধ ও বিশ্বাসও স্থাপন করতে চেয়েছেন এবং এই বিশ্বাস সমর সেনের মত সংশয়-দ্বন্দ্বে কখনও ব্যাহত হয় নি। বিষ্ণু দে-র মধ্যে এই বিশ্বাস সঞ্চিত হয়েছে যতটা না মার্ক্স-লেনিনে, তার বেশি মননচর্চার পথে। সুভাষের সঙ্গে এক্ষেত্রে মিল সুকান্তের। দু'জনেই ভারতীয় কমিউনিস্ট দলের সদস্যপদ গ্রহণ করে দলের কার্যক্রমের অঙ্গ করে তোলেন তাঁদের সাহিত্যচর্চাকে। সুভাষ কিভাবে এই বিশ্বাস স্থাপন করেছেন, দৃষ্টান্তসহ তা পর্যালোচনা করা যেতে পারে: 'কমরেড, আজ নবযুগ আনবে না?/......আমাদের থাক মিলিত অগ্রগতি,/একাকী চলতে চাই না এরোপ্লেনে,/আপাতত, চোখ থাক পৃথিবীর প্রতি,/শেষে নেওয়া যাবে শেষকার পথ চেনে।' (সকলের গান, পদাতিক)। কবি যে নবযুগ আনতে চেয়েছেন সেখানে ব্যক্তির নয়, সম্মিলিত মানুষের অগ্রগতিই তাঁর কাম্য, জীবনকে

গভীরভাবে ভালবাসার ফলেই এই অগ্রগতি সুনিশ্চিত ও সুসম্ভব। এই অগ্রগতির সহায়ক শক্তি হল কৃষক, মজুর, শ্রমিক, মধ্যবিত্ত ও নিম্নবিত্ত শ্রেণীসম্প্রদায়---এইসব সম্প্রদায়ের সঙ্গে অভিন্নতা ও আত্মীয়তা অর্জনের পথ হল এক সঙ্গে চলার রীতি, সংঘবদ্ধতা ও সংগ্রামী চেতনা। সুভাষ যেমন বলেন, 'কৃষক, মজুর! আজকে তোমার পাশাপাশি/অভিন্ন দল আমরা।' (জবাবদিহির গান)। বিশ্বযুদ্ধে বহুজন ঢেঁড়ার যে আওয়াজ চারিদিকে ধ্বনিত হয়েছে, সেই ধ্বনির সঙ্গে অকৃত্রিম মৈত্রী স্থাপনের ও সুর-মেলানোর, যাকে বলা চলে, 'আন্তর্জাতিক আত্মীয়তা' সেই অনুভবও প্রকাশ পেয়েছে গভীর চীনা-প্রীতির মধ্য দিয়ে 'চীনঃ১৯৩৮' কবিতায়। 'ঘরে বাইরে'তে আন্তর্জাতিক মুক্তি-সংগ্রাম থেকে সংগ্রামী প্রেরণা সংগ্রহের ব্যাপারটা এই প্রসঙ্গে স্মরণযোগ্য। পৌরাণিকতাকে আশ্রয় করে কখনও সাম্যবাদে আস্থা জ্ঞাপন করেন ঃ'তাই এই কুরুক্ষেত্রে উপবাসী প্রার্থনা জানাই,/আমাকে সৈনিক করো তোমাদের কুরুক্ষেত্রে, পার্থ।' (পার্থ)। 'চিরকূট' কাব্যের 'কাব্যজিজ্ঞাসা' কবিতায় কবি-হৃদয়ের আবেগ স্বতঃস্ফূর্ততায় প্রকাশিত হয়েছেঃ 'একলা নই, দিকে দিকে হাত তার আঘাত হানবে।/মুক্তিদাতা মজুর চাষা---নতুন আশা আনবে।/চলো না কবি মিছিলে মিশি---প্রশস্ত ও বিশাল/পতনে পথ করেছে চালু, পড়েছে বালু সৌধ,/আমরা দেখ বোবাকে ভাবি, দৌড়াকে দ্রুত হ্রস্ব/নত বুকে রয়েছে ধ্বনি, ঝুঁড়িতে ঢাকা শঙ্খ।/আমরা নই প্রলয় বড়ো শঙ্খ।' (কাব্যজিজ্ঞাসা)। কিংবা অন্যত্রঃ'তবু জানি আমাদের জয়,/অমর প্রতিজ্ঞাপত্রে জানি সেই দিনের স্বাক্ষর।' (স্বাক্ষর)। এই গভীর বিশ্বাস যুদ্ধের আগে এবং পরে একটা বিশেষ সময় পর্যন্ত সুভাষের মনে একধরনের উন্মাদনা জাগিয়ে রেখেছিল।

সাম্যবাদী কবিরা প্রায় প্রত্যেকেই মধ্যবিত্তশ্রেণীকে বিদ্রূপ ও পরিহাস করেছেন। সাহিত্য আন্দোলনের সূত্রে এটি একটি সাধারণ লক্ষণ। বিষ্ণু দে, সমর সেন, সুকান্ত কেউই বাদ যান নি এর থেকে। সুভাষের কাব্যে এই লক্ষণ অত্যন্ত প্রকট, অবশ্য 'পদাতিক'এর মধ্যেই তা সবচেয়ে বেশি ধারালো। ব্যঙ্গনিপুণ সুভাষের কাব্যদক্ষতা বুদ্ধদেব বসুর সক্লেশ উদ্রিক্ত না করে পারে নিঃ'এখনও নয় যে এই তরুণ কবি বেঁকিয়ে ছাড়া কথা বলতে শেখেন নি।'[১৩] প্রমাণ হিসেবে বুদ্ধদেব বসু 'না-বাঁকানো-কথার' দুটি দৃষ্টান্ত দেন 'বিরোধ' ও 'পদাতিক' কবিতা থেকে। আসলে, এই বাকভঙ্গি সুভাষের করণকৌশলের সঙ্গেই শুধু যুক্ত নয়, তাঁর ব্যক্তিত্বের প্রতিফলনও বটে। তাঁর ক্ষেত্রে এ এক অপরিহার্য উপাদান হয়ে উঠেছে। কথার বক্রিমতাই অনেক কবিতায় কাব্যগুণ বিশেষ হয়ে উঠেছেঃ'আকাশের চাঁদ দেয় বুঝি হাততালি ?/ও-সব কেবল বুর্জোয়াদের মায়া--/আমরা তো নই প্রজাপতি-সন্ধানী,/অন্তত, যার মাড়াই না তার ছায়া।' (সকলের গান)। 'ভুঁড়ো হয়ে যারা তুনের মুখ দেখে/পৌরুষ না কি হাতুড়ি তাদের পিঠে ?' (ঐ)।

দৈবপ্রসাদে করে সংসার/কটি অবতার দিয়েছে ও'রে---/সকলে যদি না বাঁচতে, তাকেই/আপন বাঁচার রক্ষা দেওয়া।' (কালোবাজারির গান)। 'দুরু বিস্ময়ে জেনেছি ক্যানের শাওয়াকে/নীল আলোটায় নীলিমার নীল সুর,/হৃদয়ে উধাও রোমাঞ্চী রক্তের আপট্টা/কালো কুয়াশায় দিক্‌ভ্রম ভুল হারানো।' (বিরোধ)। এই ভঙ্গি কি কেবলি চাপল্যজনিত? কেবলি পুরোনোর বিরুদ্ধে নির্বিচার উপহাস? নিছক শুধু চাতুরি? 'এই হালকা ভঙ্গিটি অচল'[১৬] বলে জনৈক সমালোচক রায় দিয়েছেন। এ কথা বললে সুকান্তের দক্ষতা ও কৃতিত্বকে অস্বীকার করা হয়। যাঁরা একটি নির্দিষ্ট আদর্শ ও লক্ষ্যকে সামনে রেখে কবিতাকে অস্ত্র হিসেবে গ্রহণ করেছেন, তাঁরা বিপরীতধর্মী আদর্শের বিরোধিতা করবেন না, শ্লেষ কিংবা বিদ্রূপের আঘাত হানবেন না, এটাই কি প্রত্যাশিত একজন মার্কসবাদী কবির কাছে? মার্কসবাদীরা যখন সমস্ত প্রগতিশীল সাহিত্যের জন্য উত্তরাধিকার দাবি করেন, তখন তাঁদের কাছেই বোধকরি প্রত্যাশিত এই বিশিষ্ট শিল্প-ভঙ্গিটি যা শ্লেষ আর বিদ্রূপের বাহন হিসাবে অত্যন্ত সহায়ক। তাছাড়া সুকান্ত এর মধ্য দিয়েই তাঁর গভীর অন্বেষণে পৌঁছোতে চান, একে বাদ দিলে কবিতা আর কবিতা থাকে না। যেমনঃ

'পেট জ্বলছে, ক্ষেত জ্বলছে
কে খাজনা শুধবে ?
হুজুর, এবার না বাঁচালে
আগুন জ্বলে উঠবে।'   (চিরকুট)

অত্যন্ত সংহত ভাবে ও সুকৌশলে শব্দের অব্যর্থ প্রয়োগে এর দ্বিতীয় বিকল্প আর কী হতে পারে? 'অতঃপর' কবিতাটি একটিমাত্র পংক্তিতে 'বণিকের মৌলিক প্রতিভা দেশী শিল্পে মুক্তি পাবে' কাব্যের মৌল শর্ত পূরণ করেছে, একে বাদ দিয়ে সুকান্তের কবিতার আস্বাদন সম্ভব নয়। এরকম অজস্র পংক্তি তাঁর কবিতা থেকে উদ্ধার করা যায় যা বাদ দিলে কবিতা আর কবিতা থাকবে না। যেমনঃ 'সাবাস্ বন্ধুত ভাই। প্রকাশ্যেই নেড়ে দিলে গান্ধীর চিবুক', 'আদালত সক্রিয়', 'সাম্য অতি সাদা চিত্র।--অনুচিত কিন্তু রাজদ্রোহ', 'বাহাদুর শান্তির বুকে খাঁচিপ্রান্ত অভিযান সকট', 'বোমারুক এরোপ্লেন গান গায় দক্ষিণ সমীরে--/মরণ রে তুঁহু মম শ্যাম সমান', 'চাঁদকে আমরা বেঁধেছি চাঁদির সা-রে-গা মায়,/অবৈতনিক প্রণয় রাগিণী নিশীথরাতায়', 'অভিযান শুরুর পর্ব নীলবর্ণশৃগালের মতো', 'সান্ত্বি করে ঢুকেছে দিতে', 'প্রভু, সবই তো লীলা তোমার, তাই--/আকাশে বুঝি এখন রোশনাই', 'সুনন্দ প্রার্থনা এই রাশি, অতঃপর/আমার অভিযান হাতে দিও না বক্র' ইত্যাদি ইত্যাদি। সুকান্তের এসবের বক্র বাক্‌নির্মিতিকে অলঙ্কৃত করে দেখা অনুচিত, এগুলি কবিতায় আলঙ্কারিকতার প্রয়োজনকেই শুধু দিচ্ছে

করে নি, বক্তব্যের সঙ্গে যুক্ত হয়ে বিশিষ্ট উচ্চারণকে তা অর্থ-গভীরতা দান করেছে।

সুভাষের সব কবিতাই শ্রেষ্ঠ, এমন কথা বলা যায় না। সে উচ্চাশাও আমাদের নেই। কয়েকটি কবিতা সম্পর্কে ভিন্নমত পোষণ করি। তাঁর 'জনযুদ্ধের গান' জনসাধারণে বহুল প্রচারিত। প্রগতি লেখক সংঘের সর্বভারতীয় সম্মেলনেও গানটি প্রশংসা লাভ করেছে। ভারতবর্ষের 'ইয়ুথ কালচারাল ইনস্টিটিউট'-এর বা বিভিন্ন জনসমাবেশের অনুষ্ঠানে গানটি গীত ও আবৃত্ত হয়েছে। কবিতা হিসেবে এর বিচার অনুচিত। কেননা এর প্রধান মাধ্যম হল সুর, তাছাড়া জাতীয় সংগীত হিসেবে 'বন্দে মাতরম' বা 'জনগণমন অধিনায়ক' গানটি কবিতার মানদণ্ড দিয়ে নয়, বিচার হয় জাতীয় ভাব-প্রেরণার ভেতর দিয়ে, তার ঐতিহাসিক গুরুত্ব দিয়ে, ঠিক তেমনি সুভাষের 'জনযুদ্ধের গান'টি সে যুগে যে ব্যাপক সাড়া জেগেছিল, উন্মাদনা সঞ্চার করেছিল, 'পার্টি-স্তোত্র' বা শ্লোগান সত্ত্বেও তার গুরুত্ব কবিতা হিসেবে নয়, জাতীয় জীবনের সংকট মুহূর্তের অন্তরঙ্গ প্রেরণা হিসেবে তার বিচার কাম্য। ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধে তাদের প্রচার ব্যাপক করে তুলেছিল সে সময়, জাপানি সাম্রাজ্যবাদ ঝাঁপিয়ে পড়েছিল চীনের প্রত্যন্ত সীমানায়, ভারত-ভূখণ্ডেও মাঝে মাঝে হানা দিচ্ছিল, সারা ভারতব্যাপী আতঙ্ক আর নিশ্ছিদ্র অন্ধকারের দিনগুলোয় সাহস আর প্রেরণা, দৃঢ়তা আর লড়াই করার দুর্জয় আকাঙ্ক্ষাকে উজ্জীবিত করার কাজে এই গানটির যে মহতী ভূমিকা তা অস্বীকার করলে সত্যকেই অস্বীকার করা হয়। এর মূল উপজীব্যই ছিল স্বদেশপ্রেম, স্বদেশের সংহতি।

'জবাব চাই', 'ময়দানে চলো', 'সবেরোই ফের আসবো', 'স্তালিনগ্রাদ', 'প্রতিরোধ প্রতিজ্ঞা আমার' ইত্যাদি কবিতা পার্টির দৈনিক কর্মসূচীর অঙ্গ, অর্থাৎ সমকালীন প্রেরণাই এগুলির প্রধান পটভূমি। প্রসঙ্গত বলা দরকার যে, কয়েকটি বিশেষ ঘটনা কবিদের মনে প্রায় একইরকম সাড়া জেগে গেছে। স্তালিন-গ্রাদের নাগরিকদের নাৎসীবাহিনীর বিরুদ্ধে বীরত্বব্যঞ্জক লড়াইকে অবলম্বন করে এ দেশের কবিরা প্রচুর কবিতা লিখেছেন। ১৯৪২ খ্রীষ্টাব্দের ২৩ আগস্ট জার্মানসেনা স্তালিনগ্রাদের উত্তরে প্রবেশ করে এবং বিমান আক্রমণে প্রায় ৪০ হাজার সোভিয়েতসেনা ধ্বংস হয়। ৩ সেপ্টেম্বর দক্ষিণ স্তালিনগ্রাদেও তারা প্রবেশ করে, বহুদিন উভয় অঞ্চলের অনেকখানি দখল করে, ১৯ নভেম্বরে লালফৌজের পাল্টা আক্রমণ এবং ২ ফেব্রুয়ারী জার্মানবাহিনীর চূড়ান্ত আত্মসমর্পণের ভেতর দিয়ে বিশ্বযুদ্ধের মোড় ঘুরে যাওয়ায় সারা বিশ্বের সংগ্রামী মানুষকেও রীতিমত আলোড়িত করে তোলে। প্রগতিশীল কবিরা এই ঘটনা নিয়ে কবিতা লিখবেন না, এটাই অস্বাভাবিক। সমর সেন লেখেন: 'কত বর্বরের গোরস্থান এ শহরে/ রাত্রে ভয়ঙ্কর মৃত্যুর মুখে জীবনের জয়গান বাজে'[১৭], (স্তালিনগ্রাদ)। সুকান্তঃ 'তুমি চাও সোভিয়েতের সুদ-/

যে সুখ দেখেছে স্তালিনগ্রাদ।'[১৮] (চতুরঙ্গ:১৯৪৩)। অবন্তী সান্যাল বলছেন:'অনেক স্তালিনগ্রাদ আমার সম্মুখে/ভবিতব্য টানে আজ সমুদ্ররেখায়' বা 'ভাস্করের বসুন্ধর,/তবু ও বাতাস পাই সে সিংহনাদের।/তাইত কবিতা লিখি স্টালিনগ্রাদের।'[১৯] নরেন্দ্র রায় স্ট্যালিনগ্রাডের স্মরণে 'নভেম্বর-১৯৪২' শীর্ষক কবিতায় লেখেন---'নব দিন স্ট্যালিনের কোনো দিন হবে না কুণ্ঠিত'[২০]। সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের মধ্যে স্ট্যালিনগ্রাডের বন্দনা একইভাবে সংক্রমিত। উদ্ভূত এই পরিস্থিতি থেকে কবিরা উত্তেজনার উত্তাপ অনুভব করেছেন। সুভাষ লক্ষ্য করেছেন---'গ্রাম ভূমে প্রতিজ্ঞায় লক্ষ লক্ষ রথী/দাঁড়ায় সমরাঙ্গনে'। আরও লক্ষ্য করেছেন, প্রতিটি নাগরিকের 'দেশপ্রেম ধমনীতে, চিন্তবোধ ধ্যানে'। ফ্যাসিবাদ বিরোধী সোভিয়েতের এই প্রাণপণ মুক্তিসংগ্রামকে সুভাষ দেখেছেন মহাভারতের ধর্মযুদ্ধ 'কুরুক্ষেত্র'র দিকে। বাংলাকাব্যে এই মিথটি বহুব্যবহৃত। ফ্যাসিবিরোধী পর্বে এই মিথটি প্রগতিশীল কবিরাও ব্যবহার করতে ভোলেন নি। শান্তিরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায় 'মহাভারত' শীর্ষক কবিতায় লিখছেন--'কর্ণিকের জন্মবন্ধে কুরুক্ষেত্র হ'ল কারাগার'[২১] অথবা আবুল হোসেনের 'অগ্নিহীন' কবিতায়---'অতঃপর কুরুক্ষেত্র মুখায় ক্ষুধায় /বণিক রাহুর শেষ মরীয়া সংগ্রামে' [২২] সুভাষের এই ব্যবহার প্রত্যক্ষ, কাজেই দ্বৈতার্থহীন।---'তাই এই কৃষকদের উদবাসী প্রার্থনা জানাই,/আমাকে সৈনিক করো তোমাদের কুরুক্ষেত্রে, ভাই।'(বার্তা)। 'ঘোষণা' কবিতায়: 'বিক্ষুব্ধ জীবনে আবার/কুরুক্ষেত্র করাঘাত করে।/সারাবার নেই কোন বিকৃতির দুয়ার।' স্ট্যালিনগ্রাডের স্মরণে রচিত 'স্টালিনগ্রাড' কবিতায়: 'এবার কুরুক্ষেত্র ইতিহাস দেখে নি কখনো/বসন্ত পরিভবে,/বাতাস বারুদগন্ধ, অন্ধকার বিদ্যুৎখচিত,/রৌদ্রালোকে লেগেছে গ্রহণ।' বিশেষ করে দুর্ভিক্ষগ্রস্ত বাংলাদেশের ভয়াবহ শ্মশানস্তব্ধতা বোঝাতে গিয়েও অনেকে এই মিথটি ব্যবহার করেছেন। সুভাষ 'কুরুক্ষেত্র' শব্দটি প্রয়োগ না করেও রণভূমির যে বর্ণনা দিয়েছেন তাতে দুর্ভিক্ষগ্রস্ত বাংলাদেশের আশ্চর্য বিষাদ ধরা পড়েছে:'দুয়ারে দুয়ারে বাঁধা যমদূত/মুহুর্মুহু কড়া নাড়ু নেড়ে/রক্তলোলুপ শিবা পক্ষে পক্ষে ফেরে।' (বর্ষশেষ)। কুরুক্ষেত্র শব্দটি যেভাবে একজন কবির কাছে মিথ হয়ে যায়, তেমনি স্ট্যালিনগ্রাডও একটি মিথে পরিণত হয়। স্ট্যালিনগ্রাডের প্রেরণা সুভাষকে 'মৃত্যুহীন জীবনের উৎকীর্ণ অক্ষর' উপহার দিয়েছে। মৃত্যুজয়ের মন্ত্র পাঠ করেন রবীন্দ্রনাথও, তবে তার প্রেরণাস্থল হল উপনিষদের বাণী। আর প্রগতিশীল কবিরা জীবনের কাছ থেকে তার পাঠ নেন, মৃত্যুকে এড়িয়ে যাওয়া তাঁদের উদ্দেশ্য নয়, বরং মৃত্যুকে অতিক্রম করার দৃঢ় শপথ ফুটে ওঠে তাঁদের সংগ্রামের ভেতর দিয়ে। সার্থকতা এইখানে।

কয়েকটি বিশেষ প্রসঙ্গ ও সুভাষের কবিতা:

প্রগতি সাহিত্য আন্দোলনের শরিক কবিরা সুকান্তের ভেতর থেকেই তাঁদের উপকরণ সংগ্রহ করার আগ্রহ প্রকাশ করেছেন। সুভাষ মুখোপাধ্যায়ও তার ব্যতিক্রম নন, যুদ্ধ-পরিস্থিতি চতুর্দিকে যে উত্তাপ ছড়িয়েছিল সেই উত্তাপ সুভাষকেও এমন নিবিড়ভাবে ছুঁয়ে গেছে যে তাঁকে বলতে হয়---'পরো পরো যুদ্ধের সজ্জা'। এহেন সমরবাদী কবি সুকান্তকে ভুলে থাকবেন এটা আশা করাই অন্যায়। যুদ্ধের পরিণতিতেই এদেশে দেখা দেয় দুর্ভিক্ষ। বিষ্ণু দে, সমর সেন কি সুকান্ত কেউই দুর্ভিক্ষের মত এক বিশাল ঘটনার হাত থেকে রেহাই পান নি। দুর্ভিক্ষ এই আন্দোলনের শরিক কবিদের প্রত্যেককেই তাড়না করে ফিরেছে। সুভাষের 'চিরকুট' কাব্যটি দুর্ভিক্ষের বেদনাকে, তার স্মৃতিকে ধরে রেখেছে। 'কাব্যজিজ্ঞাসা' কবিতায় এর প্রথম স্তবক: 'এখনো আগুন/পাড়ায় আগুন/বাড়ে হু হু'---এ আগুন দুর্ভিক্ষগ্রস্ত বাংলার জনজীবনের প্রকট বিপর্যয়ের, অন্যদিকে এ আগুন বৈপ্লবিক চেতনারও। বাস্তবজীবনবিমুখ কলাবিদদের কবি তাই সরাসরি দুর্ভিক্ষের মুখোমুখি কাঠগড়ায় দাঁড় করিয়ে প্রশ্ন রাখেন---'ভাঙো চিবুক-ঠেকানো হাতের নিদ্রা---/বাগানে শুকনো কঙ্কালসার বৃক্ষ,/ফিচকির পরে পালাবে কি কলাবিৎরা?/--গ্রামে ও নগরে ভিড় করে দুর্ভিক্ষ।' মনে রাখতে হবে, সুভাষ 'জনযুদ্ধে'র প্রতিবেদক হিসেবে তদানীন্তন পূর্ব বাংলার নানা অঞ্চলে ঘুরে ঘুরে দুর্ভিক্ষগ্রস্ত জীবনের বাস্তব ছবির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট হয়ে পড়েছিলেন। এই দুঃখজর্জর জীবনের অসহায়তা দেখে সুকান্ত জ্বলে উঠেছিলেন মহান ক্রোধে, এই ক্রোধ সংবরণ করতে পারেন নি আরও অনেক কবি, কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় এই যে, সুভাষ মুখোপাধ্যায়---যিনি পার্টি-অন্ত প্রাণ, তাঁর ক্রোধ নিজের সংযমকৌশলে অনতিব্যক্ত একটি স্বতন্ত্র মাত্রা অর্জন করেছে। বরং তিনি জোর দিয়েছেন, জনগণ যেন হতাশ হয়ে না পড়েন, 'ভীরু চিত্তে'র দুর্বলতা যেন কাটিয়ে ওঠেন, সব রকমের শোষণ আর সাম্রাজ্যের বিরুদ্ধে যেন সচেতন হন, তার ওপর। বাস্তবিক, এমনতর আহ্বান সাংগঠনিক স্তরের, ইতিবাচক বিকল্পভুবন রচনার সুপ্রসংকেতে এমন প্রয়াস অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। দুর্ভিক্ষগ্রস্ত বাংলাদেশ তাঁকে এই অভিজ্ঞতার সম্মুখীন করে দিয়েছে: 'বুঝেছি সমাজজীবনের দুষ্টচক্রে---/প্রাণ বাঁচানোর নেইকো সহজ পন্থা,/বজ্রমুঠিতে দুর্জন হবে তাড়াতে'। সুভাষ তাই জানেন, দুঃখমোচন একার ব্যাপার নয়---'একলা নই, মিলিত হাত আজ আঘাত হানবে'। জীবনবিমুখ কলাবিদকেও তাই সঙ্গে টেনে আনতে চেয়েছেন, মিছিলে মিলিয়ে দিতে চেয়েছেন: 'চলো না কবি মিছিলে মিশি---অসৎ ও হিংস্রক/শত্রুকে শব করেছে জানু, পড়েছে বালু সৌধ।' বালুর সৌধ তো বাসোপযোগী নয়, তাই উত্তরণের পন্থা অন্যত্র অনুসন্ধেয়। সুভাষের সমাজতান্ত্রিক স্বপ্ন রূপ পায় এইভাবে: 'আমরা দেব বোবাকে ভাষা, খোঁড়াকে দ্রুত ছন্দ/মরু বুকে রয়েছে খনি, কুঁড়িতে ঢাকা গন্ধ।'

খনি-আবিষ্কারক যেমন দুঃসাহসিক প্রয়াসের মধ্য দিয়ে আবিষ্কার করে ফেলেন মূল্যবান রত্ন-মানিক, শহর-গ্রামব্যাপী নত নত বঞ্চিত হতভাগ্য মানুষের ভেতরেও যে অজস্র ও বিচিত্র ঐশ্বর্য রয়েছে, সেই সম্পদ তেমনি করে আবিষ্কার করে সমাজবিকাশের শর্তে কাজে লাগাতে হবে, মানুষের মূল্যবান প্রাণশক্তিকে (শারীরিক বা মানসিক) বৃথা অপচয় হতে না দিয়ে সমাজ ও সভ্যতার অপরিহার্য উপাদান হিসেবে ব্যবহার করা চাই---সর্বহারাশ্রেণীর সামনে সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতির এমনতর গুরুত্বকে, এমন মহৎ বাসনাকে, কাব্যে রূপায়িত করে সুভাষ মুখোপাধ্যায় তাঁর অনায়াস দক্ষতার প্রমাণ রেখেছেন। প্রচলিত কাব্যে বা কবিতায় সমাজতান্ত্রিক অর্থনৈতিক-সম্পর্ককে এভাবে উন্মোচনের দৃষ্টান্ত নেই।

যাই হোক, সর্বহারাশ্রেণীর সামনে এই আকাঙ্ক্ষা রূপায়ণের পথটি বড় কঠিন। কেননা, দুর্ভিক্ষের সুযোগ নিয়েছে জমিদার, মহাজন, ধনী ব্যবসায়ী আর শাসকশ্রেণী। এখন 'উপবাসী চাষা, ধান উধাও' (প্রস্তাব), মহাজনদের থাবা অবশ্যই মহাজনানুগ নয়, তাই 'পথে ভিড়ায় চলেছে লোক'। 'তিন সন্ধ্যে উপোস দিয়ে/ খাচ্ছি ক'দিন বুনোশাক'---এ দশা সব গ্রামবাসীর। রক্ষা করার, দুর্ভিক্ষ শহরে নয়, তারা নিয়েছে গ্রাম বাংলায়। অবস্থা চরম: 'ঘরেতে যা আছে তাতে/ চলে না কো রক্ষা/ ঘটি বাটি বেচেছি সব---/ নিজের বলতে ছিল যা।' (চিরকুট)। 'গ্রামে' কবিতাটিতেও সেই একই রূপ: 'জমিজমা গেছে; গেছে বসত বাসা-/বাসন,/ উপবাসী দেখি একে একে মরে আপনজন।' চারদিকে নৈরাশ্য আর হাহাকার। 'পালাবার পথ বন্ধ'। আর একটি গ্রামের ভয়াবহ বর্ণনা: 'পথের দুদিকে বাসা/ বেঁধেছে কঙ্কাল,/ গ্রাম করে খাঁ খাঁ--/ লোকালয় পড়ে থাকে/ ভগ্নস্তূপ ফাঁকা।' (এই আশ্বিনে)। ফাঁকা খাঁচার অর্থ হল, কেউ তার পাখিকে চিরদিনের মত হারিয়েছে। চরাচরব্যাপী মৃত্যুজালে ঘেরা এই গ্রামের চোখে 'অনুর্বর অন্ধকার', গায়ে 'শবগন্ধ'। 'দুর্গত' কবিতাটিতেও সেই একই চিত্রণ, দুর্ভিক্ষের বাংলাদেশ শ্মশানের মত পড়ে আছে। 'সুন্দর' কবিতায় সেই ছবি একটি [illegible] অবয়ব পেয়েছে----'চিতাপাশে দুটি হাত স্থির,/ ঠোঁটে তার বিস্ফারিত ক্ষুধিত আত্মার/ কঠিন দন্তুর অভিশাপ।' অনন্ত মূল্যবোধ ভেঙে গেছে আকস্মিক বিপর্যয়ে: 'বাৎসল্য নিহত, প্রেম পরাভূত'। শত্রুর রূপ স্পষ্ট হয়: 'দরদীর ছদ্মবেশ ধরে/ শত্রুর দালাল,/ গোপনে আটকে রাখে অন্ধকার ঘরে/ লক্ষ মণ চাল,/ অন্য হাতে অগ্নিগর্ভ প্ররোচনা।' (সুন্দর)। এই 'প্ররোচনা'র বিরুদ্ধে তাই সুভাষকে অগ্নিগর্ভ আহ্বান জানাতে হয়: 'এখনো নিশ্চিন্ত বসে আছো?/ নিদ্রিত বন্ধুকেও ডাকো, রক্তে তার জ্বলুক আগুন।' (আহ্বান)। কবির পরামর্শ, 'কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে দাঁড়াও,/ হাতে হাতে বজ্র হানো/ প্রকম্পিত বিস্ফোরণে চাও:/---দুর্জনের কলঙ্কমোচন।' (এই আশ্বিনে)। কলঙ্কমোচন নিরস্ত্রভাবে হয় না, কারণ 'শ্মশানে হৃদয় বিলাবো বৃথা'---এই উপলব্ধি এই সিদ্ধান্তে দাঁড় করায়: 'তার চেয়ে এসো

দরিদ্র কুঠার/শত্রু শরীর করুক ধার।' (প্রাব্য)। সর্বহারা মানুষের এই সংগ্রাম নিছক আত্মপ্রসাদতুষ্ট দলের বিপ্লবীয়ানা নয়, এর পেছনে আছে অনেক, অনেক দিনের স্বপ্ন, সে স্বপ্ন কী? 'ঘরে ঘরে ডাক পাঠাবে।/দলে দলে সদলবল ওঠে,/নদী করে সম্ভাষণ, সাথি করে গান/মাঠের সম্রাট দেখে মুগ্ধনেত্রে দান আর দান॥' (স্বাগত)। এখানে কৃষককে বলা হয়েছে 'মাঠের সম্রাট'। এত ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য, এত মহত্ত্ব অভিধা আর কে দিয়েছেন কৃষককে? এই কৃতিত্ব সুভাষের প্রাপ্য। তাছাড়াও সুভাষ এই অসাধারণ সংক্ষিপ্ততায় গীতিকবিতার অন্তরঙ্গতা রক্ষণও যেভাবে ধরেছেন, তা তাঁর শিল্পনৈপুণ্যই প্রকাশ করে। তাঁর 'স্বাগত' কবিতাকে দুইভাবে ভাগ করা যায়। একদিকে গ্রাম বাংলার শ্মশানচিত্র, অন্যদিকে সাধারণ মানুষের আকাঙ্ক্ষার স্বপ্নচিত্র---ভিন্নধর্মী দুটি অবস্থার নাটকীয়তা বা নাট্যিক সংঘাত পরিণামে উজ্জীবনের আবেগে উদ্ভাসিত হয়ে সুভাষের জীবনাদর্শকেই সমুচ্চ মহিমায় তুলে ধরেছে। লক্ষ্য করার, সর্বহারা সমাজের রঙিন ভবিষ্যতের চিত্রণ এমন সহজ সুন্দর সম্ভাবনাময় আবেগে 'স্বাগত' বা তার আর কোন কবিতায় উচ্ছ্বসিত হয়ে ওঠে নি।

দুর্ভিক্ষ ছাড়াও সুভাষের কবিতায় যুগের অন্যান্য ঘটনা প্রাধান্য বিস্তার করেছে। জাপানের চীন আক্রমণ, জার্মানির রাশিয়া আক্রমণ, বন্দীমুক্তি আন্দোলন, ধর্মঘট, পূর্ব সীমান্ত যুদ্ধ, দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার মুক্তি-যুদ্ধ প্রসঙ্গ ইত্যাদি। সুভাষ কিছুকাল সাংবাদিকতার সুবাদে কোন কোন ঘটনাকে সংবাদ-প্রতিবেদনের আকারে উপস্থাপন করে ফেলেছেন, অবশ্য এর সঙ্গে প্রায়শ মিশে আছে একজন কবির সততা ও সমাজপ্রেম অনুভূতির স্পর্শকাতরতা। তাঁর কৌশলটি লক্ষণীয়: 'নিষ্ঠুর কালের মুঠি---/ভেঙেছে ঘটনাচক্রে হরণতি মন্ত্রীর টিকির/একে একে কুচক্রান্ত, মিউনিকের নিভেছে দেউটি,/ব্যর্থ সব ছলকলা, কালসর্প হয়েছে করাল,/অবশেষে রাজ্য-বানচাল।' (প্রতিরোধ প্রতিজ্ঞা আবার)। অথবা: 'অনুশক হার মানে।/বিভ্রান্ত চীনের রক্তচিহ্নিত শ্মশানে/জাগিছে নতুন শক্তি।/জনতার দুরন্ত প্রতাপ---/বিজয় প্রবাহ মেলে,/ছত্রভঙ্গ পরাক্রান্ত জাপ।' (চীন)। অথবা: '(আমরা কয়েকটি প্রাণী,---দুচোখে ঘুমের হরতাল।)/মাঝে মাঝে শোনা যায় অদূরে কুকুরের ঠোঁটে/নতুন শিশুর টাটকা রক্তিম খবর।/... ..../উচ্চারিত হোক তাই বিস্ফোরক দিন/বার বার বন্দুকের উজ্জ্বল মিছিলে/বিপ্লব ঘোষণা ক'রে গেছে।' (পদাতিক)। তিনটি উদ্ধৃতিতেই লক্ষ্য করার যে কী সুকৌশলে তৎকালীন গুরুত্বপূর্ণ সংবাদগুলিকে সংক্ষিপ্ত করা হয়েছে, বর্ণনাতেও তাই সাংবাদিকের প্রবণতা এসে পড়েছে। কবির পক্ষে সম্ভব নয় একেবারেই এই ধরনের বিবৃতিধর্মিতাকে অস্বীকার করা, কিন্তু কবি বলেই বোধকরি সম্ভব বর্ণনাধর্মিতার সঙ্গে কাব্যের মেজাজ মিশিয়ে দেবার। সুভাষ এক্ষেত্রে তাঁর দক্ষতার নিশ্চিত প্রমাণ রেখেছেন। ১৯৪৬ খ্রীষ্টাব্দের ডাক-তার ধর্মঘটকে স্মরণে রেখে লেখেন: 'স্ট্রাইক! স্ট্রাইক! বিজলীর চোখ গেলে দাও, করো চৌরঙ্গিকে অন্ধ।/

স্ট্রাইক! স্ট্রাইক! ডাক্-তার ভাই! টেলিফোন বোন, ভয় নেই, পাশে আমরা'। (মধুমাবে চলো)।

কবিতাটি স্লোগাননির্ভর। তবু 'বিজলীর চোখ মেলে দাও', 'করো চৌরঙ্গীকে অন্ধ', 'ডাক্-তার ভাই', 'টেলিফোন বোন' ইত্যাদি শব্দগুচ্ছের আলংকারিক প্রয়োগে কবির অভীষ্ট যেমন সিদ্ধ হয়, তেমনি তাতে করে কবিতার মেজাজটিও ধরা পড়ে। ১৯৩৮ খ্রীষ্টাব্দের জাপ-আক্রমণকে লক্ষ্য করে সুভাষের একটি বিখ্যাত কবিতা: 'জাপ দুশমনকে ধরে কুরকুরি, ঢুকে হ্যাংকাও/কমরেড, আজ বজ্রে কঠিন বন্ধুতা চাও/লাল নিশানের নিচে উল্লাসী মুক্তির ডাক/রাইফেল আজ শত্রুপক্ষের সন্ধান পাক।' (চীন: ১৯৩৮)। সুভাষ মুখোপাধ্যায় এভাবেই তাঁর কুশলী প্রয়োগে সাধারণ কথার ভেতরেও, সামান্য বা অতি তুচ্ছ ঘটনার মধ্যেও সঞ্চার করে দিতে পেরেছেন কাব্যের বিশেষ আকুতি, সুকান্তের বিশেষ বিশেষ প্রসঙ্গগুলি তাঁর হাতে ঐতিহাসিক দলিলের চেয়েও [illegible] হয়ে উঠেছে কাব্যিক গুণে।

সুভাষ মুখোপাধ্যায় সর্বতোভাবে চেষ্টা করেছেন সমকালীন ঘটনাকে সাংবাদিকসুলভ ভাষণের মধ্যেই শুধু সীমাবদ্ধ না রেখে তাকে কবিতা, যথার্থ কবিতা হয়ে উঠতে, গড়ে তুলতে, যদি অবশ্য কবিতা বলতে জীবনানন্দের ভাষায় ধরে নেওয়া হয়---'এক ধরনের উৎকৃষ্ট চিত্তের বিশেষ সব অভিজ্ঞতা ও চেতনার জিনিস'[২৩] বলে। ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তির ক্ষেত্রে এই অভিজ্ঞতা ও চেতনা ভিন্ন হওয়াই সম্ভব। ব্যক্তিত্বের ভিন্নতা স্বাভাবিকভাবেই তাই সুভাষের কবিতাকে বিষ্ণু দে ও সমর সেনের কবিতা থেকে আলাদা করে চিহ্নিত করে দেয়। এই কবির ব্যক্তিত্ব প্রথম থেকেই প্রকাশ পেতে থাকে বিপ্লবী প্রেরণার মধ্য দিয়ে। দেশ-কাল-সমাজ আর দুঃখ-পরিস্থিতি এই প্রেরণার মূল উৎস। এক মহত্তর ভালবাসায় তাঁর ব্যক্তিগত জীবন সেখানে প্রায় অনুপস্থিত। ব্যক্তির আশা-আকাঙ্ক্ষা-উদ্দীপনা-প্রেম-প্রিয়তমা-স্মৃতি-বিষাদ-হতাশা, যা আধুনিক গীতিকবিতার একটি প্রধান লক্ষণ, বিস্ময়ের বিষয়, সুভাষ আলোচ্য দশকের উল্লিখিত তিনটি কাব্যে তার কোন সুস্পষ্ট ছাপই রাখেন নি। কবিতাকে সুভাষই প্রথম ব্যক্তিগত-সীমা থেকে টেনে এনে সমষ্টি-চেতনার প্রাধান্যে সার্থকরূপ দিতে সক্ষম হন। বিশেষত বাংলা কবিতায় এই লক্ষণটি বিশেষভাবে স্মরণযোগ্য বিষয়। প্রেম-বিষয়ক কবিতা বা 'পদাতিক', বা 'চিরকূট', বা 'অগ্নিকোণ' কোথাও প্রকাশ পায় নি সম্ভবত এই কারণে। সংকটকালীন সময়ে বা বিপ্লবকালীন প্রস্তুতির সময় ব্যক্তিগত প্রেমের অবকাশ নেই---এই জাতীয় চিন্তাই কি সুভাষকে দূরে সরিয়ে রেখেছিল? ব্যক্তিগত প্রেম থেকে দূরে সরে থাকার ঘটনাকে বুদ্ধদেব বসু একটু বিস্ময়ের সঙ্গে লক্ষ্য করে বলেন, 'তিনি বোধহয় প্রথম বাঙালি কবি যিনি প্রেমের কবিতা দিয়ে কাব্যজীবন আরম্ভ করলেন না।'[২৪] বিষ্ণু দে, সমর সেন, এমন কি সুকান্তও যেখানে প্রেমের কবিতা দিয়ে কাব্যজীবন আরম্ভ করেন, সুভাষ সেখানে এক নিরুত্তাপ ও মৌনবাক্ কেন বোঝা যায় তাঁর

'পদাতিকে'র প্রথম কবিতাতে। লিখলেন---'প্রিয়, ফুল খেলবার দিন নয় অদ্য'। প্রেম কি মানুষের ব্যক্তিগত বিনাশ চায় ? না, তা নয়, নইলে এ কথা তিনি বলতে পারতেন না 'তিল তিল মরণেও জীবন অসংখ্য/জীবনকে চায় ভালবাসতে' অথবা 'প্রণয়ের যৌতুক দাও প্রতিবেশে'। ভালবাসা তো জীবনেরই জন্যে। সেই জীবনেরই বিরুদ্ধবাদী শক্তি হিসেবে যখন ধ্বংস এসে উপস্থিত হয়, পায়ে যখন প্রতিকূল পরিস্থিতির আঁচ এসে লাগে, তখন ব্যক্তিগত জীবন, ব্যক্তির সুখ-দুঃখ-স্বপ্ন-স্মৃতি-মায়ার যে বহু কাঙ্ক্ষিত কল্পভুবন, তাকে বিসর্জন দেওয়া ছাড়া গত্যন্তর কী ? 'কুয়াশাকঠিন বাসর যে সম্মুখে'---'বাসর' শব্দটি আমাদের কাছে গুরুত্বপূর্ণ এই কারণে, যে সমস্ত কমরেড 'নবযুগে'র প্রত্যাশী, তাদের কাছে মিলনের বাসররচনার ব্যাপারটি অত্যন্ত বিঘ্নসংকুল, জীবনের প্রথম শর্তই হল এই বিঘ্নকে জয় করা। নইলে ফুলের বাসর হয়ে উঠবে কাঁটার বাসর, যা অনভিপ্রেত। খুব সম্ভব এই ধরনের কোন চিন্তা-ভাবনা সুভাষকে প্রেমের কবিতা লেখা থেকে সরিয়ে নিয়ে থাকবে। তবুও লক্ষ্য করার যে, মানুষের ব্যক্তিত্ব-বাসনার রূপ ধরে যে প্রেম, সে-প্রেম থেকে কবি মুক্ত হতে পারেন না, সুভাষও পারেন নি: 'মন থেকে আজ মিতালি উধাও/শরীর সে উপনিবেশ নিলো,/জটিল স্মৃতির পায়ে পায়ে তবু/হারানো প্রেমের ছায়ারা ঘোরে।' (কানামাছির গান)। আর এই একই কারণে 'বনের হরিণ সোনা হল কার নয়নে', কিন্তু একজন মধ্যবিত্ত প্রেমিকের এই স্বপ্ন দেখা তো দোষের নয়। রবীন্দ্রনাথের হরিপদ কেরানীরা 'পরনে ঢাকাই শাড়ি, কপালে সিঁদুর'-এর রোমান্সচারণার মধ্যে বর্তমান-বিস্মৃতিকে প্রধান করে তুলে জীবনের মৌলিক সংকটগুলি এড়িয়ে যেতে চায়। সুভাষের 'বধূ'র প্রেমেও তাই এক অ-সফল দীর্ঘশ্বাসের সঙ্গে বেজে ওঠে যুগের সংকট---'ঈশ্বর থাকে কখন প্রিয়তম উধাও'। হরিপদ কেরানীরা এই প্রেমের বন্ধনকে ভয় পায়, অর্থনৈতিক কারণেই এই ভয়, পরিণাম---পালিয়ে বাঁচা। 'স্বর্গের আকাঙ্ক্ষা মনে ছিঁড়ে যায় বলেই 'পক্ষীদের পাখার নিচে' ছুটতে হয়---আর---'প্রণয়ের কাহিনীকে প্রবৃত্তির হাতে বেঁধে মুহূর্তের ভুলে/মহৎ প্রশ্রয় দেওয়া, তারপর পিঠ রেখে সম্মুখ জীবনে/বিমুক্ত হৃদয় খোঁজা,---সকল সুবাতা যাতে প্রেম হয়ে ভরে'। (পদাতিক)। এই সংকট ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থার সংকট। এর থেকে ব্যক্তির মুক্তি কোথায় ? শীর্ষনাম 'পদাতিক' এদিক থেকে খুবই উপযোগী। সুভাষ ভাবেন, মনে মনে প্রেমকে লালন না করে উপায় নেই, যদিও জীবনে তাকে গ্রহণ করা সম্ভবপর হয়ে ওঠে না আর্থিক-সামাজিক কারণে। জীবনের নিয়মেই যৌবন আসে, ঋতুচক্রের আবর্তনে যেমন বসন্তঃ 'ওরে কি বাজেয়াপ্ত ফাল্গুন, কমরেড ?/বসন্ত বিজ্ঞপ্তি আঁটে দুর্ভিক্ষের গায়ে,/পর্দায় পর্দায় হাওয়া কসরৎ দেখায়।/আকাশে অসংখ্য টর্চ, মেয়েরা কেয়ার---/গোলদীঘির গর্তে চাঁদ ধরা প'ড়ে গেছে।/বসন্ত সত্যিই আসবে ? কী দরকার এসে ?/বছর-বছর দেখা দিয়েছে সে ক্যালেন্ডারের ভিড়ে॥' (অগ্নিকোণ)।

'বৃত্তি' যখন 'একান্ত বিবাদী' হয়ে ওঠে তখন ভেঙে যায় 'সংসার পূর্ণ', হয়ে হয় 'কণ্টকিত সুখের বিছানা', তবুও প্রেমের কাছে মানুষের ঋণ রয়ে যায়: 'তবুও তোমার কাছে ঋণী/একদা আমার এই একটুকু হৃদয়হরিণী,/তোমার উজ্জ্বল দিন বাসনায় আমাকে গড়াল'। (কাব্যজিজ্ঞাসা)। যদিও 'আমাদের টীকা তাঁহার প্রেমের হত্যা' তবুও এই ঋণকে সুভাষ অস্বীকার করেন নি। তাঁর চোখে আগামী দিনের সূর্যেরা ভাসে 'নতুন পৃথিবী অজস্র সুখ, সীমাহীন ভালবাসা' আর সেইজন্যেই তাঁর পথ চলা জনতার মিছিলে মিছিলে। এই মিছিলের একটি মুখ, একটিমাত্র মুখ, উজ্জীবিত করে, দীপিত করে কবিকে, কবির চোখে কনকচাঁপের মত জ্বলজ্বল করতে থাকে সেই মুখ---মিছিল শেষ হলে সে-মুখ হারিয়ে যায়---'হায়ে হায়ে হারিয়ে গেল/মিছিলের সেই মুখ।' (মিছিলের মুখ))। এই মুখের জন্যে কবিকে দু'বেলা পথে-পথে ঘুরতে হয়, ভিড় দেখে দাঁড়াতে হয় প্রত্যাশায় 'যদি কোথাও খুঁজে পাই মিছিলের সেই মুখ'। রুশ কবি ইঙ্গিনা ওজেরতার 'মায়া'[২১] ঠিক তার রাস্তা দিয়ে চলে যাওয়া সেই মানুষটিকে খুঁজতে চান, কে সে, বুঝতে চান, বলেন: 'মানুষটা কে হতে পারে?/কোনো পুরুষ? মহিলা কি?/কিংবা একটি খুকী, বা কোনো কিশোর?/হয়তো কোনো অতিথি চলেছে ও,/বাজার থেকে কিনে নিয়ে যাচ্ছে রুপোলি মাছ,/কিংবা সে নয়তো রঙিন পৃথিবীর মতো একটা বল।' তাঁর অবিরাম অনুসন্ধান তো একরকমের আত্মানুসন্ধানও, কেননা তিনি শুধু তাঁর সেই বিশেষ মানুষটিকে দেখতেই চান না, তাকে আবিষ্কারও করতে চান, তাঁর সন্ধান তাই কখনও থামবে না, বলেন---'তা হলে, গেল কোথায় সে---আমার মানুষ?/জানি না।' ইঙ্গিনা বলছেন 'জানি না', তার অর্থ কিন্তু সেইখানে থেমে যাওয়া নয়, বরং গভীরতর অনুসন্ধান চলবে। সুভাষ এই মুখ খুঁজতে চান 'সমুদ্রের একটি সূর্য'-সেঁকার আগ্রহে। অন্য সব মুখ 'দুর্মূল্য প্রসাধনের প্রতিযোগিতায়' যখন মেতে ওঠে 'তখন অপ্রতিদ্বন্দ্বী সেই মুখ/বিস্ফোরিত তরবারির মত/জেগে উঠে আমাকে জাগায়'। এরই জন্যে সুভাষকে অন্ধকারে হাতে হাতে বিলিয়ে ফিরতে হয় 'নিষিদ্ধ এক ইস্তাহার' যার আহ্বান জানাতে হয়: 'যাতে উদ্বেলিত মিছিলে একটি মুখ দেখ পায়/যার সমস্ত পৃথিবীর মুক্তবন্ধ ভালবাসা/দুটি হৃদয়ের সেতুপথে/পারাপার করতে পারে।।' (মিছিলের মুখ)। মানুষের যাবতীয় শিল্প-শ্রম-চেষ্টা মানবিক বিকাশের জন্যে, 'মুক্তবন্ধ ভালবাসার জন্যে, 'একটি কবিতা লেখা হয় তার জন্যে'---মিছিলের সেই অপ্রতিদ্বন্দ্বী মুখ। এই ভালবাসা, এই প্রেম তিল তিল মৃত্যুর মূল্যে গড়ে তুলতে চেয়েছিলেন সুভাষ, তাই এই প্রেমের প্রতি বুদ্ধদেব বসুর দৃষ্টি পড়ে নি, কারণ প্রেম তাঁর কাছে কেবলি দৈহিক বিলাস, ক্ষুধা আর কাৎরানি---তাঁর 'সম্রাজ্ঞী বনিতা' কবিতাটি--- 'আমি ক্ষুধিত, আমি অস্থির, আমি নিষ্ঠুর।/চীৎকার ক'রে আমি চাই, চাই, চাই,/হয়তো কোনদিন ভেঙে ফেলতুম তোমার মধুর/দেবী-প্রতিমা', বুদ্ধদেব বসু

নিজের চরম নগ্নতায় নিজেই বিস্মিত---'এবার তো দেখবে আমার চরম নগ্নতা---/কী নিঃস্ব আমি, নির্লজ্জ, নিষ্ঠুর।' এই বিকৃত, অসুস্থ, ইন্দ্রিয়পরায়ণতানির্ভর প্রেম সম্পর্কে প্রগতি সাহিত্য আন্দোলনের শরিক কবিরা স্বভাবতই বিরূপ। তাঁরা প্রেমের মধ্য দিয়ে সুস্থতার ধারণাকেই লালন করতে চেয়েছেন। কিন্তু এই সুস্থতার অর্থ এমন নয় যে তা প্লেটনিক-প্রেমের আদর্শ সন্ধানে ব্যস্ত। সোভিয়েট রাশিয়ায় নভেম্বর বিপ্লবের আগেই প্রেমকে শারীরিকতার বন্ধনেই দেখা হয়েছিল, যেমন আন্না আখমাতোভা এইভাবে দেখে ছিলেন---

'You're sweet, we'll be friends, we'll take
walks, you and I,
We'll kiss, and we'll age side by side.'[২৭]

লক্ষ করবার, এখানে কুণ্ঠা প্রকাশ পায় নি, বরং বন্ধুত্বের প্রত্যয় দিতে এই প্রেমকে এক সুস্থ মানবিক-সম্পর্কে গভীরতা দান করেছে। বিপ্লবোত্তর সোভিয়েটে প্রেমের প্রকৃতি ইন্দ্রিয়াসক্তির মধ্য দিয়ে প্রকাশিত হয় নি। নিকোলাই তিখোনভ পারিপার্শ্বিক উত্তাপে তাঁর প্রেমকে শানিয়ে নিয়ে দেখেন

'As the fire loves the birch-tree she loved me
And as gay flared the flames of our love.
As the dawn on the nomad camp breaking
Her young shoulders were shining and smooth'[২৮]

(Translated by Avril Pyman)

অডেন লেখেন: 'O love, the interest itself in thoughtless heaven,' এর সমালোচনাপ্রসঙ্গে সি. এম. বোরা বলেছেন,' but by 'love' he means the larger social love of man for man, the love of which it can be said that —

'Hunger allows no choice
To the citizen or the police.
We must love one another or die.'[২৯]

অডেনের কাছে ভালবাসা এক সর্বব্যাপক অনুভূতিতে ক্রিয়াশীল হয়েছে, ব্যক্তিগত সম্পর্কের মোহে যে ক্ষুদ্রতা থাকে, তার থেকে উত্তরণের প্রয়াস এতে পাই।[৩০] একেবারে ভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গির সুরকে রাখেন পাবলো নেরুদা। তাঁর কাছেও প্রেম যেন তাৎপর্যপূর্ণ, কিন্তু কোনখানেই তা অসংযত বাসনার উলঙ্গ প্রকাশ হয়ে ওঠে

নি। সুখ-দুঃখ-ত্যাগ-ভোগবাসনাপূর্ণ সাধারণের সীমার মধ্যেই তাঁর প্রেম-চেতনা একটি স্বতঃস্ফূর্ত অথচ শোভনসুন্দর আবেগের স্রোত বইয়ে দিয়েছে---

'মাতিল্দা, প্রেয়সী আমার,
তোমার চোখ ছাড়া আমার ঘুম আসবে না।
তোমার চাহনিতে ছাড়া আমার অস্তিত্ব থাকবে না।
বসন্তকে আমি এমনভাবে বদলাই
যাতে তুমি চোখ দিয়ে আমাকে অনুসরণ করতে পারো।
বন্ধুগণ, এই হল সাকুল্যে বাসনা।
বলতে গেলে কিছু নয়, আবার বলতে গেলে সব কিছু।'[৩১]

('আমি চাই স্তব্ধতা', সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের অনুবাদ)

পল এলুয়ারের আবেগের মধ্যেও একরকম সংযত উচ্ছ্বাস তার অসাধারণ দীপ্তি নিয়ে উপস্থিত রয়েছে। যাই হোক, সমাজতান্ত্রিক আদর্শে বিশ্বাসী কবিদের কাছে প্রেমের এই সংযত প্রকাশ এদেশের প্রগতিশীল কবিদের কাছেও অনুসরণীয় হয়ে উঠেছে নানা কারণে। সুভাষের কাছেও তাই এটা প্রত্যাশিত। তাঁর প্রেম-এর বোধে শান্ত ও স্থির অথচ আবেগময়, শালীনতায় ও সংযমে স্থিত অথচ উচ্ছ্বসিত, আগ্রহে ও ব্যাকুলতায় উদ্দীপক অথচ প্রকাশে মিলিতসুন্দর একটি নতুন মাত্রা যোগ হয়েছে বলে মনে হয়। এ প্রেম সীমাস্বর্গের বাইরের নয়, নয় অলৌকিকও, সাধারণও বটে, আবার অনন্যসাধারণও, নেরুদা'র ভাষায় 'বলতে গেলে কিছু নয়, আবার বলতে গেলে সব কিছু'---এই অনন্যতাই সুভাষের প্রধান বৈশিষ্ট্য।

সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের শিল্পপ্রকরণ:

ফেদেরিকো গার্সিয়া লোরকা নিজের সম্পর্কে অত্যন্ত সচেতন ছিলেন আর সেইজন্যেই গেরার্দো দিয়েগো-কে বলতে পেরেছিলেন, 'আমি যা করছি, সে বিষয়ে আমি অ-সচেতন নই', বলেছিলেন,

'On the contrary, if it's true that I'm a poet by the grace of God — or the devil — it is also true that I'm one by the grace of technique and effort, and of knowing exactly what a poem is.'[৩২]

কবির কাছে, শিল্পীর কাছে এই সচেতনতা ব্যতিরেকে যে কোন শিল্পের প্রকরণ-পরিমণ্ডল গড়ে ওঠে না যে, এ কথা বলাই বাহুল্য। সুভাষ মুখোপাধ্যায় তাঁর শিল্পপ্রকরণকে কবির সচেতনতা থেকেই গড়ে তুলেছেন। শিল্পকর্মের দুটি দিক---একটি বিষয়বস্তু বা 'কনটেন্ট', অন্যটি আঙ্গিক বা 'ফর্ম'। মানতেই হবে, বিষয়বস্তু ও আঙ্গিকের দীর্ঘদিনের দ্বন্দ্বের অবসান ঘোষিত না হলেও এ দুয়ের তুল্যমূল্য পারস্পরিক সমন্বয়ের রীতিতে ও সংশ্লিষ্ট সম্পর্কের ওপর অনেকখানি নির্ভর করে। ই. ডি. ভোলকোভা তাঁর একটি প্রবন্ধে

বলেছেন, 'Artistic content includes the ideological, emotional, figurative, aesthetic, concrete and sensuous spheres of meaning specific to art, arranged systematically and integrally. This is the unity of the basic mental-figurative components and of the links between them. The principle of the systemic nature of content helps us expose its determining role in relation to artistic form in all art forms and stylistic movements.'[৩৩]

আমরা বিষয়গৌরবের কথা আগেই আলোচনা করেছি। আঙ্গিকগতরূপে সুভাষের অবদানও বিশেষ উল্লেখযোগ্য। তাঁর কলাকৌশলের মধ্যে পরিণত মননের আভাস লক্ষ্য করেছেন বুদ্ধদেব বসুও। প্রথমেই যেটি দৃষ্টি আকর্ষণ করে তা হল সুভাষের বাকভঙ্গির তির্যকতা, এবং এটি তাঁর সাফল্যের চাবিকাঠিও বটে। যুগের ভাষাকে তিনি অনায়াসে স্থান দেন কবিতায়: 'সংবোধনের পর বাংলেছি মুঠিকে।/আস্তিক নই,--- নির্ভীক সটান ত্রিশূলে।/প্রার্থনা সব, ছুঁড়েছি যখন মুঠিকে---/নিঃসন্দেহে পূর্ণ, শরীর ত্রিশূলে।' (আমর্ষ)। যুগের ভাষারূপ সাজাতে তাঁকে দেশীয় প্রবাদ-প্রবচনের আশ্রয় নিতে হয়েছে এবং বলা বাহুল্য, এ ব্যাপারে তাঁর কৃতিত্ব নির্ভরযোগ্য। অনায়াসে তিনি ব্যবহার করেন 'ফুলের ঘুষি', 'আপন বাঁচার পক্ষে', 'সলিল - সমাধি', 'চন্দ্রাহত যুবক', 'বাংলার শাড়ির খুঁটে পাঁচিশুদ্ধ অহিংস শক্তি', 'ধোঁকার টাটি', 'অহিংসা পরমো ধর্ম', 'রাজার কিস্তি মাৎ', 'অদৃষ্টের চাকা', 'ইংরেজ প্রভুর দেখে সর্ষেফুল', 'গৌরীসেনী টাকা', 'আদার ব্যাপারী তাই বুঝি না/জাহাজের হালচাল কিছুই', 'পান্ডববর্জিত দেশ', 'রাস্তায় রাস্তায় যুদ্ধ', 'সংসারসমুদ্রে হালে পাই না পানি', 'বিধিরাম সর্দার', 'চুলোচুলি', 'আঠারো ঘা লাল বাঘ ছুঁলে', 'এদিকে বেড়েছে বৈরী কলির গোকুলে', 'ভাতে হাত কেটে বাজীমাতের দুরাশা', 'রক্তের ধার রক্তে শুধব', 'কার ঘাড়ে কত মাথা' ইত্যাদি। সুভাষের এবংবিধ ব্যবহার দেখে সহজে বোঝা যায়, তিনি বাঙালির বাকপ্রণালীর ধাতটা ভালই রপ্ত করেছিলেন। এতেই তাঁর সহজ স্বাচ্ছন্দ্য।

বিশেষণ ব্যবহারের ভেতর দিয়েও সুভাষ দেশীয় ও সংস্কৃত উভয় রীতিকে আত্মসাৎ করেছেন। কবিতায় এসবের প্রয়োগ তাঁর মূল বক্তব্যকে আরও তীব্র, আরও তীক্ষ্ণ করে তুলতে সাহায্য করেছে। যেমন: 'ব্যবসায়ী ঘন ঘামে স্বচ্ছন্দ খুঁজছে', 'ঘরে ঘরে সেই প্রথম-বিলাসী ভাবনা', 'নীল আলোটায় নীলিমার নীল সুপ্ত', 'রক্ত রেখেছি সুনামধন্য বুকে', 'সুখের বাসনা মেটাবে আগামি রূপকে', 'বিষাদের বিমলিন কবিতা-

কখ্যাতে ধার দিই জনেজনে', 'মহৎ প্রচ্ছদ', 'পশ্চিমের লাল মেঘ অন্ধ হয় পৃথিবীর আশ্চর্য খামারে', 'বিকালে মসৃণ সূর্য মূর্ছা যাবে মেকে প্রভাত', 'বিকৃত পশ্চিম চাঁদ উদ্ভ্রান্ত স্বপ্নে অশরীরী', 'ধুরন্ধর গোয়েন্দা হাওয়ারা', 'জাতিস্মর ভুখ', 'হিংসুক হাওয়া দেখে বাঁকে চকমকি', 'ক্রীতদাস বায়ু গোটাবে না পাততাড়ি', 'উপবাসী রাত অক্ষম অভিনেতা', 'লাল রাগে কাঁপে প্রেসিয়ার দিন', 'সুপুষ্ট সিঁদুর', 'অনেক আত্মীয় রাতে বিনিদ্র আমরা/দেখেছি বৈষ্ণব বেশে অকৃপণ হাত দেয় পণ্য যুবতীকে', 'রোমান্টিক এরোপ্লেন', 'কানুনী কবিরা অর্ধেক চাঁদের মত কী করুণ চ্যাপটা হয়ে গেছে', দিশাহীন ঋতু', 'তুমি যুগবিপ্লবী দেব', 'দম্পতি রাত', 'প্রাকপুরাণিক গুহাকে ডাকলো ভূধার মদ', 'বোমারু পুষ্পক', 'সরল ঘুম ছিঁড়ে', 'একচক্ষু হৃদয়েশ্বরিণী', 'জরাগ্রস্ত কুঁড়ি', 'মন্ত্রমুগ্ধ নীলাকাশে পাখি', 'দুরন্ত মনের ইচ্ছা আরক্তিম ফুল হয়ে ফোটে', 'অহিংস ঘাস', 'দুচোখে প্রখর সূর্যপ্রভার' ইত্যাদি ইত্যাদি। সুভাষের কাব্যে বিশেষণ ব্যবহারের এই নৈপুণ্যউল্লেখ করার মত। এটি সুভাষের কাব্যের অন্যতম লক্ষণও বটে।

সাম্যবাদী কবি হিসেবে সুভাষ চেষ্টা করেছেন কবিতায় তাঁর বক্তব্যকে সহজভাবে প্রকাশ করতে, দুর্বোধ্যতার হাত থেকে কবিতাকে মুক্ত করতে। কিন্তু এই প্রয়াস সর্বত্র পরিলক্ষিত হয় না। ইংরেজি সাহিত্যে এলিয়ট কবিতায় উল্লম্ফনের একটা রীতি প্রবর্তন করেন, বাংলাদেশেও এটি প্রিয় রীতি হিসেবে গণ্য হয়। এর মূল বৈশিষ্ট্য হল একই স্তবকে একাধিক পংক্তির মধ্যে আপাত-অর্থহীনতা, সহজে এর মূল তাৎপর্য ধরা পড়ে বলে কবিতা-পাঠে স্বাভাবিক বিরোধ দেখা দেয়। ফলে দুর্বোধ্যতা অঙ্গীভূত হয়। এই রীতিটি বিষ্ণু দে-র খুবই প্রিয় রীতি। সুভাষ তাঁর মানসিকতার দিক থেকেই এই রীতির বিরোধী হলেও তাঁর 'পদাতিক' কাব্যে এর কিছু কিছু নমুনা দেখা যায়। প্রসঙ্গত বলা দরকার, এই কাব্যটি প্রকাশের (১৯৪০ খ্রীষ্টাব্দ) পূর্বেই সুভাষ সাম্যবাদী ভাবাদর্শ গ্রহণ করেন এবং যুক্ত হন প্রগতি সাহিত্য আন্দোলনের সঙ্গে। তবুও আধুনিক এই রীতিকে তিনি একেবারে বর্জন করতে পারেন নি। যেমন:

> হরিণ সময় লাগামে বাঁধতে পারো ?
> বিংশ শতকেও ফুলের বেসাতি করি,
> অতনু প্রেমের সিতারি হৃদয়ে গায়
> হিংসুক হাওয়া দেখে বাঁকে চকমকি।
> ('পদাতিক', পদাতিক)

অথবা,

> বার্ধক্যবোরখ পাঞ্জা, পিঠে কুপিত নেই আর, জাতিস্মর ভুখ,
> ধনতন্ত্রে নাভিশ্বাস, পরিচ্ছন্ন স্নান তার প্রস্তুত ভাগাড়ে,
> (সাবাস্ বল্লভ ভাই! প্রকাশ্যেই নেড়ে দিলে গান্ধীর চিবুক)
> ('দলভুক্ত', পদাতিক)

প্রথম উদ্ধৃতিতে লক্ষ্য করার, হরিণশাবককে নাগালে বাঁধার সঙ্গে ফুলের বেসাতি করা বা অতল সমুদ্রের মিতালি বা কিংশুক হাওয়ার দেশে চকখড়ি আঁকার প্রসঙ্গে কোন সংগতি নেই যাতে করে এর তাৎপর্য সহজে স্পষ্ট হয়। দ্বিতীয় উদ্ধৃতিতেও সেই একই বিশৃঙ্খলা। এইরকম আঘাত-বাহ্যিক বিশৃঙ্খলা পাঠকের অর্থগ্রহণে বাধা তৈরি করে।

প্রগতি আন্দোলনের বিশিষ্ট কবিরা প্রায় সকলেই একটি রীতি বেশি করে রক্ষা করেছিলেন বোধকরি এই কারণেই যে, সাম্যবাদে হতাশা-দুঃখ-বেদনা কিংবা ব্যক্তিগত সংকটের কোন স্থান নেই, সমাপ্তি অংশে তাই প্রায় সকলের সুর এসে ঠেকেছে আশাবাদে আর ভবিষ্যতের উজ্জ্বল কল্পনায়। সুভাষের তিনটি কাব্যেই এই আশাবাদের সুর শোনা যায়, গভীরতর বিশ্বাস থেকে উৎসারিত হয় বলেই এই সুরের আলাদা একটা বৈশিষ্ট্যও রয়েছে। আত্মবিশ্বাসের বলিষ্ঠতাকেই তা প্রতিষ্ঠিত করেছে। কিন্তু এ কথাও ঠিক যে, একই সুরের পুনরাবৃত্তি, একই প্রকরণশৈলীর বারংবার ব্যবহার একদেশদর্শিতার প্রাধান্যই সূচিত করে। সুভাষের ক্ষেত্রেই শুধু নয়, অন্যান্য বামপন্থী প্রগতিশীল কবিদের ক্ষেত্রেও একটি বড় কথা হল এই যে, তাঁদের সামনে বিশাল আর ব্যাপক বৈচিত্র্যের অভাব তো ছিল না, কিন্তু তাঁরা এক বিশেষ সময়ে কেবল আদর্শগত কারণে এই বৈচিত্র্যের স্রোত সংবরণ করেছেন। আদর্শের এই দিকটি বাদ দিলে তাঁদের প্রতি অবিচার করা হবে। সুভাষের কবিতার শেষ অংশগুলি লক্ষ্য করা যাক:

ক) হে প্রতিপক্ষ, প্রতিদ্বন্দ্ব করো গ্রহণ---
তীব্র সঙিনে আজ অনিষ্ঠ অভিবাদন'
('শ্রেণীবিনাশ', পদাতিক)

খ) 'আমরা দেব বোবাকে ভাষা, খোঁড়াকে দ্রুত ছন্দ
এক বুকে রয়েছে খনি, কুঁড়িতে ঢাকা গন্ধ।
আমরা নই প্রলয় ঝড়ে অন্ধ'
(কাব্যজিজ্ঞাসা', চিরকুট)

গ) 'পথে পথে পদশব্দ ওঠে,
নদী করে সম্ভাষণ, পাখি করে গান
মাঠের সম্রাট দেখে মুগ্ধনেত্রে
ধান আর ধান'
('স্বাগত', চিরকুট)

ঘ) গতিবিধি বাঁধো বেড়াজালে উদয়াস্ত
বাঁচবেই গণতন্ত্র এই যা রক্ষে
যুদ্ধের ধার শুধবে হাতুড়ি কাস্তে,
সাবধান! যারা চাইবে বক্ষ হানতে॥'
(মন্ত্র', চিরকুট)

ঙ) পালাবার পথে ধুলো-ওড়ানোর দঙ্গলে, তাই
ঘাঁটি নিলাম একজন, আজ প্রাণপণে তাই
ভীরুতার মুখে লাথি মেরে লাল ঝাণ্ডা ওড়াই।।'
('মিছিলের গান', অগ্নিকোণ)

উদ্ধৃতিগুলির দ্বিতীয় ও তৃতীয় অংশকে ব্যাখ্যাসাপেক্ষে যে নির্যাসটুকু ওঠে তা হল ভবিষ্যতেরই একটি রঙিন স্বপ্নচিত্র। প্রথম, চতুর্থ ও পঞ্চম অংশে তারই রূপকের, কোথাও প্রতিদ্বন্দ্বীকে সঙিনে অভিবাদন জ্ঞাপন করা, কোথাও শত্রুর বিরুদ্ধে সাবধানবাণী উচ্চারণ, কোথাও ভীরুতা জয় করে লাল ঝাণ্ডা তোলবার আবেদন---অধিকাংশ কবিতাজুড়ে এই রীতিরই সচেতন প্রতিফলন দেখা যায়। যুদ্ধের পর্বে বর্বরতার দিনগুলিতে প্রগতিশীল কবিরা অত্যাচারিতের পাশে এসে দাঁড়াতে চেয়েছিলেন, চেয়েছিলেন তাঁদের সাহস জোগাতে, প্রেরণা সঞ্চার করতে। কবিতা তখন সমাজ-পরিসেবারই একটি ঘনিষ্ঠ অঙ্গ, এ অবস্থায় তাঁরা আর কী করতে পারতেন? প্রসঙ্গত সিদ্ধেশ্বর সেনের একটি মন্তব্য স্মরণ করা যেতে পারে: 'তখন কোন সৌন্দর্যবোধে তাকে দাবিয়ে রাখা সম্ভব? আবার মনে হয় ও-কবিতাগুলিকে তাদের যথার্থমূল্যে গ্রহণ করায় কোনো বাধা থাকাই সংগত নয়।'[৩৪]

সুভাষের কবিতা-পাঠক নিশ্চয়ই লক্ষ করে থাকবেন যে, সুভাষ জীবনের ঘনিষ্ঠ সংশ্রব থেকে তাঁর চিত্রকল্প তুলে আনেন। স্লোগানধর্মী বেশ কিছু কবিতা কেবল এই চিত্ররচনার গুণে কাব্য হয়ে উঠেছে, সুভাষের দক্ষতা এতেও প্রমাণিত। যেমন:

ক) পশ্চিমের লাল মেঘ অন্ধ হয় পৃথিবীর আশ্চর্য আঁধারে,
হলুদ ঘাসের প্রান্তে ট্রামের নিষ্ফল সুর দীর্ঘশ্বাস ছাড়ে।।'
('পলাতক', পদাতিক)

খ) রক্তচোষা দিগ্বিজয়ে মেতে---
ঝঙ্কারে বাজায় ডঙ্কা
চরাচর নৃত্যতালে মেতে।
চোখে তার অনুর্বর
অন্ধকার ঢাকা
গায়ে তার শবগন্ধ,
পদতলে চিতাভস্ম রাখা।
('এই আশ্বিনে', চিরকুট)

গ) সঙ্গীচ্যুত পড়ে থাকে
জীবনস্পন্দনশূন্য নিষ্ফল শরীর।
চোখে তীব্র অভিযোগ,

ভিক্ষাপাত্রে দুটি হাত স্থির,
ঠোঁটে তার বিস্ফারিত ক্ষুধিত আত্মার
কঠিন দন্তুর অভিশাপ।'

('স্বাক্ষর', চিরকুট)

ঙ) তার জন্যে

আগুনের নীল শিখার মতন আকাশ
রাগে রী-রী করে, সমুদ্রে ডানা ঝাড়ে
দুরন্ত ঝড়, মেঘের খুরঘটা
ঘুরে ঘুরে পড়ে, বজ্রের হাঁকডাকে
অরণ্যে সাড়া, শিকড়ে শিকড়ে
পতনের ভয় মাথা খুঁড়ে মরে
বিদ্যুৎ চিরে তাকায়
সে আলোয় সারা তল্লাট জুড়ে
রক্তের লাল দর্পণে মুখ দেখে
ভস্মলোচন।
একটি কবিতা লেখা হয় তার জন্যে।

('একটি কবিতার জন্য', অগ্নিকোণ)

যুদ্ধজনিত পরিস্থিতিতে মধ্যবিত্তের সংকট, দুর্ভিক্ষ আর বিদ্রোহী দিনগুলিকে ফুটিয়ে তুলতে সুভাষের চিত্রকল্পগুলির একটি অসাধারণ ভূমিকা লক্ষ্য করা যায়। বিশেষ করে দুর্ভিক্ষগ্রস্ত গ্রাম বাংলার যথাযথ চিত্রায়ণে বিষ্ণু দে-র সঙ্গেই তাঁর খানিকটা মিল।

সুভাষের প্রতিভা প্রকাশ পেয়েছে ছন্দের ক্ষেত্রেও। 'তিনমাত্রা' ও পয়ারে তাঁকে 'ওস্তাদ' শিরোপা দিয়েছিলেন বুদ্ধদেব বসু। মাত্রাবৃত্ত ও অক্ষরবৃত্তে সুভাষের বিশেষ নৈপুণ্য। স্বরবৃত্তেও দু'একটি কবিতা লিখেছেন। তবে তাতে সুভাষের শক্তি তেমন করে প্রকাশ পায় নি, যেমন–

হাজারখানেক /প্রজা আছি
আমরা এই/ মৌজায়
সবাই মিলে/ ঠিক করেছি
কেমন ক'রে/ বাঁচা যায়।

('চিরকুট', চিরকুট)

স্বরবৃত্তের চার মাত্রার পর্বটি এখানে ঠিক আছে। প্রতিটি পংক্তি দুই পর্বের।

পয়ারজাতীয় বা অক্ষরবৃত্তের ছন্দে সুভাষ বৈচিত্র্য আনার চেষ্টা করেছেন, নিম্নোক্ত কবিতাটি বাইশ মাত্রার কিন্তু যখন লেখেন--

'নির্জন মাঠের চিন্তা/ছুঁড়ে দিয়ে বিকালের/ঝিঁঝিঁদের গানে,
শহর বিষাদে ঢেকে,/ ডাকি: 'বাউ-বুলবুলির/ হাওয়ায় এসো হে,
প্রজাপতি পায় না কো/এরোপ্লেনের শব্দ/বাতাসের কানে'
('পলাতক', পদাতিক)

দ্বিতীয় পংক্তির বিন্যাসে দ্বিতীয় পর্বকে চোখের আন্দাজে আমরা নয় মাত্রা দিই, কিন্তু শ্রুতিসাম্যতার কারণে তার প্রাপ্য আট মাত্রা। আসলে 'বুলবুলির' শব্দটি স্বরে বা অক্ষরবৃত্তে হসন্তচিহ্নের জন্যে এখানে এক মাত্রা কম পায় (যদি 'বুল্‌বুলির' লেখা হয়)। সুভাষ পরের পংক্তিতে দ্বিতীয় পর্বে যুগ্মধ্বনিকে আবার দুমাত্রা পাইয়ে দিয়েছেন। 'এরোপ্লেনের' শব্দটিতে এইভাবে বাড়তি মাত্রা আরোপে বৈচিত্র্য এসেছে। 'মির্চিনিক' কবিতাতেও 'টুকরো', 'নইলে', ইত্যাদিতে দু'মাত্রা ব্যবহার করেছেন অথচ 'লাগবে না' কে দিয়েছেন চারমাত্রা। 'বারুদের আবৃত্তি'তেও এইভাবে বৈচিত্র্য সৃষ্টি হয়েছে---

'ডায়মন্ড হারবার থেকে/ ধুরন্ধর/ গোয়েন্দা হাওয়ারা
ইতিমধ্যে কলকাতায়:/ একুশে/টেরেই চম্পট,---'

৮+৪+৬ মাত্রায় অক্ষরবৃত্ত। হসন্তচিহ্নের অকৃপণ ব্যবহার এর বিশিষ্ট লক্ষণ হয়ে উঠেছে। সুভাষ চমৎকারভাবে 'ডায়মন্ড' ও 'হারবার'কে তিন মাত্রা, 'কলকাতায়' শব্দটিকে চার মাত্রা দিয়ে ছন্দের ভারসাম্য রক্ষা করেছেন। তবে কবিতাটির শেষ পংক্তিতে 'এস্প্ল্যানেডে'কে চার মাত্রা দিয়ে সুভাষ একটু বেশিই দুঃসাহস দেখিয়েছেন। 'অতঃপর' কবিতাটিতে এই দুঃসাহস তাঁর প্রতিভাকে চিহ্নিত করে দিয়েছে। জীবনানন্দ দাশ ছাড়া (বিরল দৃষ্টান্ত যদিও) তিরিশ মাত্রার মহাপয়ার বাংলা কবিতায় আর কে রচনা করেছেন ?

'বিদ্যার্থী দুলাল দেখে/দৈনবিদ্যা কলকাতায়।/বোতলে আগুন তার/অবশ্য পশ্চিম'

'কলকাতায়' এখানে চার মাত্রা। তাছাড়া অজস্র হসন্তযুক্ত সুরে কবিতাটিকে ভরে তুলেছেন---'বাজনা', 'বিদ্যুৎ', 'হাত-পা সব হিম', 'হয়তো' (চতুর্দশ পংক্তিতে একেও দু'মাত্রা দেওয়া হয়েছে), 'ভারতবর্ষে', (চারমাত্রা), 'একচেটিয়া' (চারমাত্রা), 'খদ্দের তো খোয়া যাবো' (আট মাত্রা)--- সুভাষ এইভাবে প্রথানুগত্যের বন্ধন থেকে মুক্তি দিয়েছেন ছন্দকে, যুগের দাবীকে অস্বীকার না করেও মুক্তির এই তীব্রতা সঞ্চার করে তিনি যেন প্রগতি সাহিত্য আন্দোলনের মৌল চরিত্রকে প্রায় অর্পিত ভাবলোকে তুলে ধরতে চেয়েছিলেন। মুক্তমনা মেনে এই মুক্তির প্রয়াসকে কিছুতে উপেক্ষা করা চলে না। তাঁর মাত্রাবৃত্ত ছন্দ রচনার ভেতর দিয়েও সূক্ষ্ম কারুকর্মী মনের পরিচয় মেলে। যেমন-

'রাত্রি ফিকে/রাত্রিরই পুনর্মুক্তি
চাঁদের পাড়ায়/ মেঘের দুরন্তি/সন্ধি,

দুঃসহ-জোয়ারে/ ভেসে যায় সং/কল্প
ম্লান হয়ে যায়/সবহারাদের/বস্তি।।'
('রোমান্টিক', পদাতিক)

প্রতিটি পর্ব ছয় মাত্রার। এর আসল সৌন্দর্য যুগ্মস্বরের উচ্চারণে। এই সৌন্দর্যের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে শেষ পর্বের যুগ্মব্যঞ্জনস্বরে একটা প্রচ্ছন্ন মিলের আভাস সৃষ্টিতে, যেমন, 'তুচ্ছ', 'সঙ্ঘ', কল্প', বা 'বস্তি' ইত্যাদির ব্যবহারে মিলের ব্যাপারটা এড়িয়ে গিয়েও যে আভাস তৈরি হয় তা সুভাষের শিল্পকর্মের বিশিষ্টতাসূচক। শেষ পর্ব তিন মাত্রার, অন্যত্র তিনি পাঁচ মাত্রাও ব্যবহার করেছেন

প্রভু, যদি বলো/ অমুক রাজার/সাথে লড়াই= ৬+৬+৫
কোনো দ্বিরুক্তি/ করব না, নেব/ তীর ধনুক=৬+৬+৫

'বিরোধ'(পদাতিক) কবিতার এই পংক্তিকে আমরা কত মাত্রা দেব ?

'শুধু বিছানায় জেগেছি ক্যানের হাওয়াকে'

'হাওয়াকে' কি আমরা তিন মাত্রা দিতে পারি ? অবশ্য কবিতাটির শেষপর্বে 'নিয়েছে', 'টাঙিয়ে', 'ডিঙিয়ে', 'দুধ', 'ঝাপটা', 'প্রাণে' ইত্যাদি তিন মাত্রা পায়, সেদিক থেকে 'হাওয়াকে' আমরা তিন মাত্রাই দেব। তাহলেও মাত্রাবৃত্তে প্রতিটি স্বরের আলাদা মূল্যমাত্রার সংযোজনের নিয়মে এটি এক বিরল ব্যতিক্রম। চোখের আভাসে 'হাওয়াকে' চার মাত্রা দিলে তা ঠিক হবে না।

লক্ষণীয় সুভাষের এগারো মাত্রার বিশেষ ব্যবহার---

বড়ই ধাঁধায়/ পড়েছি মিতে
ছেলেবেলা থেকে / রয়েছি গ্রামে
বার বার ধান/ বুনে জমিতে
মনে ভাবি বাঁচা/ যাবে আরামে।'
('ধাঁধা', পদাতিক)

দুটি করে পর্ব, প্রতিটি পর্ব ৬+৫ মাত্রার। এই কবিতার সঙ্গে স্পষ্ট পার্থক্য 'কিংবদন্তী'(পদাতিক) কবিতার। 'চলছিল এককাল/বেসাতি', অপর পংক্তি 'নিরাপদে বেশ এ-দাম/দেশে', এ ছন্দের বিরল ব্যবহার সুভাষের ক্ষেত্রে ব্যতিক্রম।

এ কথা ঠিক যে, 'পদাতিক'-এ ছন্দের যে অনুশীলন ও পরীক্ষা-নিরীক্ষা করেছেন সুভাষ, 'চিরকুট' বা 'অগ্নিকোণে' তার প্রয়াসও করেন নি। বরং অগ্নিগর্ভ দিনগুলিতে বিপ্লবী আবেগের তাড়নায় মাত্রাবৃত্তকেই তিনি বেছে নিয়েছেন আত্মপ্রকাশের উপায় হিসেবে। এখানে আর বৈচিত্র্য অন্বেষণের সময় নেই, আবেগের তাড়না প্রচলিত পথেই এগোতে চেয়েছে। এও লক্ষ্য করার, বেসামাল আবেগ ছন্দের শাসনে আরও দুরন্তঃ 'লক্ষ লক্ষ/হাতে/ অন্ধকারকে/দু-টুকরো ক'রে/অগ্নিকোণের/মানুষ/সূর্যকে ছিঁড়ে/আনে।'(অগ্নিকোণ)।

উল্লেখপঞ্জী

১। অমিয় চক্রবর্তীকে একটি চিঠিতে রবীন্দ্রনাথ লিখছেন, 'আফ্রিকার উপরে কবিতা লিখতে অনুরোধ করেছিলে। লিখেছি।'---একে কি বলব ? অন্তরের প্রেরণাবশে, নাকি ফরমায়েশি ? আমাদের মতে, অবশ্যই এ লেখা ফরমায়েশি।
রবীন্দ্র-রচনাবলীর জন্যে দ্রষ্টব্যঃ চিঠিপত্র, একাদশ খণ্ড, বিশ্বভারতী গ্রন্থন বিভাগ, কলকাতা, ১৯৭৪, পৃঃ২০১

২। Tse-Tung, Mao, : Selected Writings, National Book Agency (Pvt.) Limited, Calcutta, 1967, p. 503

৩। কলকাতা(বুদ্ধদেব বসু সংখ্যা), সম্পাদকঃজ্যোতির্ময় দত্ত, বর্তমান সংখ্যা সম্পাদকঃঅরুণকুমার সরকার ও নরেশ গুহ, সপ্তম-অষ্টম, যুগ্ম-সংকলন, ১৯৬৮-৬৯, পত্র নং ৪, তারিখ-২২,১২,৭৮, পৃঃ৭

৪। বুদ্ধদেব বসুর রচনাসংগ্রহ, তৃতীয় খণ্ড, গ্রন্থালয় প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, বিশেষ সংস্করণ, ১৯৮০, পত্র নং ২৬, তারিখ-২৬,৩,৪০, পৃঃ৬২৬

৫। কলকাতা (বুদ্ধদেব বসু সংখ্যা), সম্পাদকঃজ্যোতির্ময় দত্ত, বর্তমান সংখ্যা সম্পাদকঃঅরুণকুমার সরকার ও নরেশ গুহ, সপ্তম-অষ্টম, যুগ্ম-সংকলন, ১৯৬৮-৬৯, পত্র নং ৪, তারিখ-২২,১২,৭৮, পৃঃ ৭

৬। Lenin : On Literature And Art, Progress Publishers, Moscow, Third Printing, 1975, p. 22

৭। Roxburg, Angus, Translated (From the Russian) : 'Socialism And The Development Of Art', Marxist-Leninist Aesthetics And The Arts, Progress Publishers, Moscow, 1980, pp. 29-30

৮। সুভাষ মুখোপাধ্যায়, অনূদিতঃনাজিম হিকমতের কবিতা, বিশ্ববাণী প্রকাশনী, কলকাতা, ১৩৭৭ বঙ্গাব্দ, পৃঃ৩৩

৯। Yunus, Ali, Translated (From the Turkish) : Poems By Nazim Hikmet, Masses and Mainstream Publication, New York, 1954, p. 27

১০। Ibid, 'A Note On Nazim Hikmet' by Samuel Sillen, p. 8

১১। আবু সয়ীদ আইয়ুব ও হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, সম্পাদিতঃ'ভূমিকাঃ২', আধুনিক বাংলা কবিতা, এম. সি. সরকার এ্যান্ড সন্স লিমিটেড, কলকাতা, ১৯৪০

১২। জীবনানন্দ দাশঃশ্রেষ্ঠ কবিতা, ভারবি, কলকাতা, তৃতীয় মুদ্রণ, ১৯৭২, পৃঃ১২৩-২৪

১৩। Tse-Tung, Mao : Problems Of Art And Literature, People's Publishing House Limited, Bombay, 1950, p. 8

১৪। অরুণকুমার সিকদারঃ'কবিতার কুটুম্ব', আধুনিক কবিতার দিগ্বলয়, সিগনেট বুকশপ, কলকাতা, দ্বিতীয় সংস্করণ, ১৩৮৬ বঙ্গাব্দ, পৃঃ৩৪

১৫। বুদ্ধদেব বসুঃ কালের পুতুল, নিউ এজ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, ১৯৫৯, পৃঃ ১০

১৬। বাসন্তীকুমার মুখোপাধ্যায়: আধুনিক বাংলা কবিতার রূপরেখা, প্রকাশ ভবন, কলকাতা, ১৯৬৯, পৃঃ৪৫৫

১৭। সমর সেনের কবিতা, সিগনেট প্রেস, কলকাতা, ১৩৮৮বঙ্গাব্দ, পঞ্চম পরিবর্ধিত সংস্করণ, পৃঃ১০০

১৮। সুকান্ত সমগ্র, সারস্বত লাইব্রেরী, পঞ্চদশ মুদ্রণ, ১৩৮৯বঙ্গাব্দ, পৃঃ৫৪

১৯। 'প্রকৃতি', অরণি, ২য় বর্ষ, ২৮সংখ্যা, ১০নভেম্বর, ১৯৪৩

২০। অরণি, ২য় বর্ষ, ১০সংখ্যা, ৬নভেম্বর, ১৯৪২

২১। অরণি, ২য় বর্ষ, ১১সংখ্যা, ১৩নভেম্বর, ১৯৪২

২২। অরণি, শারদীয়, ২য় বর্ষ, ৭অক্টোবর, ১৯৪২

২৩। জীবনানন্দ দাশ:'সুমিতা', শ্রেষ্ঠ কবিতা, ভারবি, কলকাতা, ১৯৭২, তৃতীয় মুদ্রণ

২৪। বুদ্ধদেব বসু: কালের পুতুল, নিউ এজ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, ১৯৫৯, পৃঃ৮০

২৫। মাসুদ হায়াৎ, অনূদিত(মূল রুশ থেকে): পঞ্চাশ জন সোভিয়েত কবি, প্রগতি প্রকাশন, মস্কো, ১৯৭৮, পৃঃ ২০৫

২৬। বুদ্ধদেব বসু: শ্রেষ্ঠ কবিতা, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, পঞ্চম সংস্করণ, ১৯৮০, পৃঃ৫৮

২৭। Zheleznova, Irina, Compiled and Translated : ... And Poetry is Born (Russian Classical Poetry), Raduga Publishers, Moscow, 1984, p. 158.

২৮। Zheleznova, Irina, Edited : Three Centuries of Russian Poetry, Progress Publishers, Moscow, 1980, p. 333

২৯। Fraser, G.S. : The Modern Writer and his World, Rupa and Company, Calcutta, 1961, p. 215

৩০। পরবর্তীকালে অবশ্য এই চরণটি অডেনের মিথ্যা মনে হয়েছে। তিনি শুধরে লিখেছেন, 'We must love one another and die'।

৩১। সুভাষ মুখোপাধ্যায়, অনূদিত: পাবলো নেরুদার আরো কবিতা, বিশ্ববাণী প্রকাশনী, কলকাতা, ১৩৮৭বঙ্গাব্দ, পৃঃ২৪-২৫

৩২। Trend, J.B. : Lorca and the Spanish Poetic Tradition, Basil Blackwell, Oxford, 1956, p. 19

৩৩। Roxburgh, Angus, Translated (From the Russian): Marxist-Leninist Aesthetics And The Arts, Progress Publishers, Moscow, 1980, p. 283

৩৪। দ্রষ্টব্য সিদ্ধেশ্বর সেন-কৃত 'চিত্রকূট' কাব্যের ভূমিকা।-পরিচয়, সুবর্ণজয়ন্তী সংকলন, ৫০বর্ষ, ১০-১২শ সংখ্যা, মে-জুলাই, ১৯৮১, পৃঃ ১০৫

সুকান্ত ভট্টাচার্যের কবিতা

(জন্ম:৩০শে শ্রাবণ,১৩৩৩--মৃত্যু:২৯শে বৈশাখ,১৩৫৪)

'একমাত্র বিপ্লব যখন জনপ্রিয় হতে শুরু করে এবং মানুষ বুক ভরে শ্বাস নেবার সময় পায়, তখন-ই কেবল নতুন বিপ্লবী সাহিত্যিকদের দেখা পাওয়া যায়।'

-লু সুন

'আমাদের নতুন সাহিত্য সম্বন্ধে ক'টি কথা', লু সুন:নানা লেখা,(অনু:সিদ্ধার্থ ঘোষ), পপুলার লাইব্রেরী,১৯৮১,পৃ:৪৬

চীনা সাহিত্যিক লু সুন সাহিত্যের স্বর্গ-মর্ত্য তোলপাড় করবার ক্ষমতায় আদৌ বিশ্বাস করেন না।[1] আক্ষরিক অর্থেই তিনি সাহিত্যের সীমাবদ্ধতার কথা মানেন। সুকান্তের কাব্যপ্রচেষ্টাকে এই দৃষ্টিভঙ্গি থেকে বিচার করা দরকার বলে মনে হয়। কারণ, সুকান্তের কাব্যপ্রতিভা বিশেষ একটি দিককে বিকশিত করবার চেষ্টায় নিয়োজিত। তাঁর সামগ্রিক দৃষ্টি নিবদ্ধ ছিল কমিউনিস্ট পার্টির মতাদর্শ ও উদ্দেশ্যকে প্রতিফলিত করার দিকে। ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির সদস্যপদ লাভ করেন ১৯৪৪খ্রীষ্টাব্দে, কিন্তু তার অনেক আগেই তিনি বিভিন্ন রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডে অংশ গ্রহণ করে সাংগঠনিক প্রতিভার পরিচয় রাখেন। বস্তুতপক্ষে, সুকান্তের কবিসত্তার সঙ্গে কর্মীসত্তার সুসমন্বয়ের ফলই তাঁর কাব্যসম্ভার।

১৯৪১খ্রীষ্টাব্দ থেকে ১৯৪৭খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত রচিত তাঁর সৃজনকর্মগুলি আমাদের বিচার্য। বলাই বাহুল্য, সময়টা বেশ তাৎপর্যপূর্ণ। দেশীয় ও আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে যুদ্ধ, যুদ্ধজনিত সংকট, জাতীয় মুক্তিসংগ্রাম, ফ্যাসিবিরোধী আন্দোলন, মন্বন্তর, দাঙ্গা, ছাত্র-আন্দোলন, ধর্মঘট, জাপানি হামলার বিরুদ্ধতা ইত্যাদি বহুবিচিত্র ঘটনার যে সমাবেশ, সুকান্তের প্রয়াস ছিল সেগুলিকে তাঁর কাব্যের উপাদান হিসেবে গ্রহণ করা। সেদিক থেকে তাঁর কাব্য সাময়িক ঘটনার দলিলই বটে। কিন্তু দলিল হল সন-তারিখের সুনির্দিষ্ট ঐতিহাসিকতা, সুকান্ত তাকে শিল্পে রূপান্তরিত করে একটি ঐতিহাসিক দায়িত্ব পালন করেছেন যা একেবারেই পূর্ব দৃষ্টান্তরহিত কোন ঘটনা নয়। নজরুল সম্পর্কেও এ কথা বলা হয়ে থাকে যে, সাময়িক উদ্দীপনাকে তিনি সাহিত্যসৃষ্টির কাজে লাগিয়েছেন। এ কথা তাঁর সব কবিতা সম্পর্কে প্রযোজ্য নয়।

সুকান্ত সম্পর্কেও একই কথা। সাময়িক উদ্দীপনা তাঁর নব্য স্তরেও কোন কোন কবিতায় নিজের যুগ-কাল পরিবেশকে এক চিরন্তন আবেগে তুলে ধরবার যে বিস্ময়কর ক্ষমতা প্রদর্শন করেছেন তা নিঃসন্দেহে কৃতিত্বের। বিপ্লবের সামাজিক-ঐতিহাসিক মূল্যকে সাহিত্যে পরিণত করার দুরূহ স্পর্ধার কবি হয়ে উঠেছেন সুকান্ত। এই স্পর্ধার পেছনে আছে তাঁর গভীর মানবপ্রেম ও গাঢ় সহানুভূতি। মার্কসবাদ যাঁর জীবনদর্শন তাঁকে কমিউনিস্ট পার্টির পতাকাতলে আসতেই হয় এবং ঘোষণা করতে হয় প্রলেতারিয়েতশ্রেণীর পক্ষে তাঁর জীবন সংগ্রাম। বস্তুত প্রগতি সাহিত্য আন্দোলন ও কমিউনিস্ট পার্টির রাজনৈতিক কার্যক্রম সুকান্ত এবং সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের কাব্যে কোন ভেদ স্বীকার করে নি, বরং একটি আর একটির পরিপূরক হিসেবে দু'জনের রচনায় তা গৃহীত হয়েছে। তবুও সুকান্তের কাব্যে মোটামুটি তিনটি লক্ষণ দেখতে পাই যাতে সুকান্তের বিশিষ্টতা ফুটে উঠেছে বলে মনে হয়। (১)দেশীয় ঐতিহ্যকে স্বীকার ও স্বীকরণের মাধ্যমে শিল্প-সাহিত্যকে প্রগতিশীল ভূমিকায় উপস্থাপন করা, (২)সর্বহারাশ্রেণীর শ্রেণী-সংগ্রামের ভূমিকাকে সাহিত্যের মধ্য দিয়ে সক্রিয় করে তোলা অর্থাৎ সাহিত্যকে শ্রেণী-সংগ্রামের হাতিয়ারে পরিণত করা, (৩)শিল্প-সাহিত্যকে মুষ্টিমেয় মানুষের দুর্বোধ্যতার দুর্গশালা থেকে উদ্ধার করে অধিক সংখ্যক জনগণের দরবারে তুলে ধরা। প্রগতি সাহিত্য আন্দোলনের মুখ্য উদ্দেশ্যের সঙ্গে এর যথেষ্ট সাদৃশ্য ও একাত্মতা রয়েছে। এই উদ্দেশ্যমূলকতা রাজনৈতিক সচেতনতারই নামান্তর। সুকান্ত এই সচেতনতাকে সাহিত্যসৃষ্টির কাজে লাগিয়েছেন।

সুকান্তের শিল্পতত্ত্বঃ

জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পটভূমিকায় সুকান্তের স্মরণীয় কবিতা প্রকাশিত হয়েছে। এই কবিতাগুলির উৎস-ভূমিতে সংরক্ত আবেগের সঙ্গে মিশে আছে সাম্যবাদের প্রবক্তা কার্ল মার্কসের চিন্তাধারা। কিন্তু এই চেতনায় হঠাৎ উত্তরণ ঘটে নি সুকান্তের, বিপ্লবী বারীণ ঘোষের সংস্পর্শে এসে তাঁর মনে দাগ পড়েছিল বিবেকানন্দের। কিন্তু বিবেকানন্দের রচনা সুকান্তের সব জিজ্ঞাসার সদুত্তর হয়ে ওঠে নি, ফলে তিনি অন্যত্র ঝুঁকেছেন। ইতিমধ্যে ১৯৩০খ্রীষ্টাব্দে বিমল সেনের বঙ্গানুবাদে গোর্কির 'মা', আরও পরে এরেনবুর্গের 'প্যারিসের পতন'(ফল অব প্যারিস) ইত্যাদি পাঠ করবার সৌভাগ্য হয় তাঁর।[২]বেলেঘাটার একটি বাড়িতে কমিউনিস্ট পাঠ-চক্রের আসর বসত, সুকান্ত ছাড়াও নিয়মিত উপস্থিত থাকতেন অরুণাচল বসু, মোহিত আইচ, শিবপ্রসাদ দাস, ননীগোপাল বসু, অজিত রায় প্রমুখ। শিক্ষক নবদ্বীপচন্দ্র দেবনাথের

রচনাকর্ম, যেমন--'ফ্যাসিস' প্রবন্ধ, 'রবীন্দ্রনাথ, নবজীবনের গান এবং লালচীন' কবিতাগুলিও সুকান্তের শিল্পমানস গড়ে তুলতে প্রয়োজনীয় সাহায্য করে থাকবে।[৩] এভাবেই সুকান্ত ক্রমশ প্রগতিশীল সাহিত্যচর্চার দিকে মনোনিবেশ করেন এবং মার্কসবাদ সম্পর্কে কৌতূহলী হয়ে ওঠেন। বন্ধুদের মধ্যে অরুণাচল বসু ও সুভাষ মুখোপাধ্যায়ও তাঁর জীবনের এই বিশেষ অধ্যায়টিতে প্রভূত সহযোগিতা করেন। তৎকালীন ছাত্রফেডারেশন কর্মী অন্নদাশঙ্কর ভট্টাচার্য প্রত্যক্ষ রাজনীতিতে তাঁকে আকর্ষণ করেন, আকর্ষণ শুধু রাজনৈতিক কারণে নয়, প্রগতিশীল সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডের বিশিষ্ট মঞ্চ হয়ে উঠে ছিল এই ছাত্রফেডারেশন[৪] এবং সুকান্ত মনের এই অবস্থানে থেকেই তাঁর অভিজ্ঞতাগুলিকে রূপায়িত করেন। অন্নদাশঙ্করের মন্তব্যঃ 'ওর অনেক কবিতাই তাই তৎকালীন ছাত্র আন্দোলন বা জাতীয় আন্দোলনের এক একটি পাতা।'[৫] অন্নদাশঙ্করের হাত ধরে অতঃপর সুকান্ত উঠে আসেন কিশোরবাহিনীর নেতৃত্ব দিতে। সুভাষ মুখোপাধ্যায় প্রসঙ্গত লিখেছেন, 'সুকান্তর সাহিত্যিক গুণগুলোকে আন্দোলনের কাজে লাগানোর ব্যাপারে অন্নদারও যথেষ্ট হাতযশ ছিল। সুকান্তর আগের যুগের লোক ব'লে আমি পার্টিতে এসেছিলাম কবিতা ছেড়ে দিয়ে, আর সুকান্ত এসেছিল কবিতা নিয়ে। ফলে, কবিতাকে সে সহজেই রাজনীতির সঙ্গে মেলাতে পেরেছিল। তার ব্যক্তিত্বে কোনো দ্বিধা ছিল না।'[৬]

সুকান্তের শিল্পপ্রেরণার নেপথ্যচারী উপরিউক্ত উপাদানগুলির মধ্যেই নিহিত রয়েছে তাঁর শিল্পবোধের উৎস ও গড়ে ওঠা শিল্পাদর্শ। সুকান্তের শিল্পতত্ত্বে মার্কসবাদী রাজনীতির ভূমিকাটিই প্রধান। ফলে তাঁর শিল্পের কেন্দ্রভূমিতে শ্রমজীবী সাধারণ মানুষেরই আনাগোনা বেশি। আর শ্রমজীবীর স্বার্থেই তাঁর প্রবল বিরোধিতা প্রকাশ পায় সাম্রাজ্যবাদ ও ঔপনিবেশিকতার বিরুদ্ধে, ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধে রুখে ওঠাও সেই একই কারণে, পুঁজিবাদী ব্যবস্থায় ধনবণ্টনের অসাম্য জেহাদ তুলতে বাধ্য করে যে, সেও শ্রমজীবীর স্বার্থিক কারণে। এই প্রেরণার সঙ্গে অনেকখানি মিল বিদ্রোহী নজরুলের, কিন্তু তফাৎ হল সুকান্ত রাজনৈতিকভাবে সচেতন। তাছাড়া সুকান্ত শুধু কবি নন, কমিউনিস্ট কর্মীও বটে। তাঁর জীবনদর্শনে ব্যক্তির নয়, সমষ্টির সাধনা ও সাফল্য স্বীকৃত। নির্জনতা নয়, জনতাই কাম্য। তাঁর শিল্পতত্ত্বের মূল কথাটি তাঁর ভাষাতেই ব্যক্ত হয়েছে এইভাবেঃ 'সাময়িকভাবে নির্জনতা ভাল লাগলে যে চিরকালই ভাল লাগবে এমন কথা আমরা বলি না। ...আর, আমি কবি বলে নির্জনতাপ্রিয় হব, আমি কি সেই ধরনের কবি? আমি যে জনতার কবি হতে চাই, জনতা বাদ দিলে আমার চলবে কি করে? তা ছাড়া কবির চেয়ে বড় কথা আমি কমিউনিস্ট, কমিউনিস্টদের কাজ-কারবার সব জনতা নিয়েই।'%[৭]

সুকান্তের এই সিদ্ধান্ত আকস্মিক নয়, নয় শুধু আবেগের তাড়নাজাতও। তৎকালীন ভারতবর্ষের তথা

সমগ্র বিশ্বের সংকটপূর্ণ রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে সুস্থ ও মননশীল মানুষের পক্ষে এই সিদ্ধান্ত ছিল ঐতিহাসিকভাবেই যুক্তিপূর্ণ। সুকান্তের সৃজনকর্মের প্রেক্ষিতে তাঁর দৃষ্টিভঙ্গি, সিদ্ধান্ত ও যুক্তিপারম্পর্যে কোথাও বিরোধের স্থান নেই। ভাবগত নয়, বরং জীবনগত বিশ্বাসের স্বীকৃতি হিসেবে তাঁর শিল্পাদর্শ গড়ে ওঠায় তা একটি আলাদা মাত্রা দাবি করে।

স্বল্পায়ু সুকান্তের পক্ষে শিল্পতত্ত্বের বিভিন্ন দিকগুলি পর্যালোচনার সুযোগ হয় নি। তবুও তাঁর কয়েকটি মতামত থেকে কিছু কিছু সূত্র সন্ধান চলে। যেমন 'ছন্দ ও আবৃত্তি' শীর্ষক নিবন্ধে আধুনিক বাংলা কবিতার স্বেচ্ছধর্মী বিশ্লেষণ করতে গিয়ে মন্তব্য করেন, 'কবিরা নতুন নতুন আবৃত্তি-উপযোগী ছন্দে লিখলে(যা আধুনিক কবিরা লেখেন না) এবং পাঠকরা তা ঠিকমতো পড়লে তবেই আধুনিক কবিতার ক্ষেত্র প্রসারিত হবে, উপেক্ষিত আধুনিক কবিতা অগোচর অবস্থা থেকে ক্রমশ জনসাধারণের দৃষ্টিগোচর হবে।'[৮] লক্ষ্য করবার, কবিতা ছন্দের খাতিরে যেন জনসাধারণের ভোগ্য হয়ে ওঠে---এই মতটিকে সুকান্ত গ্রহণ করেছেন। অভিমতটি প্রকরণগত ব্যাপার ছাড়াও কবিতার অপরবিধ উপকরণকেও ন্যায্য ঠাঁই দিয়েছে। কাব্য-কবিতা সম্পর্কে তাঁর নিজস্ব শিল্পচিন্তা ছিল বলে মনে হয়। অরুণাচল বসুকে প্রেরিত একটি পত্র-কবিতা 'সুহৃদ্বরেষু'-তে তাঁর শিল্পতত্ত্বের একটি অস্পষ্ট ভূমিকা দেখতে পাই। যদিও তা অস্পষ্ট, তবু তাঁর মতগুলি পর্যালোচনাসাপেক্ষ। কবিতাটি:

'কাব্যকে জানিতে হয়, দৃষ্টিদোষে নতুবা পতিত
শব্দের ঝঙ্কার শুধু যাহা ক্ষীণ জ্ঞানের অতীত।
রাতকানা দেখে শুধু দিবসের আলোকের প্রকাশ,
তার কাছে অর্থহীন রাত্রিকার গভীর আকাশ।
মানুষ কাব্যের স্রষ্টা, কাব্য কবি করে না সৃজন,
কাব্যের নতুন জন্ম, যেই পথ যখনই বিজন।
প্রগতির কথা শুনে হাসি মোর করুণ পর্যায়
নেমে এল (স্বেচ্ছাচার বুঝি বা গজায়)।
যখন নতুন ধারা এনে দেয় দুরন্ত প্লাবন
স্বেচ্ছাচার মনে করে নেমে আসে তখনি শ্রাবণ,
কাব্যের প্রগতি-রব? (কারে কহে বুঝিতে অক্ষম,
অশুদ্ধি ইচ্ছামতো চলে যায়, খুঁজিতে মোক্ষম।)

সুকীর্ণ প্রগতি-রথ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র উইয়ের ঠেলায়
সারথি-বাহন কেবি ইতস্তত বিপথে পালায়।
নতুন রথের পথে মৃতপ্রায় প্রবীণ ঘোটক,
যারা বেড়ে বুঝে, ইহারা-রাজযোটক।।'[১]

কথাগুলির অর্থ কি ? এ কি সুকান্তের শিল্পতত্ত্ব সম্পর্কে স্বজ্ঞান কোন মতবাদ ? সুকান্তের বক্তব্যকে আমরা এইভাবে সাজাতে পারি:

প্রথমতঃ কাব্য-কবিতা সম্পর্কে স্পষ্ট জ্ঞান থাকা দরকার। রাতকানার কাছে রাতের অর্থ অজ্ঞাত এবং দুর্বোধ্য। দিনের আলো ছাড়া তার কাছে আর সবই অপরিচিত, অস্পষ্ট। এই অস্পষ্টতা দূর করা দরকার। সুকান্ত কি মনে করেন যে আধুনিক কাব্য সম্পর্কে দুর্বোধ্যতার অভিযোগ ঠিক নয়, ব্যাপারটা অনুশীলনসাপেক্ষ? জ্ঞানচর্চার দরকার সেই কারণেই।

দ্বিতীয়তঃ কবি যে কাব্য সৃষ্টি করেন, তা ব্যক্তি কবির নিজস্ব এবং একক সৃষ্টি নয়। সামাজিক মননক্রিয়ার অংশভাকরূপে ব্যক্তি-কবির সৃজনকর্ম বিবেচ্য। বলা যায়, মানুষই আসল স্রষ্টা। কাব্যে নতুন ধারা দেখা দেয়, একটি ধারা যখন বিপুল ও বিরাট আকার ও ব্যাপ্তি পায়, তখনই, তার থেকে একটি শাখাপথ বেরিয়ে পড়ে আপনার স্বাতন্ত্র্যের চিহ্ন নিয়ে। বস্তুত এই স্বাতন্ত্র্যচিহ্নিত বৈশিষ্ট্যের জন্যে তার নতুনত্ব আমাদের চোখে পড়ে। এই পথ নিজস্বই বটে।

তৃতীয়তঃ প্রগতির অর্থ অগ্রগতি। কিন্তু মাঝে মাঝে গতির নামে উচ্ছ্বাসটাই বড় হয়ে ওঠে। কিন্তু উচ্ছ্বাসে নতুনত্ব থাকতে পারে, তা বলে তা সর্বদা শিল্পের মর্যাদা পাবে না। তাছাড়া, অগ্রগতির শর্ত স্বাতন্ত্র্যই বটে কিন্তু স্বেচ্ছাচারকে অভিনবত্বের আখ্যা দিয়ে সাহিত্যপদবাচ্য করার অভিপ্রায় নিন্দার্হ। স্বেচ্ছাচার যখন প্লাবনের প্লাবন হয়ে নেমে আসে, তখন তা আবিলতা ও বিপর্যয়ের হেতু হয়ে ওঠে। দু'তটের নিয়ন্ত্রণের মধ্যে যে বহতা ধারা তার স্বাভাবিক স্বতঃস্ফূর্ততাই যথার্থ কল্যাণময়। প্রগতি সাহিত্যে এই স্বাভাবিকতাই প্রত্যাশিত।

চতুর্থতঃ কাব্যের মধ্যে প্রগতির ভূমিকা কি অস্পষ্ট? গতির প্রতীক অশ্ব, সে বহন করে জীবনের রথ, কিন্তু অনিয়ন্ত্রিত অশ্ব, অবিন্যস্ত ও বিশৃঙ্খল অশ্ব, বল্গাহীন অশ্ব জীবনের রথকে কোথায় কিভাবে কতটা ভুল লক্ষ্যের দিকে টেনে নিয়ে যাবে? সে রথ এগোবে না, বিশৃঙ্খল অশ্বগুলি ইতস্তত বিক্ষিপ্ত হয়ে ছড়িয়ে পড়বে, নামের লোভে, যশতত্ত্ব। স্বাধীনতার লোভে, ব্যক্তিগত স্বার্থের লোভে, সুবিধাবাদের লোভে অনিয়ন্ত্রিত অশ্বগুলির উৎকট উন্মাদনা প্রগতির বৈপরীত্য সূচনা করবে। সাহিত্যের ইতিহাসে এমন ঘটনা কি ঘটে নি ? একসময়

আধুনিক সাহিত্যে প্রগতির অর্থ করা হয়েছে স্বেচ্ছাচার। ব্যক্তিগত স্বাধীনতাকে বৃহৎ আকারে প্রদর্শন করার চেষ্টা প্রচলিত আছে পুঁজিবাদী দেশগুলিতে। এদেশেও তার ব্যতিক্রম নেই। 'কল্লোল-গোষ্ঠী', 'শনিবারের চিঠি' ইত্যাদি পত্র-পত্রিকাকে কেন্দ্র করে প্রগতির যে পতাকা ওড়ানো হয়েছিল তা শেষপর্যন্ত পর্যবসিত হয়েছিল বিশুদ্ধ রবীন্দ্র-বিরোধিতায়, আর এক ধরনের মানস-বিকৃতিতে। তখনও স্লোগান তোলা হয়েছিল 'শিল্পের জন্য শিল্প'।

বস্তুতঃ দারিদ্র্য, শোষণ, রোমান্স, সুতীব্র নৈরাশ্য, দুঃখবাদ, মর্বিডিটি, যৌন-কদর্যতা আর সস্তা সেন্টিমেন্ট---বিষয়ের এতসব বৈচিত্র্যকে একদা 'প্রগতি' আখ্যা দেওয়া হয়েছে। রবীন্দ্রনাথ তাঁর চারিত্রিক সৌজন্যশোভনতা দিয়ে যা আড়াল করেছিলেন তাঁর সাহিত্যে, তারই আব্রু ঘোচাতে এইসব 'প্রগতি'পন্থীদের ছিল অপরিসীম আগ্রহ। জীবনের বাস্তব সত্যকে অস্বীকার করে প্রগতির কখনও বলিষ্ঠ রূপায়ণ ঘটে না। বুর্জোয়া-ব্যবস্থার সমর্থকরা ভুলে যান যে, পুঁজিবাদের অবক্ষয় অনিবার্য, সেই ব্যবস্থাকে অবলম্বন করে অশিক্ষিত ও দরিদ্র-হাভাতের দেশে প্রগতির রথের চাকার অগ্রগতি ঘটতে পারে না। পুঁজিবাদের ধ্বংসের ওপর নির্মাণ করতে হবে নতুন পথ, আর সেই নতুন পথেই নতুন রথের আগমন, পুরনো পথে নয়, প্রবীণ কবিদের (যাঁদের স্লোগান--শিল্পের জন্য শিল্প) জীর্ণতা পরিহার করে আগামী সম্ভাবনার দরজা উন্মুক্ত করার উদ্যোগ নিতে হবে নতুনদেরই।

ষোলো পংক্তির মধ্যে নিবদ্ধ এই কবিতাটি সুকান্তের শিল্পভাবনার অন্যতম দিক্‌নির্দেশক। সুকান্ত পার্টির 'ডিসিপ্লিন' মানতে চেয়েছেন, কবির চেয়েও কমিউনিস্ট কর্মী হিসেবে বেশি গৌরবান্বিত বোধ করতে চেয়েছেন, সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গে আলাপে জানান যে, তাঁর কবিতা পড়ে পার্টি কর্মীরা খুশি হলেই তিনি খুশি---এসবই তাঁর প্রাকৃতবচন বলে উড়িয়ে দেওয়া যায় না। তাঁর শিল্পের মূল সুর এই কবিতাটিকে কেন্দ্র করে স্পষ্ট হতে চেয়েছে। যদিও বলা দরকার, বক্তব্যটি একদেশদর্শী, নিয়ন্ত্রণের অধিকার মেনে নিলে সাহিত্যিকের পরাধীনতার প্রবৃত্তিও অনিবার্যভাবে দেখা দেয়, পার্টি-সাহিত্য প্রচারমুখী না হয়ে পারে না, কেননা তার উদ্দেশ্যই হল তাৎক্ষণিকতাকে প্রশ্রয় প্রদান। সুকান্তের মনে এসব নিয়ে প্রশ্ন জেগেছে কিনা তা তাঁর রচনা পাঠে জানা যায় না। তবে এ কথা ঠিক যে, সুকান্ত তাঁর অঙ্গীকার ঘোষণা পার্টি-সাহিত্যের মধ্যেই রেখেছেন, তাঁর শিল্পতত্ত্বে এ বিষয়ে দ্বিধার কোন অবকাশ নেই যা উক্ত কবিতায় স্ফুট হতে চেয়েছে। বলা দরকার, সেদিনের মতাদর্শের সঙ্গেই সুকান্তের বেশি নৈকট্য, অধিক আত্মীয়তা। লেনিন তাঁর প্রবন্ধে দেখিয়েছেন যে, যে কোন সাহিত্যই উদ্দেশ্যপ্রণোদিত এবং উদ্দেশ্যমুখিতা যে প্রচারবাদের জন্ম দেয়, তা সব রকম সাহিত্যেই কম-বেশি রয়েছে। তাছাড়া বুর্জোয়া ব্যবস্থার মধ্যে লেখক, প্রকাশক অথবা পাঠকসমাজের

কেউই স্বাধীন নন। লেনিনের মতে, ... 'We must say to you bourgeois individualists that your talk about absolute freedom is sheer hypocrisy. There can be no real and effective "freedom" in a society based on the power of money, in a society in which the masses of working people live in poverty and the handful of rich live like parasites.' লেনিন চ্যালেঞ্জ জানান এই বলে, , 'Are you free in relation to your bourgeois publisher, Mr. Writer, in relation to your bourgeois public, which demands that you provide it with pornography in frames and paintings, and prostitution as a "supplement" to "sacred" scenic art? This absolute freedom is a bourgeois or an anarchist phrase (since, as a world outlook, anarchism is bourgeois philosophy turned inside out). One cannot live in society and be free from society. The freedom of the bourgeois writer, artist or actress is simply masked (or hypocritically masked) dependence on the money-bag, on corruption, on prostitution.'[১০]

এত সত্ত্বেও আমাদের মনে হয়, শিল্প ব্যাপারটা যেহেতু 'বিমূর্ত চিন্তা' গোত্রের, সেইহেতু সাধারণের দাবিও এর সঙ্গে জুড়ে বসে। ভিন্ন ভিন্ন রুচির একটা ভূমিকাও সেখানে উপস্থিত হয়। শিল্পকে অবলম্বন করে ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণী-স্বার্থও এইসব কারণে দানা বাঁধে। শিল্পের মূল্য নির্ণয়েও 'ডেমোক্র্যাট ক্লাস-ইন্টারেস্ট' -এর প্রশ্ন দেখা দিতে পারে। তাদেরই আমরা বলেছি, সুকান্তের শিল্প-উপকরণ হল মুখ্যত মানুষ, সেইসব মানুষ, যারা মার্কসের অর্থনৈতিক বিশ্লেষণে 'সর্বহারা'র শ্রেণীভুক্ত। যেহেতু তাঁর মমতা ও সহানুভূতির উৎস একটি বিশেষ শ্রেণী, সেইহেতু তাঁর মানববোধ খণ্ডিত এমন ধারণা করা চলে, কিন্তু সমাজের সবচেয়ে নিপীড়িত শ্রেণীর প্রতি যে মমতা, যে অংশটি হল সর্বাধিক মানুষের শ্রেণী, সে বোধ যথার্থেই মহত্তর। কবিতায় এই বোধ প্রকাশ পেয়েছে নানাভাবে। যেমন---'কোনখানে লাঞ্ছিত মানুষের প্রিয় বাসিন্দা,/

কোনখানে দানবের 'মরণ-যজ্ঞ' চলে নিত্য,/পণ করো দৈত্যের অঙ্গে/হানবো বজ্রাঘাত, মিলবো সবাই এক সঙ্গে,' ('ডাকবার দিন আজ', পূর্বাভাস)। সহানুভূতি ও ঐক্যের উৎস সেই সর্বহারা শ্রেণী, যারা দলিত ও শোষিত, তাদের জন্যেই তাঁর অকৃত্রিম প্রার্থনা: 'আর উত্তাপ দিও,/রাস্তার ধারের ঐ উলঙ্গ ছেলেটাকে।' (প্রার্থী, ছাড়পত্র)। সোজা সরল প্রার্থনা, এই প্রার্থনার সঙ্গে একমাত্র মিল ভারতচন্দ্রের অন্নদামঙ্গলে বর্ণিত ঈশ্বরী পাটনীর। দুয়ের তফাৎ হল শুধু এইখানে---ঈশ্বরীর প্রার্থনা আত্মজ-এর জন্যে, অতএব তা আত্মকেন্দ্রিক, সুকান্তের ক্ষেত্রে তা পরার্থপ্রীতিতে উজ্জ্বল। একটি বিশেষ শ্রেণীর প্রতি এই উদারতা ও করুণা প্রকাশ পেয়েছে, সেই শ্রেণীর স্বার্থই সুকান্তের অভীষ্ট ও লক্ষ্য, আর এই কারণেই তিনি সর্বহারার কবির নকশে অনিবার্যভাবে চিহ্নিত। বলা দরকার, সুকান্তের শিল্পতত্ত্বের এই দিকটি প্রগতি সাহিত্য আন্দোলনে এক নতুন তাৎপর্য দান করতে সক্ষম হয়েছিল।

সুকান্তের কবিতা: ফ্যাসিবিরোধী পর্ব

বাংলাদেশে প্রগতি লেখক সংঘের সাংস্কৃতিক কার্যক্রম দানা বেঁধে ওঠার অনেক পরে সুকান্তের আগমন। ফলে সুকান্তের সামনে ছিল স্পষ্ট পটভূমি। তাহলেও সুকান্তের আদি কবিতা শুরু হয়েছিল আত্মগত বেদনা ও মৃত্যু-চিন্তার রোমান্টিক বিষাদময়তা দিয়ে। রবীন্দ্রনাথের প্রথম যুগের কবিতার মধ্যেও সচেতন পাঠক এইরকম বিষাদ ও বিষণ্ণতার সুর লক্ষ্য করে থাকেন। সুকান্ত অনুভব করেন, 'অহর্নিশি চিন্তা মোর বিক্ষুব্ধ হয়েছে'। কিসের জন্যে, কেন, এটা স্পষ্ট নয়, 'স্নায়ুতে স্নায়ুতে' 'অন্ধকার মৃত্যুর বিস্তার' লক্ষ্য করেন, 'কঠিন প্রবুদ্ধ চিন্তা নগরীতে বিশ্বের আধার'---এই বেদনাবোধ হয়ত কারণহীন নয়, তবু এর অস্পষ্টতা লক্ষ্য করবার। এই বেদনাবোধ তাই রোমান্সজাত। একধরনের বিপন্নতার বোধ সুকান্তের মধ্যে প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে, সুর কেটে যায়---'অসংখ্য মুহূর্তে গ'ড়ে তোলা/সুর-পূর্ণ মুহূর্ত চুরমার', (মুহূর্ত/ক)। 'নতুন মুহূর্ত আর এক/সে মুহূর্তে ছড়ালো বিষাদ', (মুহূর্ত/খ)। এই বিষাদের ভেতরকার উৎসে তখনও সুকান্ত প্রবেশ করতে পারেন নি। 'তরঙ্গভঙ্গ' শীর্ষক কবিতায় বলেন, 'আর জীবনেতে নেই অবসাদ।/কেবল দংশ, কেবল বিবাদ-/এই জীবনের এ কী সস্তা উৎকর্ষ।/পথে যেতে যেতে পায়ে পায়ে সংঘর্ষ'---এখানে এসে উপলব্ধি হয় জীবনের চলার পথ মসৃণ নয়, পায়ে পায়ে সেখানে বাধা, তাই অনিবার্য সংঘর্ষও। তাঁর ব্যক্তিগত বিষাদের কারণগুলি এভাবেই একটু একটু স্পষ্ট হতে থাকে। কিন্তু অন্তরঙ্গে যখন তীব্রতর বিষাদে ও বেদনায় আক্রান্ত হয় কোন স্পর্শকাতর মানুষ তখন তার মধ্যে অন্তত তিনটি প্রতিক্রিয়া তৈরি হয়---প্রথমত সে আত্মহত্যার বা মৃত্যুর কথা ভাববে, দ্বিতীয়ত সে জীবনের সঙ্গে আপোষ করতে পারে, তৃতীয়ত সে বিষাদের কারণগুলি বিশ্লেষণ করে এর জন্য দায়ী বিরুদ্ধশক্তির বিরুদ্ধে প্রতিবাদে ফেটে পড়বে।

সুকান্ত প্রথম দিকে সম্ভবত মৃত্যুর কথা বেশি করে ভেবেছেন জীবনের চারপাশে উজ্জীবনের প্রেরণা না পেয়ে। পরে এই ভাবনার রেশ কেটে গেছে। 'হে পৃথিবী', সহসা', 'বুদ্বুদমাত্র', 'আমার মৃত্যুর পর', 'তারুণ্য' প্রভৃতি কবিতায় তাঁর মৃত্যুচিন্তার প্রবলতা আমাদের বিস্মিত করে, তাঁকে বলতে শুনি-- 'আমি যেন মৃত্যুর প্রতীক' (তারুণ্য)। বোঝা যায়, তখনও তাঁর জীবন সম্বন্ধীয় অভিজ্ঞতা পরিণত নয়। বস্তুত এই অভিজ্ঞতা তাঁর গড়ে ওঠে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সংকটকালীন এক বিশেষ পটভূমিতে। আমাদের দেশে তাকেই ফ্যাসিবিরোধী পর্ব বলতে পারি।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের আভাস 'পূর্বাভাসে' প্রথম ব্যক্ত হতে দেখি। 'পূর্বাভাস' কবিতাটিতে তাঁর চোখে পড়েছে: 'দূর পূর্বাকাশে,/বিহ্বল বিষাণ উঠে বেজে/মরণের শিরায় শিরায়।/... ... ...অসংখ্য স্পন্দনে চলে মৃত্যু অভিযান/লৌহের দুয়ারে পড়ে কুটিল আঘাত,/উত্তপ্ত মাটিতে ঝরে বর্ণহীন শোণিত প্রপাত।' যে বর্ণনাকে আপাতদৃষ্টিতে আমাদের মনে হয়েছিল (সুকান্তর মৃত্যু-ভাবনা) রোমান্টিক বেদনাজাত, যুদ্ধের ঘনায়মান প্রতিক্রিয়ায় তা প্রকটিত হল আর্থ-সামাজিক ও আর্থ-রাজনৈতিক কারণ হিসেবে। এক সময় কবির মনে হত---'ক্রমাগত শতাব্দীর/বন্দী আমি অন্ধকারে যেন ঘুরে ফিরি/অদৃশ্য সূর্যের দীপ্তি উচ্ছিষ্ট অন্তরে', শতাব্দীর বন্দীত্বের যন্ত্রণা তখনও কোন নির্দিষ্ট অবয়ব পায় নি। ' 'তারুণ্য' ' কবিতাটিতে তাঁর উচ্চারিত অভিশাপ---'ধ্বংস হোক, লুপ্ত হোক ক্ষুধিত পৃথিবী/আর সর্পিল সভ্যতা', সুকান্ত এবারে স্পষ্ট করেন তাঁর তথাকথিত অন্তরবেদনার উৎস। এ পৃথিবী ক্ষুধিত, তাই বিশ্বময় তার কান্না, রক্ত---'পৃথিবী কি আজ শেষে নিঃস্ব/ক্ষুধাতুর কাঁদে সারা বিশ্ব,/চারিদিকে ঝরে পড়া রক্ত,/জীবন আজকে উত্যক্ত।' (মৃত পৃথিবী)। ফ্যাসিবিরোধী যুগে সুকান্ত নতুন রাজনৈতিক চেতনা লাভ করেন। এই চেতনা জীবনকে হতাশ হতে শেখায় না, বরং জীবনকে উদ্দীপ্ত করে তোলে। জীবনের জন্যে তাঁর এই স্বতঃস্ফূর্ত আবেগময় প্রত্যয় বাংলা কাব্যে একটি নতুন মাত্রা যোগ করেছে বলে মনে করার সঙ্গত কারণ আছে---'জীবন যদিও উৎক্ষিপ্ত,/তবু তো হৃদয় উদ্দীপ্ত,/বোধহয় আগামী কোনো বন্যায়,//ভেসে যাবে অনশন, অন্যায়।' ফ্যাসিবিরোধী পর্বে জীবনের সপক্ষে এই ঘোষণা সুকান্তের দৃঢ় মানসিকতাই প্রকাশ করে। তাঁর চোখে পৃথিবীর অন্য এক রূপ ধরা পড়ে, সে রূপ বড় মর্মান্তিক, বড় বেদনাময়, তাঁর চোখে তাই বিশাল বিস্ময় আর সংক্ষুব্ধ জিজ্ঞাসা:

'অবাক পৃথিবী! অবাক করলে তুমি
জন্মেই দেখি ক্ষুব্ধ স্বদেশভূমি।
অবাক পৃথিবী! আমরা যে পরাধীন
অবাক, কী দ্রুত জমে ক্রোধ দিন দিন,
অবাক পৃথিবী! অবাক করলে আরো--

দেখি এই দেশে অন্ন নেইকো কারো।

(অনুভব'-১৯৪০)

এটি সুকান্তের সত্যদর্শনও বটে। প্রথম জীবনের বয়ঃসন্ধিক্ষণেও তাঁর বিস্ময় জেগেছিল---'কোথা হতে নিয়ে এল জড় অন্ধকার,/---এই কি পৃথিবী?'সেই বিস্ময় রূপান্তরের পথে তার এক নতুন মাত্রা অর্জন করল 'অবাক পৃথিবী'তে। তাঁর ধ্যানে ও মননে কি অন্য কোন পৃথিবী ছিল?১৯৪০খ্রীষ্টাব্দে তাঁর পৃথিবীর চেহারাটা কেমন?

ক)স্বদেশভূমির পরাধীনতা

খ)অন্নহীনতা বা দারিদ্র্য

গ)বঞ্চনা,অপমান ও অকাল মৃত্যু

সুকান্তের প্রথম বিস্ময় ছিল 'জড় অন্ধকার'গ্রস্ত পৃথিবীর জন্যে,অনেকখানিই যা অস্পষ্টতায় নিহিত। দ্বিতীয় বিস্ময় যেন সচেতনতার বিস্ময়,কার্যকারণ উল্লেখসহ যার তাৎপর্য সুকান্তের কাছে রীতিমত দুশ্চিন্তার। এ পৃথিবী কোন সুস্থ ও স্বাভাবিক মানুষের প্রার্থিত হতে পারে না। সুকান্ত 'সেলাম' জানিয়েছেন এই পৃথিবীকে,অবশ্যই সশ্রদ্ধ উল্লেখের দ্বারা নয়,চূড়ান্ত বিদ্রূপের দ্বারা। এ আঘাত সেই সবলতম শক্তিকেও, যার অপর নাম সাম্রাজ্যবাদ ও পুঁজিবাদ। সুকান্ত ফ্যাসিবিরোধী পর্বের আগের সময়টিতে আত্মিক-সংকটে ভুগছিলেন,এ পর্বে তাঁর অভিজ্ঞতা হল যে,ব্যক্তির সংকট একান্তই ব্যক্তিগত নয়,তা বিশ্ব-সংকটেরই অনিবার্য ফলশ্রুতি। ফ্যাসিবিরোধী পর্বে প্রবেশ করে সুকান্তের দেখার দৃষ্টিভঙ্গি পরিবর্তিত হয়েছে,জগৎ এবং জীবনের দিকে দৃষ্টি মেলে,সম্পূর্ণ নেতিবাচক মননক্রিয়ায় যেখানে ছিল অমোঘ মৃত্যুর স্পষ্ট উপস্থিতি,সেখানে জীবনমুখিতা প্রত্যয় এসে সুরের বদল ঘটিয়ে দিয়েছে।--'সপ্তর্ষি শোনে নাকো পৃথিবীর শৈশবক্রন্দন,/দেখে নাই নির্বাকের অশ্রুহীন জ্বালা।/দিশাহীন চণ্ডালের নির্লিপ্ত আদেশে/আদিম কুকুর চাহে/ ধরণীর বস্ত্র কেড়ে নিতে।/উল্লাসে লেলিহজিহ্ব লুব্ধ হায়েনারা।'-- সুকান্ত যদি এখানে থেমে যেতেন, তাহলে তা হত নেতিবাচক বর্ণনা মাত্র,আন্তর্জাতিক যুদ্ধ-পরিস্থিতি ও ভারতীয় জাতীয় আন্দোলনগত পরিস্থিতিকে একই সূত্রে এখানে গ্রথিত করে খুবই সূক্ষ্মতর ব্যঞ্জনায় প্রতিরোধের কথাও বলা হয়েছে---'মুক্তবন্ধ উদ্যমের অদৃশ্য জোয়ারে/সংঘবদ্ধ বল্মীকের দল'।(সব্যসাচী)।

১৯৪১খ্রীষ্টাব্দে 'রক্তমত্ত পৃথিবীর ডাকঘর থেকে' সত্তায় যে ডাক এসেছে,সে পৃথিবীতে 'একক' বা নিঃসঙ্গ হয়ে কেউ থাকতে পারে না,'জনতার প্রবল জোয়ারে' সে পৃথিবী ভেসে যায়,কারণ,'নিপীড়িত জীবনেও মাটির মানুষ' 'পূর্ণতায় মুক্তি চায়'---যার সেই পূর্ণতা প্রতিরোধে,প্রতিবাদে ও সংঘবদ্ধতায়।

১৯৪১খ্রীষ্টাব্দের ২২জুন তারিখে রাশিয়া আক্রান্ত হওয়ার পর বিশ্বযুদ্ধ পরিস্থিতিতে সংযোজিত হয় একটি নতুন মাত্রা।যে যুদ্ধ ছিল দুটি সাম্রাজ্যবাদী দেশের লড়াই,অথবা,দুটি আধিপত্যকামী রাষ্ট্রশক্তির সুনির্দিষ্ট দ্বন্দ্ব,সে দ্বন্দ্বে সমাজতন্ত্রী একটি রাষ্ট্রের জড়িয়ে পড়ার ঘটনা স্বভাবতই যুদ্ধকে চিহ্নিত করল একটু স্বতন্ত্রভাবে।স্ট্যালিন এই যুদ্ধকে 'জনযুদ্ধ' ঘোষণা করলে দেশে দেশে কমিউনিস্টরাও সমাজতন্ত্রী রাশিয়ার পক্ষে লড়াই চালাতে শপথ নেন।ভারতীয় কমিউনিস্টরাও এই যুদ্ধকে 'জনযুদ্ধ' নামে চিহ্নিত করে।প্রগতি লেখক সংঘও তাদের সাংস্কৃতিক কার্যক্রমে 'জনযুদ্ধ'কে অগ্রাধিকার দিয়ে কাজকর্ম শুরু করে। ১৯৪২খ্রীষ্টাব্দের ৮মার্চ ঢাকার রাজপথে সোমেন চন্দের হত্যাকান্ডকে কেন্দ্র করে এই আন্দোলন আরও বিস্তারিত হয় এবং প্রগতি লেখক সংঘের বঙ্গীয় প্রাদেশিক শাখার নামকরণ হয় 'ফ্যাসিবিরোধী লেখক ও শিল্পী সংঘ'।সোমেন চন্দের মৃত্যু বাংলাদেশের বুদ্ধিজীবী ও লেখকদের কাছে ভয়ঙ্কর দুঃস্বপ্নের। সুকান্তের কাছেও এই মৃত্যু বড় মর্মান্তিক হয়ে দাঁড়ায়। তিনি লেখেন,'সংশয়ের মৃত্যু আজ,সুপ্ত জন্মে ছিন্ন/আচ্ছাদন উন্মোচন করেছে যত ভ্রূণ,/শঙ্কাকুল শিল্পীপ্রাণ,শঙ্কাকুল কৃষ্টি,/দুর্দিনের অন্ধকারে জন্মান্ধ দেখেছে দৃষ্টি।' (ছুরি)।[১১] লক্ষ্য করবার,কবিতাটির প্রকাশকাল ২৭মার্চ,১৯৪৩খ্রীষ্টাব্দ।অর্থাৎ সুকান্তের এটি তাৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়া নয়।তবুও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে মূল্যবোধের বিপর্যয় যে ঘোর দুর্দিনের সূচনা করেছিল সুকান্ত তা উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন।১৯৪২খ্রীষ্টাব্দে ফ্যাসিবিরোধী লেখক ও শিল্পী সংঘ 'জনযুদ্ধের গান'-এর একটি সংকলন বের করে। দ্বিতীয় সংস্করণের ২২নং গানটি সুকান্তের 'জনযুদ্ধের গান'।ভারতবর্ষ সরাসরি ফ্যাসিবিরোধী যুদ্ধে জড়িয়ে পড়ে নি ঠিক কথা, কিন্তু যুদ্ধের আঘাত যে লাগে নি তাও নয়।জাপানি হামলা শুরু হয় ।কলকাতা,চট্টগ্রাম ও আসামের সন্নিহিত এলাকায় বোমাও পড়ে।৭জুলাই,১৯৪২খ্রীষ্টাব্দে জাপ-বিরোধী ঐক্যদিবসও পালিত হয় ইউনিভার্সিটি ইনস্টিটিউট হলে।জাপানি-ফ্যাসিস্টদের প্রতিরোধের আহ্বান জানিয়ে সুকান্ত লেখেন,'জনগণ হও আজ উদ্বুদ্ধ/শুরু করো প্রতিরোধ,জনযুদ্ধ,/জাপানী ফ্যাসিস্টদের ঘোর দুর্দিন/ঘিরছে ভারত আর বীর মহাচীন।/সাম্য-বাদীরা আজ ধরো অস্ত্র/শুরু করো প্রতিরোধ,জনযুদ্ধ।/... ... ...করো জাপানের আজ গতি রুদ্ধ,/শুরু করো,প্রতিরোধ,জনযুদ্ধ।।'(জনযুদ্ধের গান)।এই সময় বার্লিন থেকে প্রত্যহ সুভাষচন্দ্রের জ্বালাময়ী ভাষণ প্রচারিত হত রেডিও মারফত।ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি জাপানের সাহায্যে সুভাষচন্দ্রের ব্রিটিশ-ভারত আক্রমণের পরিকল্পনা ও স্বাধীনতার প্রদত্ত প্রতিশ্রুতি সম্পর্কে সন্দিগ্ধ ছিলেন,সুকান্তও ব্যাপারটা মেনে নিতে পারেন নি,কাজেই 'জনৈক বন্ধুর প্রতি' কবিতায় ফ্যাসিবাদী কৌশলকে ব্যঙ্গ করে বলেন: 'ভাল কথা,/আমি প্রতিদিন/টোকিও,বার্লিন /শুনি---/আর জাপানের পদধ্বনি শুনি।.../আমাদের যখন দরকার/জাপান সরকার/ইংরেজ নিধনকারী পাঠাবে সৈনিক,/কিন্তু কাঁটা অবাধ্য

সৈনিক/বন্দরায়/আমাদের সুরাজ পাওয়ায়।/আর বন্দরায় শুধু সাম্যবাদী দল/স্বাধীনতা দেওয়া নাকি জাপানীর দল।/---এই কথা রাষ্ট্র করে তারা/ব্রিটিশের গৌরীসেনী অর্থে পুষ্ট যারা।' বলা দরকার, এই পর্বের সময়টি খুবই জটিল। 'সাম্যবাদী দল'কে এই সময় 'ব্রিটিশের দালাল', 'গুপ্তচর' ইত্যাদি আখ্যা দেওয়া হয়। উক্ত কবিতায় সুকান্ত তারই জবাব দেবার চেষ্টা করেছেন। জনযুদ্ধকে সমর্থন করে সুকান্ত 'বিভীষণের প্রতি' কবিতাটিও লেখেন। ফ্যাসিস্টশক্তির অনুকূলে দেশের অভ্যন্তরে যারা গুপ্তচরের কাজ চালাচ্ছে, এ-কবিতায় তাদের প্রতি হুঁশিয়ারি রয়েছে। লক্ষণীয়, কবিতাটিতে কৃষকদের সংঘবদ্ধ হওয়ার প্রয়োজনীয়তার ওপর গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। সুকান্তের মার্কসীয় উপলব্ধি হল শ্রমিক ও কৃষকই ফ্যাসিবিরোধী শক্তি হিসেবে গড়ে উঠতে পারে, প্রতিহত করতে পারে সব প্রকারের প্রতিকূলতা।

সুকান্ত ফ্যাসিবাদের উন্মত্ততা সম্পর্কে এবং এর প্রতিরোধ পদ্ধতি সম্পর্কে কমিউনিস্টদের বিশ্লেষণকে অভ্রান্তভাবে স্বীকার করে এসেছেন। উগ্র জাতীয়তাবাদ যে সামূহিক সর্বনাশের কারণ, রবীন্দ্র-ঐতিহ্য থেকে সুকান্ত আহরণ করেছিলেন এর উপাদান। অভিজ্ঞতার প্রত্যক্ষতার প্রয়োজন পড়ে নি। প্রতিরোধের আয়োজন সম্পূর্ণ করতে না করতে কলকাতায় জাপানি বোমা বর্ষণের একাধিক ঘটনা ঘটে। সুকান্ত এই বোমাতঙ্কের একজন অংশীদার। একটি পত্রে তিনি লিখছেন, 'মরিতে চাহি না আমি সুন্দর ভুবনে।' কিন্তু মৃত্যু ঘনিয়ে আসছে, প্রতিদিন সে ষড়যন্ত্র করছে সভ্যতার সঙ্গে। তবু একটা বিরাট পরিবর্তনের মূল্য যে দিতেই হবে।'[১২] জাপানি হামলার প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেছেন এইভাবে। আত্মত্যাগের মহৎ প্রস্তুতি প্রতিরোধের ব্যাপকতারই একটি দিক, কমিউনিস্ট কার্যক্রম শুরু হয়েছিল এইভাবে, ফ্যাসিবিরোধী লেখক ও শিল্পী সংঘও সাহিত্যিক ও সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডের দ্বারা প্রতিরোধের ব্যাপারে জনগণকে সচেতন করার ব্রত গ্রহণ করে। সুকান্তের পত্রটি সেই প্রস্তুতিরই সাক্ষ্য বহন করছে। তাঁর উক্ত উপলব্ধির পেছনে রয়েছে কমিউনিস্ট-দর্শন। অন্যদিকে ফ্যাসিস্ট দর্শন সম্পর্কে মুসোলিনির বক্তব্য ছিল:

'According to Fascist doctrine, the state or nation is the central entity. It becomes a mystical entity armed with a historical mission. It is the duty of the individual to raise himself to the national consciousness and to loss his own identity in it.'[১৩]

মুসোলিনি তাঁর কল্পিত রাষ্ট্রের পরিকাঠামো ও ব্যক্তির মূল্যায়নে যে সব কথা বলেছেন উক্ত প্রবন্ধে,

পৃঃ১০০), তার সম্পূর্ণ বিপরীত মতবাদ মার্কসের রয়েছে। এই বৈপরীত্য নির্দেশ করতে গিয়ে সমালোচক লিখেছেন, 'Fascism differs from Marxism in that Marx saw history as the history of conflict between classes; Fascists see history in terms of conflict between nations. Marxists are materialists; Fascists are spiritualists. Marxists are economic determinists; Fascists are nationalistic determinists. Marxists believe that class struggle is inevitable; Fascists believe in the organic unity of a nation. Marxism professes, to be scientific; Fasdism glorifies the irrational.'[১৪]

সুকান্ত অনুভব করেছিলেন, ফ্যাসিজমের বিরুদ্ধে গণচেতনা গড়ে তুলতে না পারলে, প্রতিরোধের প্রস্তুতির কথা নিষ্ফল হয়ে দাঁড়াবে। ফ্যাসিবিরোধী লেখক ও শিল্পী সংঘ তাদের কালচারাল স্কোয়াড গাঁয়ে-গঞ্জে পাঠিয়ে এই গণচেতনা গড়বার ভূমিকার ওপর জোর দেয়। ১৯৪২খ্রীষ্টাব্দের ১৭ অক্টোবর চট্টগ্রামের কটিকা গ্রামে সুকান্তরচিত 'জাপানকে রুখতে হবে' নাটিকাটির অভিনয় করে এই সংঘ। তরুণতর নাট্যকার এবং তাঁর নাটিকা সম্পর্কে সমালোচকের মন্তব্য প্রসঙ্গত উদ্ধার করছি: 'সাহিত্যের অন্যান্য দিকে সুকান্ত যেমন সফল হয়েছেন নাটকের ব্যাপারে তাঁর তেমন দক্ষতা ছিল না। যা হোক শিল্পের দিক থেকে অসাধারণ না হলেও একটি রাজনৈতিক দলিল হিসাবে এর মূল্য খুবই বেশী।'[১৫] তার কারণ, কমিউনিস্ট পার্টির তখনকার বক্তব্য মোটামুটিভাবে এই নাটকে প্রতিফলিত করবার চেষ্টা রয়েছে। জাপানের অন্যায় আক্রমণ থেকে আত্মরক্ষার জন্যে, বিশেষত গ্রামের কৃষক ও শ্রমজীবী মানুষকে প্রতিরোধে উদ্দীপ্ত করার প্রেরণাসংবলিত উক্ত রচনাটি। সরলরৈখিক ঘটনাবিন্যাস, গতানুগতিক থীম, নাট্যরীতির কৌশলগত ত্রুটি---সর্বত্রই দুর্বল হাতের ছাপ রয়ে গেছে। তথাপি সুকান্তের এই ভূমিকা প্রতিরোধ-আন্দোলনের ইতিহাসে স্মরণীয়।

প্রগতি সাহিত্য আন্দোলনে এ কথা অনেকখানি স্পষ্ট হয়েছিল যে, প্রগতির অর্থ মার্কসীয় দৃষ্টিভঙ্গির উপলব্ধি ও ব্যবহারিক প্রয়োগের মধ্য দিয়ে সর্বহারাশ্রেণীর বৈপ্লবিক চেতনাকে পরিস্ফুট করা।[১৬]

বলাই বাহুল্য, এসব ক্ষেত্রে কবি-সত্তার চেয়ে কর্মী-সত্তার মুখ্য ভূমিকা অনস্বীকার্য। কল্যাণকামী রাষ্ট্রের প্রয়োজনে, জনশক্তির ব্যাপক অংশের আর্থিক প্রয়োজনে এবং মনুষ্যত্বের সামগ্রিক বিকাশের প্রয়োজনে কবির চেয়ে কর্মীর আবশ্যক ঢের বেশি। আলোচনার প্রথমেই লু সুনের উক্তির উপযোগিতার বিচার-প্রস্তাবও এই দৃষ্টিকোণ থেকেই উত্থাপিত হয়েছিল, কিন্তু তার অর্থ এই নয় যে সাহিত্যের প্রয়োজন নেই। লু সুন সে রকম মন্তব্যও করেন নি। যাই হোক, এই শ্রেণীর সাহিত্য-শিল্প জনগণের অবিসংবাদিত ভূমিকাকে যথার্থ মূল্যে প্রতিষ্ঠিত করতে চায়, জনগণই এই শ্রেণীর সাহিত্য-শিল্পের মুখ্য উপকরণ। জি. এস. ফ্রেজার কমিউনিস্টদের কাব্যাদর্শ সম্পর্কে মোটামুটিভাবে একটি সাধারণ ধারণা দেবার চেষ্টা করেছেন, তিনি বলেছেন, 'Communist poetry requires a use of the symbolism of the great suffering masses : or rather it does not require symbolism or allegory at all but a direct appeal to the masses, a direct praise of them, and a tone of practical exhortation, a direct description of their activities and sufferings. And it must not be cryptical or allusive or obscure, it must make no cultural demands on the masses that would give them a sense of inferiority or weaken them in the struggle.'[১৭]

ফ্রেজারের বক্তব্য অত্যন্ত পরিষ্কার। জনগণের সাহিত্যে পাঠকের প্রতি 'ডাইরেক্ট এ্যাপীল' থাকে, 'সিম্বলিজম' বা 'এ্যালিগোরি'র মধ্য দিয়ে কবিতায় যে জটিলতা সৃষ্টি করা হয়, অধিকাংশ জনগণের তা বোধগম্য নয়। জনগণের সুখ-দুঃখ-আহ্লাদের বর্ণনা তথা তাদের সক্রিয় সংগ্রাম যেন যথাযথ মূল্য পায়। সবচেয়ে বড় কথা, তাদের সাংস্কৃতিক চাহিদা পূরণের জন্যে যে মূল্যবোধ তৈরি করা হবে তাকে যেন কোনমতেই হীনমূল্য করে না দেখানো হয় অথবা তাদের সংগ্রামের পরিপন্থী যেন না হয়। সাম্যবাদী কবিতার ক্ষেত্রে আবেদনের সহজতা যেন সর্বদাই প্রকাশ পায়। সোভিয়েত কবি মায়াকোভস্কি জনগণকে গুরুত্ব দিয়েছেন এই দৃষ্টিকোণ থেকেই। লক্ষ্য করবার, সুকান্তর সামগ্রিক চেষ্টার মধ্য দিয়ে এই আকাঙ্ক্ষাই ফলবতী হতে চেয়েছে।

সুকান্তের কাব্যে ফ্যাসিবিরোধী সুর অত্যন্ত জোরালো, কেননা তার লক্ষ্য জনগণ, এই জনগণকে বাদ দিয়ে তাঁর কবিতার আস্বাদন সম্ভব নয়। ভাষার ক্ষেত্রেও সুলভ সহজতা লক্ষণীয়। মজুর-কৃষকগণকে কেন্দ্র করে সুকান্ত বলেন, 'শ্রমিক দুস্থ কারখানায়, কৃষক দুস্থ মাঠে, / তাই প্রতীক্ষা, কখন দিন সুপ্তহীন হাটে। / তীব্রতর আগুন চোখে, চরণপাত নিবিড় / মজুরেরা জবাব দেবে এদেশে জনশিবির।।' (জবাব)। বক্তব্যে কোথাও জড়তা নেই। শ্রমিক ও কৃষকশ্রেণীর সংহতির ওপর জোর দিয়েছিলেন 'জাপানকে রুখতে হবে' নাটিকায়, এই কবিতাটিতেও সেই একই দায়িত্ব পালন করেছেন সুকান্ত। কমিউনিস্টদের কাব্যাদর্শ সম্পর্কে ক্রেশার যে যে লক্ষণের ওপর জোর দিয়েছিলেন, এখানেও তার ব্যত্যয় নেই। 'উদ্যোগ' কবিতাটিতেও তারই পুনরাবৃত্তি। প্রচলিত সমাজতন্ত্রে শিল্পী-সাহিত্যিকের দায়বদ্ধতার কথা অস্বীকার করা হয়। প্রগতি সাহিত্য আন্দোলনে সামাজিক দায়বদ্ধতাই স্বীকৃত। সুকান্ত তা অঙ্গীকার করেছেন এবং এ বিষয়ে তাঁর দ্বিধাহীনতা বড় বেশি স্পষ্ট। তাঁর ঘোষণাঃ 'তাই আমি যেতে চাই সেখানেই যেখানে পীড়ন, / যেখানে জনস্রোতে উঠবে আমার অস্থির কিরণ।' (মীমাংসা)। সুকান্তের কণ্ঠস্বরে নজরুলের প্রতিধ্বনি শোনা যায়। নজরুলও সামাজিক দায় অনুভব করতেন। সামাজিক এই দায়বদ্ধতার প্রশ্ন থেকেই কমিউনিস্টরা গণ-চেতনার প্রতি গুরুত্ব দিয়ে থাকেন। একদা সুকান্ত লিখেছিলেন, 'দিন রাত শুধু চেতনা আমাকে নির্দয় হাতে চাবুক মারে'---এই চেতনা ছিল সে সময় ব্যর্থতা-দুঃখ-অক্ষমতার, একরকমের অনুভব---অনেক দুঃখে রক্ত আমার অসংযত'। এ চেতনা এখন থেকে ও বিদ্রোহে স্পষ্ট হতে চায় যার নেপথ্য কারণঃ 'সংক্রমিত রক্ত-স্রোত পৃথিবীর প্রতি ধমনীতে'। অতঃপর সেই দায়বদ্ধতা---'আমি যেতে চাই সেখানেই যেখানে পীড়ন'। এ সময় জাপানি হামলা তীব্রভাবে শুরু হয়, বিশেষ করে ভারতের পূর্ব প্রান্তরে। সুকান্ত এ পর্বে দেশপ্রেমিকের কর্তব্যে অটল। লেখেন, 'একদিকে দেশের পূর্ব প্রান্তরে / আবার বোমারু রক্ত পান করে, / ক্ষুব্ধ জনতা আসামে, চাটগাঁয়ে, / শাসিত-দৈন্য-মগ্ন অন্যায়ে।' (মধ্যবিত্ত)। এই অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ তখনই সম্ভব যখন দেশের প্রতি গভীর মমতা জাগ্রত হবে। কিন্তু শ্রেণীর দিক থেকে যারা সাধারণত মধ্যজীবী, তাদের দেশাত্মচিন্তা অনেক সময়েই স্বার্থপরতার দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। দেশের যুদ্ধ-সংকটে, আগস্ট আন্দোলনের (১৯৪২খ্রীষ্টাব্দ) ফলে উদ্ভূত বিপর্যস্ত পরিস্থিতিতে জাতীয়তাবাদী নেতারা যখন অন্তরীণ, তখন অন্যদিকে জাপানি সহায়তায় জাতির মুক্তির স্বপ্নে উদ্বেলিত একদল দেশপ্রেমিক ('দেশপ্রেমিক' উদ্ধৃত চিহ্ন কবির) জাপানিদের সমর্থনে এগিয়ে আসেন---এই চেতনা, সুকান্তের মতে, সুবিধাবাদী চেতনা। জাতিপ্রেমের উগ্র অন্ধতা চীনের স্বাধীনতাকে একদিকে অস্বীকার করে, অন্যদিকে ভারতবর্ষের স্বাধীনতার স্বপ্ন দেখে জাপানির চোখে, এই দু'রকম অন্যায়ের দ্বৈততা কমিউনিস্ট সুকান্ত

কিভাবে মেনে নেবেন ?

'তাদের স্বার্থ আমার স্বার্থকে,
দেখবে চেহারা আজকে এক চোখে।।'

এ কথাগুলি তাই গভীরতর শোনায়। 'তাদের স্বার্থ' কথাটির ব্যাপকতা এখানেই যে, ফ্যাসিবাদী শক্তির বিরুদ্ধে যারা প্রতিরোধ ও প্রতিবাদের জন্যে অগ্রণী ভূমিকা নিয়েছে, তাদের ব্যাপকতর স্বার্থের সঙ্গে সুকান্তের স্বার্থও ঘনিষ্ঠভাবে সংশ্লিষ্ট---মার্কসবাদী চিন্তার দিক থেকে এই বোধের নামই হল আন্তর্জাতিকতাবাদ। 'বিবৃতি', 'মণিপুর', 'চট্টগ্রাম-৪৩', প্রভৃতি কবিতায় এই আন্তর্জাতিকতাবাদেরই অজস্র বিস্তার ছায়াপাত ঘটেছে। সুকান্তের স্বদেশপ্রেম ও আন্তর্জাতিক প্রেম কিভাবে একাকার হয়ে একটি নতুন মাত্রা এনেছে কবিতায়, সে সম্পর্কে অধিক বিশ্লেষণ অবান্তর হবে না। সুকান্ত লিখছেন---

'আমার সোনার দেশে অবশেষে মন্বন্তর নামে'

এ দেশ সোনার বাংলা। ফ্যাসিস্টশক্তি এ দেশ আক্রমণ করেছে---

'শত্রুরা এসেছে আজ হিংস্র পশু আক্রমণ করে'

অন্যদিকে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের দুর্দমনীয় শাসন---

'নিযুত অন্যায় হানে জরাগ্রস্ত বিদেশী শাসন'

এই তিনরকম অত্যাচারের ত্র্যহস্পর্শে সোনার দেশ রীতিমত বিপর্যস্ত। এমন অবস্থায় চতুর্থ মাত্রা যোগ হয় গৃহযুদ্ধের কলুষ-কলহ নিয়ে---'সহসা অনেক রাতে দেশদ্রোহী ঘাতকের হাতে' জ্বলে ওঠে আরেক মৃত্যুবাণ। এর বিরুদ্ধে যারা রক্ত ঢালে তাদের প্রেম কি তুচ্ছতা ও অবজ্ঞার বিষয় ? এ প্রেমও দেশপ্রেম, এবং মহতী প্রাণনায় উদ্দীপ্ত। এ প্রেমের রচয়িতা মধ্যবিত্তশ্রেণী নয়, অথবা জাতীয়-বুর্জোয়া, এর রচয়িতা, সুকান্তের চোখে---

'আজকে মজুর ভাই দেশময় তুচ্ছ করে প্রাণ,
কারখানায় কারখানায় তোলে ঐকতান।
অভুক্ত কৃষক আজ সূচীমুখ লাঙলের মুখে
নির্ভয়ে রচনা করে জঙ্গী কাব্য এ মাটির বুকে।'

(বিবৃতি)

শ্রমিক-কৃষক-মজুরই এ প্রেমের মহান রচয়িতা। এ প্রেম, বলা অবান্তর, কেবল বাংলাদেশের আঞ্চলিকতাকে আশ্রয় করে অথবা ভারতবর্ষকে আশ্রয় করে গড়ে-ওঠা জাতীয়প্রেম নয়, এ প্রেমের সংজ্ঞার্থ

নতুন অর্থদ্যোতনা পায়---'ওদেশে তাকায় ভ'রে দেখে জানি নতুন য়ুক্রেন', এই পংক্তিতে। 'নতুন য়ুক্রেন' হল বিপ্লবোত্তর রাশিয়ার এমন একটি এলাকা যা আধুনিক কৃষিতে প্রভূত উন্নতি সাধন করেছে এবং যা দৃষ্টান্তস্বরূপ। 'নতুন য়ুক্রেন' ও 'বিপন্ন পৃথিবী' এই দুটি শব্দ সতর্কভাবে অনুধাবন করলে স্পষ্ট বোঝা যাবে সুকান্তের দেশপ্রেমের গভীরতা, একে উগ্র দেশপ্রেম কিছুতে বলা চলে না, বরং তা বিশ্বের যা কিছু ভাল, যা কিছু শ্রেয়, তাকে গ্রহণ করেই তাঁর দেশপ্রেম পেয়েছে একটি ভিন্ন মাত্রা। স্বদেশপ্রেমের অন্যান্য কবিতা থেকে সুকান্তের দেশপ্রেমের কবিতা এই কারণেই বৈশিষ্ট্যপূর্ণ। তাঁর দেশপ্রেম তাই এই প্রার্থনায় দুঃসাহসী হয়---

> 'রক্তে আনো লাল,
> রাত্রির গভীর বৃন্ত থেকে ছিঁড়ে আনো ফুটন্ত সকাল।'

বলা দরকার, এই প্রার্থনা সাধারণ গোত্রের নয়। এ দেশপ্রেম সহজ ভক্তি-আপ্লুত নয়, রাত্রির বৃন্ত থেকে যে সকালকে ছিঁড়ে আনতে হয়, তা রীতিমত স্পর্ধা ও দুঃসাহসসাপেক্ষ। অতএব তা গর্বনযোগ্য ব্যাপার। বাংলা কাব্যে সুকান্তের আগে দেশপ্রেমের কবিতা লিখে খ্যাতি অর্জন করেছেন বঙ্কিম, রবীন্দ্রনাথ, দ্বিজেন্দ্রলাল রায়, নজরুল, অতুলপ্রসাদ, রজনীকান্ত প্রমুখ, কিন্তু সরাসরি সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের আহ্বান জানিয়ে স্বদেশপ্রেমের এমন চূড়ান্ত স্বাক্ষর আর কেউ রাখেন নি।

'মণিপুর' কবিতাটি এরই বিস্তৃতরূপ।

গভীর দেশপ্রেমের সঙ্গে দেশের ঐতিহ্য ও ইতিহাসের অভিজ্ঞতা পরিপূর্ণতার আবহ সৃষ্টি করেছে এতে। মণিপুর আক্রমণ ভারতবর্ষে যুদ্ধের আতঙ্ক ও ত্রাস সৃষ্টির নিশ্চিত সেতু হয়ে দাঁড়ায়। সুকান্তের দুর্নিবার দ্রোহ তো সেই কারণেই। সুকান্ত-সমালোচক প্রশান্ত ঠিকই বলেছেন, 'এখন আর তিনি সতের বছরের কিশোর নন, হাজার বছরের প্রবীণ যোদ্ধা, রক্তে তাঁর সুপ্রাচীন ঔপনিবেশ-বিরোধী প্রতিরোধ সংগ্রামের ঐতিহ্য। ... সমকালের আর কোন কবির দৃষ্টিতেই এমন করে ভারতবর্ষের মূর্তি আঁকা হয় নি। এ কবির স্বপ্ন-চোখে দেখা আজাদী রূপ নয় বা বিদেশী-লাঞ্ছিত ক্রন্দসী মাতৃমূর্তি নয়। কোন অবয়বহীন স্বাদেশিক আবেগের ভাবপ্লাবনে এ কবিতার সৃষ্টি হয় নি। কিংবা কয়েকজন ঐতিহাসিক পুরুষের বীরত্ব গাঁথাও এ কবিতার উদ্দেশ্য নয়।' [১৮] সুকান্তের বলবার ভঙ্গিটি কী চমৎকার-

> এ আকাশ, এ দিগন্ত, এই মাঠ, স্বপ্নের সবুজ ছোঁয়া মাটি,
> সহস্র বছর ধ'রে একে আমি জানি পরিপাটি,
> জানি এ আমার দেশ অজস্র ঐতিহ্য দিয়ে ঘেরা,
> এখানে আমার রক্তে বেঁচে আছে পূর্বপুরুষেরা।'

দ্বিজেন্দ্রলাল রায় লিখেছিলেন, 'স্বপ্ন দিয়ে তৈরি সে দেশ স্মৃতি দিয়ে ঘেরা', আলোচ্য পংক্তিগুলিতে তারই অস্পষ্ট প্রতিধ্বনি। সুকান্ত পূর্বসূরীর উত্তরাধিকার স্বীকার করে নিয়েছেন স্বকীয় বৈশিষ্ট্য ও স্বাতন্ত্র্যের সমীকরণ ঘটিয়ে---তারই অভিব্যক্তিঃ'এখানে আমার রক্তে বেঁচে আছে পূর্বপুরুষেরা'। কাব্যে ঐতিহ্যের ক্ষেত্রেও এ কথা সমান সত্য। ফ্যাসিজমের বর্বরতাকে 'দ্বিতীয় মৃত্যুর ছদ্মবেশে' দেখেছেন সুকান্ত। তাঁর মতে, এমনতর বর্বরতা ইতিহাসে বার বার দেখা গেছে---'এখানে রক্তের দাগ রেখে গেছে চেঙ্গিস্, তৈমুর, /সে চিহ্নও মুছে দিল কত উচ্চৈঃশ্রবাদের খুর। /কত যুদ্ধ হয়ে গেছে, কত রাজ্য হয়েছে উজাড়, /উর্বর করেছে মাটি কত দিগ্বিজয়ীর হাড়।' (মণিপুর)। শুধু তাই নয়, অত্যাচারিতের দলও প্রতিরোধে এগিয়ে গিয়ে অশুভশক্তির মোকাবিলা করেছে, তাদের উৎসর্গীকৃত জীবনের মূল্যে 'মাটির মান' বেড়েছেঃ'এ মুলোয় প্রতিরোধ, এ হাওয়ায় ঘূর্ণিত চাবুক, /এখানে নিক্ষিপ্ত হল কত শত সর্বোন্নত বুক। /এ মাটির জন্যে প্রাণ দিয়েছি তো কত যুগ ধ'রে, /রেখেছি মাটির মান কতবার কত যুদ্ধ ক'রে।' (ঐ)। লক্ষণীয়, সুকান্ত মাত্র কয়েকটি পংক্তি প্রয়োগের মধ্যদিয়ে অতীতের সঙ্গে আত্মীয়নিষ্ঠ হয়ে উঠেছেন---ক)'সহস্র বছর ধ'রে একে আমি জানি পরিপাটি', খ)'যুগ যুগ আমরা যে বেঁচে থাকি পতনে উত্থানে', গ) 'আজকে দেখেছি আমি অদ্ভুত নতুন এক চোখে, /আমার বিশাল দেশ আসমুদ্র ভারতবর্ষকে', ঘ)'এ মাটির জন্যে প্রাণ দিয়েছি তো কত যুগ ধ'রে'। আর ভবিষ্যতের সঙ্গে অন্বিষ্টতা ঘটেছে এইভাবে---ক)'ঘোষণা করুক তারা এ মাটিতে আসন্ন বৈশাখ', খ)'ওরা আসে, কান পেতে আমি তার পদধ্বনি শুনি', গ)'ওদের দুচোখে আজ বিকশিত আমার কামনা'। অতীতের সঙ্গে আত্মীয়তাসম্পৃক্তির বোধ একদিকে, অন্যদিকে ভবিষ্যতের নিবিড় স্বপ্নরাজি---এই দুইকে মেলাতে গিয়ে আমি ও আমরা এবং তারা ও ওরা এই দুইপ্রকার সর্বনামের আশ্রয় নিয়েছেন কবি। বাস্তবিকপক্ষে সুকান্তের কাব্যপাঠক একটু সন্দিগ্ধ না হয়ে পারেন না যে, তিনি এ ধরনের কবিতায় সর্বনাম পদের উত্তম পুরুষের একবচন ও বহুবচন(বহুল প্রয়োগ লক্ষ্য করবার) সাধারণত ব্যবহার করে থাকেন, কিন্তু 'তারা' বা 'ওরা' এই বহুবাচনিক সর্বনাম ব্যবহার করে সংশয়জনক বিভেদরেখা টেনে আনবেন কেন।

খুব সম্ভব, এর সম্ভাব্য ব্যাখ্যা এমনটা হওয়া বিচিত্র নয়, সুকান্ত হয়ত ভেবেছেন, তিনি বিপ্লবের সমর্থকমাত্র, কিন্তু যারা বিপ্লব করবে তারা হল চাষী-কৃষক-শ্রমিক-মজুর, প্রধান ভূমিকা তাদেরই। সুকান্ত কবি, দ্রষ্টার আসন তাঁর, তবে তিনি স্বপ্নদ্রষ্টা, নিজে স্বপ্ন দেখতে পারেন, অন্যকে দেখাতে পারেন এবং প্রেরণা জোগাতে পারেন মাত্র। ফ্যাসিবিরোধী মুক্তিসংগ্রামকে যথার্থ সফল করে তোলবার দায়িত্ব যেহেতু জনগণের এবং নেতৃত্ব থাকবে তাদের হাতে, তাঁর কবিতায় যেমন বলা হয়েছে---'এদেশে

কৃষক আছে, এদেশে মজুর আছে জানি, /এদেশে বিপ্লবী আছে জনরাজ্যে মুক্তির সন্ধানী। /দাসত্বের ধুলো ঝেড়ে তারা আজ আহ্বান পাঠাক, /ঘোষণা করুক তারা এ মাটিতে আসন্ন বৈশাখ।' কবি শুধু তাই স্বপ্নই দেখতে পারেন---'ওদের দুচোখে আজ বিকশিত আমার কামনা', কবি বিপ্লবীদের সঙ্গে সমান্তর দূরত্ব রচনা করতে চান নি, কবিও তো একজন বিপ্লবী, তাঁর রাজ্যপাটের প্রকৃতি একটু ভিন্নধর্মী হওয়াই বাঞ্ছিত। দর্শনের দিক থেকে এখানে দ্বন্দ্ব নেই, কিন্তু একই লক্ষ্যকে ভিন্নভিন্নভাবে উপায় ও পদ্ধতির সাহায্যে পরিপূর্ণ করে তোলার দায়িত্বের তথা পরিচালনের প্রকৃতিতে আছে মাত্রাগত ভিন্নতা। এই ভিন্নতা উপায়ের, আদর্শের নয়। লুকিচ 'ইডিওলজি' এবং 'আর্ট'কে সংজ্ঞার্থ দিতে গিয়ে বলেছেন যে, 'আর্ট' হচ্ছে 'ইডিওলজির'ই একধরনের বিশেষ প্রকাশভঙ্গি, যে কোন শিল্পকর্মই অবশ্য এই দাবি করতে পারে। সুকান্ত তাঁর শিল্পকর্মে এ ক্ষেত্রে ও বিষয়গত দূরত্ব বোঝাতে উক্ত আঙ্গিক ব্যবহার করেছেন বলে মনে হয়। তাছাড়া সুকান্তর শিল্পরচনার ভেতর দিয়ে লুকিচের অপর মন্তব্যটিরও সাদৃশ্য দুর্লক্ষ্য নয়, তাঁর মন্তব্যটি--
'Art is also the object of the influence of a certain ideology.'[১১]
রবীন্দ্রনাথও 'প্রান্তিক' কাব্যের ১৮সংখ্যক কবিতায় 'আমি'-বোধক সর্বনামের দ্বারা সংগ্রামের আহ্বান জানিয়েছেন। সুকান্ত ক্রমে ফিরে গেছেন উত্তম পুরুষের বহুবাচনিক সর্বনামে, যেখানে সুকান্ত আর একা নন, বহুজনের সংগ্রামের সাথী, জনতার একজন।

ঐতিহ্যের সঙ্গে সম্পৃক্তি ও ঐক্য অনুভবের সার্বিক প্রয়াসের ভেতর দিয়ে যে বহতা ধারা, যার অন্য নাম দেশপ্রেম, প্রগতিশীল সাহিত্যের চারিত্র্যলক্ষণ হিসেবে তাকে কখনও অস্বীকার করা হয় নি। সুকান্তের দেশপ্রেম ঐতিহ্যবোধেরই নবরূপায়ণ। যখন ভারতের সন্ত্রাসবাদী আন্দোলনের পথে তিনি তাঁর ঠিকানা খোঁজেন---'জালিয়ানওয়ালায় যে পথের শুরু/সে পথে আমাকে পাবে, /জালালাবাদের পথ ধ'রে ভাই/ ধর্মতলার পরে, /দেখবে ঠিকানা লেখা প্রত্যেক ঘরে/ক্ষুব্ধ এদেশে রক্তের অক্ষরে।'(ঠিকানা)। তখন জাতীয় মুক্তিসংগ্রামের অপর ধারা, জালিয়ানওয়ালাবাগের সংঘটিত সাম্রাজ্যবাদী বর্বরতার বিরুদ্ধে জাগ্রত জনমতের সঙ্গেও সুকান্ত ঐক্য অনুভব না করে পারেন না। অন্যদিকে আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে মুক্তিসংগ্রামের যে বিবিধ ধারা ও উপধারা, তার সঙ্গেও সুকান্তের ঐক্য অনুভবের চেষ্টা দেখা যায়---'ইন্দোনেশিয়া, যুগোস্লাভিয়া, /রুশ ও চীনের কাছে, /আমার ঠিকানা বহুকাল ধ'রে/জেনো গচ্ছিত আছে।'(ঐ)। এই অনুভব কবির বিকশিত পরিণত রূপ। ঐতিহ্যের স্বীকৃতিতে সুকান্তের মধ্যে দ্বিধা বা কুণ্ঠার প্রকাশ খুবই কম, 'মণিপুর'-এ তাই সরাসরি বলতে পারেন পূর্বপুরুষের রক্ত-ঋণ স্বীকারের কথা, হাজার হাজার বছর ধরে শ্রমজীবী-মজুর মানুষের ত্যাগ স্বীকারের ও দুঃখভোগের কথা---এমন কি বুর্জোয়াযুগের মূল্যবান

সংগ্রামী ঐতিহ্য ও সুকৃতিকেও তিনি সানন্দে স্বীকরণ করতে ভোলেন নি। 'চট্টগ্রাম:১৯৪৩' শীর্ষক কবিতাতেও এই বোধেরই স্বীকৃতি: 'তাই আজো মনে পড়ে রক্তাক্ত তোমাকে/সহস্র কাজের ফাঁকে মনে পড়ে শার্দুলের ঘুম/অরণ্যের সুপ্ত চোখে, দাঁতে নখে প্রতিজ্ঞা কঠোর।' (চট্টগ্রাম:১৯৪৩)। 'মনে পড়ে' কথাটা লক্ষ্য করবার। ১৯৩০খ্রীষ্টাব্দে সূর্য সেন (মাস্টার দা)প্রমুখের নেতৃত্বে এই চট্টগ্রামে যে বিপ্লবী কর্মকাণ্ড সংঘটিত হয়েছিল, স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসে সে অধ্যায় অত্যন্ত উজ্জ্বল। সুকান্ত সে কথাই স্মরণ করেছেন এখানে। ১৯৩০ থেকে ১৯৪৩খ্রীষ্টাব্দ, মাত্র একযুগ সময়ের মধ্যে জাপানি আক্রমণ শুরু হয়েছে। সুকান্ত অতীতের প্রেরণাকে সম্বল করে ফ্যাসিস্ট বিরোধী সংগ্রামে সামিল হতে চান। ঐতিহ্যের অনুসরণ এভাবেই তার পথ করে নেয়। লুনাচারস্কির অভিযোগের জবাবে লেনিন যা বলেছেন এখানে তা উদ্ধার করা যেতে পারে: 'Marxism has won its historic significance as the ideology of the revolutionary proletariat because, far from rejecting the most valuable achievements of the bourgeois epoch, it has, on the contrary, assimilated and refashioned everything of value in the more than two thousand years of the development of human thought and culture. Only further work on this basis and in this direction, inspired by the practical experience of the proletarian dictatorship as the final stage in the struggle against every form of exploitation, can be recognised as the development of a genuine proletarian culture.'[২০]

লেনিন তাঁর বক্তব্যে প্রলেতারীয় সংস্কৃতি বলতে সেই সংস্কৃতিই বুঝেছেন, যা মানব চিন্তা ও সংস্কৃতির হাজার হাজার বছরের বিকাশের মধ্য দিয়ে ক্রমধারাবাহিকতায় সর্বোত্তম ও মূল্যবান। অর্থাৎ ঐতিহ্যকে গ্রহণের প্রশ্নে লেনিনের আস্থা প্রকাশ পায় শ্রেষ্ঠ উপাদানটির ওপর। প্রগতি লেখক সংঘের ইস্তেহারেও এই বক্তব্যের সমর্থন মেলে।[২১] সুকান্ত তাঁর কাব্যে এই সূত্রকে প্রতিষ্ঠা দেবার যথাসাধ্য প্রয়াস পেয়েছেন।

ফ্যাসিবিরোধী সংগ্রামে অংশগ্রহণ করে প্রলেতারীয় সংস্কৃতির উজ্জীবনের সাহিত্যিক চেষ্টা নিঃসন্দেহে অভিনন্দনযোগ্য। কেননা, এ কথা বলার অপেক্ষা রাখে না যে, ফ্যাসিবিরোধী সংগ্রামে অগ্রণী ভূমিকা গ্রহণ করে আন্তর্জাতিক কমিউনিস্ট-এর নেতৃত্বে বিভিন্ন দেশের শ্রমিক-কৃষক-মজুরের নানা সংস্থা ও পার্টিসমূহ।

জাতীয় ও আন্তর্জাতিক ঘটনার সাম্প্রতিকতা সুকান্তকে বারংবার স্পর্শ করে গেছে। এই পর্যায়ের অন্যতম মর্মান্তিক ঘটনা দুর্ভিক্ষ প্রসঙ্গ আলোচনার আগে সেইসব ঘটনার প্রতি সুকান্তের মনোভাব পর্যালোচনা করতে পারি।

১৯৪৩খ্রীষ্টাব্দের মার্চে ইটালিতে শ্রমিক সাধারণের প্রবল বিক্ষোভের সামনে মুসোলিনি পদত্যাগ করতে বাধ্য হন। সেই গণ অভ্যুত্থান ও মুসোলিনির পরাজয়কে স্মরণ করে লেখা সুকান্তের দুটি কবিতা---'রোম: ১৯৪৩' ও 'চিল'। প্রথম কবিতায় রোমের পতনে বিজয়ীর উল্লাস প্রকাশ পেয়েছে। ফ্যাসিস্টবাহিনীর অধিনায়কের পরাজয়ে হাজার বছর ধরে গড়ে ওঠা তিলোত্তমা নগরীর একটি কলঙ্ক দূর হল। শ্রমিকের রক্তের বিনিময়ে 'মুক্তির দুয়ার দিল খুলে'। অযুত শিল্পী আর মজুরের শ্রমে একদা গড়ে উঠেছিল শ্রেষ্ঠতম নগরী এই রোম, আর এই রোমকেই উদ্ধত ক্ষমতালোভী মুসোলিনি তাঁর দস্যুতার অবাধ উপনিবেশ বানিয়ে তুলেছিলেন---কিন্তু আজ সেই উদ্ধত ক্ষমতালোভী দস্যুতার ব্যর্থ পরাজয়ে' শুরু হল আর এক অধ্যায়, সে অধ্যায় 'সংহার-যুদ্ধে' রক্তাক্ত---'পথে পথে জনতার রক্তাক্ত উত্থান,/বিস্ফোরণে বিস্ফোরণে ভেঙে ওঠে গান।'(রোম: ১৯৪৩)। এই অভ্যুত্থানের অর্থ সমস্ত বিদ্রোহ বা বিপ্লব, উদ্ধত ক্ষমতালোভী দস্যুতার বিরুদ্ধে। আন্তর্জাতিক সমস্ত আইন লঙ্ঘন করে আবিসিনিয়া দখলের মধ্য দিয়ে সাম্রাজ্যবাদের সম্প্রসারণ-প্রবণতার দম্ভ সহসাই ভেঙে পড়ল: ভেঙে পড়ে দস্যুতার, পশুতার প্রথম প্রাসাদ/বিক্ষুব্ধ অভ্যুত্থানে উচ্চারিত শোষণের বিরুদ্ধে জেহাদ।/যে উদ্ধত একদিন দেশে দেশে দিয়েছে গুজব/আবিসিনিয়ার চোখে আজ তার সে দম্ভ নিষ্ফল।' (ঐ)। মুসোলিনির জীবনের ট্র্যাজিডি হল জনসাধারণের হাতে মৃত্যু। একসময় যিনি পৃথিবীটাকে 'নরকের অবাধ উপনিবেশ' হিসেবে দেখেছিলেন, তাঁর মৃত্যুতে জনসাধারণ আজ নিরাপদ: 'অনেকে আজ নিরাপদ,/নিরাপদ ইঁদুর খাবারা আর খাদ্য-হাতে ক্লান্ত পথচারী,/নিরাপদ কারণ আজ সে মৃত।' (চিল)। মুসোলিনির জীবনের সঙ্গে এই চিলেরও মিল: 'ওরই ফেলে-দেওয়া উচ্ছিষ্টের মতো/ও পড়ে রইল ফুটপাতে,/শুকনো, শীতল, বিকৃত দেহে।'(চিল)। সমগ্র কবিতায় এই সমস্তের রূপকের আড়ালে ফ্যাসিজমের পরাজয়ের কথা বলা হয়েছে। বিপ্লবীদের অনুপ্রেরণার দিক থেকে কবিতাটি জয়োল্লাসের তাৎপর্য বহন করে।

মুসোলিনির মৃত্যু যেমন জনসাধারণের ক্রুদ্ধতায়, হিটলার বা গোয়েবলসের মৃত্যু তেমনি আত্মহত্যায়। ৮মে, ১৯৪৫ খ্রীষ্টাব্দে নাৎসীবাহিনী পরাজয় মেনে আত্মসমর্পণের চুক্তিতে সই করেন। 'পঁচিশে বৈশাখের উদ্দেশে' কবিতায় প্রকারান্তরে প্রকাশ পায় তারই জয়ধ্বনিঃ 'ইতিহাস মোড় ফেরে পদতলে বিধ্বস্ত বার্লিন,/পশ্চিম সীমান্তে শান্তি, দীর্ঘ হয় পৃথিবীর আয়ু,/দিকে দিকে জয়ধ্বনি, কাঁপে দিন রক্তাক্ত আলোয়।' (পঁচিশে বৈশাখের উদ্দেশে)। অন্যত্র সুকান্ত বলেছেনঃ 'রাম রাবণের যুদ্ধে বিক্ষত এ ভারতভূমায়/মৃতপ্রায়, যুদ্ধাহত, পীড়নে-দুর্ভিক্ষে মৌনমূক।/পুনর্বার দীপ্ত ক'রে বিশ্বজন-সমৃদ্ধ সভায়/রবীন্দ্রনাথের বাণী তার দাবি ঘোষণা করুক।/এবারে নতুন রূপে দেখা দিক রবীন্দ্র ঠাকুর/বিপ্লবের স্বপ্ন চোখে কণ্ঠে গণ-সংগীতের সুর,/জনতার পাশে পাশে উজ্জ্বল পতাকা নিয়ে হাতে/চলুক নিন্দাকে ঠেলে গ্লানি মুছে আঘাতে আঘাতে।' (ঐ)। ফ্যাসিবাদের পরাজয়ের পর পুনর্বার দীপ্ত করে রবীন্দ্রনাথের উজ্জ্বল আবির্ভাব ঘটুক, যেন প্রার্থনার ভঙ্গিতে সুকান্ত এমনটা কামনা করেছেন। রবীন্দ্রনাথের সুগভীর মানবপ্রেম সুকান্তের কাব্যপ্রেরণার অন্যতম উৎস, বারংবার স্মরণের মধ্য দিয়ে, শ্রদ্ধানিবেদনের মধ্য দিয়ে অগ্রজের প্রতি অনুজের কৃতজ্ঞতা প্রকাশ পেয়েছে। মনে রাখতে হবে, সুকান্তের রবীন্দ্রনাথ আর এক ইউটোপীয় কল্পনার রবীন্দ্রনাথ, এই রবীন্দ্রনাথের কণ্ঠে গণসংগীতের সুর, জনতার মিছিলে সামিল হন এই রবীন্দ্রনাথ, হাতে তাঁর উজ্জ্বল পতাকা, বস্তুত এই রবীন্দ্রনাথ প্রতিবাদী প্রাকৃতজনের বিদ্রোহী নেতা। কমিউনিস্ট সুকান্ত ছাড়া এমন কল্পনা আর কেই-বা করবেন। রবীন্দ্রনাথের কণ্ঠে সুকান্ত সেই বাণীই প্রত্যাশা করেন, যে বাণীতে দিন বদলের পালা ঘোষিত হয়েছে, অগ্নিগর্ভ দিনগুলি পেয়েছে অগ্রগতির স্বীকৃতি, মানুষের অপমানে গর্জন করে উঠেছে যে উদাত্ত মানবিকতা। ফ্যাসিবাদের অবসান হলেও কবির মনে এখন কিছু কিছু জিজ্ঞাসা জেগে উঠেছে। জয়ের বাদ্যরোলে সেইসব প্রশ্নের উত্তর কোথায়?---'তুষারধবল চিত্ত মাঠে,/ট্রেঞ্চে, দুর্গে, জঙ্গলে, পর্বতে/অস্থির বাতাস ঘোরে দুর্বোধ্য ধাঁধায়,/ভাঙা কামানের মুখে/আর স্তূপে উৎকীর্ণ জিজ্ঞাসাঃ/কোথায় সে প্রশ্নের উত্তর?' (পঁচিশে বৈশাখের উদ্দেশে)। কবিতায় যে 'অনাগতকে আহ্বান করেছিলেন, 'দিন বদলের পালা'য় সেই আহ্বান খানিকটা সংশয়াচ্ছন্ন, তাঁর প্রশ্ন তাই অনেকটা আত্মজিজ্ঞাসার মত। ফ্যাসিবাদের অবসানের পর তাঁর রণকৌশল---সাম্রাজ্যবাদী ও ঔপনিবেশবাদী প্রভুত্বের অবসান। কবি বলেছেনঃ 'দিগ্বিজয়ী দুঃশাসন,/বহু দীর্ঘ দীর্ঘতর দিন/তুমি আজ মৃত্যু সিংহাসনে সমাসীন,/হাতে হিসেবের খাতা'---এই পৌরাণিক প্রতীকটি থেকে কবি বুঝিয়ে দিতে চেয়েছেন ব্রিটিশ-শাসকের বিরুদ্ধে এখন তাঁর দ্বিতীয় সংগ্রাম, তিনি আরও স্মরণ করিয়ে দিতে চান, যুদ্ধে জয়ী হলেও এই জয় ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের জয় নয় কিছুতেই, আগামী যুদ্ধের প্রস্তুতি চলেছে ('দেখ ঘরে ঘরে আজ

জেগে ওঠে এক এক ঠাঁই') দেশের অভ্যন্তরে,'জুলুম শাসনের দুর্দমনীয় বিরুদ্ধে এই লড়াইয়ের মধ্য দিয়ে সূচিত হয়েছে দিন বদলের পালা। এ কথা স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন কবি, কারণ, ফ্যাসিবাদ পরাজিত হলেও সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলি এখনও মানব-ইতিহাসের সত্য বোঝে নি, দেশে দেশে মুক্তিস এর যে ঢেউ লেগেছে তাকে অস্বীকার করার অর্থ মানব-সভ্যতার ইতিহাসকেই('ইঙ্গিত দিয়েছে মহাকা অস্বীকার করা। যুদ্ধশেষে সুকান্ত সেই দাবিই তুলেছেন---'লক্ষ লক্ষ প্রাণের দাম/অনেক দিয়েছি, উজা গ্রাম।/সুদ ও আসলে আজকে তাই/যুদ্ধশেষের প্রাপ্য চাই।' (বোধন)। এ কথা ঠিক যে, ফ্যাসিবিরো মুক্তিসংগ্রাম থেকে প্রেরণা গ্রহণ করে দেশে দেশে মুক্তিসাধিনী জাতীয়শক্তি সাম্রাজ্যবাদ ও ঔপনিবেশ বিরুদ্ধে অতঃপর সংগ্রাম শুরু করে।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর জাতীয় স্বাধীনতা যুদ্ধ। ইন্দোনেশিয়া, চীন, ভারতবর্ষ, বর্মা ও ইউরোপের অন্যান্য বহু দেশ এই সংগ্রামে রত। আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে সংগ্রামের প্রশ্নে সুকান্তের যেমন দ্বিধা ছিল না তেমনি জাতীয় মুক্তিসংগ্রামের প্রশ্নেও তাঁর দ্বিধা নেই। '৪২-এর জাতীয় আন্দোলনের প্রশ্নে কমিউনিস পার্টি জনযুদ্ধ ঘোষণা করেছিল, ব্রিটিশবিরোধিতার অর্থ সেদিন ছিল অত্যন্ত পরিষ্কার---ফ্যাসিবাদে পথ তৈরি করা। সুকান্ত দলীয় সিদ্ধান্তে ছিলেন অনড়। যুদ্ধের পরে জাতীয় ক্ষেত্রে সংগ্রামের প্রশ্নে তিনি এখন পূর্ণোদ্যমে সচেতন।

'প্রিয়তমাসু' কবিতাটি ফ্যাসিবাদের অবসান-পরবর্তী ভারতের জাতীয় সংগ্রামের মূল প্রকৃতিকে তুলে ধরেছে। এই সময় কমিউনিস্ট পার্টির ভূমিকা হচ্ছে, কংগ্রেস, মুসলিম লীগ ও অন্যান্য দলকে নিয়ে সংযু মোর্চা গঠনের মাধ্যমে সাম্রাজ্যবাদী ব্রিটিশ শাসনের বিরোধিতা করা। ফ্যাসিবিরোধী যুগে সুকান্ত বলেছিলেন, 'স্বদেশপ্রেমের ব্যাখ্যা পারি/আরণ্যক স্ব বলে, কোনো তা কি?' এই বাক্যের পেছনে ছিল স্বদেশপ্রেমের বিরোধিতা নয়, উগ্র জাতীয়তাবাদী প্রবৃত্তিগুলির বিরোধিতা, তাছাড়া সুকান্ত জানেন, স্বদেশের স্বাধীনতা ব্যতীত, কল্যাণ ব্যতীত, বৃহত্তর কল্যাণের প্রশ্ন একেবারে নিষ্ফল। তাতেই ব্রিটিশ-সাম্রাজ্যবাদের অবসান এই মুহূর্তে জরুরি বলে বিবেচিত। মার্কস 'কমিউনিস্ট মেনিফেস্টো'র এক জায় বলেছেন: 'Though not in substance, yet in form, the struggle of proletariat with the bourgeoisie is at first a national strugg The proletariat of each country must, of course, first of all matters with its own bourgeoisie.'[২২]

সুকান্তসমকালীন যে আর্থ-সামাজিক ও আর্থ-রাজনৈতিক রাষ্ট্রব্যবস্থা, প্রলেতারিয়েত হিসেবে যদি প্রতিবাদ বা বিদ্রোহ করতে হয়, তবে তা কার বিরুদ্ধে চালিত হবে? এ বিষয়ে কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিকের চতুর্থ কংগ্রেসের একটি বয়ান হল এইরূপ: 'উপনিবেশ ও আধা-উপনিবেশিক দেশগুলিতে শ্রমিক আন্দোলনকে সর্বাগ্রে সাধারণ সাম্রাজ্যবাদবিরোধী ফ্রন্টে একটি স্বাধীন কর্মশক্তিরূপে নিজের ভূমিকা নিশ্চিত করে নিতে হবে। শুধুমাত্র এই বিশেষ বর্গের স্বীকৃতি এবং পূর্ণ স্বাধীনতা রক্ষার ভিত্তিতেই বুর্জোয়া গণতন্ত্রের সঙ্গে অস্থায়ী ঐক্য অনুমোদনযোগ্য এবং প্রয়োজনীয়।'[২৩] এদের বক্তব্য থেকে অনুমান করতে অসুবিধে হয় না, ব্রিটিশশাসকের বিরুদ্ধেই প্রধানত এই সংগ্রাম চালিত হবে। অর্থাৎ জাতীয় বুর্জোয়াদের স্বার্থকে বুর্জোয়া গণতন্ত্রের বিকাশের লক্ষ্যে নিয়ে যেতে হবে। প্রলেতারিয়েতশ্রেণীর সামাজিক মুক্তির দাবিকে এই ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত করতে হবে শেষ বিপ্লবের স্বার্থেই। মার্কসের অপর বক্তব্যটি এখানে প্রণিধানযোগ্য: 'All previous historical movements were movements of minorities, or in the interests of minorities. The proletarian movement is the self-conscious, independent movement of the immense majority, in the interests of the immense majority. The proletariat, the lowest stratum of our present society, cannot stir, cannot raise itself up, without the whole superincumbent strata of official society being sprung into the air.'[২৪]

প্রলেতারিয়েতের লক্ষ্য, উপনিবেশবাদের উচ্ছেদ, সেইসঙ্গে বুর্জোয়াশ্রেণীরও উচ্ছেদ। প্রলেতারিয়েতের আধিপত্য প্রতিষ্ঠার এগুলি প্রাথমিক স্তর। মার্কসের এই কথাগুলি মনে রাখলে 'প্রিয়তমাসু' কবিতার আসল বক্তব্য স্পষ্ট হবে।

বিশ্বযুদ্ধ শেষ। পুঁজিবাদের সর্বোচ্চস্তর যে ফ্যাসিবাদের চূড়ান্ত পরিণতির ঐতিহাসিক ভিত্তি—— এই সত্যের যথার্থতা স্বীকৃত ও সমাপ্ত। ফ্যাসিবাদের পরাজয় মানে সাম্রাজ্যবাদের অবসান নয়, অতএব প্রলেতারিয়েত শ্রেণী জাতীয়ক্ষেত্রে আন্দোলনের সম্মুখীন হবে। কোথাও গণতান্ত্রিক পথ দিয়ে, কোথাও জনগণতান্ত্রিক বিপ্লবের কার্যসূচীর মাধ্যমে। সুকান্তের যুদ্ধফেরত সৈনিক স্বদেশের সীমানায় এসে 'থমকে' দাঁড়িয়েছে।

ত্রিউনিসিয়া থেকে ইটালি, ইটালি থেকে ফ্রান্স, ফ্রান্স থেকে ব্রহ্মদেশ, এক যুদ্ধক্ষেত্র থেকে আর এক যুদ্ধক্ষেত্রে রক্তাক্ত পরিক্রমা সেরে সীমান্তসৈনিক এখন গৃহাভিমুখী। এই সেই গৃহ, যেখানে তার বীরত্বকে অভিনন্দিত করবার সাড়ম্বর অনুষ্ঠানের বালাই নেই। কিন্তু একটি 'হৃদয় নেচে উঠবে' তার আবির্ভাবে। সে হৃদয় প্রেমিকার, সে হৃদয় স্বদেশভূমির। সীমান্তসৈনিক এখন স্বদেশের মুক্তি-অভিলাষী। 'যুদ্ধ চাই না আর, যুদ্ধ তো থেমে গেছে' এবং 'পরের জন্যে যুদ্ধ করেছি অনেক, এবার যুদ্ধ তোমার আর আমার জন্যে'---আপাতদৃষ্টিতে পংক্তি দুটির ভেতর বিরোধ লক্ষ করা যায়। মার্কসের আগের উদ্ধৃতি এবং কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিকের চতুর্থ কংগ্রেসের উল্লিখিত উদ্ধৃতিতে এটা অন্তত স্পষ্ট হয়েছে যে, ভারতে ব্রিটিশশাসনের প্রেক্ষিতে প্রলেতারিয়েতের সংগ্রাম সর্বস্তরেই প্রথমত জাতীয় সংগ্রাম, এ পর্যায়ে স্বদেশী বুর্জোয়াদের সঙ্গে বিরোধটা দ্বিতীয় পর্যায়ের। ফ্যাসিবাদকে রুখতে যে সংগ্রামের আয়োজন তা ছিল পরার্থে; পরাস্ত ফ্যাসিবাদের পর দ্বিতীয় প্রকারের সংগ্রাম হল জাতীয় সংগ্রাম। 'তোমার আর আমার জন্যে' যুদ্ধের প্রয়োজনীয়তার কথা বিবেচনা করলে মনে হওয়াই স্বাভাবিক, প্রলেতারিয়েত দুনিয়া গঠনের আহ্বান এতে প্রতিফলিত, জাতীয় সংগ্রামের স্তর এটি নয়। স্বদেশ এখানে ভারতবর্ষ নয়। হতে পারে, অন্য যে কোন দেশ, বুর্জোয়া-শাসন যেখানে প্রচলিত, ঔপনিবেশিক নয়। কয়েকটি সাধারণ লক্ষণ বিশ্লেষণ করা যেতে পারে: 'কতবার হৃদয় জ্বলেছে অনুশোচনার অঙ্গারে/তোমার আর তোমাদের ভাবনায়। /তোমাকে ফেলে এসেছি দারিদ্র্যের মধ্যে/ছুঁড়ে দিয়েছি দুর্ভিক্ষের আগুনে, /ঝড়ে আর বন্যায়, মারী আর মড়কের দুঃসহ আঘাতে/বার বার বিপন্ন হয়েছে তোমাদের অস্তিত্ব।' (প্রিয়তমাসু)। দারিদ্র্য, দুর্ভিক্ষ, ঝড়, বন্যা, মারী আর মড়ক ইত্যাদি শব্দভূষিত হয়েছে যে আগুনে, ঔপনিবেশিক পরিকাঠামোর লক্ষণগুলি সেই আগুনে কোথাও বর্ণিত হয় নি। এমন একটি শব্দও সুকান্ত ব্যবহার করেন নি যাতে ব্রিটিশ-শাসনের বিরুদ্ধে মতামত গঠন করা যায়। তবে এর জন্যে ভারতবর্ষকে পটভূমি হিসেবে বেছে নেওয়া হল কেন? পটভূমি যে ভারতবর্ষ তা বোঝা যায় কয়েকটি লক্ষণের দ্বারা। যেমন: 'জানি, আমার জন্যে কেউ প্রতীক্ষা ক'রে নেই/মালায় আর পতাকায়, প্রদীপে আর মঙ্গলঘটে;'---মালা বা পতাকার ব্যবহার যে কোন দেশে সম্ভব, কিন্তু প্রদীপ আর মঙ্গলঘট একেবারে ভারতীয় প্রথা বা কাল্চার। এসবই শেষ কথা নয়, সুকান্তের কবি-কল্পনায় দরিদ্র ভারতবর্ষ, দুর্ভিক্ষগ্রস্ত ভারতবর্ষ, মারী ও মড়কগ্রস্ত ভারতবর্ষ, ঝড়ে বা বন্যায় তলিয়ে যাওয়া ভারতবর্ষ——যে ভারতবর্ষই থাক না কেন, শাসকশ্রেণীর প্রতিকূলতার বিরুদ্ধে তাঁর এই সংগ্রাম অন্তিম সংগ্রাম, প্রলেতারিয়েতের রাষ্ট্রগঠনের মধ্য দিয়ে এই সংগ্রামের অবসান। আন্তর্জাতিকক্ষেত্রে যে সমস্যা উদ্ভূত হয়েছিল, তার অবসান আগেই ঘটেছে এবং জাতীয়ক্ষেত্রে নতুন করে শুরু হতে যাচ্ছে আর

এক সংগ্রাম। তার মানে এই নয় যে, আন্তর্জাতিকতা থেকে জাতীয়তায় কবি সরে এলেন। 'কমিউনিস্ট মেনিফেস্টো'তেই বলা হয়েছে, সর্বহারাশ্রেণীর কোন দেশ নেই।[২৫] প্রোলেতারিয়েতশ্রেণীকে যেহেতু নিজের স্তরেই রাজনৈতিক আধিপত্য অর্জন করতে হবে, দেশের পরিচালকশ্রেণীতে উঠতে হবে, সেইহেতু তাকে জাতি বা 'নেশন' (বুর্জোয়া অর্থে নয়) হিসেবে গড়ে উঠতে হয়, দেশ নামক সীমারেখার মধ্যে তাদের সংগ্রামকে কেন্দ্রীভূত করতে হয়।

সুকান্তের এ কবিতাটি ফ্যাসিবিরোধী প্রেরণাই শুধু বহন করে না, দেশপ্রেম ও মানবপ্রেমের গভীরতাকেও তা স্পর্শ করে যায়। তাছাড়াও লক্ষ্য করার, মার্কসীয় চিন্তার মৌল সূত্রগুলি কেমন সুচ্ছন্দ কাব্য-প্রক্রিয়ার অঙ্গীভূত হয়ে ওঠে।

মন্বন্তর ও সুকান্ত:

সুকান্তের জীবনে মন্বন্তরের ভূমিকাকে বোধকরি একটু আলাদাভাবে দেখা অসংগত হবে না। কারণ, এই পর্বে সুকান্ত হয়ে উঠেছেন একেবারে পরিণতমনস্ক, দুর্ভিক্ষ তাঁকে যেন রাতারাতি অভিজ্ঞতাসম্পন্ন প্রৌঢ়-প্রবীণ করে তুলেছে।

ফ্যাসিস্টবিরোধী লেখক সংঘের পক্ষ থেকে সুকান্তকে ভার দেওয়া হয়েছিল মন্বন্তরসম্পর্কিত কবিতার সংকলন প্রকাশের। তাঁর সম্পাদিত 'আকালে'র 'কথা-মুখ' অংশে সুকান্ত খুব সংগতভাবে কয়েকটি প্রশ্ন তুলেছেন: 'বাংলাদেশের আধুনিক কবিরা কি চিত্তে ও চিন্তায়, ধ্যানে ও জ্ঞানে, প্রকাশে ও প্রেরণায় জনসাধারণের অভাব-অনাহারের পীড়া-পীড়ন আর মৃত্যু-মন্বন্তরকে প্রবলভাবে উপলব্ধি করেন? তাঁরা কি নিজেকে মনে করেন দুর্গতজনের মুখপাত্র? তাদের অনুক্ত ভাষাকে কি করেন নিজের ভাষায় ভাষান্তরিত? এক কথায় তাঁরা কি জনমনের কবি?'[২৬] এই প্রশ্নগুলি করার যথেষ্ট অধিকার রয়েছে সুকান্তের। মন্বন্তর পর্বে (১৯৪৩ খ্রীষ্টাব্দ) সুকান্ত কমিউনিস্ট স্বেচ্ছাকর্মীরূপে সেবামূলক কাজে লিপ্ত ছিলেন। লঙ্গরখানায় অথবা রেশনের দোকানে চালের লাইনে হাজার হাজার দুর্ভিক্ষপীড়িত নরনারীর ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্যে থেকে সুকান্তের অভিজ্ঞতা ও উপলব্ধি প্রত্যক্ষতার জারকরসে সঞ্জীবিত হয়েছিল। ১৩৫০ বঙ্গাব্দের দুর্ভিক্ষ প্রাকৃতিক কারণের ফল ছিল না, ছিল সাম্রাজ্যবাদ ও পুঁজিবাদের প্রতিভূসৃষ্ট কৌশলী প্রক্রিয়া মাত্র। সুকান্ত একদিকে প্রবল বেদনার সম্মুখীন হয়েছেন, তেমনি অসহ্য ক্রোধে এই পর্বে ফুলে উঠেছেন প্রতিবাদে। উক্ত 'কথা-মুখ' অংশে তিনি বলেছেন, 'সে-ইতিহাস একটা দেশ শ্মশান হয়ে যাওয়ার ইতিহাস, শহরতলী গ্রাম-পাড়ার ইতিহাস, দোরে দোরে কান্না আর পথে পথে মৃত্যুর ইতিহাস, আমাদের অক্ষমতার ইতিহাস।'

এই ইতিহাস সুকান্তের কাব্য-জগতের অনেকখানি জায়গা জুড়ে আছে। 'রবীন্দ্রনাথের প্রতি' কবিতায় তাঁর মনোবেদনা প্রকাশ পায় এইভাবে:

তবুও নিশ্চিত উপবাস——
আমার মনের প্রান্তে নিয়ত ছড়ায় দীর্ঘশ্বাস---
আমি এক দুর্ভিক্ষের কবি,
প্রত্যহ দুঃস্বপ্ন দেখি মৃত্যুর সুস্পষ্ট প্রতিচ্ছবি,
আমার বসন্ত কাটে চালের দোকানে প্রতীক্ষায়,
আমার গভীর রাত্রে সতর্ক সাইরেন ডেকে যায়,
আমার রোমাঞ্চ লাগে অযথা নিষ্ঠুর রক্তপাতে,
আমার বিস্ময় জাগে, নিষ্ঠুর শৃঙ্খল দুইহাতে।

তাই আজ আমারো বিশ্বাস---
"শান্তির ললিত বাণী শোনাইবে ব্যর্থ পরিহাস,"
তাই আজ চেয়ে দেখি ,প্রতিজ্ঞা প্রস্তুত ঘরে ঘরে,
"দানবের সাথে আজ সংগ্রামের তরে।।" [২৭]

('রবীন্দ্রনাথের প্রতি', 'অরুণি'র পাঠ)

কেন যৌবনের দিনগুলি খাদ্যের সারিতে প্রতীক্ষায় থাকে——এর উত্তরে কবি বলেন, 'তবুও ক্ষুধিত দিন ক্রমশ সাম্রাজ্য গড়ে তোলে'। জানেন, এর পেছনে সাম্রাজ্যবাদী ও দেশীয় পুঁজিবাদীদের সংহত ও শক্তিশালী উপস্থিতির কথা। এও জানেন, দানবের বিরুদ্ধে মানবের প্রবল ও রক্তাক্ত সংগ্রাম ব্যতীত 'নিষ্ঠুর শৃঙ্খল' মোচনের আর কোন পন্থা নেই। রবীন্দ্রনাথের মত অত্যন্ত সজ্জন ও মানবতাবাদী কবিকেও সাম্রাজ্যজীবীদের প্রতি প্রবল ঘৃণায় মানুষের সংগ্রাম-তাৎপর্যকে কেবল উপলব্ধি নয়, তার আস্বাদনে ব্রতী হতে হয়েছিল। সুকান্ত সেই মহান কণ্ঠেরই প্রতিধ্বনি করেছেন এ কবিতায়। 'রবীন্দ্রনাথকে নিবেদিত 'পঁচিশে বৈশাখের উদ্দেশে' কবিতাতেও কবি দুর্ভিক্ষক্লিষ্ট বাংলাদেশের কথা ভুলতে পারেন নি। 'গোপনে লাঞ্ছিত হই হানাদারী মৃত্যুর কবলে'——প্রতিনিয়ত লাঞ্ছনার কথা জনগণের প্রতিনিধি কবি কিভাবে বিস্মৃত হবেন? তিনি রবীন্দ্রনাথের দ্বিতীয় আবির্ভাব কামনা করেছেন যাতে তাঁর জ্বালাময়ী বাণী সাম্রাজ্যবাদী শক্তি ও তার দোসরদের প্রবলভাবে নাড়া দেয়: 'বিগত দুর্ভিক্ষে যার উত্তেজিত তিক্ত তীব্র

তারা/মৃত্যুতে ব্যথিত আর লোভের বিরুদ্ধে খরধার,/ধ্বংসের প্রান্তরে বসে আনে দৃঢ় অনাহত আশা/তাঁর জন্ম অনিবার্য, তাঁকে ফিরে পাবই আবার।' (পঁচিশে বৈশাখের উদ্দেশে)। 'মন্বন্তর রেখে গেছে তার পদে পদে স্বাক্ষর'---সেই স্বাক্ষরের অন্যতম দ্রষ্টা সুকান্ত, কিন্তু নিঃস্পৃহ দ্রষ্টা নয়, তাঁর জীবনের ওপরেও এর স্বাক্ষর রক্তক্ষতচিহ্নে আঁকা হয়ে গেছে। 'দূরাগত সুরের কী দুর্দিন' এ কথা সুকান্ত ভেবেছেন, 'সঙ্কিত হন আগামী দিনেরা'; —কিন্তু তিনি সহজে হতাশ হন না, কারণ, এই জনতা মৃত্যুঞ্জয়ী, মৃত্যু-উত্তরণেই মানুষের জীবনের সার্থকতা। আর সেইজন্যেই জনতার মিছিল দেখে তাঁকে সচকিত হয়ে উঠতে হয়; 'সহসা জানলায় দেখি দুর্ভিক্ষের স্রোতে/জনতা মিছিলে আসে সংঘবদ্ধ প্রাণ—/অদ্ভুত রোমাঞ্চ লাগে সমুদ্র পর্বতে,/সে মিছিলে শোনা গেল/জনতার মৃত্যুঞ্জয়ী গান॥' (মৃত্যুঞ্জয়ী গান)। এদেশে জন্মে যে মানুষকে প্রতিনিয়ত পদাঘাতই সহ্য করতে হয়, দারিদ্র্যই যে মানুষের জন্মনিয়তি, রাজ্যের ক্ষুধা নিয়ে সে কখনও পৃথিবীকে কাব্যময় দেখবে না, ঝলসানো রুটির একটি অনন্য সুরে সে বিভোর হতে পারে মাত্র— দুর্ভিক্ষের দুঃস্বপ্নে আচ্ছন্ন সুকান্ত কোটি কোটি জনতার সঙ্গে সম্মিলিতসুরে তাই রোষভরে ফেটে পড়েন—আওয়াজ তোলেন, 'দুর্ভিক্ষকে তাড়াও, ওদেরও তাড়াও—/সন্ধিপত্র মাড়াও, দু'পায়ে মাড়াও।/তিন-পতাকার মিনতিঃশেষে না তাড়াও?/অসহ্য ক্ষুধা কোটি কোটি মুখেরা।' (ডাক)। দুর্ভিক্ষই দূর করলে চলবে না, সেইসঙ্গে 'ওদের'ও দূর করতে হবে, সুকান্ত [illegible] ভাষায় সরাসরি এ বক্তব্য আবেদন করেছেন। 'ঐতিহাসিক' কবিতায় কবির কান্না ও প্রতিবাদ মিলেমিশে একাকার। তাঁর প্রশ্ন: 'কেন মৃত্যুকীর্ণ শবে ভরলো পঞ্চাশ সাল?' মুক্তির বদলে কেন এরা, এইসব মানুষেরা, মৃত্যু কিনতে যায়, সুকান্ত জানেন, এটা ঐক্যের অভাব, কবিতায় বলেন: 'একদা দুর্ভিক্ষ এল/ক্ষুধার ক্ষমাহীন তাড়নায়/পাশাপাশি ঘেঁষাঘেঁষি সবাই দাঁড়ালে একই লাইনে/ইতর-ভদ্র, হিন্দু আর মুসলমান/একই বাতাসে নিলে নিঃশ্বাস।/চাল, চিনি, কয়লা, কেরোসিন?/এ সব দুষ্প্রাপ্য জিনিসের জন্য চাই লাইন।/কিন্তু বুঝলে না মুক্তিও দুর্লভ আর দুর্মূল্য,/তারো জন্যে চাই চল্লিশকোটির দীর্ঘ, অবিচ্ছিন্ন এক লাইন।' (ঐতিহাসিক)। মন্বন্তরের কঠিন আবর্তে পড়ে ঐক্যহীন বিশৃঙ্খলায় 'মুক্তির দোকানের ঝাঁপ' কিভাবে বন্ধ হয়ে যায়, সুকান্ত তাও সকলের সঙ্গে লক্ষ্য করেছেন। বিপ্লবীকণ্ঠে যে ঐতিহাসিক তাৎপর্য তাঁর মর্মমূল উদ্ভাসিত করে রেখেছে, তা হল: 'লাইনে দাঁড়ানো আয়ত্ত করেছে যারা,/সোভিয়েট, পোল্যান্ড, ফ্রান্স/রক্তমূল্যে তারা কিনে নিয়ে গেল তাদের মুক্তি/সর্বপ্রথম এই পৃথিবীর দোকান থেকে।' (ঐ)। এই ঐতিহাসিকতার ভেতর দিয়ে সেই ধ্রুবসত্যই প্রকাশ পায় যা চিরন্তন সংগ্রামের প্রেরণাবিশেষ— 'আমি ইতিহাস, আমার কথাটা একবার ভেবে দেখো,/মনে রেখো, দেরি হয়ে গেছে, অনেক অনেক

দেখি।/যার মনে ক'রো আকাশে আছে এক ধ্রুব নক্ষত্র,/নদীর ধারায় আছে গতির নির্দেশ,/অরণ্যের মর্মরধ্বনিতে আছে আন্দোলনের ভাষা,/আর আছে পৃথিবীর চিরকালের আবর্তন।।' (ঐ)। কার্ল মার্কস একথা বলেছিলেন, জীবন সংগ্রামময়। বিপ্লবোত্তর রুশ কবি মায়াকভস্কি ঘোষণা করেছিলেন-

'All my ringing poetic power

I give to you attacking class.'

সুকান্তও পৃথিবীর চির-আবর্তনের মধ্য থেকে সংগ্রামী প্রেরণাকে কাব্যপ্রেরণায় রূপান্তরিত করতে দ্বিধাবোধ করেন নি। যাঁর 'সোনার দেশে অবশেষে মন্বন্তর নামে', 'দুর্ভিক্ষের জীবন্ত মিছিল' যাঁকে দেখতে হয়, যাঁর চোখে পড়ে 'আহার্যের অন্বেষণে প্রতি ঘরে আমিষ আগ্রহ/রাস্তায় রাস্তায় নামে প্রতিদিন নগ্ন শবারোহ' অথবা——'পথে পথে দলে দলে কঙ্কালের শোভাযাত্রা চলে,/দুর্ভিক্ষ গুঞ্জন তোলে আতঙ্কিত অন্দর মহলে।/দুয়ারে দুয়ারে ব্যগ্র উপবাসী প্রত্যাশীর দল,/নিষ্ফল প্রার্থনা-ক্লান্ত, তীব্র ক্ষুধা অস্থির মন্থর,/রাজপথে মৃতদেহ উগ্র দিবালোকে,/বিস্ময় নিক্ষেপ করে অনভ্যস্ত চোখে।'(বিবৃতি)। এ ছবি সুকান্তের প্রত্যক্ষ দেখা। দেখার পর শুধু মাত্র একজন মানুষ হিসেবে তিনি উদাসীন থাকতে পারেন নি, জেহাদ ঘোষণা করেছেন অপেক্ষাকৃত উঁচু গলায়: 'নিরন্ন আমার দেশে আজ তাই উদ্ধত জেহাদ,/টলোমলো এ দুর্দিন, থরোথরো জীর্ণ বনিয়াদ।/তাইতো রক্তের স্রোতে শুনি পদধ্বনি/বিক্ষুব্ধ টাইফুন-মত্ত চঞ্চল ধমনী:/বিপন্ন পৃথিবীর আজ শুনি শেষ মুহুর্মুহু ডাক/আমাদের দৃপ্ত মুঠি আজ তার উত্তর পাঠাক।/ফিরুক দুয়ার থেকে সন্ধানী মৃত্যুর পরোয়ানা,/ব্যর্থ হোক কুচক্রান্ত, অবিরাম বিপক্ষের হানা।।' (বিবৃতি)। দুর্ভিক্ষ যে সুকান্তকে প্রবলভাবে মোচড় দিয়েছে, 'বোধন' কবিতাটি তার জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত। আকাশ, দিগন্ত, মাঠ, সুজসবুজ মাটি সব কিছুকে আচ্ছন্ন করে মৃত্যু দুর্ভিক্ষের ছদ্মবেশে ঘাঁটি গেড়েছে বাংলাদেশের বুকে। এক-একটি মৃত্যুর বিনিময়ে চোরাকারবারীরা তাদের মজুত ভান্ডার গড়ে তুলছে, শ্রেফ মুনাফার জন্যে যে শ্রেণী লক্ষ লক্ষ মানুষকে মৃত্যুর দিকে ঠেলে দেয়, তাদের প্রতি কবির কোন কথা নেই। যে বিষয়-উপকরণ নিয়ে তাজা সম্পাদকীয় লেখা যায়, সুকান্ত সেই উপকরণের সাহায্যে কবিতা লিখেছেন: 'শোনরে মালিক, শোনরে মজুতদার।/তোদের প্রাসাদে জমা হল কত মৃত মানুষের হাড়——/হিসাব কি দিবি তার ?/... প্রিয়াকে আমার কেড়েছিস তোরা,/ভেঙেছিস ঘরবাড়ি,/সেকথা কি আমি জীবনে মরলে /কখনো ভুলতে পারি ?' অতঃপর কবি শপথ নেন প্রতিশোধের——'আদিম হিংস্র মানবিকতার যদি আমি কেউ হই/স্বজন হারানো শ্মশানে তোদের /চিতা আমি তুলবই।/শোনরে মজুতদার,/ফসল ফলানো মাটিতে রোপণ/ করব তোকে এবার।' (বোধন)। একি কেবলি

চীৎকৃত প্রস্তাব? পরক্ষণে তাঁর কামনা প্রার্থনার গাম্ভীর্যে গগনের সুদূরতায় প্রতিধ্বনিত হয়——এই দুই মেজাজের আশ্চর্য সম্মিলন কবিতাটিতে একটি বৈশিষ্ট্য এনে দিয়েছে: 'হে জীবন, হে যুগ-সন্ধিকালের চেতনা——/আজকে শক্তি দাও, যুগ যুগ বাঞ্ছিত দুর্দমনীয় শক্তি,/প্রাণে আর মনে দাও শীতের শেষের তুষার-গলানো উত্তাপ।/টুকরো টুকরো ক'রে ছেঁড়ো তোমার/অন্যায় আর ভীরুতার কলঙ্কিত কাহিনী।' (বোধন)। সাধারণত ক্রোধের বিস্ফোরণ ঘটে প্রতিশোধস্পৃহায়। সুকান্ত এই কবিতায় ক্রোধে একেবারে আত্মহারা হন নি। মার্কস-এঙ্গেলস-লেনিন তাত্ত্বিক লড়াই চালিয়েছেন হঠকারী তথা উগ্র বামপন্থার বিরুদ্ধে। কমিউনিস্ট বলেই সুকান্ত যে আত্মহারা হন নি, এমন নয়, আসলে তিনি শিল্পী কবি বলেই তা সম্ভব হয় নি। শিল্পের প্রথম বিস্ফোরণ ক্রোধের মুহূর্তেও তিনি যুগ যুগ বাঞ্ছিত দুর্দমনীয় শক্তিপ্রার্থনার ভেতর দিয়ে যে সংযমনৈপুণ্য প্রদর্শন করেছেন তাতেই তাঁর কাব্যপ্রতিভা যাচাই হয়ে গেছে। আর এই গুণেই 'বোধন' তাঁর অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবিতা হয়ে উঠেছে। একদিকে শক্তিপ্রার্থনা, অন্যদিকে প্রাণে আর মনে শীত-শেষের তুষার-গলানো উত্তাপের প্রার্থনায় বস্তুবাদী বিপ্লবীর মনে নৈসর্গিক প্রতিফলনের যে অবকাশ তৈরি হয়েছে তার কাব্যিক স্নিগ্ধতা চমৎকার। লক্ষণীয়, শব্দের দুই সংকেতে কবি জোর দিয়েছেন শোষিতের শ্রেণী-চেতনা ও শ্রেণী-সংহতির ওপর। তিনি জানেন, সংহতির দৃঢ় ভিত্তির ওপর যে কোন সংগ্রামের সাফল্য নির্ভর করে। এও জানেন, 'প্রতিটি শ্রেণী-সংগ্রাম হচ্ছে রাজনৈতিক লড়াই'[২৮], তাতেই কবির দায়িত্ব অনেক বেশি।

মন্বন্তরে সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছেন গ্রামবাংলার কৃষিজীবী সম্প্রদায়। প্রাচীন এইসব কৃষক ও মজুরশ্রেণী অসংগঠিত সম্প্রদায়, ফলে তাদের বিক্ষোভ বা আন্দোলন কোন সুসংহত পরিণতির অন্তরায়। এই দায়িত্ব সেইসময় পালন করেছিল কমিউনিস্ট পার্টি পরিচালিত কৃষকসভাগুলি, কিন্তু তা ছিল বড় সীমাবদ্ধ। বীজধান, লাঙল, গরু বা বলদ প্রভৃতির জন্যে এবং আরও ফসল বাড়ানোর দাবিতে এই কৃষক-সভাগুলি অগ্রাধিকার দিয়ে যে আন্দোলন শুরু করে তা ছিল দুর্ভিক্ষ মোকাবিলা করার অন্যতম চেষ্টামাত্র। জনযুদ্ধে'প্রকাশিত 'ভুখ মিছিল' শিরোনামায় গ্রামবাংলার দুর্ভিক্ষগ্রস্ত জনসাধারণের ওপর আলোকপাত করার চেষ্টা হলে তদানীন্তন বাংলা গভর্ণমেন্টের হোম ডিপার্টমেন্টের(পলিটিক্যাল) এক অধ্যাদেশবলে সম্পাদককে হুঁশিয়ার করে দেওয়া হয়।[২৯] অর্থাৎ নানাভাবে এই আন্দোলনকেও শাসকশ্রেণী দমন করতে সচেষ্ট হন। ১৯৪৩খ্রীষ্টাব্দের ১৪জুলাই থেকে ২০ জুলাই পার্টির তরফ থেকে ফসলবৃদ্ধির জন্যে কৃষকদের কাছে আবেদন জানানো হয়।[৩০] এই কর্মসূচী লক্ষ্য করে গণসংগীতও রচিত ও সুরারোপিত হয় কনক মুখোপাধ্যায় ও বিনয় রায় কর্তৃক:

'এক ফসলা জমিতে আজ দুই ফসল ফলাও

নিরন্ন দেশবাসীর মুখে অন্ন তুলে দাওরে।।'[৩১]

আর সুকান্ত ফসল বাড়ানোর অভিযানকে কাব্যরূপ দিলেন আর-এক ভাষায়, বললেন, 'কাস্তে দাও আমার এ হাতে/সোনালী সমুদ্র সামনে, ঝাঁপ দেব তাতে।' লক্ষ্য করার, সুকান্ত নজরুলের মোকাবিলা করতে চেয়েছেন কাস্তের চৈতন্যপ্রখরতা দিয়ে——'আমার পুরনো কাস্তে পুড়ে গেছে ক্ষুধার আগুনে,/তাই দাও দীপ্ত কাস্তে চৈতন্যপ্রখর——/যে কাস্তে ঝলসাবে নিত্য উগ্র দেশপ্রেমে।/ জানি আমি মৃত্যু আজ ঘুরে যায় তোমাদেরও দ্বারে,/দুর্ভিক্ষ কেনেছে যারা তোমাদের দৈনিক ভাণ্ডারে,/তোমাদের বাঁচানোর প্রতিজ্ঞা আমার,/শুধু আজ কাস্তে দাও আমার এ হাতে।/পর্যস্ত অনেক চাষী, ক্ষিপ্রগতি নিঃশব্দ মরণ——/দুরন্ত মৃত্যুর হাতে দেখা গেল বুভুক্ষুর আত্মসমর্পণ,/তাদের ফসল প'ড়ে, দৃষ্টি তুলে সমুদ্র-সন্ধানী/তাদের ক্ষেতের হাওয়া চুপিচুপি করে কানাকানি——আমাকেই কাস্তে নিতে হবে।'(ফসলের ডাকঃ১৩৫১)। কবিতাটি 'অরণি'তে 'কৃষকের দাবি' এই শিরোনামে প্রকাশিত হয়েছিল।[৩২] মন্বন্তরগ্রস্ত বাংলাদেশের প্রতি সুকান্তের আঘাত তীব্র প্রেম এক নতুন মাত্রা পেয়েছে। যে সুকান্ত উগ্র দেশপ্রেমের বিরোধী, তাঁকেই এখানে উচ্চারণ করতে হয়েছে উগ্রতার কথা। তার কারণ আছে। সাম্রাজ্যবাদী ও দেশীয় বুর্জোয়াশ্রেণীর আধিপত্যের বিরুদ্ধে লড়াইকে তীব্র আকারে উপস্থিত না করলে, বিশেষ করে বর্তমান পর্যায়ে, বাংলাদেশের সামূহিক সর্বনাশকে ঠেকানো মুশকিল। শোষিতশ্রেণীর প্রতি গভীর মমত্বও তাঁকে উগ্র দেশপ্রেমের কথা উচ্চারণ করতে প্ররোচিত করে থাকবে। অবশ্য, উগ্রদেশপ্রেমের পরিণতি একেবারে নেতিবাচকও নয়, সৃজনের নব নব সম্ভাবনায় ভাস্বরঃ 'এ বন্ধ্যা মাটির বুক চিরে/এইবার ফলাব ফসল——/আমার এ বলিষ্ঠ বাহুতে/আজ তার নির্জন বোধন।' (কৃষকের গান)। কবি এই মাটির গর্ভে আসন্ন জন্মের সুস্পষ্ট সংকেত খুঁজে পান। তা হল 'দুর্ভিক্ষের অন্তিম কবর'। আর যেন মৃত্যুর ছদ্মবেশে দুর্ভিক্ষ না হানা দেয়, কবির প্রতিজ্ঞাঃ'এ মাটিতে জন্ম দেবো আমি/অগণিত পল্টন-ফসল'[৩৩]।

'এই নবান্নে' কবিতাটিতেও দুর্ভিক্ষের বেদনা ও শোকের গভীর ছায়াঃ'তবুও এহাতে কাস্তে তুলতে কান্না ঘনায়ঃ/হালকা হাওয়ায় বিগত স্মৃতিকে ভুলে থাকা দায়,/গত হেমন্তে মরে গেছে ভাই, ছেড়ে গেছে বোন,/পথে-প্রান্তরে খামারে মরেছে যত পরিজন,'——প্রিয়জনের অকাল বিয়োগ প্রতি নবান্নে মনে করিয়ে দেয়——'প্রাণের বদলে যারা প্রতিবাদ করেছে উচ্চারণ' তাদের কথা। এই বেদনার স্মৃতি সত্ত্বেওঃ 'দুর্ভিক্ষের আঁচল জড়ানো গায়ে/এ গ্রামের লোক আজো সব কাজ করে,/কৃষক-বধূরা ঢেঁকিকে নাচায় পায়ে/

প্রতি সন্ধ্যায় দীপ জ্বলে ঘরে ঘরে।' (চিরদিনের)। রাতের বেলা অন্ধকার দাওয়ায় বসে ঠাকুমারা নাতনীকে যে গল্প শোনায় তাও দুর্ভিক্ষের স্মৃতিবিজড়িত, শোকবেদনায় ভারাক্রান্তঃ 'কেমন ক'রে সে আকালেতে শহরের,/চলে গেল লোক দিশাহারা দিকে দিকে।' এই দুর্ভিক্ষের মধ্যে জড়িয়েছে বিভিন্ন জাতি ও সম্প্রদায়, কামার, কুমোর, তাঁতী, জেলে প্রভৃতি। কৃষক তো বটেই। কবিতার শেষ চার পংক্তি আশাবাদের ব্যঞ্জনায় অপূর্ব মাদকতা সৃষ্টি করেছেঃ 'হঠাৎ সেদিন জল আনবার পথে/কৃষক-বধূ সে থমকে তাকায় পাশে,/ঘোমটা তুলে সে দেখে নেয় কোনোমতে,/সবুজ ফসলে সুবর্ণ যুগ আসে।' (চিরদিনের)।

দুর্ভিক্ষ যাদের শরীরে সত্তায় ব্যাপ্ত তারা কেমন করে 'সবুজ ফসলে সুবর্ণ যুগ আসে' বলে সুখের নিশ্চিত স্বপ্নে ডুব দেবার অবকাশ পায়? এই স্বপ্নদর্শনের ভিত্তি অলীক ভাববিলাস নয়, বৈজ্ঞানিক মনন-উপলব্ধিতে এর সূত্র মেলে। কডওয়েলের বক্তব্যে এর সমর্থন পাইঃ

'Of the future one can only dream — with greater or less success. Yet to dream is not to associate 'freely' but to have certain phantasies, a certain reshuffling of memory-images of past reality blended and reorganised in a new way, because of certain real causes in present reality. Even dream is determined, and a movement in dream reflects perhaps a real movement into daylight of material phenomena at present unrecognised. That is why it is possible to dream with accuracy of the future — in other words, to predict scientifically. This is the prophetic and world-creating power of dream. It derives its world-creating power, not by virtue of being dream — this is denied by the phantasies of madmen — but because it reflects in the sphere of thought a movement which, with the help of dream, can be fully realised in practice. It draws its creative power, like the poetry of the harvest festival, from its value as a guide and spur to action. It is dream already passed out

of the sphere of dream into that of social revolution. It is the dream, not of an individual, but of a man reflecting in his individual consciousness the creative role of a whole class, whose movement is given in the material conditions of society.' [৩৪]

'শত আকাশের মৃত্যুকে মুছে' দিয়ে মৃত্যুঞ্জয়ী প্রাণসত্তার জাগরণ-সম্ভাবনাকে দূরদর্শী সুকান্ত লক্ষ্য করেছেন একজন কৃষক-বধূর চোখের দৃষ্টিতে, সেই দৃষ্টিই আসে বিপ্লবের দুর্বার অভিব্যক্তি লাভ করে যুগ যুগ লাঞ্ছিত মানবাত্মার নির্ভীক পুরুষকারের দৃপ্ত ভঙ্গিতে---'জ্বলে পুড়ে-মরে ছারখার/তবু মাথা নোয়াবার নয়', (দুর্বার)। আর এই দৃপ্ততা সব দিক উজ্জ্বল হয়ে ওঠে সোনালি নয়, 'রক্তে রঙিন ধানে'র ছটা কামনায়।

সুকান্ত দুর্ভিক্ষপীড়িত বাংলাদেশের জনগণের নিবিড় নৈকট্য থেকে যে জীবনীচিত্র সংগ্রহ করেছেন, তা শুধুমাত্র হতাশার মধ্যে, দুঃখের মধ্যে শেষ হয়ে যায় নি, শ্রেণীদ্বন্দ্বের তীব্রতা তাকে সমাজতান্ত্রিকযুগের গরীয়ান তাৎপর্য দিয়ে জীবনের ইতিবাচক দিকগুলিকে তুলে ধরেছে। দুর্ভিক্ষের মধ্যে সুকান্ত দুটি দিক লক্ষ্য করেছেন। একটি হল এর কারুণ্যের দিক, অন্যটি হল সমস্ত শোক-দুঃখ মুছে দিয়ে আবার নতুন করে বাঁচার লড়াইয়ে শামিল হওয়ার প্রেরণা। প্রগতি সাহিত্য আন্দোলনের অন্যান্য কবিদেরও দুর্ভিক্ষ এবং দুর্ভিক্ষজনিত সমস্যা বিদ্ধ করেছে, দুঃখে কাতর করেছে, কিন্তু সুকান্তসম্পর্কেই বোধকরি এই কথাটা প্রযোজ্য---'আমি এক দুর্ভিক্ষের কবি', কেননা, এমন নিবিড় অন্বেষণ এক বিষ্ণু দে ছাড়া আর কারোর কবিতায় দেখা যায় নি।

<u>সুকান্তের অন্যান্য বিপ্লবাত্মক কবিতাঃ</u>

গণ-আন্দোলন ও গণ-সংগ্রামের সমূহ উপকরণ প্রয়োগ করে যে শিল্প-সাহিত্য গড়ে ওঠে তার মৌলিক বৈশিষ্ট্যই হল বৈপ্লবিকতা ও বিদ্রোহ। সুকান্তের ১৯৪২খ্রীষ্টাব্দের পরবর্তী রচনাগুলি সেই সাক্ষ্য দেয় যাতে বিক্ষুব্ধ পরিস্থিতির গুরুত্বকে অগ্রাধিকার দিয়ে বিদ্রোহের আহ্বানকে সুনিশ্চিত করা হয়েছে। বাংলা কাব্যধারায় গুণগত বৈশিষ্ট্যের দিক থেকে এটি উল্লেখের দাবি রাখে। তাঁর কবিতায় বিপ্লবীমনের উত্তাপকে সহজে অনুভব করা যায়। এমন প্রতীক্ষার পেছনে রয়েছে শ্রেণীবিভক্ত সমাজে শিল্পসাহিত্যকে শ্রেণীসংগ্রামের হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করার মানসিকতা। কডওয়েলের মত সুকান্তও জানেন যে

শিল্প জন্ম নেয় সংগ্রামের ভেতর থেকে, কডওয়েল বলেছেন, সমাজের মধ্যে অলীককল্পনা ও বাস্তবের একটা সংঘাত থাকে যা স্নায়ুরোগীর সংঘাত নয়। এটা একটা সামাজিক সমস্যা আর সমাজের হয়ে শিল্পী তার সমাধানে এগিয়ে আসেন।[৩৪] এই সামাজিক ভূমিকা পালনের বিষয়টি বুর্জোয়া নন্দনতত্ত্ববিদের দৃষ্টি এড়িয়ে যায় অথবা সমালোচনার শরটি সেখানে নিক্ষেপ করেন। সুকান্ত এক্ষেত্রে আপন লক্ষ্যে অটল। তাঁর বিপ্লবাত্মক কবিতাগুলিতে এই পরিচয় বিধৃত আছে।

সুকান্তের প্রথম পৃথিবী ছিল দ্বন্দ্ব-বিক্ষুব্ধ, চেতনার দিক থেকে এই দ্বন্দ্ব তখনও স্পষ্ট নয়, কার্যকারণ-শৃঙ্খলাসম্পর্কে বস্তুগত ধারণা তখনও সুকান্তের স্পষ্ট নয়; পৃথিবীজুড়ে যে তীব্র দহনের জ্বালা, সে সম্পর্কে তাঁর মত স্পষ্ট নয়: 'প্রথম পৃথিবী আজ ভুলে রাত্রিদিন/আকাশের সঞ্চিত দাহনে/চিরদিন দ্বন্দ্ব চলে তোমার আঁটায়,'। (আসন্ন আঁধার)। 'কেবল ধ্বংস, কেবল বিষাদ' যে পৃথিবীতে, তার মূল অনুসন্ধান করতেও কবির ক্লান্তি আসে, তাঁর মনে হয়েছে, এসবই বুঝি নতুন সভ্যতার জন্যে, তাই পুরনো পৃথিবীকে আঁকড়ে ধরতে চেয়েছেন কবি: 'বন্ধু, আমরা হারিয়েছি বুঝি প্রাণধারণের শক্তি,/তাই তো নিঠুর মনে হয় এই অযথা রক্তারক্তি।/এর চেয়ে ভাল মনে হয় আজ পুরনো দিন,/আমাদের ভাল পুরানো, চাই না বৃথা নবীন।' (তরঙ্গভঙ্গ)। সুকান্তের তারুণ্য ক্রমে হতাশা ও অবক্ষয়ের দিকে যাত্রা করে: 'বিক্ষিপ্ত ধ্বংসের পরে ক্ষুব্ধ পৃথিবী।/বিকৃত বিশ্বের বুকে প্রকম্পিত ছায়া/মরণের, মড়কের আস্তানে বিস্তর/তারুণ্যের দুঃখসিক্ত বিদীর্ণ বিলাপ।' (তারুণ্য)। 'সুপ্রভাত' কবিতাটিতে কবির দ্বিতীয় জন্ম ঘটে, চেতনায় ঘটে রূপান্তর। তাঁর উপলব্ধি ঘটে বিষয়গত ব্যাপকতার সূত্রে: 'লাঞ্ছিত সম্মান/ফিরে চায় তীব্র-দৃষ্টি দিয়ে।/দুর্বল তিতিক্ষা আজ দুর্বাসার তেজে/শুধু যাবে উঠেছে বিষিয়ে।' (পূর্বাভাস)। 'রক্তাক্ত পৃথিবীর ডাকঘর' থেকে আসা সভ্যতার ডাকে কবি শুনতে পান জনতার প্রবল কোলাহল, একক সত্তার অবশেষে 'শঙ্কিত মনের অস্পষ্টতা অতঃপর মুছে যায়। কবি অনুভব করেন: 'প্রাণের অস্পষ্ট প্রত্যাশায়/অজ্ঞাত রক্তিম ফুল ফোটে' ।(১৯৪১ সাল)। যে 'অজ্ঞাত রক্তিম ফুল'-এর কথা কবির অগোচরে একটা অবয়ব পাচ্ছিল, সেই ফুল তো বিপ্লবেরই চেতনাবহ্নি। কিন্তু কার বিরুদ্ধে? 'বণিকের চোখে' দেখেন কেমন করে 'দুরন্ত স্রোত' ঝরে পড়ে। দেখেন, ব্যক্তির ব্যর্থতা কিভাবে গোটা সমাজকে ব্যর্থ করে তুলছে। লক্ষ্য করেন: 'নদীতে জেলেরা ব্যর্থ, তাঁতী ঘরে, নিঃশব্দ কামার,/অর্ধেক প্রাসাদ তৈরী, বন্ধ ছাদ-পেটানোর গান,/চাষীর লাঙল ব্যর্থ, মাঠে নেই পরিপূর্ণ ধান।' (অনন্যোপায়)। অসংগঠিত প্রয়াসের ব্যর্থতা সুকান্তকে এক নতুন অভিজ্ঞতা দিয়েছে, তাঁর মনে জন্ম নিয়েছে বিদ্রোহ——'যতবার পড়ে তুমি, ততবার চকিত বন্যায়/উদ্যত মুক্তিকে তাতে পৃথিবীতে অবাধ বন্যায়।/বার বার ব্যর্থ তাই আজ মনে এসেছে বিদ্রোহ,/

নির্বিঘ্নে গড়ার সুর কেটে গেছে, ছিন্নভিন্ন মোহ।' (অনন্যোপায়)। অন্তরে অন্তরে যে বিক্ষোভ জমা হয়, একদিন তা আত্মপ্রকাশ করেঃ 'জানে না তো কেউ পৃথিবী উঠেছে কেঁপে/ধরেছে মিথ্যা সভ্যতার টুঁটি চেপে,/কখনো কেউ কি ভূমিকম্পের আগে/হাতে শাঁখ নেয়, হঠাৎ সবাই জাগে ?/যারা আজ এত মিথ্যার দায়ভাগী,/আজকে তাদের ঘৃণার কামান দাগি।' (বিক্ষোভ)। ঘৃণাও কখনও কখনও মহৎ হয়ে ওঠে আদর্শের কারণে, শ্রেণীশত্রুর প্রতি তীব্র ঘৃণা না জন্মালে সেই শক্তির উচ্ছেদ সম্ভব নয়। মানুষের সভ্যতার ইতিহাস হল শ্রেণীসংগ্রামের ইতিহাস। বুর্জোয়া ব্যবস্থায় নীতিভ্রষ্ট সুকান্ত দেখে নিয়েছেন মুদ্রারই একটি দিক যা সুকান্তকে শ্রেণীশত্রুর প্রতি তীব্র ঘৃণায় প্ররোচিত করেছে। ব্যক্তির মুক্তি-আকাঙ্ক্ষার ভেতর দিয়ে নয়, সমষ্টির মুক্তির লক্ষ্যকে সামনে রেখে তাঁর যাত্রা শুরু হয়েছে। 'মিলিত প্রাণের' বিদ্রোহে সুকান্ত সামিল হয়েছেন। এই বিদ্রোহ মূলত তাদেরই বিরুদ্ধে চালিত হয়েছে, 'জনতার মুখে ফোটে বিদ্যুৎবাণী' কবিতায় বলেছেনঃ 'ওদের কাহিনী বিদেশীর খুনে/গুলি, বন্দুক, বোমার আগুনে/আজো রোমাঞ্চকর'——দেশের সন্ত্রাসবাদী বিপ্লবীরা ব্রিটিশ শাসনের বিরুদ্ধে তাদের লড়াই চালিয়েছিল, সুকান্ত তারই উত্তরাধিকারী, অতএব তাঁর লড়াই ব্রিটিশশক্তির বিরুদ্ধে, অন্যদিকে আছে——'মহাজন ওরা, আমরা ওদের চিনি,/ওরা আমাদের রক্ত দিয়েছে,/বদলে দুহাতে শিকল নিয়েছে/গোপনে করেছে ঋণী'---দেশীয় বুর্জোয়া ও মহাজনদের বিরুদ্ধেও সুকান্তের লড়াই। শত্রুর বিরুদ্ধে সংগ্রামেই সুকান্তের লড়াই থেমে যায় না, কারণ একজন আদর্শবাদীর কাছে, বিশেষত কমিউনিস্টদের কাছে ভাঙনটাই বড় কথা নয়, গড়ে তোলার প্রশ্নও সমান মর্যাদা দাবি করে তার কাছে, তাই তাঁকে বলতে হয়ঃ 'বন্ধু, আজকে দোদুল্যমান পৃথ্বী,/আমরা গঠন করব নতুন ভিত্তি,/তারই সূচনাকে করেছি সাধন,/হে সাথী, আজকে রক্তিম অভিবাদন।'[৩৬] (অভিবাদন)। এই নতুন ভিত্তিটা গড়নের মধ্য দিয়ে সুকান্ত নির্মাণ করে নিতে চান এমন এক জগৎ, যেখানে জেলেরা আর ব্যর্থ হবে না, তাঁতীরা ঘরে ঘরে হতাশ হবে না, চাষীদের লাঙলের মুখে প্রসারিত মাঠে মাঠে ফুটে উঠবে পরিপূর্ণ ধান, কারখানায় শব্দ উঠবে নিত্যনিয়ত। এই সুর সমাজতন্ত্রকামী সুকান্তের বড় প্রিয় সুর, এই সুরই তাঁর নতুন সমাজের ভিত্তিমূল।

আর এই জন্যেই সুকান্তের কাব্যসাধনা।

দেশ, কাল আর মানুষের ত্রয়ী উপকরণে যে জগৎ সুকান্ত গড়তে চান তা রবীন্দ্রকথিত কবিদের অলৌকিক জগৎ নয়, প্লেটোকথিত অনুকরণের অনুকরণময় জগতও নয়, কিংবা অ্যারিস্টটলের সত্যেও সে জগতের কোন মিল নেই, এ জগৎ একজন রাজনীতিবিদ কবি-শিল্পীর বাস্তব জগৎ। বাস্তব এবং বিজ্ঞানসম্মত, কিন্তু আদর্শবাদেরও সেখানে স্থান আছে। ১৯১৭খ্রীষ্টাব্দের রুশ সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব বাস্তবভিত্তির কাছে

খুবই বাস্তব, অথচ তাঁর চোখে এটি প্রতিভাসিত হচ্ছে 'স্বাধীনতা ও ন্যায়ের', 'আনন্দ ও প্রেরণা'র প্রতীক হিসেবে, আলেকজান্দার উষাকোভের ভাষায়ঃ 'For him the Revolution is the symbol of liberty and justice, a source of joy and inspiration.'[৩৭] অর্থাৎ রাষ্ট্রনৈতিক মুক্তি ও শিল্পীর মুক্তির সাযুজ্য ও সমন্বয়ের ভেতর থেকে গড়ে ওঠা জগৎ তাঁদের কাছে লাভ করেছে একটি আলাদা মূল্য, আলাদা মাত্রা। মায়াকভস্কির জগতেও মানুষের মৌলিক চাহিদার সম্পূরণ সম্ভব---

All other questions
are more or less clear,
Concerning bread
and concerning peace,
But this
most cardinal question
of spring being here
shout be settled
at once
by all means ![৩৮]

(The Problem of Spring)

সুকান্তের মতো মায়াকভস্কির এই মিল কেন? প্রেমানন্দ বলছেন, 'সমাজের বিশেষ অংশ ও মুক্তিধর্মী শিল্পে উৎসাহী জনসাধারণের মধ্যে যেখানেই এক সমানুভূতিশীল বোঝাবুঝি, সেখানেই উপযোগবাদী শিল্পের জন্ম ও প্রসারলাভ।'[৩৯] আর এই কারণেই সুকান্তের মতো প্রগতিশীল বিপ্লবী কবিদের মিল অনিবার্য, তাঁদের জগৎ হয়ে ওঠে বহুজনের কাম্য জগৎ।

সুকান্তের কবিতার আত্মভূমিই হচ্ছে গণ-আন্দোলন। এই আন্দোলনকে কেন্দ্র করেই তাঁর কবিতাগুলি শিল্পের লক্ষ্য সাধন করতে চেয়েছে, তাঁর শিল্প শুধু জীবনকেই প্রতিফলিত করে নি, জীবনের একটা ব্যাখ্যাও দিয়েছে। 'রানার', 'বোধন', 'কলম', 'সিগারেট' 'দেশলাই কাঠি', 'সিঁড়ি', 'যে পশুজীবন' প্রভৃতি কবিতায় শ্রেণী-চেতনার নিরিখে মানবজীবনের যে ব্যাখ্যা দিয়েছেন তা সুকান্তের গভীরতম উপলব্ধির পরিচয় বহন করে। ১৯৪৩ খ্রীষ্টাব্দের ঘটনা আগেই আমরা আলাদাভাবে আলোচনা করেছি। ১৯৪৫ খ্রীষ্টাব্দে

নভেম্বর মাসে আজাদ হিন্দ ফৌজের বন্দীদের মুক্তির দাবিতে সারা কলকাতাব্যাপী বিপ্লবী সংগ্রামের সূচনা হলে এতে শামিল হন সুকান্ত। ২১ নভেম্বরে ধর্মতলার মিছিলে শহীদ রামেশ্বর ও আবদুস সালামের পাশে এই সুকান্তকেই দেখি। ১৯৪৬-এর ফেব্রুয়ারীতে রশীদ আলি দিবসে গুলি চালনা ও হত্যার প্রতিবাদে প্রকাশ্য রাজপথে পুলিশ ও সেনাবাহিনীর সঙ্গে খণ্ড যুদ্ধে মেতে ওঠে সমগ্র নগরী——সুকান্ত সেখানেও উপস্থিত। ১৯৪৬ খ্রীষ্টাব্দের জুন-জুলাইতে আকাশবাণীর কলকাতা কেন্দ্রে শিল্পী ও কর্মীদের ধর্মঘট এবং ডাক-তার ধর্মঘট, নৌ ও বিমানবাহিনীর ধর্মঘট এ পর্বের এক উল্লেখযোগ্য ঘটনা। সুকান্ত তারও সাক্ষী। লেখেন: 'বিদ্রোহ আজ বিদ্রোহ চারিদিকে, / আমি যাই তারি দিন-পঞ্জিকা লিখে, / এত বিদ্রোহ কখনো দেখে নি কেউ, / দিকে দিকে ওঠে অবাধ্যতার ঢেউ,' (অনুভব: ১৯৪৬)। বন্দী মুক্তি আন্দোলনের ফলে মুক্ত বীরদের প্রতি সুকান্ত তাঁর অভিনন্দন জানাতে ভোলেন না। সেদিনের কথা মনে করে লেখেন, 'মনে পড়ে চল্লিশে ? / সেদিন দুপুরে সারা কলকাতা হারিয়ে ফেলেছে দিশে, / হাজার হাজার জনসাধারণ ধেয়ে চলে সম্মুখে / পশ্চিম-গেটে হাজির সকলে, শেষ প্রতিজ্ঞা বুকে / গর্জে উঠল হাজার হাজার ভাই: / রক্তের বিনিময়ে হয় হোক, আমরা ওদের চাই।' (মুক্ত বীরদের প্রতি)। মুক্ত বন্দীদের মুক্তিলাভে সুকান্ত শপথ নেন: 'যতদিন আছে আমাদের প্রাণ, আমাদের সম্মান, / আমরা রুখব গৃহযুদ্ধের কালো রক্তের বান।' (ঐ)। মুক্তির শেষ দরজা ভাঙতে চান তিনি। একুশে নভেম্বরের ঘটনাকে স্মরণে রেখে 'একুশে নভেম্বর: ১৯৪৬' কবিতা লেখেন। 'রানার' কবিতায় ডাক-তার ধর্মঘটের ছায়ায় দেখলে রানারের বঞ্চিত জীবনের মর্মবেদনা আরও প্রকট হয়ে ওঠে। ঐতিহাসিক মে' দিবসকে মনে রেখে বাঁচার নতুন শপথ নেন——'চলো, শুকনো হাড়ের বদলে / সন্ধান করি তাজা রক্তের, / তৈরী হোক লাল আগুনে ঝলসানো আমাদের খাদ্য।' (১লা মে-র কবিতা'৪৬)। বিপ্লবী পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়েছিল এই সময়, অথচ তার সদ্ব্যবহার হয় নি। সুকান্ত সময়টিকে ঠিকই ধরেছিলেন---'দিক থেকে দিকে বিদ্রোহ ছোটে, / বসে থাকবার বেলা নেই মোটে, / রক্তে রক্তে লাল হয়ে ওঠে / পূর্বকোণ।' (বিদ্রোহের গান)। 'সেপ্টেম্বর '৪৬' কবিতায় বোঝা যায় কী ভয়ানকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হল কলকাতার জনজীবন, ভ্রাতৃঘাতী দাঙ্গায় (আগস্ট ও সেপ্টেম্বর মাস জুড়ে এই দাঙ্গা চলেছিল) গণ-আন্দোলন তার আসল লক্ষ্যটি হারিয়ে ফেলল। সুকান্ত তাঁর কবিতায় সেই স্মৃতিটুকুও মুছে ফেলতে চেয়েছেন: 'আগস্ট এবং সেপ্টেম্বর মাস / এবারের মতো মুছে যাক ইতিহাসে।' (ঐ)। বিপ্লবী শহর এখন জনজীবন ও জনমিছিলকে ভয় পায়, শহর জুড়ে এখন শুধুই আতঙ্ক: 'সাহসী পথিকহীন / এ শহর আতঙ্ক ছড়ায়। / সারি সারি বাড়ি সব / মনে হয় কবরের মতো, / মৃত মানুষের স্তূপ বুকে নিয়ে পড়ে আছে / চুপ ক'রে সভয়ে

নির্জনে।/...... হয়তো অনেক রাতে/পথ চারী কুকুরের দল/মানুষের দেখাদেখি/স্বজাতিকে দেখে/আস্ফালন, আক্রমণ করে।' (ঐ)। সাম্প্রদায়িক বিভেদবুদ্ধি মানুষকে যে নীচ-প্রবৃত্তির দাস করে তুলেছে, তা সুকান্ত কেন, কোন মানবিকবোধসম্পন্ন মানুষই মেনে নেবেন না, কুকুর শব্দের প্রতিতুলনা থেকে বোঝা যায়, সুকান্ত কী ঘৃণায় শব্দটি ব্যবহার করেছেন। অন্যত্র বলেছেন: 'মারামারি করেছ পরস্পর,/তোমাদের ঐক্যহীন বিশৃঙ্খলা দেখে/বন্ধ হয়ে গেছে মুক্তির দোকানের ঝাঁপ।' (ঐতিহাসিক)। সুকান্তের একান্ত কাম্য তো সকল সম্প্রদায়ের, সকল বর্ণের সর্বহারাদের মুক্তি, কিন্তু যে সংকীর্ণ স্বার্থপরতা মানুষকে অন্ধ আবেগের কাছে আত্মসমর্পণ করতে শেখায়, তাদের মুক্তি কীভাবে সম্ভব? আশ্চর্য, তিনি মানুষের সার্বিক অধঃপতন দেখেও হতাশ হন নি, বলেছেন, 'এখনো তোমাদের স্থান হতে পারে——/এ কথা ঘোষণা ক'রে দাও তোমাদের দেশময় প্রতিবেশীর কাছে।' (ঐ)। তখন খুব স্বাভাবিকভাবেই আমাদের মনে পড়ে যায় সভ্যতার সংকট দেখেও রবীন্দ্রনাথের সেই শেষ উচ্চারণ, মানুষের প্রতি বিশ্বাস হারানো পাপ, কথাটি। তাই মনে হয়, সুকান্ত মুক্তির নেশায় অচঞ্চল। কারণ, তিনি জানেন, 'মুক্তিও দুর্লভ আর দুর্মূল্য'। তাঁর রাজনীতিসচেতনতা একটি লক্ষ্যে স্থির থাকার মূলপ্রেরণা, বলেছেন: 'একটি কথায় ব্যক্ত চেতনাকাশে বীজ,/মুক্তি সেখানে তাইতো পদধ্বনিতে দিন।/সামনে মৃত্যুকবলিত দ্বার,/থাক অরণ্য, থাক না পাহাড়,/ব্যর্থ নোঙর, নদী হব পার, খুঁটি শিথিল।/আমরা এসেছি মিছিলে, গর্জে ওঠে মিছিল।' (আমরা এসেছি)। সুকান্ত আত্মসচেতন বিপ্লবী——'ক্ষুদ্র আমি তুচ্ছ নই——জানি আমি ভাবী বনস্পতি', এই সচেতনতা তাঁকে 'বৃহতের দলে' মিশে যেতে প্রেরণা জোগায়, সর্বহারাদের অঙ্গীকার ঘোষণা তাঁকেই মানায়——'এ বিশ্বকে এ শিশুর বাসযোগ্য ক'রে যাব আমি——/নবজাতকের কাছে এ আমার দৃঢ় অঙ্গীকার।' (ছাড়পত্র)। এভাবেই সুকান্ত সমকালের গণ-আন্দোলনগুলিকে তাঁর কাব্যে চিহ্নিত করেন, বিপ্লবী মহিমা দেন, যেমনতি জনগণের সমস্যাগুলিকে মানুষের বিবেকের সামনে হাজির করেন, সর্বহারার মুক্তির স্বপ্নকে সফল করার প্রয়াসে ব্রতী হন---তাঁর এবংবিধ সর্বাত্মক প্রয়াসের তুলনা কোথায়?

শিল্পী হিসেবে যতটা না পরিচিতি পেয়েছেন সুকান্ত, তার চেয়ে বেশি অনুরক্তি প্রকাশ করেছেন কমিউনিস্ট কর্মীর পরিচয়ে, আর এই দায়বদ্ধতা থেকেই বৃহতের দলে মিশে 'জনতার কবি' হওয়ার আকাঙ্খা উদ্দীপিত হয়েছে।

<u>সুকান্তের শিল্প-প্রকরণ:</u>

র‍্যালফ ফক্স বলেছেন, একজন বিপ্লবী লেখক একজন দলীয় লেখক। তাঁর দৃষ্টিভঙ্গি মুক্তিকামী সংগ্রামী

শ্রেণীর দৃষ্টিভঙ্গির সমান। কাজেই তাঁর কাছ থেকে বিশুদ্ধতম কল্পনার ব্যাপ্তি, চূড়ান্ত সৃষ্টিশীল উদ্যম আশা করা যায়। তিনি দলীয় উদ্দেশ্য সাধন করেন এক নতুন সাহিত্য সৃষ্টি করে। সেই সাহিত্য ক্ষয়িষ্ণু বুর্জোয়াজির স্বৈরাচারী ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদ থেকে পৃথক। তাঁর নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গি তাঁর থেকে পৃথিবীর যে চিত্রণ আশা করে, তিনি তার বিকল্প হিসেবে তাৎক্ষণিক কোন শ্লোগান সর্বস্বতায় নিমজ্জিত হন না।'[৪০] ফকসের এই বক্তব্য ঔপন্যাসিকসম্পর্কে, তবুও একজন শিল্পীর শিল্পসম্পর্কে আরোপিত শর্তগুলির চরিত্র ব্যাখ্যার অপেক্ষা রাখে। শর্ত হল: ১) বিপ্লবী শিল্পী স্বভাবতই দলীয় লেখক, ২) তাঁর থাকবে মুক্তিকামী সংগ্রামী শ্রেণীর দৃষ্টিভঙ্গি, ৩) তাঁর সৃষ্টি শিল্পে বিশুদ্ধতম কল্পনার অবকাশ ও সৃষ্টিশীল উদ্যম থাকবে, ৪) দলীয় উদ্দেশ্যসাধনই তাঁর ব্রত হবে, এই ব্রত উদ্‌যাপিত হয় নতুন সাহিত্য নির্মাণের দ্বারা, বুর্জোয়া-ধারণার বিরোধিতার দ্বারা, ৫) সামাজিক-দায়বদ্ধতার কারণে বিকল্প হিসেবে তাৎক্ষণিকতাকে আশ্রয় করে শ্লোগানসর্বস্ব হয়ে উঠবেন না শিল্পী। মনে রাখা দরকার, প্রগতি সাহিত্য আন্দোলনের মুখ্য আলোচ্য বিষয়ই হয়ে উঠেছিল মার্কসীয় শিল্পরীতির নিরিখ কী হওয়া উচিত, এই আলোচনায় ঠাঁই পেয়েছিল স্বাভাবিকভাবেই তার বিষয়বস্তু (কনটেন্ট) ও আঙ্গিক (ফর্ম) প্রসঙ্গ। কিন্তু এই সাহিত্য আন্দোলনের অধিকাংশ লেখকই বিষয়বস্তুকে যতটা গুরুত্ব দিতে চেয়েছেন, আঙ্গিকরীতিকে ততটাই লঘু করে দেখেছেন। এ কথা বলা অবান্তর হবে না যে, সুকান্ত তাঁর ক্ষেত্রে বিষয়বস্তুসম্পর্কে যথেষ্ট সচেতন, বাংলা সাহিত্যে তিনি বিষয়বস্তুর বৈচিত্র্য ও অভিনবত্বের কারণে সাধুবাদ নিঃসন্দেহে পেতে পারেন। প্রেম, মানবিকপ্রার্থনা, সাম্রাজ্যবাদবিরোধিতা, ফ্যাসিবাদবিরোধিতা, মন্বন্তরে বিক্ষোভ, শ্রমিক-কৃষক-মজুরের তথা সাধারণ মানুষের (যেমন, 'রানার') দুঃখ-বেদনার কথা, সামান্য ও তুচ্ছ বিষয়োপকরণকে অবলম্বন করে (যেমন, সিগারেট', দেশলাই কাঠি', চিল', 'একটি মোরগের কাহিনী' ইত্যাদি) রূপক ও প্রতীকের দ্বারা নতুন অর্থ-তাৎপর্য দান করা---এসবই তাঁর কবিতাকে ব্যাপ্তি ও বৈচিত্র্যে ভরিয়ে তুলেছে। বিষয়বস্তুর সঙ্গে কবি-কল্পনার এই সম্মিলন প্রতিফলিত হয়েছে অতঃপর তাঁর প্রকরণে বা আঙ্গিকে। কখনও তা সহজ স্বতঃস্ফূর্ততায়, কখনও সচেতন করণকৌশলের অঙ্গ হিসেবে।

যেখানে তিনি শুধু বিষয়সচেতন, সেখানে কখনও কখনও ব্যর্থতা এসেছে, এই ব্যর্থতা অনেক সময় প্রকরণগত। ল্যাংস্টন হিউজের 'মজুরদের ঝড়' ('লেবার স্টর্ম') কবিতাটি সুকান্ত যে পারিপার্শ্বিক কারণে অনুবাদ করেন, সেই কারণটি বা বিষয়বস্তুটুকু বাদ দিলে কবিতাটির শিল্পগুণ বা কাব্যগুণ প্রায় কিছুই থাকে না। যেমন: 'কারাগারে যাওয়া মূর্খের দল, / বিচ্ছিন্ন, তিক্ত, দুর্বোধ / হতাশ আর

মৃত্যুর দূত——/বেরিয়ে এসো!' (বুদ্ধদেবের প্রতি)।কাব্যে শ্রেণীসচেতনতা কৃত্রিম কারণে পাঠকদের মাত্রাতিরেক ব্যবহার কাব্যের ন্যূনতম শর্তকে উল্লঙ্ঘন করে যায়।কেবলমাত্র প্রকরণগত কৌশলের কারণে ন্যাংক্টন কিংবা সুকান্তের মহান বোধও কাব্যধর্মের বিরোধী হয়ে ওঠে।সুকান্ত এরকম একাধিক কবিতা লিখেছেন যাতে শ্রেণীবোধ ও ক্ষোভ প্রকাশ পেয়েছে অথচ কাব্য হয়ে ওঠার সাধারণ দাবিকে তিনি মোটেও আমল দেন নি।'জনযুদ্ধের গান' কবিতাটি——'জনগণ হও আজ উন্মুখ/শুরু করো প্রতিরোধ,জনযুদ্ধ,/জাপানী ফ্যাসিস্টদের ঘোর দুর্দিন/ভিতরে ভারত আর বীর মহাচীন।/সাম্যবাদীরা আজ মহা ক্রুদ্ধ/শুরু করো প্রতিরোধ,জনযুদ্ধ।' (জনযুদ্ধের গান)।কাব্যপাঠকের মননক্রিয়ায় এর আবেদন বিশুদ্ধ ঐতিহাসিকতায়,দলিলগত,অথচ প্রকরণকৌশলের দ্বারা,অথবা সচেতন নির্মাণের দ্বারা এবংবিধ সৃষ্টিই অসাধারণ শিল্পকর্ম হয়ে উঠতে পারত,যেমন করে 'সে মহাজীবন' কবিতাটি হয়ে উঠেছে।'জবাব' কবিতাটি প্রচারধর্মের বা স্লোগানের প্রেক্ষিত অবলম্বন করেও চমৎকার ছন্দের কৌশলে তার বক্তব্যকে তুলে ধরেছে, 'শত্রুদল লোপাদে আর,হানো আঘাত/এসেছে দিন,পড়েছে আজ রক্তপাত/আনে কি ক্ষোভ,দুর্বোধ দুর্দিনে?/উজ্জ্বল শানিত হোক সংগীনে।' (জবাব)।

সুকান্ত খুবই অল্পসংখ্যক গদ্যকবিতা লিখেছেন,বেশির ভাগই মিলযুক্ত,ছন্দোবদ্ধ।কয়েকটি ছড়াও বিশেষ উল্লেখযোগ্য।গদ্য কবিতায় যে বিপুল সম্ভাবনা আছে,সুকান্ত সে সম্পর্কে ওয়াকিবহাল ছিলেন।গদ্যছন্দ সম্পর্কে তাঁর বক্তব্য প্রণিধানযোগ্যঃ'গদ্য ছন্দের যে একটা বিশিষ্ট সুর আছে,সেটাও যে পদ্যের মতোই পড়া যায়,তা অনেকেই জানেন না।কেউ কেউ গল্প পড়ার মতোই পড়েন।'[৪১] 'চিল', 'প্রার্থী',কাশ্মীর','প্রিয়তমাসু', 'ছাড়পত্র' ইত্যাদি কবিতায় সুকান্তের গদ্যছন্দ-পরীক্ষাকে সফল বলা যায়।এই কবিতাগুলির আবৃত্তি-উপযোগিতাও অনস্বীকার্য।ছন্দের ক্ষেত্রে তিন ছন্দেরই নিপুণ ব্যবহার লক্ষণীয়।সুকান্তের ঝোঁক প্রকাশ পেয়েছে বিশেষ করে মাত্রাবৃত্তে,ছয় মাত্রার পর্বে তাঁর সবিশেষ অনুরক্তি।আর এই ছন্দে নিসর্গের গীতল রূপটি সুকান্তের হাতে উন্মোচিত হয় এইভাবেঃ'হিমালয় থেকে সুন্দরবন হঠাৎ বাংলাদেশ/কেঁপে কেঁপে ওঠে পদ্মার উচ্ছ্বাসে,/সে কোলাহলের রুদ্ধস্বরের আমি পাই উদ্দেশ/জলে ও মাটিতে ভাঙনের বেগ আসে।'(দুর্মর)।অন্যত্রঃ 'এর দুঃখের কথা জানবে না কেউ শহরে ও গ্রামে,/এর কথা ঢাকা পড়ে থাকবেই কালো রাত্রির খামে।/দরদে তারার চোখ কাঁপে মিটিমিটি,——/একে যে ভোরের আকাশ পাঠাবে সহানুভূতির চিঠি——'।(রানার)।মাত্রাবৃত্তে সুকান্তের নিরীক্ষাপ্রবণতা বেশি করে উচ্ছ্বসিত হয়েছে,'রৌদ্রের গান'-এঃ 'ভারতী! তোমার লাবণ্য দেহ ঢাকে/রৌদ্র তোমায় পরায় সোনার হার,/সূর্য তোমার শুকায় সবুজ চুল/প্রেয়সী,তোমার কত না অহংকার।' (রৌদ্রের গান)।

অন্তরঙ্গেও সুকান্তের স্বচ্ছন্দ বিচরণ লক্ষ করবার মত। যেমনঃ 'আমার নেইকো সুখ, দীপান্বিতা লাগে নিরুৎসব,/রক্তের কুয়াশা চোখে, স্বপ্নে দেখি শব আর শব।/এখানে সুপ্তেই আমি কানে শুনি আর্তনাদ খালি,/মুমূর্ষু কলকাতা কাঁদে, কাঁদে ঢাকা, কাঁদে নোয়াখালী,'। (দেওয়ালী)।

সুকান্ত শব্দসচেতন কবি, তাঁর শব্দব্যবহারের দিকে তাকালে এই প্রত্যয় দৃঢ় হয়। শব্দগুলি যদিও খুব পরিচিত, তবুও তার বৈশিষ্ট্য হল এক ভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গি প্রকাশ করা, সুকান্ত এই ক্ষমতাকে কাজে লাগিয়ে তাঁর বিপ্লবী পরিমণ্ডল তৈরি করেছেন অনায়াসে। কয়েকটি উদাহরণঃ ১)ক্লিষ্ট দিনেরা কাঁদে অনর্থক প্রসব ব্যথায়, ২)দুরন্ত মৃত্যুর হাতে দেখা গেল বুভুক্ষুর আত্মসমর্পণ, ৩)দুঃসংবাদকে মনে হয় না কি/কালো অক্ষরের পরিচ্ছদে শোকযাত্রা ? , ৪)অভুক্ত কৃষক আজ সূচীমুখ লাঙলের মুখে/নির্ভয়ে রচনা করে জঙ্গীকাব্য এ মাটির বুকে, ৫)রক্তে আনো লাল,/রাত্রির গভীর বৃন্ত থেকে ছিঁড়ে আনো ফুটন্ত সকাল, ৬)আমার দৃষ্টিতে লাল প্রতিবিম্ব মুক্তির পতাকা, ৭)কবিতা তোমায় দিলাম আজকে ছুটি,/ক্ষুধার রাজ্যে পৃথিবী-গদ্যময়ঃ/পূর্ণিমা-চাঁদ যেন ঝলসানো রুটি, ৮)রাত্রি এখানে স্বাগত সন্ধ্যা পাঁয়ে/কিষাণকে ঘরে পাঠায় যে আল-পথ,/বুড়ো বটতলা পরস্পরকে ডাকে/সন্ধ্যা সেখানে জড়ো করে জনমত, ৯)নিভৃত কল্পনাগুলি বন্ধ্যা তবু/বারবার প্রসব করে অব্যক্ত যন্ত্রণা, ১০)জনসিংহের ক্ষুব্ধ নখর/হয়েছে তীক্ষ্ণ, হয়েছে প্রখর/ওঠে তার গর্জন---, ইত্যাদি ইত্যাদি। সুকান্তের কবিকল্পনার যে বিচিত্র বিস্তার লক্ষ করি, তাকে অস্বীকার করা কোনমতেই সম্ভব নয়। তাঁর আলঙ্কারিক বাক্‌নির্মিতি বাংলাকাব্যের ঐতিহ্য অনুসারী হলেও অনেক ক্ষেত্রে তা ব্যতিক্রমধর্মীও বটে। শ্রমিক-কিষাণ-মজুরের দৈনিক জীবন-যাপনের দুর্লভ চিত্রগুলিকে কাব্যে ঠাঁই দেবার দুঃসাহস ক'জন কবি দেখিয়েছেন ? সুকান্ত শিক্ষিত সম্প্রদায়ের কবি হতে চান নি, হয়ত সেইসব কারণেই কেবলমাত্র আলঙ্কারিক প্রয়োগের ওপর নির্ভর না করে নির্ভার সরলতাকে তিনি তাঁর কাব্যের আভরণ করেছেন। এর জন্যে তাঁকে যে কাব্যভাষা গ্রহণ করতে হয়েছে তা ভঙ্গির দিক থেকে, বিন্যাসের দিক থেকে আপাতসরল। এই সরলতার পাশাপাশি মাঝে মাঝে জটিলতার সংমিশ্রণও যে ঘটেছে তা অনেক সমালোচকের দৃষ্টি এড়িয়ে গেছে বলে মনে হয়ঃ দৃষ্টান্তগুলি বিশ্লেষণ করা যেতে পারেঃ 'আমার দেশেতে আজ ঘরে লোক অনাহারে,/এসেছি তাদের তরে ধনবানের দ্বারে—/রাতে রাতে তারা আজ পরের দুয়ার থেকে/মৃত্যুদলিত পথে পথকে ফেলেছে ঢেকে।/চাষী ভুলে গেছে চাষ, মা তার ভুলেছে স্নেহ,/কুটিরে জমে গলিত মৃতের দেহ,' (অভিযান)। অথবাঃ 'চাষী মজুর দীন দরিদ্র সবাই মোদের ভাই,/একসুরে বলব মোরা স্বাধীনতা চাই॥/থাকবে নাকো মতভেদ আর হিংসা সম্প্রদায়/ছিন্ন হবে ভেদের গ্রন্থি কঠিন প্রতিজ্ঞায়।' (ভবিষ্যতে)। বলা বাহুল্য, ভঙ্গিসর্বস্বতা এগুলিতে

আত্মস্থ করে নি। কিন্তু কিছু কিছু পংক্তি উদ্ধার করা যায়, যা অত্যন্ত সহজ শব্দের মার্জিত ও পরিশীলিত রূপ বলে মনে হয়। যেমনঃ ক) অতল কথার সমুদ্র থেকে নিঃশব্দ শব্দেরা উঠে আসে, খ) মুক্তিহীন আকাশের বিদ্যুৎ সান্ত্বনাঃ/ ধু-ধু করে চোরাপুঞ্জি—— অতিক্ষুদ্র হৃদয়।/ক্লান্তিহারা পথিকের অবলম্বন,/ নিশীথে দেহের বুকে জাগে মৃত্যুভয় গ) সমুদ্রে জাগে বাড়বানল,/কী উচ্ছল,/তীরসন্ধানী ব্যাকুল জল, ঘ) নিহত দিনের দীর্ঘ আশায় কাটে বসন্তদূত ইত্যাদি। এই ভাষা জনগণের মুখের ভাষা থেকে একটু কৃত্রিম ব্যবধান রচনা করেছে, এ কথা মানতেই হবে। এই ভাষাভঙ্গির মধ্যে মিশে রয়েছে কখনও রবীন্দ্রনাথের, কখনও সমর সেনের, কখনও সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের ও নজরুলের উচ্চকণ্ঠ প্রবণতার।--

সমর সেন লিখেছেন--

'আমার ঘরে শান্তি নেই, আমার চোখে ঘুম নেই',

সুকান্ত—'কলকাতায় শান্তি নেই। / রক্তের কলঙ্ক ডাকে মধ্যরাতে/ প্রতিটি সন্ধ্যায়'

সমর সেন— 'দুরন্ত অন্ধকার ডানা নাড়ে/উদ্ধত পাখির মতো'

সুকান্ত—'বাদুড়ের মতো কালো অন্ধকার/ভর ক'রে গুজবের ডানা/উৎকর্ণ কানের কাছে/সারা রাত
ঘুরপাক খায়'

সুভাষ মুখোপাধ্যায় লিখেছেন——'জনপুঞ্জকে করে তুবড়ি, তুলে প্যাকাট'

সুকান্ত——'এদিকে দেশের পূর্ব প্রান্তরে/আবার বোমারু রক্ত পান করে'

সুকান্ত রবীন্দ্রনাথকে এবং তাঁর স্মরণীয় কিছু উক্তিকে নানাভাবে স্মরণ করেছেন 'রবীন্দ্রনাথের প্রতি', 'বোধন', 'পঁচিশে বৈশাখের উদ্দেশে' প্রভৃতি কবিতায়, 'গীতিগুচ্ছ'র গানে, 'সূর্য-প্রণাম' শীর্ষক আলেখ্যে। যাই হোক, সুকান্তের কাব্যভাষা নিছক অনুকরণের ভেতর থেকে গড়ে ওঠে নি, জীবনের কাছাকাছি থেকেও তা রূপ গ্রহণ করেছে। গদ্যের সহজ রূপটি 'প্রার্থী' কবিতায় প্রকাশ পেয়েছেঃ 'হে সূর্য! / তুমি আমাদের স্যাঁতসেঁতে ভিজে ঘরে/উত্তাপ আর আলো দিও, / আর উত্তাপ দিও, / রাস্তার ধারের ঐ উলঙ্গ ছেলেটাকে।' গ্রামের রানারের জীবনকথাকে সাদামাটাভাবে বিবৃত করতে গিয়ে যে নিরলঙ্কার ভাষার আশ্রয় নেন তা কাব্যের করুণরসকে উদ্বোধিত করতে সুনিশ্চিতভাবেই সক্ষম ——'এমনি ক'রেই জীবনের বহু বছরকে পিছু ফেলে, / পৃথিবীর বোঝা ক্ষুধিত রানার পৌঁছে দিয়েছে 'মেলে'। / ক্লান্তশ্বাস ছুঁয়েছে আকাশ, মাটি ভিজে গেছে ঘামে / জীবনের সব রাত্রিকে ওরা কিনেছে অল্প দামে। / অনেক দুঃখে, বহু বেদনায়, অভিমানে অনুরাগে, / ঘরে তার প্রিয়া একা শয্যায় বিনিদ্র রাত জাগে।' (রানার)। এ ভাষায় ছন্দযোজনার পর্ব-বিন্যাস গদ্যের নয়, মুখের ভাষার। সুকান্ত স্বয়ং বলেছেন, বাংলা কবিতার ভবিষ্যৎ নির্ভর করছে গদ্য

ছন্দের চর্চায়।

সবশেষে সুকান্তের শিল্পসিদ্ধি সম্পর্কে কয়েকজন সমালোচকের মতামত উদ্ধার করা অনুচিত হবে না বলে মনে হয়। এর দ্বারা প্রগতি সাহিত্য আন্দোলনে সুকান্তের ভূমিকা আরও স্পষ্ট হবে। সরোজ আচার্যের মতে, ...'তাঁর কবি-প্রতিভার স্থায়ী মূল্য বাংলা কাব্যে যুগপ্রবর্তক হিসেবে। এই সংকটের যুগে সমাজ-সচেতন তো অনেক কবি ও শিল্পীই হতে বাধ্য হয়েছেন, ত্রিশ দশক থেকে বাংলা কাব্যে সমাজ-সচেতন কবিদের নানা পরীক্ষা-নিরীক্ষা আমরা লক্ষ্য করেছি।'তাঁর আরও বক্তব্য, সুধীন্দ্রনাথ দত্ত ও বিষ্ণু দে'র এই চেতনা ছিল বড় বেশি 'ভাবগম্ভীর' ও 'অন্তরাশ্রয়ী'। সুকান্ত মধ্যবিত্তশ্রেণীর মানুষ, কিন্তু তাঁর মনে তার সাধারণ মধ্যবিত্ত মানুষের রাজনৈতিকচেতনার সংশয়াচ্ছন্নতা ছিল না, ছিল না তর্কজড়িত অন্তর্দ্বন্দ্ব, পুঁথিগত প্রেরণার সঙ্গে বৃহত্তর সমাজজীবনের যে অবিচ্ছিন্ন সম্বন্ধ রাজনৈতিক দিক থেকে দরকার, মধ্যবিত্ত অন্যান্য বুদ্ধিজীবীশ্রেণীর ক্ষেত্রে তা ছিল অনস্বীকার্য ব্যাপার।'কাজেই প্রথম প্রচেষ্টায় আমাদের সমাজ-সচেতন কাব্য হয়েছিল এলিয়ট বুদ্ধিগত বিলাসের প্রতিধ্বনি অথবা তার চেয়েও ব্যর্থ কাব্য-প্রেরণাহীন স্লোগান বা ছন্দহীন ম্যানিফেস্টো। রাজনৈতিক চেতনাকে বুদ্ধিগত তাত্ত্বিক স্তর থেকে মুক্ত করে এনে জীবনের প্রশস্ততর ক্ষেত্রে কাব্যের সহজ উদার প্রেরণায় পরিণত করতে পেরেছিল সুকান্তই প্রথম।'[৪২]

সরোজ আচার্যের এই বিশ্লেষণ কমিউনিস্ট মতাদর্শের দিক থেকে। অকমিউনিস্ট সমালোচকের সপ্রশংস প্রশংসাও সুকান্ত কুড়িয়েছেন। অমলেন্দু দে রাজনৈতিক চেতনার প্রেক্ষিত বর্জন করেও তাঁর কবিতা থেকে সর্বধারী জীবনের এক নতুন মহিমা আবিষ্কার করেছেন——'তাঁর 'কবিতার প্রাণবস্তু যে চলমান জীবনের সাময়িক রাজনৈতিক ধারণা নয়, রাজনৈতিক ধারণারও ভিত্তিতে যে সর্বধারী জীবন-প্রত্যয় নিযুক্ত কর্মচঞ্চল, এবং এই প্রাণবস্তু যে মানবীয় শিল্পকৃতির অন্তঃস্থলীয় চেতনা'[৪৩]——এটি লক্ষ্য করেছেন।

অপর সমালোচক অধ্যাপক জগদীশ ভট্টাচার্য 'কবি কিশোর' প্রবন্ধে সুকান্তকে মহৎ কাব্যের কবিরূপে বর্ণনা করেছেন। প্রবন্ধটি যে একটি মৃত কিশোরের প্রতি তথাকথিত স্তুতিজ্ঞাপন, তা নয়, তাঁর রীতি বিশ্লেষণাত্মক বলেই তাঁর মন্তব্যের সারবত্তা গ্রহণযোগ্যঃ 'সুকান্ত নবজীবনের চারণ নয়, সে ঋত্বিক। তার কণ্ঠে গান নেই, আছে মন্ত্র। তার প্রেরণা ক্লাসিক। তার বাচনভঙ্গী ঋজু। তার প্রধান বাহন সমতুক তানপ্রধান ছন্দ, সে ছন্দের আবেদন বাক্‌স্পন্দনের। তাথার অনিবন্ধকারের চেয়ে অর্থগৌরব তার কাছে বড়। সে রীতি-সোচ্চ-হীন, উদাত্ত কণ্ঠে নবজীবনের মন্ত্রোচ্চারণ করে গেছে।' এবারকশ্রুতির উদ্ধৃতি দিয়ে তিনি বলেন, 'সুকান্ত সেই মহৎ কাব্যের কবি।'[৪৪]

প্রগতি সাহিত্য আন্দোলনের মধ্য দিয়ে যে নতুন চিন্তা নাড়া দিয়েছিল, সুকান্ত তাঁর আশ্চর্য উদ্যমে

ও সাময়িকতায় তাকে কাব্যরূপে ধরতে চেয়েছিলেন এবং বলাই বাহুল্য, তিনি সফল। এদিক থেকে দেখলে সুকান্তকে বলতে হয়, তিনি এই আন্দোলনেরই সৃষ্টি, সুকান্তের যা ভাল তা যেমন এই আন্দোলনের ভাল দিক, তেমনি এর মন্দটুকুও এই আন্দোলনেরই ত্রুটি।

উল্লেখপঞ্জী

১। সিদ্ধার্থ ঘোষ, অনূদিতঃ 'সাহিত্য ও বিপ্লব', লু সুনঃ বাছা লেখা, পপুলার লাইব্রেরী, কলকাতা, ১৯৮১, পৃঃ৪১

২। অমিয়ভূষণ চক্রবর্তীঃ সুকান্ত-পরিচয়, ২য় খণ্ড, নতুন দিগন্ত, কলকাতা, ১৯৮২, পৃঃ২৫

৩। বিশ্বনাথ দে, সম্পাদিতঃ সুকান্ত বিচিত্রা, সাহিত্যম, কলকাতা, পুনর্মুদ্রণ, ১৯৮২, পৃঃ১৩৭-৩৮

৪। তদেব, পৃঃ৫৭

৫। তদেব, পৃঃ৫৮

৬। তদেব, পৃঃ৩৪-৩৫

৭। সুকান্ত ভট্টাচার্যঃ সুকান্ত-সমগ্র, সারস্বত লাইব্রেরী, কলকাতা, পঞ্চদশ মুদ্রণ, ১৩৮৯বঙ্গাব্দ, পৃঃ৩০৯

৮। তদেব, পৃঃ৩৫১

৯। তদেব, পৃঃ৩৫৯

১০। Lenin : On Literature And Art, Progress Publishers, Moscow, Third printing, 1975, pp. 24-25.

১১। অরণি, তৃতীয় বর্ষ, ১মসংখ্যা, ২৭আগস্ট, ১৯৪০

১২। সুকান্ত ভট্টাচার্যঃ সুকান্ত-সমগ্র, সারস্বত লাইব্রেরী, কলকাতা, পঞ্চদশ মুদ্রণ, ১৩৮৯বঙ্গাব্দ, পৃঃ২৯৬

১৩। Gould, James, A. and William H.Truitt : Political Ideologies, Macmillan Company, New York, 1973, p. 101

১৪। Ibid, p. 102

১৫। অমিয়ভূষণ চক্রবর্তীঃ সুকান্ত-পরিচয়, ২য় খণ্ড, নতুন দিগন্ত, কলকাতা, ১৯৮২, পৃঃ৪০০

১৬। ই. এম. এস. নাম্বুদিরিপাদঃ মার্কসবাদ ও সাহিত্য, ন্যাশনাল বুক এজেন্সি, কলকাতা, তৃতীয় মুদ্রণ, ১৯৮৪, পৃঃ৩২-৩৩

১৭। Fraser, G.S. : The Modern Writer And His World, Rupa and Company, Calcutta, 1961, p. 217

১৮। অনুনয় চট্টোপাধ্যায়ঃ জীবন শিল্পী সুকান্ত, পপুলার লাইব্রেরী, কলকাতা, দ্বিতীয় সংস্করণ, ১৯৮১, পৃঃ১২১

১৯। Roxburgh, Angus, Translated (from the Russian) : Marxist-Leninist Aesthetics And The Arts, Progress Publishers, Moscow, 1980, p.107

২০। Lenin : On Literature And Art, Progress Publishers, Moscow, Third printing, 1975, p. 142

২১। ১৯৩৬খ্রীষ্টাব্দের এপ্রিলে লক্ষ্ণৌ-এ অনুষ্ঠিত প্রথম সর্বভারতীয় প্রগতি লেখক সংঘের ইস্তেহারে জোরের সঙ্গে উচ্চারিত হয়েছিল এ কথাঃ 'ভারতীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতির যা কিছু শ্রেষ্ঠ, আমরা তার উত্তরাধিকারের দাবী করি।'

দ্রষ্টব্যঃ প্রগতি লেখক সংঘের বঙ্গীয় শাখা কর্তৃক ১৩৪৪বঙ্গাব্দে প্রকাশিত এবং হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় ও সুরেন্দ্রনাথ গোস্বামী কর্তৃক সম্পাদিত 'প্রগতি' সংকলনের 'পরিশিষ্ট'।

২২। Marx, Karl and Frederick Engels : Selected Works, Vol. 1, Progress Publishers, Moscow, 1966, p. 118

২৩। খালেদ চৌধুরী, অনূদিতঃ কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিকঃ ঐতিহাসিক রূপরেখা, প্রগতি প্রকাশন, মস্কো, ১৯৭৮, পৃঃ১১১

২৪। Marx, Karl and Frederick Engels : Selected Works, Vol. 1, Progress Publishers, Moscow, 1966, p. 118

২৫। Ibid, p. 124

২৬। সুকান্ত ভট্টাচার্য, সম্পাদিতঃ 'আকাল', আকাল, সারস্বত লাইব্রেরী, কলকাতা, প্রথম সারস্বত সংস্করণ, ১৩৭৩বঙ্গাব্দ।

২৭। অরণি, ২য় বর্ষ, ৪৮সংখ্যা, ৬অগাস্ট, ১৯৪৩, পৃঃ৮২১

২৮। Marx, Karl and Frederick Engels : Selected Works, Vol. 1, Progress Publishers, Moscow, 1966, p. 116

২৯। জনযুদ্ধ, ১ম বর্ষ, ৩০সংখ্যা, ২১এপ্রিল, ১৯৪৩

৩০। জনযুদ্ধ, ২য় বর্ষ, ১২সংখ্যা, ১৪জুলাই, ১৯৪৩

৩১। জনযুদ্ধ, ২য় বর্ষ, ১১সংখ্যা, ৭জুলাই, ১৯৪৩

৩২। 'কৃষকের দাবি' এই শিরোনামে কবিতাটি প্রকাশিত হয়েছিল 'অরণি'তে। পরে পংক্তিবিশেষের পরিবর্তন করা হয়েছে। যেমনঃ

ক) ২২তম পংক্তির পর ২৩তম পংক্তি ছিল এইরূপঃ'যে কাস্তে শত্রুর কাছে দেখা দেবে অত্যন্ত ধারালো', 'সুকান্ত-সমগ্রে' (পৃঃ৭২) এটি বাদ দেওয়া হয়েছে।

খ) ২৯তম পংক্তিতে যেখানে আছে 'দৃষ্টি জ্বলে সুদূরসঞ্চারী', 'অরণি'র পাঠে পাই, 'তারা আর ফিরবে না জানি'।

গ) ৩২তম পংক্তিতেও পরিবর্তন, 'অরণি'র পাঠে ছিল 'নিযুত আমার কানে গুঞ্জরিত ভুখিদের ক্ষুধার যন্ত্রণা'। 'সুকান্ত-সমগ্রে' (পৃঃ৭৩) বাদ গেছে 'ভুখিদের' শব্দটি।

দ্রষ্টব্যঃ অরণি, ৩য়বর্ষ, ২০সংখ্যা, ১১ফেব্রুয়ারী, ১৯৪৪

৩৩। অরণি, ২য় বর্ষ, ৪৬সংখ্যা, ২৩জুলাই, ১৯৪৩

৩৪। Caudwell, Christopher : Illusion and Reality, People's Publishing House, Delhi, Reprinted, 1981, p. 285

৩৫। Ibid, p. 280

৩৬। 'অরণি'র পাঠে দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্তবক ছিল সম্পূর্ণ বিপরীত, অর্থাৎ 'সুকান্ত-সমগ্রে'র দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্তবক 'অরণি'র পাঠে যথাক্রমে তৃতীয় ও দ্বিতীয়। লক্ষণীয় আর একটি পরিবর্তন দ্বিতীয় স্তবকে ঘটেছে, 'অরণি'র পাঠে পাইঃ

'তখন সকল দেবতা-নারায়ণরা,
তখন পৃষ্ঠে বিজিত উন্মাদনা।'

—দ্রষ্টব্যঃ অরণি, ২য়বর্ষ, ৩২সংখ্যা, ১৬এপ্রিল, ১৯৪৩

'সুকান্ত-সমগ্রে' (পৃঃ৮৭) রয়েছেঃ

'তখন পৃষ্ঠে বিজিত উন্মাদনা,
তখন সকল সুখের দিন গোনা।'

৩৭। Mayakovsky, V : 'Foreword', Selected Verse, Vol. 1, Raduga Publishers, U.S.S.R. 1985, p. 16

৩৮। Ibid, p. 92

৩৯। সর্বজিৎ সেন, অনুদিতঃ শিল্প এবং সমাজজীবন (জি. ভি. প্লেখানভের 'আর্ট এ্যান্ড সোশ্যাল-লাইফ'), পপুলার লাইব্রেরী, কলকাতা, ১৯৮২, পৃঃ২৬

৪০। সর্বজিৎ সেন, সিদ্ধার্থ ঘোষ, অনুদিতঃ নভেল এ্যান্ড দ্য পিপল (র‍্যালফ ফক্সের গ্রন্থ), পপুলার লাইব্রেরী, কলকাতা, ১৯৮০, পৃঃ৯৫

৪১। সুকান্ত ভট্টাচার্যঃ সুকান্ত-সমগ্র, সারস্বত লাইব্রেরী, কলকাতা, পঞ্চদশ মুদ্রণ, ১৩৮৯বঙ্গাব্দ, পৃঃ৩৩০

৪২। পরিচয়, সুবর্ণজয়ন্তী সংকলন, ৫০বর্ষ, ১০ম-১২শ সংখ্যা, মে-জুলাই, ১৯৮১, পৃঃ১৭৩-৭৪

৪৩। দ্রষ্টব্য অমলেন্দু দে-র প্রবন্ধ 'কবি সুকান্ত', —পরিচয়, শারদীয়, ৪৮বর্ষ, ১-৩সংখ্যা, অগাস্ট-অক্টোবর, ১৯৭৮, পৃঃ২১৪-১৬

৪৪। সুজিতকুমার নাগ, সম্পাদিতঃ সুকান্ত স্মৃতি, করুণা প্রকাশনী, কলকাতা, ১৩৭৭বঙ্গাব্দ, পৃঃ৮২

ঘ। প্রগতি সাহিত্য আন্দোলন ও সমকালীন কয়েকজন কবি

প্রগতি সাহিত্য আন্দোলনের ফলে আধুনিক বাংলা কবিতার সমৃদ্ধ সৃষ্টিশীল বৈচিত্র্য ও ব্যাপ্তি সমর সেন, বিষ্ণু দে, সুভাষ মুখোপাধ্যায় ও সুকান্ত ভট্টাচার্য প্রমুখের মধ্যেই নিঃশেষ হয়ে যায় নি। বরং এই আন্দোলনের ফলে যে তীব্র পরিবেশ যুবমনে সঞ্চারিত হয়েছিল তাতে মেতে গিয়েছিল সারা বাংলাদেশ। খ্যাত-অখ্যাত বহু কবির কণ্ঠে সেদিন বেজে উঠেছিল মুক্ত বলিষ্ঠ প্রতিবাদ——যে কোন অন্যায়ের বিরুদ্ধে, শোষণের বিরুদ্ধে, ফ্যাসিবাদী দুর্বৃত্তশক্তির বিরুদ্ধে, যুদ্ধের বিরুদ্ধে, বুভুক্ষা-বেকারিত্ব-বঞ্চনার বিরুদ্ধে, শ্রেণীবৈষম্যের বিরুদ্ধে, শ্রমিক-কৃষক-মেহনতি মানুষের সপক্ষে, শান্তির সপক্ষে এইসব কবিতা প্রকৃতপক্ষে হয়ে উঠেছিল গণ-আন্দোলনের কবিতা। এর বিষয় বা প্রসঙ্গ মুখ্যত তাই মানুষ ও মানুষের জীবনসংগ্রাম। এইসব কবিতা তাই রাজনৈতিক আদর্শসম্পন্নও বটে। এর লক্ষ্য ও প্রেরণা সমাজতান্ত্রিক আদর্শ——শ্রমিক ও কৃষকের তথা প্রলেতারিয়েতের রাষ্ট্রক্ষমতায় আধিপত্য। এই প্রেরণা অত্যন্ত সুস্পষ্টভাবে প্রকাশিত হয়েছে। যেখানে এই প্রেরণা উচ্চকণ্ঠ ও সোচ্চার সেখানে তা যথার্থ কবিতা হয়ে উঠতে বাধা পেয়েছে।

বাস্তবিকপক্ষে প্রগতি সাহিত্য আন্দোলন ছিল তৎকালীন বিশ্বপরিস্থিতির একটি অংশবিশেষ। সেই যুগ ও কালের চিহ্ন এইসব কবিতার ঐতিহাসিক সম্পদ। ঘটনার দলিলকে কবিতা বলা চলে না, তথাপি এই পর্বের অজস্র সৃষ্টিসম্ভার যেমন ঘটনার দলিল হিসেবে চিহ্নিত, তেমনি কিছু কিছু দ্যুতি ও বর্ণময়তায়, সৌন্দর্যে ও চাতুর্যে, মানবিক আবেদনে ও সংবেদনায় অত্যন্ত সমৃদ্ধ এবং উৎকর্ষে অতুলনীয়।

প্রগতি সাহিত্য আন্দোলনকে এই পর্বের কবিরা গভীর হৃদয়াবেগ দিয়ে গ্রহণ করেছিলেন। ফলে বক্তব্য-বিষয়ে-ছন্দে-চিত্রকল্পে অজস্র বৈচিত্র্যের পাশাপাশি একটি বিশেষ ঝোঁক ফুটে উঠেছে। তা হল—— নিজেদের শ্রেণীগত অবস্থান থেকে এঁরা সরে গিয়ে প্রলেতারিয়েতের শ্রেণী-অবস্থানকে সর্বদা স্বকীয় করে তুলতে চেয়েছেন। আরোপিত ও অংশত একটা কৃত্রিম চেষ্টা দেখা দিয়েছিল প্রেমেন্দ্র মিত্রের মধ্যে——'আমি কবি যত কামারের আর কাঁসারির আর ছুতোরের/আমি কবি যত ইতরের' মত পংক্তিমালায়। এই রকম আরোপিত শ্রেণী-অবস্থানজনিত সমস্যা আমাদের বর্তমান নিবন্ধের অন্তর্গত আলোচ্য কবিদের ক্ষেত্রে কোন সমস্যা হয়ে দেখা দেয় নি। অধিকন্তু এঁদের গভীর উন্মাদনা সব সময় ঘিরে রয়েছে যেহেতু প্রলেতারিয়েতের সপক্ষে, তাই তা কোন রকমের জোরাল সংশয়ও সৃষ্টি করে নি। এই সংশয় খানিকটা গড়ে উঠেছিল সমর সেন ও বিষ্ণু দে'কে ঘিরে। তবে তা ছিল অনেকটাই তত্ত্বগত, মার্কসীয় দ্বন্দ্বতত্ত্বের গভীর সমস্যাগত সেই ব্যাপার। কিন্তু তাঁরা সাম্যবাদী নন এ প্রশ্ন ওঠে নি। আমাদের বর্তমান আলোচনা সেইসব কবিদের নিয়ে যাঁরা প্রগতি সাহিত্য আন্দোলন ও কমিউনিস্ট কার্যক্রমের মধ্যে কোন বিভেদ স্বীকার করেন নি। সাহিত্য আর রাজনীতির মধ্যে পার্থক্য না টেনে বরং সাহিত্যকে রাজনৈতিক অধিকার অর্জনের হাতিয়ার হিসেবেই দেখেছেন। এঁদের শিল্পতত্ত্ব অকুণ্ঠ আত্মবিশ্বাসের, দৃপ্ত আত্মপ্রত্যয়ের, শ্রমজীবী সাধারণের হয়ে উচ্চকণ্ঠ প্রতিবাদের। নির্দ্বিধ, নিঃসংশয় এই মানস।

বলা অবান্তর হবে না, এই প্রতিবাদ এসেছে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের বহুবর্ণ সংকট থেকে, জীবনের গ্লানি ও কুশ্রীতা থেকে, সেইসঙ্গে জাপানী-হামলা, দুর্ভিক্ষের যন্ত্রণা, তেভাগার দাবি, মুক্ত স্বদেশস্বপ্ন, নৌ-বিদ্রোহ, তেলেঙ্গানার সশস্ত্র সংগ্রাম, সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা, ধর্মঘট, দেশবিভাগ, শান্তি আন্দোলন——প্রায় প্রতিটি ঘটনাই কোন-না-কোনভাবে প্রগতিশীল কবিদের রচনাকে প্রেরণা জুগিয়েছে। এ ছাড়া আছে সমাজবিপ্লবের স্বপ্নকে নবভাবে রূপায়িত করবার সদিচ্ছা।

কাব্যে এই স্বপ্নকে লালন করার পথে বিস্তর বাধা। কেননা রবীন্দ্রনাথের মত অতুলনীয় একক ব্যক্তিত্ব এখানে অনুপস্থিত। ভাষার প্রসাদগুণ, আবেগ, শব্দচয়ন, শব্দব্যবহার, চিত্রকল্প, প্রতীক বা ছন্দ নিয়ে সযত্ন পরীক্ষা-নিরীক্ষা করবার মতন অবসর ও অবকাশও এঁদের কম, দৈনন্দিন জীবনের কর্মব্যস্ততার সঙ্গে মিটিং-মিছিল-সমাবেশে অংশগ্রহণের মতন কর্মসূচীও এঁদের রয়েছে——তাছাড়া রয়েছে তৎকালের অস্থির যুগপ্রেক্ষিত যা কবিকে প্রতিনিয়ত আশঙ্কায়-আগ্রহে-ভয়ে-পরাজয়ে-আবেগে-উদ্বেগে সতত অ-ধৈর্যশীল করে রাখে——এই অস্থিরতা কবিতার মধ্যেও সঞ্চারিত হয়ে অযত্নলালিত কিছু ব্যর্থ প্রতিশ্রুতিতে পরিণতি পেয়েছে। এ যুগের কবিতায় তাই নিটোল ও পরিচ্ছন্নরূপ পাওয়া এক ঈর্ষণীয় সৌভাগ্যের ব্যাপার। তাহলেও বলতে হবে, পারস্পরিক ব্যক্তিগত পার্থক্য যে ব্যক্তিবিশেষের ব্যক্তিক-স্বাতন্ত্র্যের সম্পদ——সে-সম্পদ ভিন্নভিন্ন কবি-ব্যক্তিত্বেও ধরা পড়েছে। কবি-মনের এই ভিন্ন-কাঠামো তুলে ধরেছে তাঁদের পৃথক কবি-বৈশিষ্ট্যকে। যদিও তাঁদের সম্মিলিত চেষ্টা গণ-আন্দোলনে অংশগ্রহণ এবং একটি 'কমন-প্ল্যাটফর্মে' সমবেত হওয়া। এই বৈশিষ্ট্যহেতু তাঁদের কবিতায় বিচিত্র ও বিবিধ ধরনের বর্ণ-স্বাদ-গন্ধ-রূপের অনুপম বিস্ফূর্তি এসেছে যা প্রগতি সাহিত্য আন্দোলনের ধারাকে বিশেষ পুষ্টি দান করেছে অজস্র ত্রুটি-বিচ্যুতি সত্ত্বেও। এ কথা প্রগতিশীল কাব্যধারার দিকে তাকিয়ে নিঃসন্দেহে বলা চলে।

অরুণ মিত্র (জন্ম: ১৯০৯ খ্রীষ্টাব্দ) : এই ধারার অন্যতম প্রধান কবি অরুণ মিত্র 'কাব্যের প্রসঙ্গে' শীর্ষক একটি প্রবন্ধে 'প্রগতি' ও 'প্রতিক্রিয়া'র সরলীকরণের বিরুদ্ধে তীব্র আপত্তি জানিয়েছেন, তেমনি আক্রমণ করেছেন 'বিশুদ্ধ' শিল্পের প্রবক্তাদের। কাব্যের সার্থকতা সম্পর্কে তাঁর অভিমত : 'কাব্যের সার্থকতা শুধু তখনই আসে যখন কবির ব্যক্তিত্ব তাঁর কাজে, মানে তাঁর সৃষ্টিতে, ধারাবাহিক জগৎসংসার বোঝাবার চক্ষুষ্মান হয়ে ওঠে। সেই integration থেকেই সার্থকতার জন্ম।'[1] তিনি মনে করেন, একজন কবি আত্মপ্রকাশ করেন 'মানস-অভিজ্ঞতা'র সম্পদ আহরণ করে, বাইরে থেকে ধার করা অভিজ্ঞতা গ্রহণ করে নয়। কেবল আশা-বিশ্বাস কিংবা 'সুন্দরের গীত' ধারণ করলেই কাব্য সার্থক হয় না——তিনি জোর দিয়েছেন মননের ও অভিজ্ঞতার ওপর এবং আত্মপ্রকাশের স্বকীয় রীতির ওপর। অরুণ মিত্রের কণ্ঠস্বর একটু নিচুগ্রামে বাঁধা। ১৯৪০ খ্রীষ্টাব্দের আগে 'প্রান্তরেখা' এবং ১৯৪৮ খ্রীষ্টাব্দের আগে লেখা 'সারণকাল'——এই দুটি কাব্য তাঁর আলোচ্য পর্বের অন্যতম সৃষ্টি। তিনি মোটামুটি 'প্রতীকী'-ধারার কবি। হৃদয়ের বিস্তার চেয়েছেন এই কবি——'হে হৃদয়, ফুল দেখো বিদীর্ণ পাষাণে'[2], (হে হৃদয়)—— কঠিন বাস্তবতার ভূমিতে

সহজে দাঁড়াবার জায়গা মেলে না বলে তাঁকে সংগ্রামের অংশীদার হতে হয়। শ্রেণীসংগ্রামের গুরুত্বকে নির্দ্বিধভাবে গ্রহণ করে তাঁকে বলতে হয়---'হাতের তেজি নামুক নিঃশব্দে।'[৩] (এবার)। 'অরণি'র সোভিয়েট সংখ্যায় তাঁর বিখ্যাত কবিতা 'কসাকের ডাক : ১৯৪২'[৪] প্রকাশিত হয়। দীর্ঘ কবিতাটিতে রাশিয়ার জীবনপণ সংগ্রামকে মূর্ত প্রেরণা হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে। অরুণ মিত্র স্বভাবতই যে নিচুগ্রামে কণ্ঠস্বর বেঁধে রেখেছিলেন, এই একটি কবিতায় তাঁকে দেখি অত্যন্ত উচ্চকণ্ঠ হতে। সমস্ত কবিতাটি জুড়ে এক সুতীব্র আবেগতন্ময়তা 'জনযুদ্ধে'র প্রতিরোধাত্মক [illegible] আস্বাদকে সুনিশ্চিত করে তুলেছে:

> কসাকের কড়া পাহারায় দুরন্ত ঘাঁটিগুলো এবার।
> মজ্জায় মজ্জায় এ কৃষাণকে চেনো--
> ইউক্রেইনের গমের চারায় কুবানের হাড়ের সার,
> আর ধমনীতে ডনের স্রোত।
> জনসাধারণ অসাধারণ
> কৃষাণগণের কারকণায় অপূর্ব আয়োজন--
> দুষমণ... দুষমণ।
>
> *** *** ***
>
> সাদা দুনিয়ার ভাই গো
> বড় দুনিয়ার ভাই
> সারা দুনিয়ার ভাই গো
> একসাথে দাঁড়াই
> দুষমণ দুনিয়ার
> দুষমণ দুনিয়ার
> হাতিয়ার দাও ভাই গো---
> হাতিয়ার

(কসাকের ডাক: ১৯৪২', অরণি, সোভিয়েট সংখ্যা)

'প্রান্তরেখা' কাব্যের অন্তর্গত এই কবিতার আলোচ্য পংক্তিগুলির দুর্বলতা লক্ষ করে বিমলচন্দ্র সিংহ তাঁর পুনর্বার আলোচনায় বলেছেন, 'সত্যি কথা বলতে এই ধরনের লাইনগুলি অত্যন্ত হাস্যকর ঠেকে। 'ভাই গো' সম্বোধন যে চিত্র আমাদের মনে জাগায়, সে ভালগার এবং কমিক। এরকম সম্বোধনের দরকার কি ? 'সাথী কাঁধে কাঁধ মেলাও' লিখবার পর এ লাইনগুলির দরকারই ছিল না, আর যদি নিতান্ত লিখতে হয় তা হলে 'সাদা দুনিয়ার ভাই, বড় দুনিয়ার ভাই' এরকমভাবে লিখলেও অনেক বেশী সুমিত ও গম্ভীর শোনাত। বাস্তবিকপক্ষে এইরূপ লাইনগুলি আকস্মিক নয়, এর পিছনে গভীর কারণ আছে ব'লে মনে হয়। আসল কথা,

কবিদের মন গণাভিমুখী হ'লেও এখনও দ্বিধাসংশয় কাটে নি, সেইজন্য প্রতিরোধের কবিতা বা জনগণ নিয়ে কবিতা বা জনগণের জন্য কবিতা অনেক সময়ই ভালো হ'তে হ'তে এক এক সময় গুরুতর পদস্খলন ঘটে। মধ্যবিত্ত শ্রেণীর কবিদের এটা বোধহয় এখনও সম্পূর্ণ যেতে বসে নি, তাই আমরা নতুন সত্তা যদি মনেপ্রাণে গ্রহণ করতে উৎসুক থাকি তবু সময়ে সময়ে ভুল হয়ে যায়।'[৫] মাঠে-ময়দানে খালি গলায় আবৃত্তিযোগ্য এই কবিতাটির স্বাদ যে অভিজ্ঞতা সঞ্চার করে, ঘরের কোণের একলা পাঠে সে স্বাদ মিলবে না। স্লোগানধর্মিতাই এর কাব্যবৈশিষ্ট্য, তবুও এর ঐতিহাসিক মূল্য কিছু কম নেই। অরুণ মিত্রের প্রতিভার অনন্য সৃষ্টি 'লাল ইস্তাহার' কবিতাটি। স্লোগানকেও তিনি আশ্চর্য কাব্যমূর্তি দিতে পেরেছেন এতে: 'প্রাচীরপত্রে পড়োনি ইস্তাহার? / লাল অক্ষরে আগুনের হলকায় / ঝলসাবে কাল জানো। / (বোকাদের ধরায় বিদ্রোহের উত্তাপ/ ভোঁতা হয়ে গেছে পুরানো কথার ধার।) / যুগান্ত উৎকীর্ণ, এখনি পড়ো / নতুন ইস্তাহার।'[৬] (লাল ইস্তাহার)। যুগ যুগ ধরে মানুষের সাধনা অন্ধকার থেকে আলোয়, মুক্তির দিকে অভিযাত্রা, এই মুক্তিকে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের সঙ্গে একীভূত করে দিয়েছেন অরুণ মিত্র: 'We want more breath, more air, and more ! we choke !/The stifling atmosphere will pass away !/You mighty gods, beware !/Darkness will *gasp for breath in spiralled* smoke,/Humanity ! take care !'[৭] ('Poster' by Arun Mitra).

লাল অক্ষরে লটকানো ইস্তাহারের মধ্য দিয়ে তিনি আগামী যুবকের কাছে সমাজতান্ত্রিক সূর্যকে যেভাবে প্রতীকায়িত করেছেন তা বলিষ্ঠ কাব্যমর্যাদা লাভ করেছে। 'সৈকতে'[৮] যে হতাশা ('যতই অভুক্ত অন্ধ, হাতাবে তা সমুদ্র লবণে') ১৯৪২ খ্রীষ্টাব্দের দিকেও নিঃশেষ হয় নি, অথবা ১৯৩৬ খ্রীষ্টাব্দে যে জিজ্ঞাসা ও সংশয় তাঁকে 'যুগান্তের ইতিহাস অন্ধ-কলরব'[৯]----এই বোধে পীড়িত করে উৎসাহিত করে দিল 'জীবন-দক্ষিণা' দিতে----সে-সংশয়ের গভীর নিরসন 'কপাটের ডাক: ১৯৪২' এবং 'লাল ইস্তাহার' কবিতাটিতে। অরুণ মিত্র এক সময় ভেবেছিলেন বহু প্রত্যাশা নিয়ে, বহু স্বপ্ন নিয়ে যে শিশুটিকে এই পৃথিবীতে আনা হয়, প্রতিকূল বিশ্ব (এখানে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের ধ্বংসের রূপ বুঝতে হবে) তার প্রতি চূড়ান্ত অবিচার করে চলে, সেই অমানব আবহরচনা, তাঁর ভাষায়: 'সোজা পাহাড় একক সাগর / উত্তুঙ্গের ছায়া ফেলে দাঁড়ায় শিয়রে, / নতুন নিঃশ্বাস পড়ে বাষ্পাকুল হাওয়ার ভিতরে / তারপর জমে হয় ভারী ভারী ভয়ের মুখোশ।'[১০] (শিশুর কান্নার ঘর)। এই একই আবহ তাঁকে জর্জরিত করে রেখেছে দুর্ভিক্ষের মুহূর্তেও: 'ঘূর্ণির বাতাসে, / মৃত্যুর মতন ঠান্ডা মাঠে / রোদে ঠাঠা আকাশের মাঠে/ সর্পিল শিকড় ফের পেয়ে যায় জন্মের ঠিকানা।'[১১] (একাগ্র দুঃখের তপে)। কিন্তু নীলকণ্ঠের মত সমস্ত যন্ত্রণার বিষ পান করে এই পৃথিবীকে 'শান্তির শিশির-স্নাত ঝলমল' করে তুলতেই তাঁর ব্যাকুলতা ও দৃঢ় আত্মপ্রত্যয় বলিষ্ঠ আন্তরিকতা লাভ করেছে: 'আমরা মুঠোয় নিয়ে অবিনাশী বীজ / পা বাড়াই দিনের পরিখার পারে।'[১২] ('পরিখার পারে', চতুরঙ্গ)।

বিমলচন্দ্র ঘোষ (জন্ম: ১৯১০ খ্রীষ্টাব্দ) : বিমলচন্দ্র ঘোষ প্রগতি সাহিত্য আন্দোলনের একজন একনিষ্ঠ সৈনিক। প্রগতি লেখক ও শিল্পী সংঘের শেষ সম্মেলনে তিনি সহ-সভাপতি ছিলেন। ব্যক্তিগত জীবন ও সাহিত্য-

জীবন——দুইকে তিনি মিলিয়ে দিয়েছেন তাঁর সাহিত্যিক সাধনায়। আবহমান কাব্যরীতির সঙ্গে মিল রেখে বিমলচন্দ্র ঘোষ সে সময় সবচেয়ে জনপ্রিয় হয়ে উঠেছিলেন। সমালোচকের ভাষায়: ...'সাধারণ বাঙালী পাঠক যাতে অভ্যস্ত, সেইভাবেই তিনি কবিতা লিখে থাকেন।'[13] এই অভ্যস্ততা রামায়ণ-মহাভারত-বেদ-উপনিষদ-সাধুসাহিত্য থেকে সহজ চিত্রকল্প ও উপমা খুঁজে নিয়েছে, দীর্ঘ কবিতায় সংযমের বদলে বাঙালির কুলপ্রথী আবেগপ্রবণতার সুযোগ নিয়েছে আর আদর্শবাদের তাড়নায় কবিতাকে উচ্চকণ্ঠ স্লোগানের বেপরোয়া তৎপরতায় তুলে ধরেছে। সত্যি বলতে, প্রগতিশীল এই আন্দোলনের মধ্যে যে জঙ্গী ও অতিবাম দৃষ্টিভঙ্গি ছিল, বিমলচন্দ্র ঘোষের রচনায় সেই কণ্ঠস্বরই বেজে উঠেছিল অকৃত্রিম আন্তরিকতায় ও একনিষ্ঠ প্রত্যয়ে। মার্কসবাদে সমর্পিত প্রাণ এই কবি প্রথম থেকেই মানুষের মৌলিক চাহিদা সম্পর্কে সচেতন বলে নরনারী-প্রেম-চেতনা, যৌনতা বা আনুষঙ্গিক বিষয়কে এড়িয়ে তিনি সমসাময়িক ঘটনাকে প্রাধান্য দিয়েছেন যা তৎকালীন দলীয় সংগ্রামের দলিল বিশেষ। অতিশিক্ষিত বুদ্ধিজীবিদের কাছে, অন্তত এই সিকি শতাব্দীর ব্যবধানে, তাঁর কাব্যের আবেদন অত্যন্ত ক্ষীণ। তাহলেও শোষিত ও সংগ্রামী মানুষের কাছে এর মূল্য স্মরণীয় ঐতিহ্যবহ। 'সাবিত্রী', 'ছন্দশতক' প্রভৃতি কাব্য বর্তমান প্রজন্মের কাছে শুধুমাত্র ঐতিহাসিক দলিল বললে সত্যের অপলাপ হবে। বক্তব্যপ্রধান কবিতার কিছু কিছু ত্রুটি অবশ্যই থাকে। তা হল এর সাংবাদিকসুলভ সরল বিবৃতির ধরন। বিমল ঘোষের অনেকখানি ত্রুটি এর মধ্যেই রয়েছে। কখনও আবেগের অতিরেক কবিতায় একপ্রকার আতিশয্য এনে দিয়েছে। কিন্তু তাঁর রচনায় [illegible] ঠাঁই নেই। প্রলেতারিয়েত শ্রেণীর প্রতি তাঁর রয়েছে আন্তরিক দুর্বলতা যা সংরক্ত আবেগের সঙ্গে যুক্ত। অকৃত্রিম ঘৃণায় অগ্নিবর্ণ ক্রোধে তাঁর সত্বর শব্দভেদী বাণ নিক্ষিপ্ত হয়েছে বুর্জোয়া ভাববিলাসিতার বিরুদ্ধে: 'আশ্চর্য জীবনযাত্রা। জীবাত্মা অমর। / মরেমরে তবুও মরি নি, / জননীর যাদুমন্ত্রে আজো বেঁচে আছি / বেঁচে আছি শ্রেণীর সতর্ক প্রেমের শাসনে, / দ্বিপদ মনুষ্যাকার বুদ্ধিমন্ত পশুর জীবন।'[14] (মধ্যবিত্ত মন)। জীবন সংগ্রামময়——দ্বন্দ্বই তার অগ্রসরণশীলতা অব্যাহত রাখে, প্রগতির এই সংজ্ঞাই তাঁর মার্কসবাদপুষ্ট মনন গ্রহণ করেছে: 'বৈপ্লবিক গতিময় সময়ের ঘূর্ণিস্রোতে তাই / অতিক্ষুদ্র জীবকণা আপন সত্তার [illegible] / বিশ্বাসী সুচিন্তার/ বিদ্যুতের দ্রুত [illegible] অহঙ্কার/সামাজিক প্রয়োজনে অমোঘ বিচারে/গতির পরম মুক্তি আনে মুক্তি রহস্যের দ্বার। / যে স্রোত চলেছে তার কে ফেরাবে গতি ? / নব নব প্রাণের সংহতি/ সংগ্রথিত মহাসাম্যে সর্বজয়ী কালের প্রগতি।'[15] (প্রগতি)। সমসাময়িক ঘটনাকেও তিনি উপজীব্য করে অজস্র কবিতা লিখেছেন। জাপানী-আগ্রাসনকে যারা দেশের স্বাধীনতার পক্ষে মঙ্গলজনক ভেবেছে, তাদের বিরুদ্ধে বিদ্রূপাত্মক কবিতা 'বন্যা-সুরাজ'[16], প্রমজীবীর প্রতি সহানুভূতি জানিয়ে 'শেষ উইল'[17], সমালোচকী লেখকদের 'আরামকেদারা'[18] আখ্যা দিয়ে তাঁর কবিতায় এক ধরনের সরসতর মেজাজ আনার চেষ্টা করেছেন। দুর্ভিক্ষ তাঁকে বেদনাহত ও করেছে। সেই বেদনাও অত্যন্ত সরলভাবে প্রকাশিত হয়েছে তাঁর কবিতায়: 'অন্ন? / এ সমাজ মহারণ্য। / রাস্তার অন্ধকারে [illegible] / শীতে কাঁপে ফি ফি—/ বিবস্ত্র জনতা.. / অস্থিচর্মসার-শিশু-শিশু / ক্লীব নিষ্ঠুরতা, / অভাবে অনাহারতার / নির্গুণ মৃতার।/......দুঃখ মুখায় ঢুঁকে ঢুঁকে/

প্রবঞ্চিত নরলোকী চলে, / রক্তপঙ্ক অবশে---/ পেটে মুখ, ঢাকে বুক/যৌন মুখ হাজার হাজার,/পাইনে উদ্দেশ খুঁজে এ পোড়া শহরটার।'[১৯] (১৩৫৫)। যুদ্ধশেষে হয়ত প্রেরণা পান নতুন মন্ত্রে আর নবীন বিস্ময়ে, তাঁর প্রার্থনা : 'নবমন্ত্রে প্রাণে প্রাণে গানে গানে নবীন বিস্ময়/ আলো নব মুখ বুকে, মুছাও সংশয়।'[২০] (প্রার্থনা)

যুদ্ধোত্তর দুনিয়ায় সাম্যবাদের প্রসারকে অভিনন্দিত করেন 'ইতিহাস'[২১] শীর্ষক কবিতায়। সাম্যবাদের প্রতি তাঁর অবিচল নিষ্ঠা, সংশয়হীন, দ্বিধাহীন তিনি এই মতবাদে। চীন এবং কোরিয়ায় যখন মুক্তির আন্দোলন অত্যন্ত জোরদার তখনও তিনি সেই মুক্তিসংগ্রামের পাশে পাশে অবিচল নিষ্ঠায় তাঁর গান গেয়ে গেছেন। যুদ্ধবাজদের বিরুদ্ধে তাঁর তীব্র প্রতিবাদ ধ্বনিত হয়: 'তবুও দুর্গা বণিকের দল /শান্তির নামে ভীত চঞ্চল/কোরিয়ার নীল আকাশে ক্ষিপ্ত শকুনের মত ওড়ে/ মাটির উষ্ণ বাষ্পের তাপে দানিক ডানা পোড়ে।... / আমার শান্তিকপোতের আবেদনে/ স্বাক্ষর দেয় কোটি কোটি প্রাণ ব্যথিত ক্ষুব্ধ মনে।'[২২] (আমার শান্তি)। এভাবেই তিনি হয়ে ওঠেন সাম্যবাদের এক নিষ্ঠ চারণ-কবি। যে কবির প্রবল আবেগ ধ্বনিত করে 'এ্যানিকাকো'[২৩] ও 'উত্তরাকাশের তারা'[২৪] -র মত ঋজু, স্মিত ও সুগম্ভীর গদ্য কবিতা জন্ম দেয় তাঁকে রবীন্দ্রোত্তর গদ্যছন্দের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবিও বলা যায়। 'জয়ন্তী'[২৫] (ভারতীয় গণনাট্য সংঘের উদ্দেশে নিবেদিত) শীর্ষক কবিতাটিও একটি শিল্পপ্রয়াসের ফসল। কমিউনিস্ট পার্টি বেআইনী ঘোষিত হলে তাঁর কবিতার আবেগ ও বক্তব্য প্রচণ্ড তীব্র এবং তীব্র রূপ নেয়, সে সময়ের একটি কবিতা 'ক্ষুধা'[২৬] : 'ক্ষুধাকে তোমরা বেআইনী করেছ/ ক্ষুধিতদের আখ্যা দিয়েছ বিপজ্জনক/ হে দেশভক্ত মহানায়কেরা/ তোমরা ভুল বুঝোনা এই কবিতাকে/যদি বাজে মনে হয় তবে সমস্ত ক্ষুধার জগতকে/ ঝোলাও ফাঁসি-কাঠে'...। ক্ষুধিতের প্রতি, অসহায়ের প্রতি মানবিকতার এই বাক্সীপাঠ কবিকে দিয়েছে এক গরীয়ান মর্যাদা। এই বিশিষ্ট সুরটি প্রগতি সাহিত্য আন্দোলনের একটি বিশেষ দিক, যা কাব্যশিল্পে একেবারে উপেক্ষণীয় নয়।

কিরণশঙ্কর সেনগুপ্ত (জন্ম: ১৯১৮ খ্রীষ্টাব্দ) : প্রগতি সাহিত্য আন্দোলন যে- বিশিষ্ট আধুনিক কাব্যধারার প্রবর্তন করে তার প্রবল প্রবাহে স্বাতন্ত্র্যের স্বাক্ষর রাখেন কিরণশঙ্কর সেনগুপ্ত। ফ্যাসিজমের বিরুদ্ধে প্রবল প্রতিবাদ হিসেবে ১৯৪০ খ্রীষ্টাব্দে তাঁর 'নতুন খাঁচড়' কাব্যগ্রন্থটি প্রকাশিত হয়। কিন্তু লক্ষ্য করবার যে, সাহিত্যের রাজনৈতিক সুরই যেখানে প্রধান হয়ে ওঠে, সেখানে সাহিত্য পর্যবসিত হয় এক ধরনের উদ্‌বোধনায়। যদিও ফ্যাসিবাদের সম্প্রসারণ পর্বে বহির্বিশ্বের সাহিত্যিকরা যুদ্ধাকর্ষী এবং এদেশের সাহিত্যিকরা তাঁদের সহকর্মী মাত্র, যেখানে সাহিত্যকে দেখা হচ্ছে সংগ্রামশীল চেতনার বাহন হিসেবে, সেখানে স্বভাবতই একটি সংশয় ও সন্দেহ দেখা দিতে পারে। জনৈক 'ব' ছদ্মনামীয় সমালোচককে কবির রচনাশক্তি সম্পর্কে প্রশংসাবাণী উচ্চারণ করা সত্ত্বেও এ কথা বলতে হয়েছে, '...যে জিনিসটির অভাবে কবিতা অসার্থক সেই কাব্যপ্রাণ কবিকল্প ও আবেগই কবিতাগুলোতে অনুপস্থিত।'[২৭] কিরণশঙ্কর সেনগুপ্তের কবিতার যৌনমধুর প্রেমচেতনা, যে চেতনা সংরক্ত আবেগধর্মের অজ্ঞা কিন্তু দেশ-কাল সম্পর্কে অত্যন্ত সচেতন, দুটি মানুষের ভালবাসা একান্তই দৈহিক

কিন্তু তার বিস্তৃতি বিশ্বব্যাপী নীরাসৌন্দর্যের অভিব্যক্তিতে পূর্ণ। যেমন--'একদিকে আকাশে উড়েছে বিমানগুলি/ অন্যদিকে ছিঁড়েছে জড়ানো কুন্তলজাল। / নিভেছে নিশান ভেঙেছে খাবার থুলি। / ওড়ে নরমুণ্ড নীরবে অমানতার। / সুচরিতা মোর। তোমাকে তুলি কি বাঁধি।'[৫৮] (১৯৩৭-'৩৯)। বাস্তু বিস্মৃত প্রেম নয় এটি। এশিয়ার আসন্ন যুদ্ধের স্মৃতিবহ 'সুর'[৫৯] কবিতাটিতে বুর্জোয়া-জীবনের অবক্ষয়কে তুলে ধরেছেন কবি। সমসাময়িকতার সংবাদধর্মী প্রাধান্য পেয়েছে একটি কবিতায়: 'চেম্বারলেন কি চুপ থাকে, কিন্তু হ'য়ে তাই অনায়াসে/ অবাধ দমননীতি মনোল্লাসে অক্লান্ত দুহাতে/শোষিত ভারতবর্ষে, পূর্বপ্রান্ত হতে ভেঙে আসে/ প্রতিদ্বন্দ্বী দস্যুদল, তবু যেন তার তার সাথে/ বাড়াবাড়ি কিছু নেই। সিঙ্গাপুরে আর প্রত্যেদেশে কী বিষম মার খেলে।'[৬০] (কোনোও দুষ্টবুদ্ধি বণিককে)। ১৯৪২ খ্রীষ্টাব্দের জাপানী বিমান হামলায় কবির প্রতিক্রিয়া: 'নির্জিত জীবন। / কবে তার / আরো নানা দুঃসংবাদ তার। / শূন্য মন/ ত্রিশঙ্কুর মতো, / ঊর্ধ্ব নীচে আকাশ আসন।'[৬১] (অভিব্যক্তি)। তাঁর প্রশ্ন, সারা বিশ্বব্যাপী এই রক্তলীলার অবসান কবে। যুদ্ধক্ষত পৃথিবীর ভয়াবহতা তাঁর চোখে পাণ্ডুর ছায়া বিস্তার করে: 'অন্ধকার, যুদ্ধ চলে তাই নিষ্প্রদীপ / বণিক-নগরে, / সুতরাং ভীত নর-নারী / ঊর্ধ্ববেগে ধাবমান, পাণ্ডুছায়া তাদের অধরে।'[৬২] (দুর্যোগে)। কবিকে ইতিহাসের সংগ্রামী আহ্বানে সাড়া দিতে হয়: 'ইতিহাস দিয়েছে তো ডাক। / ভেসে রৌদ্রে নদীস্রোতে প্রান্তরে হাওয়ায়/ সম্মুখী সংগ্রামের সংকল্প অটুট /যাক [illegible] থাক---- / পরাজিত মনোবৃত্তি, তার মেঘ আজকেই কেটে যাক।' (ঐ)। কবিতার এই সাহসপূর্ণ তখনকার প্রায় সব কবিতারই সাধারণ বৈশিষ্ট্য। প্রায় সকলেই সংগ্রামী আহ্বান ও চেতনার উত্তরণ ঘটাতে চেয়েছেন ইতিহাস থেকে শিক্ষা নিয়ে। ব্রিটিশ-ভারতের সাম্রাজ্যবাদী পরিকাঠামোর প্রতি কবির আস্থা রাখার কথা নয়, তাই জনগণের সংহতিকে তাঁকে আশ্রয় করতে হয়েছে----'বিষণ্ণ আমলাতন্ত্র... দুর্গের পতিত পতাকায়/ একদিকে বিজিত লোক দৃঢ় ঐক্য গড়ে তোলে এক।'[৬৩] (ক্ষণিক)। যুদ্ধ মানুষের কাছে শুভবার্তা নিয়ে আসে নি, এ সত্য উপলব্ধি করেছেন কবি। তাঁর স্মৃতিতে ক্ষতচিহ্ন এঁকে দিয়েছে তেরশ' পঞ্চাশের দুর্ভিক্ষ: 'দুঃস্বপ্ন অন্ধকারে / বারে-বারে/ পথে যেতে পদতলে ঠেকেছে কঙ্কাল, / চকিত স্মরণে আসে / তেতাল্লিশ সালে যারা পায় নি তো চাল।'[৬৪] (বিশ্বলোক)। বর্তমানের দুঃসহ যন্ত্রণা কবিকে নৈরাশ্যাভিমুখী করে তোলে, তথাপি----'অনেক সংশয় তর্ক, তবু তো বিশ্বাস/ হৃদয়ে রেখেছি বারোমাস'---এই বিশ্বাস যে, বিশ্বলোকব্যাপী ক্ষুধিত শিশুর কান্না, অথবা ভিখারী আর যুবতীর অশ্রুজল নিয়েই যে সংসার, সেখানে সাময়িকভাবে বিশ্রান্ত বিশ্রাম হলে চলবে না, সেখানে অবশ্যই নিতে হবে দীর্ঘ সংগ্রামের শপথ। কবি তারই প্রতীক্ষায় রয়েছেন: 'যে বাঁচায় তারে নিয়ে আছি। / দরিদ্র কুটিরে, মুক্তির কানাকানি /... সর্বত্রই জীবনের স্বাধিকার প্রতিষ্ঠার বাণী, / তোমার আশায় তাই আছি বজ্রপাণি।'[৬৫] (প্রতীক্ষা)। কবিতাটিতে বোম্বেতে নৌ-বিদ্রোহের ইঙ্গিত থেকে মনে হয়, কবি হয়ত সাময়িক অভ্যুত্থানকেও স্বদেশহিতৈষণার দিক থেকে স্বাগত জানিয়েছেন। ১৯৪৬ খ্রীষ্টাব্দ কবির মনে যে প্রত্যাশা জাগিয়েছিল, গণ-আন্দোলনের ইতিবাচক ভূমিকাগুলি সম্পর্কে যেভাবে আশাবাদিতায় তাঁকে উৎসাহিত করে তুলেছিল কবিকে, সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা ও আনুষঙ্গিক বিভেদপন্থা তাঁর সেই প্রত্যাশা চূর্ণ করে দিল: 'ভুলতে পেরেছি তবু আদিমের জিঘাংসার স্বাদ? / অরণ্যপশুর মতো উন্মত্ততা, হিংস্রতার দৃঢ় আস্ফালন, / নিজেদের রক্তস্রোতে এ যুগের মানুষেরা সে-সকলি করেছে পালন।'[৬৬] (অরণ্য)। বেদনাকরুণ এমন অবস্থাকে সর্বকালের কোনো কবিই

মেনে নিতে পারেন না। কিরণশঙ্কর সেনগুপ্তও এর বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদে বিস্ফোরিত হয়েছেন অন্তরে-বাহিরে---কবিতায় তারই স্বাদ আমরা পাই। প্রথম দিকের ব্যক্তিগত প্রেমচেতনা পরবর্তীতে তাঁকে টেনে এনে দাঁড় করিয়ে দিয়েছে যুগ-সংকটের সামনে, দেশের সমস্যাকীর্ণ পরিস্থিতির অভ্যন্তরে আর কবির সুতীব্র মুক্তি-আকাঙ্ক্ষাও জাত হয়েছে এর ভেতর থেকে। দুর্বল চিত্রকল্প, আবেগের আতিশয্য, মৌল কবি-কল্পনার অভাব, একই ছন্দের (অধিকাংশ কবিতাই তানপ্রধান ছন্দে রচিত) পুনরাবৃত্তি তাঁর ত্রুটি বিশেষ হিসেবে আমাদের কাছে প্রতিভাত হয়েছে। সাময়িকতার ক্ষেত্রে কবি নিজেকে বন্দী রেখেছেন, তাঁর বিশ্বাস, আশা কোনটাই উজ্জ্বল আত্মপ্রত্যয়ের দৃঢ়তা ব্যক্ত করে নি। তাঁর গুণ অন্যত্র। সেটি হল তাঁর বিশেষ বাচনভঙ্গি, বাক্যের নিপুণতা, প্রচারধর্মী বক্তব্যকে সহজ দক্ষতায় কাব্যে রূপান্তরিত করা আর অন্তরের ক্ষোভকে অনবদ্যভাবে পাঠকমনে সঞ্চার করে দেওয়ায়।

মণীন্দ্র রায় (জন্ম: ১৯১৯ খ্রীষ্টাব্দ): এই আন্দোলনের অন্যতম প্রতিশ্রুতিবান কবি। দীর্ঘ কবিতাতেই এঁর আবেগের স্ফূর্তি। চেষ্টা করেছেন, কবিতাকে সাময়িকতার ভেতর থেকে টেনে তুলতে এবং তাঁর উত্তরণ, এক কথায় সফল বলতে হয়। 'ত্রিশঙ্কু', একচক্ষু', 'ছায়াসহচর', 'সেতুবন্ধের গান' এই কাব্যগুলি এই আন্দোলন-পর্বের রচনা। কবি বিশ্বাস করেন, কোন কবিই সমাজের বাইরের বাসিন্দা নন, তাঁর মতে, 'একটি বিশেষ দেশের বিশেষ সময়ের সমাজই কবিকে জোগায় তাঁর কাব্যের উপাদান।'[৩৭] তিনি মনে করেন, সার্থক ও মহৎ কবিতার পেছনে থাকে কবির চিন্তার বিচিত্র ও ঐশ্বর্যবান এক অভিজ্ঞতাসমৃদ্ধ জগৎ।[৩৮] কবিরা তাঁদের সৃষ্টিশীল রচনায় কেউ কেউ প্রচার চালান নিজের স্বাধীনতার পক্ষে---এ ব্যাপারে অন্যান্য মার্কসবাদীদের মত তাঁরও স্পষ্ট বক্তব্য: 'বুর্জোয়া সমাজে ব্যক্তির স্বাধীনতা আসলে প্রকৃত স্বাধীনতা নয় বলেই কবিরা হয়ে ওঠেন ব্যক্তিকেন্দ্রিক ও সমাজবিচ্ছিন্ন।'[৩৯] শিল্পতত্ত্বের দিক থেকে তো বটেই, প্রত্যয়ের দিক থেকেও প্রগতি সাহিত্য আন্দোলনের সঙ্গে তাঁর যোগ আত্মিক ও আন্তরিক। পৃথিবীময় 'বেদনার জ্বলন্ত প্রবাহ'-এর ভেতরে সংবেদনশীল এই কবিকে অনিবার্য অবগাহন করতে হয়েছে---এই অবগাহন অকারণ নয়, চেতনায় নতুন পৃথিবীর সুপ্রসম্ভাবনা জেগেছে: 'সুদূর দিগন্তপারে নতুন পৃথিবী এক হয়েছে উদয়, / আমার বিহঙ্গপ্রকৃতি মুখরিত কূজনে/ করে দেখে তার বন্দন।'[৪০] (মুক্তি)। 'ত্রিশঙ্কু' কাব্যের মধ্যে তাঁর আত্মানুসন্ধান যে অদ্ভুত অনুভূতি নিয়ে বিদ্যমান ছিল, পরিণামে আর সময়ের সংকটকালে সেই সচেতনতা আরও তীব্রতা পেয়েছে 'ছায়াসহচর' কাব্যে। এই ছায়া পৃথিবীর কুটিল সংকট, সর্বজনের সঙ্গী, কবি তাঁর সন্ধান ব্যাপৃত রেখেছেন তাই মুক্তির ক্ষেত্রে। মণীন্দ্রের অন্বেষণের সীমাক্ষেত্র বিষ্ণু দে-র দৃষ্টি এড়ায় নি, বলেছেন, 'বহির্বিলাসী প্রগতিবাদের তুচ্ছতা ও অন্তর্বিনাশী আত্মসর্বস্বের ব্যর্থতার গ্লানি মুক্তি পায় যে আকস্মিক অবৈকল্যে চৈতন্যের অখণ্ডতায়, মনে হয় তার আভাস মণীন্দ্রের কাব্যচৈতন্যে বর্তমান।'[৪১] একচক্ষুতে' তারই পূর্বাভাস: 'ছায়া পড়ে স্নায়ুতে শিরায়: / কালের প্রবাহ আর আমার ভিতরে ছায়া পড়ে।'[৪২] (একচক্ষু)। সেজন্যে এই সময়

ও সংকটে পড়ে কবি বিভ্রান্তও হয়েছেন : 'উৎকেন্দ্রিক তার পাখনায় / হায়, হতভাগ্য আমি, নাভিচ্যুত গ্রহের মতন / ভ্রান্তির বিমূঢ় শূন্যে করি চংক্রমণ।' (একচক্ষু)। 'সুবাসিত আত্মসচেতন' যিনি, 'জনসভা, ধর্মঘটে করেছি সতত/সাম্যের অনন্ত সুখ আমিও কীর্তিত---তবুও তাঁকে কেন ভ্রান্তির শিকার হতে হয় ? অভিজ্ঞতা, বিশেষত মার্কসীয় বিশ্ববীক্ষা, আর্থসামাজিক ও আর্থরাজনৈতিক সমস্যাবলি বিশ্লেষণের সম্যক বিশ্লেষণ তুলে ধরতে সাহায্য করেছে কবিকে : 'অসম্ভব । এ-দুর্যোগে নেই অব্যাহতি। / আমারে টানিছে মোর আত্ম-অসংগতি।/ বৃথা মার্কসবাদ, বৃথা কৃপাভিক্ষা, স্তব,/কবে মোর জড়ায়েছে বিপদের সূর্যপুঞ্জ নির্মিতুল সব,/...তবুজানু এ কালের উজ্জীবন-সম্ভাবনা-হীন / বিবতি বুদ্ধির শূন্যে একচক্ষু পলায়নে যদি সূর্য বিভ্রান্ত হরিণ।' (একচক্ষু)। এই প্রেক্ষিতটার ওপরে কবির আঘাত সিদ্ধান্ত : 'উজ্জ্বল অতীত হ'ল আকাশ্রী টীকা।/ ইতিনাম মার্ক্স, মার্ক্স মোতর পতাকা।/বন্দরে নিঃশঙ্ক যত বিদ্রোহী সামাসী।। /...আলোড়িত অন্ধকারে মৌন অট্টহাসি। / আসন্ন দুর্যোগ, মোরে প্রগতির চাকা।'[৪৩] (নবচতুর্দশপদী-১)। অর্থনৈতিক বিশ্লেষণ লোককবি 'ভ্রান্ত-ভ্রাতাগণের বিবৃতি'তে এক চূড়ান্ত রূপ পেয়েছে। ফ্যাসিবিরোধী যুগে দেশীয় মানুষের নিশ্চেষ্টতা তাঁকে পীড়িত করেছে---'পুড়ে হয় খাক /নগর, পল্লীর মাঠ। তবু নেই ক্ষোভ। আপন বাসার লোভে/ আপনাকে করে পরিহাস।'[৪৪] (ভ্রান্ত-ভ্রাতাগণের বিবৃতি)। 'সর্বহারার পত্র' কবিতাটি সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের 'অতঃপর' কবিতার আঙ্গিক রীতিকে স্মরণ করিয়ে দেয়। ক্ষুধা-ব্যাধি-যন্ত্রণাক্লিষ্ট সমুহ বাংলাদেশ---অথচ মধ্যবিত্ত শ্রেণীর মানুষ এখনও দ্বিধাদীর্ণ, কবির আবেগ ও প্রশ্ন একই সঙ্গে জেগে ওঠে : 'এরপরও দ্বিধায় কি থমকিত থাকবেন?'[৪৫] ফ্যাসিবিরোধী যুগের এই দ্বিধা ও দৈন্যতার বিরুদ্ধে কবিরা বেছে নিয়েছিলেন মানুষকে সচেতন করবার দায়িত্ব: 'তাঁদের হাতে আছে সাধারণ লেখনী এবং মনের মধ্যে অসাধারণ দেশপ্রেম। ফ্যাসিস্ট অত্যাচারের বিরুদ্ধে এই দুটি মাত্র জিনিস সম্বল করে তাঁরা প্রস্তুত হয়েছেন দুরাগত আক্রমণকারীর বিরুদ্ধে জনমতকে জাগ্রত করবার দায়িত্ব গ্রহণ করতে।'[৪৬] দুর্যোগসংকুল পরিস্থিতিতে কবিকে সততার সঙ্গে বলতে শুনি---'সুসত্য অত্যুৎসাহী জানি জানি এখনো কঠিন'-----তবুও সততার গুণ যে নবীনশক্তি লোপ করতে তৎপর হয়, তারই জন্যে যে কোন দুর্যোগ অতিক্রম করা সহজ হয়---এই বিশ্বাসের অভিব্যক্তি পাই 'অন্তর্বীন'[৪৭] (?) কবিতায়। দুর্ভিক্ষ তাঁকেও দিয়েছেন এক তিক্ত অভিজ্ঞতা: 'আউশ ডুবেছে বর্ষায়, গেল আমন খরে, / বিচালি বিহীন শীর্ণ বলদ কশাই কিনেছে জলের দামে, / মেয়েটা শান্তঃ চুপচাপ ঘরে/ভাবনা নামে।/ বউয়ের শরম রাখে না গ্রাম্য-ঘোমটায়, আমি শহরে হেঁটেছি: / কত কোটিপতি রয়েছে, থাকই দু'মুঠো পেটে।'[৪৮] (অনুভব)। দুর্ভিক্ষ যে চরম দুঃখই বহন করুক না কেন, কবির অক্লিষ্ট ভাবনা--- 'কোথাও আছেই শেষ'। 'সেতুবন্ধের গান' কাব্যটি দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর পর্বের। এ পর্বে 'অন্তর্মুখী চেতনার পীড়িত প্রকরণের সঙ্গে পূর্বের বহির্মুখী সমাজচৈতন্যের সেতুবন্ধন ঘটেছে বলে মনে করেন সমালোচক।[৪৯] যুদ্ধশেষের পর্ব কি শান্তির ?---'বিজয়ী যোদ্ধৃজনতা, চলেছ দেখি/ দেশবিদেশের সীমান্ত থেকে ঘরে।/ পাঁচটি বছর

ছুঁয়েছে যেদিন, সে কি/ আসে এ বিদ্রোহী সূর্যের খুঁজিতে ? /...যুদ্ধজয়ের সুযোগ পেয়ে/ রূপনেতাদের ডাকবে শান্তিজয়ে ?'[৫০] (পরিক্রমা-১)। ভারতের একমাত্র আশা——'যুদ্ধ জিতেছি, হব স্বাধীন'——কিন্তু বহু প্রত্যাশিত সেই স্বাধীনতা এল না, তার বদলে ১৯৪৬ খ্রীষ্টাব্দে শুরু হল দাঙ্গা, হানাহানি। অন্যদিকে চট্টগ্রাম আর গোয়ালিয়রে প্রতিরোধ, গণ-আন্দোলন ও ধর্মঘট প্রভৃতি ঘটনা একটি ঐতিহাসিক পটভূমিও গড়ে তুলছিল, তাছাড়া ১৯৪৬-এ কেন্দ্রে যুক্ত-মন্ত্রিসভা গঠনের ও প্রাদেশিক আইনসভা নির্বাচনের বিষয়টিও ছিল এই পর্বের মুখ্য বিষয়। কবিতায় তার ছাপ : 'ঠকের সঙ্গীত/ তোমায় তাদের। /তোলো নির্বাচনী রণে/ আসমুদ্র সংগ্রামের কুহকী তিমির। / তবুও বিভ্রান্ত, আসে আশার ছলনে/বৈদেশ্যেরই দুয়ারে। দিন-এ ধর্মঘটী তিমু।'[৫১] (জানুয়ারী'৪৬-গোয়ালিয়র)। ১৯৪৬ খ্রীষ্টাব্দের শেষ দিকে বঙ্গীয় কৃষক সমিতির আহ্বানে শুরু হয় তেভাগা আন্দোলন। 'সুন্দরপুরের কাব্য' বিচিত্র ছন্দ-ব্যবহারের দিক থেকে তো বটেই, বিষয়ের মহত্ত্বেও তার তার গরীয়ান প্রকাশভঙ্গি কবির সংগ্রামী ভূমিকাকে তুলে ধরেছে এই দীর্ঘ কবিতাটিতেঃ 'যারে না দুর্ভিক্ষ তারা, জা জানে নাকো মজুতের রীতি। /তুরাদি-চাষীর ঘরে কৃষাণ-সমিতি/ দিয়ে গেল ডাকঃ/সবার মুক্তির দাবী মুক্তি দিয়ে যাক।'[৫২] একক মুক্তির চেষ্টা বিফল, তাই ব্যক্তির মুক্তিকে সমষ্টির মুক্তির সঙ্গে মিলিয়েই প্রলেতারিয়েতের বিপ্লবপ্রয়াসকে সম্পন্ন করার কথা কবিকে বলতে হয়েছে। এই মুক্তিচেতনা শুধু কর্মজগতের স্তরে নয়, অবকাশের সঙ্গেও তা সংশ্লিষ্ট। বিহারী ঘুড়ির ছেলেটা এভাবেই 'তুলে ধরে দীপ্ত রাঙা ঘুড়ি।'[৫৩] (ঘুড়ি)। এই কবিতাটি সরোজভাবে ঘনীভূত হয়েছে একই সঙ্গে খণ্ড স্বাধীনতার বেদনায় ও উদ্বাস্তুর মর্মযন্ত্রণায়('উন্মূলিত মানুষের দুঃস্বপ্ন সে স্মৃতি ভাসে ভাসে অর্জিতের দুঃসাহস জ্বালে')। 'শীতলাই' (পাবনা জেলার একটি বিখ্যাত গ্রামও বটে) কবিতায় স্বাধীনতা-সম্পর্কিত বক্তব্যে কবি উদ্দিষ্ট কর্মীর সত্যভাষণই সার্থকঃ 'ঘুমপাড়ানিয়া গানে বুলবুলি খেয়ে গেল ধান,/ হা অন্ন এই চুয়াল্লিশ যেন ডাকে পঞ্চাশে/সেখানে কোথায় স্বাধীনতা, এই আমন ধান ?'[৫৪] (শীতলাই)। আবেগের সঙ্গে মননের, সমাজচেতনার সঙ্গে ইতিহাস-বোধের, সর্বোপরি গভীর আত্মজিজ্ঞাসা থেকে উঠে এসেছে 'সেতুবন্ধের গান' শীর্ষক কবিতাটিঃ'আমার পৃথিবী হবে ধুলোর প্রাসাদ? /এই সুপ্রভাত, এই মমতা অগাধ/ সবই তুচ্ছ, সবই দুঃস্থ, ক্লীব ?/নিঃসাড় নির্জীব ?'[৫৫] পঞ্চাশের শান্তি-আন্দোলনকে মণীন্দ্র রায় ভারতের সর্বহারা মানুষের দিক থেকে দেখতে চেয়েছেন। কমিউনিস্ট দল তখন বেআইনী, সশস্ত্র বিদ্রোহের আহ্বান জানিয়েছেন বি. টি. রণদিভে, জওহরলাল ও তাঁর সরকারের বিরুদ্ধে তীব্র শ্লেষের সুরে কবি বলেন——'কেড়েছে ক্ষুধার অন্ন, লজ্জার কাপড়, ভিটে মাটি,/ নতুন দাতার নীতি ভেঙেছে সমাজ পরিবার,/...এখানে শান্তি কোথা ?.../...শান্তি পাব মৃত মাঠে সাম্যগীর্ণ প্রাণের উদ্দেশে।'[৫৬] (শান্তি পাব)। সাম্প্রতিকতার সঙ্গে অতিনবত্বের এইসব স্বাদ বাংলা আধুনিক কবিতায় স্থায়ী সম্পদ।

মঙ্গলাচরণ চট্টোপাধ্যায় (জন্মঃ ১৯২০ খ্রীষ্টাব্দ)ঃ প্রগতি-ধারার আর একজন বিশিষ্ট কবি। কর্মী ও কবিসত্তাকে মেলাতে চেয়েছিলেন তিনি, বস্তুত তাঁর কথায় এই সত্যের উচ্চারণ রয়েছেঃ...'যে-সুধার কিছুকাল

পরে 'পরিচয়' পত্রিকার সম্পাদনার দায়িত্ব নিয়ে আমি সহযোগিতা করেছি তা আমার পক্ষে বিচ্ছিন্ন কোনো সাহিত্যকর্ম ছিল না, তা ছিল সেই সুদূর ১৯৩৪ সাল থেকে 'পরিচয়'-এর সম্পাদনা-বিভাগের কর্মী হিসেবে এবং ফ্যাসিস্ত বিরোধী ও প্রগতি লেখক সঙ্ঘের কর্মী ও সম্পাদক হিসেবে আমার কাজের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গী যুক্ত। আর এই সব কিছুই ছিল সাহিত্যকর্মীর স্বরূপে আমার কমিউনিস্ট হয়ে ওঠার প্রয়াসের অন্তর্গত।[৫৭] অবশ্য সাহিত্য সাধনা চলছিল ১৯৩৩ খ্রীষ্টাব্দের আরও আগের থেকে, ১৯৪১-এ 'স্বায়ু', ১৯৪২-এ 'মনপবন' নামের দুটি ছোট কাব্যগ্রন্থ প্রকাশিত হয়। ১৯৪২ খ্রীষ্টাব্দের আগেই তিনি মোটামুটি 'লাল ঢেউ আর লাল আগুনের' আঁচ পেয়েছিলেন। 'হৃৎস্পন্দনে দ্রুত ছন্দ/লাল ঢেউয়ে ভেসে যাই ভেলাতে।'[৫৮] (রক্ত)। অন্যত্র তাঁর চোখে পড়েছেঃ 'জ্বলে! লাল আগুন জ্বলে!'[৫৯] (কে)। ফ্যাসিবিরোধী যুগে অনিবার্য ছিল এই একটি প্রশ্নঃ 'কার রক্তের ওপে/ নতুন দিনে/ জ্বলবে সেই আগুন ?' (কে)। প্রথম থেকেই এই আত্মসচেতন ও সমাজসচেতন মনন-জিজ্ঞাসা কবির অভিজ্ঞতার সঙ্গে যুক্ত হয়ে কবিকে আকর্ষণ করেছে নিসর্গের বস্তুগত উপাদানসমূহের প্রতি। কবির সূক্ষ্মতা অথবা নির্মিতির উপকরণ সংগ্রহে প্রকাশ পায় নি, প্রকাশ পেয়েছে এর কাব্যভাষা-নির্মাণে, উপমা ও চিত্রকল্পের বিশিষ্ট ও স্বতন্ত্র ব্যবহারে, সংগীতগুণের মুখ্যতায়, সংক্ষিপ্তি, বিশ্লেষণশীল জিজ্ঞাসার সঙ্গে আবেগের অথবা হৃদয়ের সরল কিন্তু দৃঢ় বিশ্বাসবোধে। মার্কসবাদী কবিদের রচনায় যে ধরনের শ্লেষ ও বিদ্রূপ প্রকাশ পায়, মঙ্গলাচরণ তার থেকেও বিরত থেকেছেন। এভাবেই তিনি নির্মাণ করে নিতে পেরেছেন নিজস্ব একটি পরিমণ্ডল। এক-একটি শব্দই তাঁর কাছে অমোঘ শব্দব্রহ্ম হয়ে ওঠে, বাক্যের গঠনবুনানীর অন্তর্নিহিত বিন্যাসের জটিলতাকে আত্মসাৎ করেঃ 'ক্লান্তি। মৃত্যুই শান্তি। তির্যক জীবন।'[৬০] (জলতরঙ্গ)। এই রীতি মঙ্গলাচরণের পূর্বে একমাত্র কবি অমিয় চক্রবর্তীর রচনায় সার্থকভাবে মেলে। চিত্রকল্প নির্মাণেও তাঁর অবিসংবাদিত দক্ষতাঃ 'একটি মেয়ের চোখ আমাকে বারবার মনে পড়ে। / প্রথম প্রাণের কথা হঠাৎ উৎসুক সেই চোখে,/ টিয়াপাখি-রঙ শাড়ি মেলায় ঝিমঝিম ঃ বলে লোকে। / এমনি মেয়ের চোখ হঠাৎ বারবার মনে পড়ে।'[৬১] (মনে পড়ে)। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ প্রত্যক্ষ বাংলাদেশে আঘাত হেনেছে দুর্ভিক্ষের তীব্রতায়, মঙ্গলাচরণ সে-আঘাতে অস্থির হয়েছেন। প্রত্যাঘাতের আবেগ আছে তাঁর কবিতায়, কিন্তু হয়ত এই আবেগের স্বতঃস্ফূর্ততা অনেকটা ব্যাহত করেছে বলে মনে হয়, যেমন ---'সামনে পাকা ফসল, লোভী শকুপাল, তাই এক আকালে শেষ নয়---/মৃত্যু জোর দুহাত তোলে ওরা বসতিতে বারবার। জোট বেঁধে সব জোট!'[৬২] (প্রশ্ন)। এ কথা বলবার উদ্দেশ্য আমাদের নেই যে, মঙ্গলাচরণের কবিতাগুলি কেবলি রীতিসর্বস্ব, বরং এই জটিল রীতিগুলিকে আত্মীভূত করার পরেও তাঁর কবিতার বিশিষ্ট সৌন্দর্য ও সহজ আবেদনের [illegible] একটি দিকও আছে যাতে শ্রেণী-আবেগের পরিণতি দেখতে পাওয়া যায়, দেখতে পাওয়া যায় গণ-আন্দোলনগুলি সম্পর্কে তীব্র সচেতনতা, যুগ-কালের বিশালতর প্রেক্ষিতকে উপলব্ধি করার বিশ্লেষণধর্মী প্রয়াস। এবং এই বস্তুনিষ্ঠতা তাঁর দায়কে প্রাজ্ঞশিল্পীর পুরোচারী ব্যঞ্জনায় প্রকাশ করতেও সমর্থ হয়েছে। গণ-সাহিত্যের বিশিষ্ট রূপক তাঁর

'মেঘবৃষ্টিঝড়' কাব্যগ্রন্থটি। ১৯৪৪ খ্রিস্টাব্দে তিনি লিখেছিলেন, 'নির্জন অন্ধকারে পথচলার শেষ নেই।/নেই নেই। নেই তো দিনান্ত দিকভ্রান্ত।'[৬৩] (ঘুম নেই)। দুর্ভিক্ষ-পরবর্তী বাংলাদেশের সংকট---সামাজিক-রাজনৈতিক এবং অর্থনৈতিক, উত্তরোত্তর সত্যি সত্যি আশার আলো দেখবার প্রস্তুতি ছিল না কোথাও, তথাপি মানুষের যাত্রা তো থামে না, থামেও নি, 'তবু তো ঘন অন্ধকারে চলবেই'---এই উপলব্ধিতে ছিল না প্রত্যয়ের কোন রেশ। মনে হয়েছিল---'এই বাংলাদেশ। আর সুপ্রদেশ এবার,' কিন্তু সেই সঙ্গে এও মনে হয়েছিল---'সূর্যের দুর্বহ সে এই দেশের দেখা সেই মাঠ ও মাটি, নদীর---/মৃত্যুর বন্যায় বাঁধ-বাঁধার চেষ্টায় আমরা যার দোসর।'[৬৪] (জলতরঙ্গ)। ক্ষীণ আর ক্ষুদ্র চেষ্টা। সন্দেহ নেই। কারণ এরা কয়জন এখনও শুনতে পায়: 'শুনবে কান: 'আয় বুনবি বীজবান, তুলবি ঘর'।' কেননা, 'সেখানে শেষ বাঁধ-বাঁধার খাল-কাটার চেষ্টায় আমরা একজোট।'[৬৫] (নূতন)। দুর্ভিক্ষ এক গভীর বিপর্যয়কর স্মৃতি হিসেবে এদেশের মাটিতে সূচনা করে কৃষক-আন্দোলন---তেভাগা তারই পরিণতি। মাদুর-পোড়া, খাঁ-খাঁ বুক আর ভাঙা শরীরের মানুষ তাঁর ভাবনায় ছায়া ফেলে: 'কভি ঝুঁকে ঝুঁকে বীজ বোনা দেখে তুলব ঢেঁকাই যখন/ না-খেয়ে না-খেয়ে ক্ষেতো কাক হি হি হিমে হাড় কাঁটা কাঁপায়/...বর্গী তাড়াব দেশ থেকে, বুলবুলিকে বাঁধব খাঁচায়।/ আজ আমাদের মালিক আমরা---তোমরা সাক্ষী করুন--/ আউসে ধন্য আমায়, আমনপক্ব প্রচুরায়ণ।'[৬৬] (আউসে ধন্য আমায়)। বিপর্যস্ত গ্রামবাংলা তাঁর চেতনায় বারবার হানা দেয়, উপদ্রুত আর বিপন্ন অস্তিত্ব-সংকটের আবর্তে পড়া গ্রামই হয়ে ওঠে তাঁর প্রিয় স্বদেশ, তাঁর ধর্ম, তাঁর ধ্যান: 'একটি ঘুঘু ঘুম, ঘুমের টানেই/মাঠ এবার মাঠ, মাঠের কিনার/মেঘ ভেজের বন, হঠাৎ দু'পাশ/নারিকেলের ঝালর, ঝরা পাতার/ নদী ঢেউয়ে শুকতারার আসর।/কেবল ফিরে ফিরে আসাই কেবল/একটি ঘুঘু ঘুম, ঘুমের টানেই/এই আমার দেশ আমার দেশের।'[৬৭] (এই দেশ)। এই ঘুমের সঙ্গে মিশে বিপ্লবী কুশিয়ারের, জোনাকজ্বলা অন্ধকারের, এই ঘুমের সঙ্গে মিশে আছে জীবন-মরণের সার্বিক অস্তিত্বের সমস্যা। কেননা বাংলাদেশের মূল অর্থনীতি কৃষিনির্ভর এবং এর অর্থ গ্রামনির্ভরতা---অথচ গ্রাম উপেক্ষিত, নগরের খাদ্যসম্ভার যাত্রা কোথায়, বঞ্চনা আর শোষণের অভিঘাত তাদের জীবনেই প্রথম আসে। সম্ভবত এই সত্য মর্মে মর্মে অনুভব করেছেন মঙ্গলাচরণ। প্রগতি সাহিত্য আন্দোলনে যে সমস্ত কবিরা সামিল হয়েছিলেন, তাঁদের প্রত্যেকেই মানসিকতার দিক থেকে নগরমনস্ক, মঙ্গলাচরণও নগরমনস্ক, কিন্তু, তাঁর প্রবল ভাবাবেগ আলোড়িত হয়েছে গ্রামকে কেন্দ্র করে, বিশেষত অর্থনৈতিক বঞ্চনার এক সুস্পষ্ট রূপ তিনি কাব্যের আকারে প্রকাশ করতে ব্যাকুল হয়েছেন। এইরকম আন্তরিক ব্যাকুলতা বাংলা কাব্যে খুব কম চোখে পড়ে। মঙ্গলাচরণ চট্টোপাধ্যায় এই গ্রামকে তাঁর বিনম্র শ্রদ্ধার্ঘ্য অর্পণ করেছেন:

...'আমি মাঠ-ঘাট-হাট-জোঁওয়া রাখি প্রণাম', 'বাংলাদেশ, লহ প্রণাম, প্রণাম।'[৬৮] (প্রণাম)। এই গ্রামই হঠাৎ জেগে উঠেছে নতুন যুগে হাঁই দিয়ে---'অবাক খবর: শুনি, তোমরা নাকি ফিরে ফিরছ ঘরের/খাটনি দিয়ে ভেঙা বাঁধলে, বুকের বেড়ায় ঘেরা ভিটেয়/লক্ষ্মীর আসন পাতলে, হাঁই দিলে নতুন যুগে আবার?'[৬৯] (পাড়ি)। তবু' কবিতাটিতেও দুর্ভিক্ষের স্মৃতি, শোষণের যন্ত্রণা আর তেভাগা-আন্দোলনের পরোক্ষ প্রভাব অনুভূত হয়। 'পঞ্চাশের

মড়ক ফেলে পেছনে' যে চাষী বউকে নিয়ে কতজনের মধ্যে সামান্য ছাউনি তোলার সূত্রপাত করে চলেছিল, তার প্রথম দায় ছিল: 'দেশজোড়া এ-বুলবুলির বংশগত দায় বাতিল' করা। এর জন্যে চাই সর্বাত্মক সংগ্রাম। সম্পত্তির সঙ্গে সঙ্গে এসেছে তার সুরক্ষার ব্যবস্থা---এ কথা মার্কসেরই কথা। এই বিশাল রক্ষীবাহিনীর বিরুদ্ধে সাধারণ কৃষকপ্রজার লড়াই অনেকটাই অ-সম, তবু সামান্য শক্তি সম্বল করে তেভাগার কৃষকশ্রেণীর ব্যাপক স্বাধিকার প্রতিষ্ঠার লড়াইকে কবি ছোট করে দেখতে পারেন না---তাঁর চোখে সমস্ত ছবিটা এইভাবে ধৃত হয়েছে: 'এবার তাই বর্গী এল সঙ্গে বুলবুলির, / পাইক এল পেয়াদা এল ভাগাড় থেকে শকুন,/বন্দী এল ডুলি এল, গাঁয়ে উঠল শ্মশান,/এবার বুঝি রেহাই নেই বউ, মরদ জোয়ান।'[৭০] (তবু)।'ধানীরঙের মন-কেমন'-করা কৃষক জাগ্রত রাজনৈতিক চেতনা নিয়ে মঙ্গলাচরণের কাব্যে বলতে পেরেছেন 'তবু থাকব ঘরে ঘরের বউ, মরদ জোয়ান।'মঙ্গলাচরণের প্রতিবাদের ধরনটাও একটু ভিন্নধর্মী। সুকান্তের ভেতরে সংক্ষুব্ধ ক্ষোভ আমরা লক্ষ্য করি, অথবা সুভাষের তীব্র আত্মবিশ্বাসী কণ্ঠস্বর, মঙ্গলাচরণের মধ্যে গর্জনশান্ত অথচ চড়িয়ে প্রতিবাদী এই বিশিষ্ট মেজাজটির স্বকীয়তা তাঁর কবিতার সঙ্গে (বিশেষত শেষ দিকে) কেমন ব্যাপ্ত হয়ে গেছে। ভঙ্গির দিক থেকে তা মোটেও সরল নয়। এই মেজাজটির সঙ্গে অংশত মিল চোখে পড়ে চিলির কবি পাবলো নেরুদার। নেরুদার সঙ্গে এইখানেই শুধু মিল নেই, আছে যতি-চিহ্ন ইত্যাদি চিহ্নের ব্যবহারেও। শব্দের সরল রীতি ভেঙে, বাক্যের গড়ন ভেঙে মঙ্গলাচরণও তাঁর কবিতায় একটা বৈচিত্র্য আনার চেষ্টা করেছেন। সাম্প্রতিকতাকে অশেষ নৈপুণ্যে ব্যবহার করেছেন এই কবি। ১৯৪৬ খ্রীষ্টাব্দে সম্মুখের চরে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা প্রতিরোধ করতে গিয়ে নারমোহন দেব প্রাণ হারান। এই প্রেক্ষিতে '১৯৪৭, গ্রীষ্ম' কবিতাটি রচিত: 'সবই যে উধাও, তবু মিল, হৃদয়ে হৃদয়ে পারাপার, / খিল/খুলে দাও: ঘরে-বাইরে একাকার, / সাথি/ সাইন সাইন যাও যাও...মুক্তি মুক্তি... মুক্তপক্ষ জীবনের ঘুম! /......মেঘবার মোহানার খোলা জল ভাঙলো শুধু শুধু, সেই দ্বীপ দ্বীপ / সমুদ্রে সন্দ্বীপ : তার / কর্ণ জাগে প্রেমে পূর্ণ সম্পূর্ণ মানুষ।'[৭১] (১৯৪৭, গ্রীষ্ম)। এ পর্বের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবিতা 'নিশাচর কামদুগ্ধ বুদ্ধ'।[৭২] কবিতাটি সম্পর্কে দুর্বোধ্যতার অভিযোগ এনেছেন আর এক কবি---মণীন্দ্র রায়।[৭৩] প্রত্যুত্তরে মঙ্গলাচরণও কয়েকটি ত্রুটি ও দুর্বলতা স্বীকার করেছেন।[৭৪] ইংরেজ-রাজত্বের দুশো বছরের শাসন-শোষণের ঐতিহাসিক অবস্থা থেকে সাম্প্রতিককালের নৌসেনা-বিদ্রোহ, কাশ্মীর, ত্রিবাঙ্কুর আর হায়দরাবাদের প্রতিটি গণ-আন্দোলন এ কবিতার বিষয়বস্তু হয়ে উঠেছে। গম্ভীর মন্ত্রোচ্চারণের অনিবদ্ধে এ কবিতার সংগীতগুণ বিষয়টিকে অত্যন্ত গরীয়ান করে তুলেছে। তেলেঙ্গানার সশস্ত্র কৃষক-বিদ্রোহকে স্মরণ করে লেখা 'শিশুরাষ্ট্র তেলেঙ্গানায়'[৭৫] বাংলাদেশের হতদরিদ্র চাষীর পুঞ্জিত ক্রোধকে যথার্থ ভাষা দিয়েছেন কবি। '২৯-জুলাই, ১৯৪৮'[৭৬] কবিতাটিও সাম্প্রতিকতার দলিল। শান্তি-আন্দোলন প্রসঙ্গকে ছুঁয়ে গেছে 'শান্তি নেই'[৭৭] কবিতাটি। শান্তি জীবন-বিচ্ছিন্ন দাবি নয়, জীবনের জন্যেই এই সঙ্গত দাবি: 'শান্তি চাই আমি। / জমি চাই, কাজ চাই, এ-জীবনে বাঁচতে চাই/শান্তিতে বাঁচার অধিকার, /শান্তি চাই আমি।'[৭৮] (শান্তির সপক্ষে)। ১৯৪৯ খ্রীষ্টাব্দে বিনাবিচারে বন্দী কমিউনিস্টদের মুক্তির দাবির মিছিলে গুলি চলে নিহত

হবনতিকা সেন, প্রতিভা গাঙ্গুলি, গীতা দত্ত ও অমিয়া---কবিতাটিতে সেই বেদনাও প্রকাশিত হয়েছে। মঙ্গলাচরণ চট্টোপাধ্যায় এভাবেই সাম্প্রতিক প্রসঙ্গকে কাব্যায়িত করার সচেতন প্রয়াসে ব্রতী হয়েছিলেন যার মূলে রয়েছে প্রগতি সাহিত্য আন্দোলনের সুনির্দিষ্ট আদর্শ ও লক্ষ্য। ১৯৫০ খ্রীষ্টাব্দের ১০ অক্টোবর বরাহনগরে প্রগতি লেখকদের ও বুদ্ধিজীবীদের সম্মেলনে রচিত ঘোষণাপত্রের আলোচনা প্রসঙ্গে মঙ্গলাচরণ বলেন, 'সাহিত্যে স্লোগানসর্বস্বতা পরিত্যাগ করে বিষয়বস্তু ও আঙ্গিকের সমীকরণ করা একান্ত প্রয়োজন।'[৭৯] এ কথা ঠিক যে প্রগতি সাহিত্য আন্দোলনে দীর্ঘদিন ধরে কাব্যের করণকৌশলের প্রতি বেশি জোর দেওয়া হয়নি, বিষয় গৌরবকে তুলে ধরা হয়েছিল একটু বেশি উঁচুতে, কিন্তু মঙ্গলাচরণের কাব্যে করণকৌশলের সঙ্গে বিষয়ের যথার্থ মেলবন্ধন ঘটেছে। তাঁর মন্তব্যের সারবত্তা তাই অনস্বীকার্য।

বীরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় (জন্ম: ১৯২০ খ্রীষ্টাব্দ) : চল্লিশের দশকের শেষদিকে এই আন্দোলনে সামিল হলেও তেমন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা প্রগতি লেখক সংঘে তাঁর তখনও জোটে নি। বীরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় আরও বড় কবি হিসেবে প্রতিষ্ঠা পেয়েছেন সত্তর দশকে। এখানে আমাদের আলোচনা নির্দিষ্ট কালপরিধির মধ্যে সীমায়িত। ফলে সমুদ্র প্রতিভা, তাঁর মনের সৃষ্টিশীল বৈচিত্র্য, আলোচ্য পর্বে সম্পূর্ণ পরিস্ফুট নয়। কবির একনিষ্ঠ প্রবণতা প্রথম থেকেই তাঁর কবিতায় উপস্থিত। সমাজচেতনার সঙ্গে তীব্র ব্যক্তিস্বরের বিশিষ্টতা, সাম্প্রতিকতার সঙ্গে রাজনৈতিক বিশ্লেষণের বিচক্ষণতা, সর্বোপরি প্রলেতারিয়েত শ্রেণীর সঙ্গে অবিচ্ছিন্ন আত্মীয়বন্ধন তাঁকে এক স্বতন্ত্র মর্যাদার আসনে আসীন করেছে। 'একটি সহজ কবিতা'য় বীরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়ের কাব্যসাধনার মূল লক্ষণগুলি ফুটে উঠেছে বলে মনে হয়: 'যেখানে মানুষ মানুষের নীচে/ ফুটপাতে আর পথের ধুলায়,/ সেখানে বিপথ পথের তাদের/ উন্নত করে তুলবো। /...সাম্য, মৈত্রী আর স্বাধীনতা----/আমরা শোনাবো আজাদির বারতা,/ শিকল ছেঁড়ার শেষ সাধনার/ চেষ্টা আমরা করবো।'[৮০] (একটি সহজ কবিতা)। বীরেন্দ্রনাথ স্বপ্নদর্শী কবি। কাজেই আশা-ভরসার কথা তাঁর কবিতায় অতি সহজভাবেই এসেছে: 'কত প্রাসাদের শ্বেতপাথরের ঝুলঝুরায়/ রাজার ছেলেরা ঘুমিয়ে ছিলো,/কত কুঁড়েঘরের মলিন মেঝের খোলা আঙিনায়/ রাজার ছেলেরা ঘুমিয়ে ছিলো,/ কত ফুটপাতে রক্তবীজসম পথের ধুলায়/ রাজার ছেলেরা ঘুমিয়ে ছিলো,/মায়ে মায়ে তুমি সে রূপকথার কাহিনী বলো, /হে ঘোড়সওয়ার---আবার চলো।/ ...হে ঘোড়সওয়ার, চকিতে ঘোড়ার লাগাম ধরো,/ছেড়ে দাও ভীরু পথের ভয়।/ মরা পৃথিবীর মাটির কবর ভেঙ্গে ওঠো,/সে মাটি কখনো বন্ধ্যা নয়।'[৮১] (রূপকথা)। শ্রেণীবিভক্ত সমাজে উদার মানবতা সম্পর্কে যে প্রতিষ্ঠিত ধারণা, বীরেন্দ্রনাথের মানবতা সেদিক থেকে বিবেচ্য নয়, ন্যায়ত, সর্বহারা মানুষের দুঃখ-বেদনা-যন্ত্রণার প্রতি তাঁর ততোধিক মমতা ও মানবতা-বোধ গড়ে উঠেছে। একে স্মরণ করে কবি আমৃত্যু জীবনের পথপরিক্রমা করতে চেয়েছেন। 'একটি সহজ কবিতা'র সরলতম উচ্চারণ ও প্রার্থনা বাক্যের আশ্রয় নিয়েছে 'শিবস্তীর প্রার্থনা'য় যার আসল লক্ষ্য আরাম প্রিয় সংগ্রামভীরু মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়: 'দধীচির হাড়ে হবে নাকো আর বজ্রগড়া ইন্দ্ররাজের ?/গোসাই তোমার একটু বদলে দাও।/

...বেশ তো ছিলেম অন্ত-অতলে ইতিহাসের হাতল ধরে ,/ দেবতা কি কভু পথের ধুলায় নামে ?/ দধীচিরা মরে এই তো নিয়ম, মরনে যদি পূর্ণ ওঠে / আইনে রয়েছে যাবে সেইস্থানে ।' [৮২] (শিখন্ডীর প্রার্থনা)। অদ্ভু-দেশানো এক বিপন্ন আবেগ তুলে ধরেছেন 'পদধ্বনি' কবিতাটিতে। কবিতাটিতে বিষ্ণু দে-র প্রভাব অনুমান করা যায়: 'দীর্ঘ রাত্রি; জীর্ণ পথ, বুভুক্ষাবিদীর্ণ রাজধানী/ শান্তিহীন সুপ্তিমগ্ন; পথপ্রান্তে ভিখারীর রানী/ অনাহারতপ্ত আঁখি, তারো চোখে নেমে এল ঘুম ,/ ঝিল্লির ঝঙ্কার স্তব্ধ; আকাশের তারারা নিঝুম।/ বণিকের সুনিদ্রায় পরিপূর্ণ সুপ্তি আয়োজন; / পদধ্বনি; কার পদধ্বনি ?/ অকস্মাৎ মধ্যরাতে ব্যর্থ করে রাত্রির যৌবন;' [৮৩] (পদধ্বনি)। কবি অদ্ভুত প্রতিবেশের ভেতরেও সততার সঙ্গে ইতিবাচক ইঙ্গিত দিতে ভোলেন নি--- 'কান পেতে শুনি/ কোথা হতে অকস্মাৎ অতিক্রান্ত রাতে পদধ্বনি।' প্রসঙ্গত বলা দরকার, বীরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় কাব্যে প্রতীকের ব্যবহারসম্পর্কে বিদ্রূপ করলে এবং তাকে প্রগতিবিরোধী বললে 'অরণি' পত্রিকায় একটি বিতর্ক শুরু হয়ে যায়। বীরেন্দ্রনাথের বিরুদ্ধাচারণ করে কবি অরুণ মিত্র বলেন, 'বীরেন্দ্রবাবু সিম্বলিজমকে প্রগতি-বিরোধী বলেছেন। এ কথা আমি মানি না। সিম্বলিজম্ হল আর্টের একটা রীতি' ... [৮৪] । অনিতা দেবী বীরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়ের মত সমর্থন করে কাব্যের 'অতি-ব্যঞ্জনা দোষ' , 'অতি-অলঙ্কারিতা' ও 'অস্পষ্টতা দোষ'কে যুগচাহিদার বিরুদ্ধ প্রকৃতি বলে বর্ণনা করেন। [৮৫] কিন্তু লক্ষ্য করবার যে, 'পদধ্বনি'তে বীরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় প্রতীকধর্মিতার লক্ষণকেই বরং বেশি করে আত্মসাৎ করেছেন। উক্ত লক্ষণ 'রূপকথা'তেও মেলে। ১৯৪৬ খ্রীস্টাব্দে ঘটে যাওয়া কয়েকটি ঘটনা এই কবিকে তীব্রভাবে আলোড়িত করে তোলে। ২৯জুলাইয়ের ডাক-তার ধর্মঘট, ১৬আগস্টের সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা বা ২১নভেম্বরের ছাত্র-আন্দোলন ও বিক্ষোভ সমাবেশ-এর ওপরে লেখা 'তিনটি তারিখ' [৮৬] কবিতাটি। '২১শে নভেম্বর': 'সে এক তরুণ, চোখে [illegible] এনেছিলো সূর্যের প্রভাতি , / রক্তে তার বড় হ'য়ে ছিঁড়ে দিলো রক্তিম প্রশান্তি।' '২৯শে জুলাই': 'দেড়শো বছর পরে কী এক আশার দৃশ্য যেন/ আকাশে সূর্যের মতো দীপ্তস্বরে হয় উদ্ভাসিত।' '১৬ই আগস্ট': 'আমরা দেখেছি সূর্য ডুবে ছিলো কোনো দীপ্তস্বরে/ কয়েকটি মৃত্যু হ'য়ে কলকাতায় আত্মদানী আহ্বানে ,/ ... যে ঢেউয়ে তীরের সুখ ভেসেছিলো তান্ডবের মতো ,/ অকস্মাৎ আত্মমেঘ ঘূর্ণিজলে তারাই আহত।' প্রথম যে দুটি ঘটনা উজ্জীবনের সহায়ক হয়ে উঠেছিল, শেষের ঘটনার আকস্মিকতা তেমনি বিমূঢ় করে দিয়েছিল কবিকে। আশাহত কবির বেদনা নানাভাবে প্রকাশ পেয়েছে। ১৯৪৭ খ্রীস্টাব্দে স্বাধীনতাপ্রাপ্তির পরেও কবির রচিত সুস্থজগৎ সুপ্রতিষ্ঠ হয় নি বলে ভেতরে ভেতরে দুঃসহ এক যন্ত্রণায় অস্থির হয়েছেন তিনি : 'তোমার মনের সুখ অরণ্যের মরীচিকা হয়ে/ আকাশে অঙ্গুলি তুমি খুঁজেছিল পথের নির্দেশ , / আকাশ দিয়েছে শুধু নিষিদ্ধ, পাতালপ্রহরে/ ছিন্নমূল মরীচিকা অবশেষে হয়েছে প্রস্তর'। [৮৭] (প্রস্তর ও প্রতিমা)। এই মর্মবেদনার সঙ্গে অভিজ্ঞতার সমন্বয় ঘটতে থাকে কালের নিয়মে---- যতীন দাসের ছবি দেখে তাই কবি ঐতিহাসিক সত্য আবিষ্কারের উত্তেজনা ও বিস্ময় অনুভব করতে পেরেছেন: 'এই ছবি দেখে দেখে স্পষ্ট হ'ল, কেন মরা হাড়ে/ দধীচি এখনো বজ্র ?---- সব প্রশ্ন আগুন তো নয় , / এ কথা যেমন সত্য, তবু কেউ পুড়ে

যেতে চায়/পৃথিবীকে আলো দিয়ে,---কী আশ্চর্য সেই সূর্য হয়।'[৮৮] (যতীন দাসের কন্টো)। সহসাই এই উদ্দীপনার জ্বলন্ত শিখা স্তিমিত হয়ে যায় দেশ-কালের তথা স্বাধীন ভারতের আদর্শের [illegible] দেখে। মনে মনে যে স্বাধীনতা-সাম্য-মৈত্রীর স্বপ্ন লালন করেছিলেন কবি, সে-স্বপ্ন এখন ব্যর্থ---এই মানসিক-সংকটের ভেতর দিয়ে রূপে তাঁর আত্ম-উত্তরণ ঘটেছে, কিন্তু তা আরও পরবর্তীকালের কথা। বর্তমান সংকটের রূপবর্ণনায় তিনি সুতীব্র আবেগের আশ্রয় নেন---'দেখি/যদিও হয়েছে মিঠে সোনায় সোনায় ভরা সুরের সকাল/তবু সেই মেয়ে/আমার স্বদেশ, এই দ্বিপ্রহরে সূর্যের প্রখর আলো দেখে নেয়/শুধু দিতে পুষ্প, শান্ত জননীর মতো---/গর্ভে তার ধরে নাই সাম্য-মৈত্রী-স্বাধীনতা এইসব ওকুর সন্তান.../ব্যর্থ তবে দ্বিপ্রহর, ব্যর্থ তবে জননের সর্বনাশী আয়োজন, হেমন্তের গান।'[৮৯] (হেমন্ত, ১৩৫৪)। আর এরপরেই 'দু'চোখে দুঃস্বপ্ন' ক্লান্তি অনুভব করতে থাকেন কবি। এই ক্লান্তি তাঁর অসহায়তার, ব্যক্তিগত ব্যর্থতাবোধের। এই ব্যর্থতা মর্মান্তিক হয়ে উঠেছে ছাব্বিশে জানুয়ারী দিবসে---''অনেক ভেকের কণ্ঠে আকণ্ঠ কাদায়/কচুরি পানার বিলে মশার সংগ্রামে/কোনদিন। তবু বর্ষা রৌদ্র হ'য়ে নামে,/অকত্রু সহস্র মৃত্যু রূপান্তর পায়/জীবনে বসন্তে।...তবু তুমি ব্যর্থতারি দেবদূত, তুমি। ---ছাব্বিশে জানুয়ারী।'[৯০] (ছাব্বিশে জানুয়ারী)। অতঃপর পাপমুক্তি ঘটেছে কবির--- কিন্তু কিভাবে, রূপকের আড়ালে তা রয়ে গেছে সন্ধ্যাভাষার মতঃ 'বুঝি সমুদ্রের ঢেউ, আমার বুকের মেঘ হয়ে/একদিন ছিলো যারা সঞ্চিত ধনের মতো প্রেমহীন মৃত্যুতে লুকিয়ে,/ যারা করেছিলো শূন্য শক্তিহীন এই দেহ অবশপাতাল---/তারাই আজকে বড়ে সমুদ্রের গর্জনের সুর সঙ্গে করে/ তাদের জন্মাকাঙ্ক্ষী নদে অথবা কি ব্যর্থতার সন্ধান প্রাণ আমাদের/ হ'লো বৃষ্টি, হ'লো বন্যা? -আহা, সুর নেমে আসে মুক্তিতে, জোয়ারে,---/অন্তরাত্মাতল।'[৯১] (পাপমুক্তি)।

গোলাম কুদ্দুস : একসময় গোলাম কুদ্দুস ও জ্যোতিরিন্দ্র মৈত্র ফ্যাসিস্ট বিরোধী লেখক ও শিল্পী সংঘের যুগ্ম সম্পাদক হিসেবে কার্যভার নেন। সময়টা ১৯৪৪ খ্রীষ্টাব্দ। গোলাম কুদ্দুস 'পরিচয়' পত্রিকার সঙ্গেও ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত ছিলেন। এই পর্বের তাঁর প্রথম কাব্য 'বিদীর্ণ'। কুদ্দুস অত্যন্ত স্পর্শকাতর আর সময়সচেতন কবি। সরলতার সঙ্গে গভীর আন্তরিকতার [illegible] উপস্থিতি তাঁর কাব্যে লক্ষ্য করবার। তাঁর প্রত্যক্ষভাষণ শিল্পরসিকদের কাছে আকর্ষণীয় হয়ে ওঠে নি। বাস্তবিক তাঁর আবেদন সাধারণ মানুষের কাছে। কবিতার আঙ্গিকের প্রতি তাঁর সযত্নপ্রয়াসের চিহ্ন নেই, নেই বাক্-চাতুর্য তথা সঘন আলঙ্কারিতা, সংবাদধর্মী বক্তব্যপ্রধান কবিতার আবেদনে সংহতির অভাবে গোটা কবিতা জুড়ে তাঁর দুর্বলতাগুলি সচেতন পাঠকের চোখে পড়বে। একসময় তাঁর 'ইলা মিত্র' কবিতাটি শম্ভু মিত্রের কণ্ঠে বেশ খ্যাতি এনে দিয়েছিল। যদিও এখানে তার আলোচনা আমাদের সময়সীমার বাইরে। যাই হোক, গোলাম কুদ্দুসের কবিতাগুলি প্রগতি সাহিত্য আন্দোলনের অন্যতম দলিল বললে অত্যুক্তি হবে না। তার মূল্য যতটা না সাহিত্যগত তার বেশি রাজনৈতিক। প্রসঙ্গত গোলাম কুদ্দুসের আলোচনা করতে গিয়ে এই আন্দোলনেরই অন্যতম কর্মী ও সাহিত্যিক সরোজ আচার্য মহাশয়ের কথাগুলি উল্লেখ করা দরকার বলে মনে হয় : 'গোলাম কুদ্দুসও সংগ্রামী জীবনের সঙ্গে কাব্যের আত্মীয়তা স্থাপন করতে চেষ্টা

করেছেন। কুদ্দুস যে ভালো কবিতা লিখতে পারেন ও লিখেছেন সে কথা অনেক সময় ভুলে যেতে হয়, তার কারণ তাঁর ইদানিংকার কবিতা প্রায়ই হয়েছে পদ্যের আকারে সাময়িক সংবাদ ও শ্লোগান বা রাজনৈতিক সংকলন। উৎকৃষ্ট সাম্যবাদী কবিতায় বিদ্রোহের চড়া সুর এবং ভাবী সম্ভাবনার আভাস থাকবে না এরকম কোন বিধান দেওয়া নিশ্চয়ই বাতুলতা। কিন্তু কবিতা উৎকৃষ্ট হতে হলে চাপকাপ্রেকের মতো আশাবাদী উপসংহার না থাকাই ভালো। ...কুদ্দুসের কবিযুক্তিতে সংশয় নেই, তার সমাজ-সচেতনতা ও সংগ্রামী মনোভাব অবশ্যই আন্তরিক, সময়ে-সময়ে অতিরিক্ত সোচ্চার।'[৯২] এই মন্তব্য কুদ্দুস সম্পর্কে সঠিকভাবে বিবেচ্য। 'কৃত্রিম বন্যা' কবিতাটিতে ঊপংকোড়া যুদ্ধের আয়োজনকে মনে করিয়ে দিয়েছেন সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধঃ 'কৃত্রিম বন্যার বন্যা যেন জনপদ গেছে জুড়ে'[৯৩]—ব্যক্তির অসুস্থতা ও ব্যাধি সঞ্চারিত হয়েছে রাষ্ট্রিক ব্যাধিতে। এই সরলভাষণ ও রূপকধর্মী সরলতা তাঁর কবিতার সাধারণ বৈশিষ্ট্য। ১৯৪২ খ্রীষ্টাব্দের কলকাতায় জাপানী বিমান হামলার সময় কলকাতা ছেড়ে যেসব বীরপুঙ্গব স্ত্রীপুত্রপরিবারকে বাইরে পাঠিয়ে নিশ্চিন্ত হতে চেয়েছিলেন, সেইসব মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের মানুষের উদ্দেশে তাঁর ব্যঙ্গঃ 'আমরা যারা কলকাতাতে রয়ে গেলাম/স্ত্রীপুত্রকে বাইরে কোথাও রেখে এলাম/তারা সবাই বৃন্দাবনের বন্যা নারী,/ব্রজধামে পুরুষ ত এক বংশীধারী।'[৯৪] (শ্যামের বাঁশি) কবি এই আতঙ্কিত সমস্যার বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ানো কর্তব্য মনে করেছেন, তিনি জানেন, মৃত্যুভীত মানুষও মৃত্যুঞ্জয়ী নন, অতএবঃ 'বিনাশ আমার এই রাজ-নিষ্পেষণ,/ দারিদ্র্যদুর্ভোগ আসে সন্তোষের মত,/ কঠোর মৃত্যুর মুখে সহাস্যে দাঁড়ানো/ নিতান্ত আমার কাছে সহজ কৌতুক।'[৯৫] (সমুদ্র)। রাশিয়ার অক্টোবর-বিপ্লবের সঙ্গে লেনিনের সম্পর্ক এক অবিচ্ছেদ্য ইতিহাস, ১৯৪২-এর 'জনযুদ্ধের যুগে' গোলাম কুদ্দুস তাঁর মহান নেতাকে অনিবার্যভাবে স্মরণ করেছেন এবং নতুন করে প্রেরণা সংগ্রহ করতে চেয়েছেনঃ

'অনির্বাণ হিংসা কিন্তু লেনিনের অবিস্মৃত বুকে/লালিত হয়েছে যত্নে, তারপর আপন জ্বালাকে/ধীরে ধীরে ঢেলে দিলো বৃহত্তম জ্বালার সম্মুখে।/... এক প্রতিহিংসা জ্বালা লক্ষ প্রতিহিংসার ভঙ্গিতে/ অকস্মাৎ প্রেম হয়। সেই প্রেম আমাদের ঘরে অসীম বিশ্বাসে জ্বালি ভারতের এ কৃষ্ণ রাত্রিতে'[৯৬]....। (লেনিন—'সব্যসাচী')। 'হাত'[৯৭] ও 'অপ্রাকৃতিক'[৯৮] কবিতায় শোষণজর্জর সমাজব্যবস্থায় কুদ্দুসের মহতী ক্ষোভ প্রকাশ পেয়েছে। কিন্তু এই ক্ষোভে তাঁর ভাষার সংযম ও শালীনতাও হারিয়ে গেছে। তার নমুনাঃ 'ভক্তদের মুন্ড চাই/শক্তি ছাড়া ভক্তি নাই/রক্তে হোক সত্যের শোধন/ দুঃখ নয়, নয় শোক,/বক্তব্যর শেষ হোক/আগে চাই মুক্তির তর্পণ।' (অপ্রাকৃতিক)। ত্রিপদীতে বাংলা কবিতা, বিশেষ করে আধুনিক কবিতা খুবই কম লেখা হয়েছে, অথচ প্রগতি আন্দোলনের অন্যতম দুই বিশিষ্ট কবি, বিমলচন্দ্র ঘোষ ও গোলাম কুদ্দুস উভয়েই এই ছন্দে কবিতা লিখতে দ্বিধা বোধ করেন নি। কুদ্দুসের ভালবাসা মানুষের প্রতি, এ বিষয়ে কোন সংশয় নেই। তবু তাঁকে বলতে শুনিঃ 'মানুষকে ভালবেসে হৃৎপিণ্ড কেটে রক্ত আসে।'[৯৯] (মহাপ্রাণ)। কিন্তু তিনি স্পষ্টত অনুভব করেছেন যে, এইসব মানুষের নিশ্চেষ্টতা ও সক্রিয়তার অভাব তাঁদের যথেষ্ট সংগ্রামশীল করে তুলছে না। এত সত্ত্বেও তাঁর

মানুষের প্রতি বিশ্বাস বিচলিত হয় নি। দুর্দিনে মানুষের বিপুল বিপত্তি তাঁকে কষ্ট দেয়, তাই গভীর বিশ্বাসবোধ থেকে 'জীবনকে সম্পূর্ণ প্রণাম' জানাবার অঙ্গীকার গ্রহণ করেন: 'অর্ধ অনশন হ'তে পূর্ণ উপবাস, / তিল তিল মৃত্যু হ'তে অন্তিম নিঃশ্বাস, / একই প্রণাম আর একই কঠিন?' [১০০] (প্রণাম)। 'চাষা' কবিতাটিতে মধ্যবিত্ত শিক্ষিত মানুষের চরিত্রের স্বরূপ ধরা পড়েছে। কর্মভীরু, পলাতক, দেশসম্পর্কে উদাসীন প্রকৃতিকে ব্যক্ত করা সত্ত্বেও তাঁর গভীর মানববোধ সহিষ্ণু জীবনদর্শনের অধিকারী বলে একজন চাষীর জবানীতে অকরুণ সত্যের উন্মোচন করেছেন এইভাবে: 'তবু ও ক্ষেতের প্রান্তে হালছাড়া খুঁড়িতে খুঁড়িতে / একজন চাষী তাই বলে দিল হেসে, / আমি না খাই, খাবে আমার নাতিপুতি এসে।' [১০১] (চাষা)। সম্ভাবনার এই দিকটি, ভবিষ্যতের দিকটি নিহিত থাকে বর্তমান কর্মধারা ও জীবনধারার মধ্যে। তাই কর্মোদ্যোগী হতে চান কুদ্দুস, মানুষের সমস্ত নিশ্চেষ্টতা, অকর্মণ্যতা, শোষণ, বঞ্চনা আর ভীরুতার বিরুদ্ধে রুখে দিতে চান 'মুক্তিস্নান'—'যে কগুলো চোখের সামনে মরে গেলো—কুকুর বিড়ালের মতো মরে গেলো, / চুপ করে তাই দেখতে হল। / যাদের খাবা খান মরে গেলো---কাটার অভাবে মরে গেলো, / নিশ্চুপ তাই দেখতে হলো। / আকাশে ওড়ার যুগ যখন তখনো মানুষ মাটিতে পড়ে। / মাঠে মাঠে সোনা ফলে, মানে ক্ষুধায় প্রাণ উড়ায়। / হাতুড়ি, কাস্তে, কমরেড, তাই মুক্তিস্নান।' [১০২] (লাল সালাম)। গোলাম কুদ্দুস শিল্পীর জন্যে একটি সামাজিক দাবি পোষণ করেন, তা হল সামাজিক-বাস্তবতা ও সততার দাবি, চিত্রশিল্পী জয়নুল আবেদীন প্রসঙ্গে সেই দাবি উত্থাপন করে তিনি বলেন, '...আমাদের সমাজ যত জটিল, যত নির্মম, যত কর্কশই হোক, মানুষের শিল্পের খাতিরে এবং শিল্পীর নিজের প্রাণের তাগিদে তাকে কোনোমতেই এড়ানো চলে না।' [১০৩] দেশব্যাপী যে বিশাল আর্থ-সামাজিক বৈষম্য, কুদ্দুস তা পদে পদে অনুভব করবার সুযোগ পেয়েছেন, হয়ত-বা এই তাগিদে শিল্পের বিন্যস্ত বা আঘাত সাজানো এলাকায় তিনি পরিক্রমা করতে চান নি, পরিবর্তে তিনি প্রাণের তাগিদে সমাজের সহজ সত্যটাই অকপট ভাষণে স্পষ্ট করতে চেয়েছেন। কিন্তু প্রাণের তাগিদ-এর সঙ্গে শিল্পেরও একটা সমন্বয় যে বাঞ্ছিত এ সত্য বিস্মৃতির ফলশ্রুতিতে কুদ্দুসের পক্ষে মোটেও ভাল হয় নি। মনে হয় প্রগতি সাহিত্য আন্দোলনের মৌলিক ত্রুটিও এই খানে।

জ্যোতিরিন্দ্র মৈত্র: প্রগতি লেখক সংঘের সঙ্গে তাঁর নিবিড় যোগ ছিল, এ কথা আগেই বলেছি। তাছাড়া ১৩৫১ বঙ্গাব্দে ফ্যাসিস্ট বিরোধী লেখক ও শিল্পী সংঘ কর্তৃক তাঁর এ পর্বের দুটি বিখ্যাত গ্রন্থ বের হয়। একটি 'মধুবংশীর গলি' ও অন্যটি 'নবজীবনের গান' (গণসংগীত)। তাঁর কবিতার বস্তু-উপকরণ বিচিত্র, তাঁর কবি-প্রতিভার বিকাশ হয়ত-বা সংগীতপ্রীতির কারণে খানিকটা ব্যাহত হয়েছে। তাঁর কিছু প্রকট দুর্বলতার অন্যতম হল কবিতার গঠন-কাঠামোর দীর্ঘায়িত অতিরেক যা অনেকটাই অপরিণত। বক্তব্যপ্রধান কাব্যের অন্যতম দুর্বলতা, বিশেষত রাজনীতি-সচেতন কবিতার স্লোগানসর্বস্বতা ও সোচ্চারভাব। কিছু কিছু দুর্বল পংক্তি অথবা পংক্তিমালা ও চোখে পড়ে। শ্রেণীবিভক্ত সমাজের জটিলতা তিনি মর্মে মর্মে উপলব্ধি

করেছেন, মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের প্রতি চিরাচরিত ব্যঙ্গের কশাঘাত, যেমন প্রকাশ পায় সমস্তপ্রকার শোষণের বিরুদ্ধে সতেজ আহ্বান জানানোর প্রচলিত কৌশলের পুনরাবৃত্তিও। ইতর-বিশেষ তাঁর কবিতায় চোখে পড়ে না। যুদ্ধের বিপন্ন পটভূমিতে এই কবির প্রতিরোধ-চেতনার উন্মেষে সমস্ত হতাশা দূর হয়েছে: '...উদ্ধত পায়ে/ শেষ পাব। অঙ্কুরিত ভবিষ্যের বুকে/নব্য শ্যাম প্রাণ-চিহ্ন'[104] (চতুর্দশপদী)---- কিন্তু এটা সাময়িক মাত্র, কেননা, দুর্ভিক্ষ-সংকট এখনও সম্পূর্ণ কাটেনি কবির। 'রণক্লিষ্ট' কবিতায় এখনও শব খোঁজার কথা পাই: 'প্রান্তে এসে থামে রণশিখা। / রক্তের স্রোতে শান্ত এ রণক্ষেত্র। / গঙ্গার পাশে মুখ প্রাণশিখা,/ শকুন খোঁজে, হায়, না কোনো ভ্রান্তি।'[105] (রণক্লিষ্ট)। দুর্ভিক্ষ তাঁকে এক নতুন চেতনায় উদ্দীপিত করেছে: 'নড়া কিছু নাই। / বেদনার বিষ পিঠেকে ধরবো না করি/ মোরা গান গড়ি।'- -এই বেদনাবিদ্ধ এইরকম: 'মৃত্যুর কবলে ভরে কালের ভান্ডার। / ছিন্ন শির, বিকৃত দেহ, ধূলিসাৎ অট্টালিকা, আর/ মৃত-মাতা শিশুদের ক্ষুদ্র শীর্ণ মুঠি, / মৃতবৎসা মাতার ভ্রূকুটি। / পাশবিকতা দুর্বার করে হাহাকার, / বিবর্ণ নীল এই আকাশ কাঁপায়, / নিশ্চল কঙ্কালসার গাছের শাখায়।'[106] (আমাদের গান)। জাপানী বিমান হামলা ও ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধে আঘাত-তীব্র প্রতিবাদ ধ্বনিত হয় 'মুক্তপক্ষ'[107] কবিতায়। 'মধুবংশীর গলি'তে মোট সাতটি কবিতা রয়েছে। প্রত্যেকটি দীর্ঘ কবিতা এবং গঠনে একটা বৈশিষ্ট্য রয়েছে। তবে আবেগতীব্র উচ্ছ্বাসবাহুল্যে কয়েকটি কবিতা যথার্থ শিল্পগুণসমৃদ্ধ হয়ে উঠেছে। 'মুক্তি-বাচন' কবিতাটির অন্তিম স্তবকের রূপকটি চমৎকার। লালবাড়িতে আগুন লেগেছে। নীল ধোঁয়ার স্রোত তার থেকে বেরিয়ে আসছে, নিচে বস্তি, শিশুদের কান্না---সেই সময়: 'সহসা কি করে আগুন লেগেছে দেখি। / লাল বাড়ী লাল আগুনের সমাবৃত। / তন্দ্রা পালায় মধ্যরাত সুপ্তির। / মুক্তোর বাবুরা নিচে করে ছুটাছুটি। / অপরূপ হাওয়া বাজায় চিত্র যেন।'[108] (মুক্তি-বাচন)। আধুনিক নগর-সমাজের ব্যভিচার ও অবক্ষয়-এর চিত্র ধরা হয়েছে 'বহুব্রীহি' কবিতায়, উচ্চবিত্ত শিক্ষিত ও মধ্যবিত্তশ্রেণীর শিকার আভিজাত্য সম্পর্কেও তাই কটূক্তি করেন: 'মার্কস্ পড়ে এবং বোঝে না। / একোন স----ব্যাকিট্যুরিং--/ যাবার দিদি আছে পড়তেই হবে।'[109] (বহুব্রীহি)। এই শহরকে কবির মনে হয়েছে 'অন্তঃসারহীন শক্তযুক্ত কপিত্থের মত', তবু এরই মাঝখানে একটি 'সুন্দর আকাশ' অন্বেষণ করেছেন কবি। বিষ্ণু দে-র মত কবিতায় সংগীতের ধ্বনি-তাৎপর্যের চেয়ে কিছু শব্দ ও অনুষঙ্গের ব্যবহারে বিশিষ্ট হয়ে উঠেছে কয়েকটি পংক্তি, যেমন---'সারেঙ্গীওয়ালার অতি কথা হানে দীর্ঘকী সমকে', 'সারেঙ্গীর সুর গড়ে বাঁধা এই পদ সওয়ালন, / মধ্যবীর গতি। / প্রাণের উচ্ছ্বাস দেখি অট্টহাসে সমের চূড়ায়/ শ্বেত ও রেখিল, রক্তে শুনি তুরঙ্গ-হ্রেষা দুর্নিবার'[110] ইত্যাদি ইত্যাদি। (নিঃশোত্তরী)। লক্ষ্য করবার, আঙ্গিকের প্রতি দৃষ্টি দিতে গিয়ে কবিতাটির মূল বক্তব্য অত্যন্ত জটিল হয়ে উঠেছে। কবির মনে হয়েছে 'দুগ্ধ-ঘোড়া রাত্রিগুলি অভিযানে আত্মঘাতী হল একে একে'----এই অবস্থায় কবির বাজে ফ্যাসিস্টশক্তির বিরুদ্ধে ক্ষুরধার, 'ভৈরবের ডাকবে করাল স্ফূর্তিই দেখি।' ১৯৪৩-এর দুর্ভিক্ষ-সংকটের পটভূমিতে ব্যক্তির কর্মৈষণা প্রেমকে নতুনতর উপলব্ধির মাত্রা দিয়েছে 'একটি প্রেমের কবিতায়'[111]। জাপানী-আক্রমণে দেশীয় ফ্যাসিস্টশক্তির পুনর্জিত সমর্থকদের বিরুদ্ধে

তাঁর কণ্ঠ সোচ্চার: 'যদি মনে করে থাক/তোমাদের হাতে স্বর্গ চাঁদা এনে দেবে কেউ,/ মুক্তির মোয়া—/ সে ভুলে যাও,/ সে মোহের ঘোর দেখ।'[১১২] (নগরসংকীর্তন)। অত্যন্ত সোচ্চার ও শ্লোগানধর্মী কবিতা। যেন 'নিশান উড়িয়ে ঢোলের বাজ বাজে'। বিশেষত শহুরে মধ্যবিত্তশ্রেণীর দোদুল্যমান মনোভাব, প্রতিরোধ-চেতনা, মহতী চেতনা নিয়ে 'মধুবংশীর গলি' কবিতাটি অন্যতম উল্লেখ্য এবং সম্ভবত কবির সুদীর্ঘতম কবিতা:— 'যারা মধ্যরাতে অগাধ বাঁশিনা চ'ষে নিদ্রাহীন চুপ তাকায়,/ ছেলেদের মতো তারা যারা টোপে তাকায়,/ যারা তোমার আমার অবসরের গান ভেঙে চুরমার করে।/পুরু ঠোঁটে পুরু পাঁজর পিষ্টকে তালা পড়ে,/শ্লোগানমুখী মন শানানো সঙ্গীনের মতো ঝলক দিয়ে ওঠে,/ফ্যাসিস্ট বিরোধী সংঘে যোগ দেয়,/ মুখে মুখে ফোটে বিদ্রোহের দস্তুর হাসি,/ আর, বুকে সামাজিক মন্ত্রের আগি'[১১৩] (মধুবংশীর গলি)—এদের সঙ্গে স্বয়ং কবিরও একটা আত্মজিজ্ঞাসা পরোক্ষ প্রশ্নের আকারে যেন উত্থাপিত হয়েছে কবিতাটিতে। বলা বাহুল্য, সাম্প্রতিক সমস্যার, চরিত্র আত্মজিজ্ঞাসার সূত্র সংকেতগুলি কোন কোন পংক্তিতে অত্যন্ত দুর্বল হলেও তার কাব্যরূপ অনস্বীকার্য। সাম্প্রতিক সমস্যা অবলম্বন করে লেখা 'মন্বন্তর-পুঞ্জ' কবিতাটি একটু চিত্রধর্মী প্রেরণার— বাংলার ধার করে এসেছে, চলমান জীবনপ্রবাহ থেকে বৈপ্লবিক উন্মাদনা এখন লক্ষ্য করেন কবি: 'রক্তে আর আগুনে লাল/ ১৯৪৩ সালের মন্বন্তর।/ কিন্তু বহ্নি প্রাণ করে মনে মনে/ অত্যাচারীর অনুভব।'[১১৪] (মন্বন্তর-পুঞ্জ)। 'মিছিলের গান' সম্পূর্ণত গণ-সংগীত, শ্লোগানই এর মুখ্য বিশেষত্ব: 'আমাদের সকলের হাতে পতাকা—/ মুক্তির, সাম্যের,/ মুক্তির কাম্যের,/সত্যের, কর্মের,/নবযুগধর্মের,/সকলের মর্মের/রক্তে রাঙা পতাকা।'[১১৫] (মিছিলের গান)। জ্যোতিরিন্দ্র মৈত্র ও বঞ্চিত স্বাধীনতাকে মেনে নিতে পারেন নি, পারেন নি সহ্য করতে সাম্প্রদায়িক উন্মাদনা আর সুবিধাসর্বস্ব নিষ্প্রাণ রাজনৈতিক-নেতৃবর্গকে: 'ভেবে দিলে মনে মনে,/ স্বাধীন সূর্যের নীচে/ স্বাধীন আকাশ আর স্বাধীন মানস/তোমাকে দেখাবে পথ'—কিন্তু তা বাস্তবায়িত হয় নি, পরিবর্তে 'পৃথিবীর সিংহাসনে বসেছে যে দাঙ্গাবাজ/ফুকার সম্রাট।/তারই রাজ্যপাট/ ছেয়ে আছে দেশে দেশে/নানা ছদ্মবেশে।'[১১৬] (হে মানুষ, দেশের মানুষ)। কবির কামনা এর অবসান। ১৯৪৮ খ্রীষ্টাব্দে কমিউনিস্ট পার্টি বেআইনী ঘোষিত হলে কবির প্রতিক্রিয়া: 'সকালের ঘুম ভোরে ভাঙাতে/উঠে দেখি বেআইনী আমি,/ বেআইনী হয়ে গেছ তুমি।/বেআইনী আমাদের পথ।/মুক্তির এ প্রভাতে/ ফোটে শাসনের অঙ্কুর।'[১১৭] (বাস্তবতা)। অতঃপর কবির বিদ্রোহ শপথসর্বস্ব উচ্চারণে: 'আমাদের সম্মিলিত বিদ্রোহের শব/ জ্বলে ওঠে নবতম সূর্যের প্রাতে/তীক্ষ্ণ তরবারি।/ রাজিবের রা শাসনের চেয়ে তাহা ভারি।' (ঐ)।

বর্তমান আলোচনায় মোটামুটি বাইশজন কবির রচনায় প্রগতি সাহিত্য আন্দোলনের প্রভাব ও লক্ষণগুলি কিভাবে ফুটে উঠেছে তা দেখিয়েছি। এই আলোচনায় সাধারণভাবে এটুকু বোঝা গেছে যে, কবিরা প্রত্যেকেই সময়সচেতন, সামাজিক-রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক সমস্যাগুলি তাঁদের রচনায় মার্কসীয় দৃষ্টিকোণ থেকে আলোচিত, প্রবল

ন্যায়বোধ, মার্কসীয় রাজনৈতিক আদর্শ, এবং বিশ্বরাজনীতি তথা দেশগত রাজনৈতিক সংকটগুলি তাঁদের কাব্যের প্রাথমিক ও মৌল উপকরণ হিসেবে গণ্য হয়েছে। রাজনৈতিক মূল্যবিচারই আলোচিত কবিতাগুলির প্রকৃত মূল্য, তা নয়, আমরা দেখেছি, রাজনৈতিক মূল্যকে সাহিত্যমূল্যে পরিণত করার প্রতিভাও তাঁদের অনেকের মধ্যে বিদ্যমান। তাছাড়া, প্রগতি সাহিত্য আন্দোলনের প্রেরণায় সঞ্জীবিত হয়েও কোন কোন কবি (বিশেষত অরুণ মিত্র ও বীরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়) প্রতীকী-ধারাকেও সচেতন অথবা অবচেতনে গ্রহণ করেছেন। আবার এও দেখেছি, তাঁদের অনেকের রচনায় বিচিত্র বস্তু-উপকরণ থাকা সত্ত্বেও, বিষয়বস্তুর সঙ্গে যথার্থ কাব্য-কৌশলের সমন্বয়ের অভাবে শিল্পসৃষ্টি পরিণত হয়েছে স্রেফ প্রচারধর্মিতায়——ব্যর্থ সৃষ্টির এইসব স্রষ্টারা বিমলচন্দ্র ঘোষ, গোলাম কুদ্দুস, জ্যোতিরিন্দ্র মৈত্র প্রমুখ। এঁদের মধ্যে ব্যতিক্রমী প্রতিশ্রুতিসম্পন্ন মণীন্দ্র রায় ও মঙ্গলাচরণ চট্টোপাধ্যায় তাঁদের স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য বজায় রাখতে সমর্থ হন। আধুনিক কবিতার ক্ষেত্রে এঁদের এইসব সচেতন প্রয়াসের ফল অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। প্রগতি সাহিত্য আন্দোলনের পরবর্তী ব্যর্থতা সত্ত্বেও এইসব শিল্পসৃষ্টির মূল্য মানবিকতার তাৎক্ষণিক উত্তেজনাকে অতিক্রম করে এক শাশ্বত সৌন্দর্যের দিকে আমাদের নিয়ে যেতে সাহায্য করে।

প্রসঙ্গত আরও দু-একটি কথা বলা জরুরি মনে হয়। কেননা, এই আন্দোলন শুধু সৃষ্টিশীল সক্রিয় আবেগই তৈরি করে নি, দেশি-বিদেশি বিভিন্ন কবিতার অনুবাদ-কর্মেও কবিদের নানাভাবে উদ্বুদ্ধ করেছে। আরও অজস্র কবি এসে ভিড় জমিয়েছিলেন এই আন্দোলনের মধ্যে। বিষ্ণু দে এলিয়টের 'ফাঁপা মানুষ',[১১৮] 'চড়কের গান'[১১৯], ডক্টর ভেরিয়ার এলউইনের 'ফক্ সংস অব ছত্তিশগড়' থেকে 'ছত্তিশগড়ী গান',[১২০] কনস্তান্তিন সিমোনভের থেকে 'প্রতীক্ষা'[১২১] প্রভৃতি, মঙ্গলাচরণ চট্টোপাধ্যায় 'আধুনিক ইরানী কবিতা'[১২২] পাবলো নেরুদা'র 'ধর্ষিত দেশ ও প্রত্যাবর্তন'[১২৩], নেরুদার 'মাদ্রিদে আন্তর্জাতিক ব্রিগেডের প্রবেশ উপলক্ষে',[১২৪] সুভাষ মুখোপাধ্যায় পরলেক শহীদী'র 'কয়েকটি রুবাই',[১২৫] পদ্মলোচন বসু (টি. মু. লেংকো'র) 'নাজিম হিকমত',[১২৬] মৃণাল রায় স্টিফেন স্পেন্ডারের 'বেকার',[১২৭] যুবকবি পাসট্রাকোভিচ্-এর কবিতার অনুবাদ,[১২৮] কার্ল স্যান্ডবুর্গের 'তিনটি কথা',[১২৯] সুশীল রানা 'কার্ল স্যান্ডবার্গের অনুসরণে'[১৩০] সতীন্দ্র মৈত্র ভ্লাদিমির মায়াকভস্কির 'শিল্পী সৈনিকদের প্রতি',[১৩১] আব্দুল কাদির 'তাজিক লোকসংগীত',[১৩২] বীরেন্দ্রনাথ রায় উজবেকিস্তানের কবি গোলাম গফুরের 'পথ',[১৩৩] অমিয়কুমার গঙ্গোপাধ্যায় তুর্কমেনিস্তানের কবি কারাদিয়েভের 'রক্তগোলাপ'[১৩৪] প্রভৃতি রচনা এই সময়ের অভূতপূর্ব উদ্দীপনার এক অনিবার্য অনুবাদ-কর্ম। ইতিহাসের দিক থেকে এই সত্যই উদ্ঘাটিত হয় যে, যে রাজনৈতিক ভাবাদর্শ এই কর্মচঞ্চল আবেগের জন্ম দিয়েছিল, ক্ষুদ্র-ভুল বিচ্যুতি সত্ত্বেও আমাদের সাহিত্যের ইতিহাসে তার মূল্য অপরিসীম। প্রসঙ্গত মনে রাখতে হয় যে, এইসব অনুবাদ কর্মের দ্বারা স্বয়ং কবিরাও প্রভাবিত হয়েছেন, কেননা, তাঁদেরই কবিতা এঁরা অনুবাদের জন্যে বেছে নিয়েছেন যাঁদের কবিতায় পাওয়া গেছে সমাজসচেতন ও রাজনৈতিক ভাবাদর্শের এক নিবিড় মানসিক ঐক্য ও প্রাণদ প্রেরণা। এই মিল সর্বতোভাবে আদর্শগত ও নৈতিক।

প্রসঙ্গত এ কথাও স্মরণ করতে হয় যে, প্রগতি সাহিত্য আন্দোলনের অভূতপূর্ব প্রেরণা ও উদ্দীপনা অনেক শুকদিকে দিয়ে যেমন কবিতা লিখিয়ে নিয়েছে, তেমনি এই আন্দোলনের চাপে অনেক অ-কবিও কবি হয়ে যায়। গোপাল হালদার, নীরেন্দ্রনাথ রায়, সুরেন্দ্রনাথ গোস্বামী, অমরেন্দ্রপ্রসাদ মিত্র প্রমুখের মননধর্মিতার সার্থক অবলম্বন হল প্রবন্ধ-সাহিত্য, অথচ এই আন্দোলনের প্রেরণায় এঁরা কবিতাও লিখতে শুরু করে দেন। বুদ্ধদেব বসুও দু-একটি ফ্যাসিবিরোধী কবিতা (যেমন---'রবীন্দ্রনাথের প্রতি') লেখেন। এই আন্দোলনকে ঘিরে যে অজস্র কবিতা লিখিত হয়েছে, তাঁদের উল্লেখ্য কবিরা হলেন, রবীন্দ্রকান্ত ঘটকচৌধুরী, সুরেশ রায়, অবন্তী সান্যাল, রাম বসু, ফররুখ আহমদ, ফয়েজ আহমদ ফয়েজ, শান্তিরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়, মহেন্দ্রনাথ, চঞ্চল চট্টোপাধ্যায়, কামাক্ষীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়, নবেন্দু রায়(ওরফে অনিল কাঞ্জিলাল), চিত্তরঞ্জন গুপ্ত, সুরজিৎ দাশগুপ্ত, মতিউল ইসলাম, আহসান হাবীব, প্রমথ গঙ্গোপাধ্যায়, সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায়, সুধাংশু বসু, নীহার দাশগুপ্ত, ভবতোষ চট্টোপাধ্যায়, সোমনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, জগন্নাথ চক্রবর্তী, সুনীল রাহা, পঞ্চাশের একেবারে শেষদিকে শচীন্দ্র মৈত্র, রমেন্দ্রকুমার আচার্যচৌধুরী, পূর্ণেন্দু পত্রী, সলিল চৌধুরী ধনঞ্জয় দাশ প্রমুখ। আধুনিক বাংলা কাব্যে এঁদের পূর্ণাঙ্গ অবদান সম্পর্কে পর্যালোচনা স্বতন্ত্র অভিনিবেশ দাবি করে। এখানে শুধু কয়েকজনের নামোল্লেখ করা হল মাত্র। এর দ্বারা এই আন্দোলনের বিশালতা ও ব্যাপকতা সম্পর্কে একটা ধারণা জন্মাবে বলে মনে হয়।

উল্লেখপঞ্জী

১। অরণি, ৬ষ্ঠ বর্ষ, ১০ সংখ্যা, ১৫ নভেম্বর, ১৯৪৬

২। অরুণ মিত্র : উৎসের দিকে, বাক্‌সাহিত্য, কলকাতা, পরিবর্ধিত সংস্করণ, ১৩৬৪ বঙ্গাব্দ, পৃঃ ৭৭

৩। তদেব, পৃঃ ৮০

৪। অরণি, সোভিয়েট সংখ্যা, ১ম বর্ষ, ৪৪সংখ্যা, ২৬ জুন, ১৯৪২

৫। পরিচয়, চতুর্দশ বর্ষ, ৭ সংখ্যা, মাঘ, ১৩৫১

৬। অরুণ মিত্রের শ্রেষ্ঠ কবিতা, ভারবি, কলকাতা, ১৯৭২, পৃঃ ২৫-২৬

৭। Mukherjee, Hiren, Edited : US (A People's Symposium), Anti-Fascist Writers' and Artist's Association, Calcutta, 1943, p. 55

৮। অরণি, ২য় বর্ষ, শারদীয়া সংখ্যা, ৭ অক্টোবর, ১৯৪২

৯। সুরেন্দ্রনাথ গোস্বামী ও হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, সম্পাদিত : 'জীবন-দক্ষিণা' (অরুণ কুমার মিত্রের কবিতা), প্রগতি, প্রগতি লেখক সংঘ, কলকাতা, ১৩৪৪ বঙ্গাব্দ, পৃঃ ১১৬-১১৭

১০। পরিচয়, সপ্তদশ বর্ষ, ১ম খণ্ড, ১ম সংখ্যা, শ্রাবণ, ১৩৫৪

১১। অরুণ মিত্র: উৎসের দিকে, বাক্‌সাহিত্য, কলকাতা, পরিবর্ধিত সংস্করণ, ১৩৬৪বঙ্গাব্দ, পৃঃ ৬৬

১২। তদেব, পৃঃ ৭১

১৩। 'পুস্তক-পরিচয়', পরিচয়, বিংশ বর্ষ, ৭ সংখ্যা, মাঘ, ১৩৫৭, পৃঃ ৭২

১৪। অরণি, ৩য় বর্ষ, শারদীয়া সংখ্যা, ১৯৪৩, পৃঃ

১৫। ,, ২য় বর্ষ, ৫ সংখ্যা, ১৮ সেপ্টেম্বর, ১৯৪২

১৬। ,, ,, শারদীয়া সংখ্যা, ৭ অক্টোবর, ১৯৪২

১৭। পরিচয়, চতুর্দশ বর্ষ, ৬ সংখ্যা, পৌষ, ১৩৫১

১৮। 'একটি সনেট', পরিচয়, পঞ্চদশ বর্ষ, ২য় খণ্ড, ১ সংখ্যা, মাঘ, ১৩৫২

১৯। সুকান্ত ভট্টাচার্য, সম্পাদিত : আকাল, সারস্বত লাইব্রেরী, কলকাতা, ১৩৭০ বঙ্গাব্দ, পৃঃ ১৪-১৫

২০। পরিচয়, পঞ্চদশ বর্ষ, ১ম খণ্ড, ২ সংখ্যা, ভাদ্র, ১৩৫২

২১। পরিচয়, ,, ২য় খণ্ড, ৪সংখ্যা, বৈশাখ, ১৩৫৩

২২। ,, বিংশ বর্ষ, ১ম খণ্ড, শারদীয়, ৩ সংখ্যা, আশ্বিন, ১৩৫৭

২৩। ,, পঞ্চদশ বর্ষ, শারদীয়, কার্তিক, ১৩৫২

২৪। ,, ষোড়শ বর্ষ, ১ম খণ্ড, শারদীয়, ১৩৫৩

২৫। ,, সপ্তদশ বর্ষ, ১ম খণ্ড, শারদীয়, আশ্বিন, ১৩৫৪

২৬। ,, ,, ২য় খণ্ড, ৩ সংখ্যা, চৈত্র, ১৩৫৭

২৭। 'পুস্তক-পরিচয়', অরণি, ৩য় বর্ষ, ১২ সংখ্যা, ২৬ নভেম্বর, ১৯৪৩, পৃঃ ১৯১

২৮। কিরণশঙ্কর সেনগুপ্ত : দিনযাপন, কবিতা পরিষদ, কলকাতা, ১৩৬ ১৩৬৯ বঙ্গাব্দ, পৃঃ ১৬

২৯। তদেব, পৃঃ ১২-১৫

৩০। অরণি, ২য় বর্ষ, ৬ সংখ্যা, ২৫ সেপ্টেম্বর, ১৯৪২

৩১। পরিচয়, দ্বাদশ বর্ষ, ১ম খণ্ড, ১ সংখ্যা, শ্রাবণ, ১৩৪৯

৩২। পরিচয়, ,, ,, ৩সংখ্যা, আশ্বিন, ,,

৩৩। ,, ,, ২য় খণ্ড, ৪সংখ্যা, বৈশাখ, ১৩৫০

৩৪। ,, পঞ্চদশ বর্ষ, ,, ২য় সংখ্যা, ফাল্গুন, ১৩৫২

৩৫। ,, ষোড়শ বর্ষ, ,, ,, ,, ১৩৫৩

৩৬। ,, সপ্তদশ বর্ষ, ১ম খণ্ড, শারদীয়, আশ্বিন, ১৩৫৪

৩৭। মণীন্দ্র রায় : 'পরিশিষ্ট', কাব্যসংগ্রহ:১, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, ১৯৭৭, পৃঃ ১৯৮

৩৮। তদেব, পৃঃ ১৯৯

৩৯। তদেব, পৃঃ ২০১

৪০। মণীন্দ্র রায়ের শ্রেষ্ঠ কবিতা, ভারবি, কলকাতা, ১৯৭০, পৃঃ ১১

৪১। 'পুস্তক-পরিচয়', পরিচয়, দ্বাদশ বর্ষ, ১ম খণ্ড, ৫ সংখ্যা, অগ্রহায়ণ, ১৩৪৯, পৃঃ ৪০২

৪২। মণীন্দ্র রায়ের শ্রেষ্ঠ কবিতা, ভারবি, কলকাতা, ১৯৭০, পৃঃ ১৪-১৬

৪৩। তদেব, পৃঃ ১৭

৪৪। পরিচয়, দ্বাদশ বর্ষ, ১ম খণ্ড, ১ সংখ্যা, শ্রাবণ, ১৩৪৯

৪৫। ,, ,, ,, ৪ সংখ্যা, কার্তিক, ,,

৪৬। 'পুস্তক-পরিচয়', পরিচয়, দ্বাদশ বর্ষ, ১ম খণ্ড, ৪ সংখ্যা, কার্তিক, ১৩৪৯, পৃঃ ৩৩৪

৪৭। সম্ভবত শব্দটি ছাপার ভুল। হওয়া উচিত 'অকর্মিন'। - অরণি, ২য় বর্ষ, শারদীয়া সংখ্যা, ৭ অক্টোবর, ১৯৪২

৪৮। সুকান্ত ভট্টাচার্য, সম্পাদিত : আকাল, সারস্বত লাইব্রেরী, কলকাতা, ১৩৭৩ বঙ্গাব্দ, পৃঃ ২০-২১

৪৯। ধনঞ্জয় দাশ, : মণীন্দ্র রায় : কবি ও কবিব্যক্তিত্ব, সারস্বত লাইব্রেরী, কলকাতা, ১৯৭৯, পৃঃ ৭

৫০। পরিচয়, পঞ্চদশ বর্ষ, ২য় খণ্ড, ১ সংখ্যা, মাঘ, ১৩৫২

৫১। ,, ,, ,, ৩ সংখ্যা, চৈত্র, ,,

৫২। ,, ষোড়শ বর্ষ, ১ম খণ্ড, ২ সংখ্যা, ভাদ্র, ১৩৫৩

৫৩। পরিচয়, সপ্তদশ বর্ষ, ১ম খণ্ড, শারদীয় ,আশ্বিন,১৩৫৩

৫৪। মণীন্দ্র রায়ের শ্রেষ্ঠ কবিতা, ভারবি, কলকাতা, ১৯৭০, পৃঃ ৩৩-৩৪

৫৫। মণীন্দ্র রায় : সেতুবন্ধের গান, দি বুক এম্পোরিয়ম লিমিটেড,কলকাতা, ১৯৪৮, পৃ : ৩৬-৪২

৫৬। পরিচয়, বিংশ বর্ষ, ১ম খণ্ড, শারদীয়,৩ সংখ্যা, আশ্বিন,১৩৫৭

৫৭। 'পরিচয়'-এর বিশ বছর', পরিচয়, সুবর্ণজয়ন্তী পরিপূরক সংখ্যা, নভেম্বর,১৯৮১,কার্তিক,১৩৮৮, পৃ : ২৬

৫৮। মঙ্গলাচরণ চট্টোপাধ্যায় : শ্রেষ্ঠ কবিতা, ভারবি,কলকাতা, ১৯৮৩,পৃঃ ১

৫৯। তদেব, পৃ : ৩

৬০। মঙ্গলাচরণ চট্টোপাধ্যায় : মেঘবৃষ্টিঝড়,কাব্যকোণ,কলকাতা,১৩৫৮ বঙ্গাব্দ,পৃ : ৪

৬১। তদেব, পৃঃ ৬

৬২। তদেব,পৃঃ ১২

৬৩। তদেব,পৃঃ ৩

৬৪। তদেব,পৃঃ ৫

৬৫। তদেব,পৃঃ ১২

৬৬। তদেব,পৃঃ ১৩

৬৭। তদেব,পৃঃ ১৪

৬৮। তদেব, পৃঃ ১৬

৬৯। তদেব,পৃঃ ১৭

৭০। পরিচয়, ষোড়শ বর্ষ, ২য় খণ্ড, ৪ সংখ্যা, বৈশাখ, ১৩৫৪

৭১। ,, সপ্তদশ বর্ষ,১ম খণ্ড, ২ সংখ্যা, ভাদ্র, ,,

৭২। ,, ,, ,, ৪ সংখ্যা,কার্তিক,১৩৫৪

৭৩। 'পাঠক-গোষ্ঠী',পরিচয়, সপ্তদশ বর্ষ,১ম খণ্ড, ৫ সংখ্যা,অগ্রহায়ণ,১৩৫৪

৭৪। 'আলোচনা', ,, ,, ,, ৬ সংখ্যা, পৌষ, ,,

৭৫। মঙ্গলাচরণ চট্টোপাধ্যায় : মেঘবৃষ্টিঝড়,কাব্যকোণ,কলকাতা,১৩৫৮ বঙ্গাব্দ,পৃঃ ৩৬-৩৮

৭৬। তদেব, পৃঃ ৪০-৪৫

৭৭। মঙ্গলাচরণ চট্টোপাধ্যায় : শ্রেষ্ঠ কবিতা,ভারবি,কলকাতা, ১৯৮৩, পৃঃ ৩১-৩৩

৭৮। মঙ্গলাচরণ চট্টোপাধ্যায় : মেঘবৃষ্টিঝড়,কাব্যকোণ, কলকাতা, ১৩৫৮ বঙ্গাব্দ,পৃঃ ৪১

৭৯। 'সংস্কৃতি-সংবাদ',পরিচয়, বিংশ বর্ষ, ৪ সংখ্যা, কার্তিক,১৩৫৭,পৃঃ ৫৮

৮০। অরণি, ১ম বর্ষ, ৪১ সংখ্যা, ৩১ জুলাই,১৯৪২

৮১। .. .. ৪৫ সংখ্যা, ৩জুলাই, ..

৮২। .. ২য় বর্ষ, ৬ সংখ্যা, ২৫সেপ্টেম্বর,১৯৪২

৮৩। .. ৪র্থ বর্ষ, ৩২ সংখ্যা, ১৩ এপ্রিল, ১৯৪৫

৮৪। .. ৬ষ্ঠ বর্ষ, ১০ সংখ্যা, ১৫ নভেম্বর,১৯৪৬

৮৫। .. .. ২০ সংখ্যা, ২৪ জানুয়ারী,১৯৪৭

৮৬। .. .. ১১ সংখ্যা, ২২ নভেম্বর, ১৯৪৬

৮৭। পরিচয়, সপ্তদশ বর্ষ, ১ম খণ্ড, ২ সংখ্যা, ভাদ্র,১৩৫৪

৮৮। .. .. .. ৪ সংখ্যা, কার্তিক, ১৩৫৪

৮৯। অরণি, ৭ম বর্ষ, ১৫ সংখ্যা, ১৯ ডিসেম্বর, ১৯৪৭

৯০। .. .. ২০ সংখ্যা, ২৩ জানুয়ারী,১৯৪৮

৯১। পরিচয়, সপ্তদশ বর্ষ, ২য় খণ্ড, ১ সংখ্যা, মাঘ,১৩৫৪

৯২। .. সুবর্ণজয়ন্তী-সংকলন, মে-জুলাই,১৯৮১, জ্যৈষ্ঠ-শ্রাবণ,১৩৮৮, পৃঃ ১৭৪

৯৩। অরণি, ১ম বর্ষ, ৩০ সংখ্যা, ২০ মার্চ, ১৯৪২

৯৪। .. .. ৩১ সংখ্যা, ২৭ মার্চ, ..

৯৫। .. ২য় বর্ষ, ২ সংখ্যা, ২৮ আগস্ট, ..

৯৬। .. .. শারদীয়া সংখ্যা, ৭ অক্টোবর, ১৯৪২

৯৭। .. .. ১১ সংখ্যা, ১৩ নভেম্বর, ..

৯৮। .. .. ২২ সংখ্যা, ৫ ফেব্রুয়ারী, ১৯৪৩

৯৯। .. .. ২৯ সংখ্যা, ২৬ মার্চ, ..

১০০। .. .. ৩৫ সংখ্যা, ৭ মে, ..

১০১। পরিচয়, ষোড়শ বর্ষ, ১ম খণ্ড, ১ সংখ্যা, শ্রাবণ, ১৩৫০

১০২। অরণি, ৩য় বর্ষ, ১৮ সংখ্যা, ৭ জানুয়ারী, ১৯৪৪

১০৩। পরিচয়, ষোড়শ বর্ষ, ১ম খণ্ড, ৫ সংখ্যা, অগ্রহায়ণ, ১৩৫০

১০৪। অরণি, ২য় বর্ষ, ৩৯ সংখ্যা, ৪ জুন,১৯৪৩

১০৫। .. ৩য় বর্ষ, শারদীয়া সংখ্যা, ..

১০৬। [illegible] সুকান্ত ভট্টাচার্য, সম্পাদিত : আকাল, সারস্বত লাইব্রেরী, কলকাতা, ১৩৭০ বঙ্গাব্দ, পৃঃ ২৫-২৬

১০৭। পরিচয়, দ্বাদশ বর্ষ, ২য় খণ্ড, ৩ সংখ্যা, চৈত্র, ১৩৪৯

১০৮। জ্যোতিরিন্দ্র মৈত্র : মধুবংশীর গলি, ফ্যাসিস্ট-বিরোধী লেখক ও শিল্পী সংঘ, কলকাতা, ১৯৪৪, পৃঃ ৩

১০৯। তদেব, পৃঃ ৯

১১০। তদেব, পৃঃ ১২-১৩

১১১। তদেব, পৃঃ ১৪-১৭

১১২। তদেব, পৃঃ ১৮

১১৩। তদেব, পৃঃ ২০

১১৪। পরিচয়, ষোড়শ বর্ষ, ১ম খণ্ড, ১ সংখ্যা, শ্রাবণ, ১৩৫৩

১১৫। ,, শারদীয়, ১৩৫৩ (আশ্বিন ?)

১১৬। ,, সপ্তদশ বর্ষ, ১ম খণ্ড, শারদীয়, আশ্বিন, ১৩৫৪

১১৭। ,, ,, ২য় খণ্ড, ৩ সংখ্যা, চৈত্র, ১৩৫৪

১১৮। সুরেন্দ্রনাথ গোস্বামী ও হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, সম্পাদিত : প্রগতি, প্রগতি লেখক সংঘ, কলকাতা, ১৩৪৪ বঙ্গাব্দ, পৃঃ ৮৯-৯২

১১৯। পরিচয়, শারদীয়, ১৩৫৩ (আশ্বিন ?)

১২০। ,, ষোড়শ বর্ষ, ২য় খণ্ড, ১ সংখ্যা, মাঘ, ১৩৫৩, পৃঃ ৪৬৪-৬৯

১২১। জনযুদ্ধ, ২য় বর্ষ, ১ সংখ্যা, ২৮ এপ্রিল, ১৯৪৩, পৃঃ ১২

১২২। পরিচয়, পঞ্চদশ বর্ষ, ২য় খণ্ড, ৬ সংখ্যা, আষাঢ়, ১৩৫৩, পৃঃ ৮৫৩-৫৬

১২৩। ,, সপ্তদশ বর্ষ, ,, ৩ সংখ্যা, চৈত্র, ১৩৫৪, পৃঃ ২১৭-১৯

১২৪। ,, বিংশ বর্ষ, ১ম খণ্ড, শারদীয়, ৩ সংখ্যা,, আশ্বিন, ১৩৫৭, পৃঃ ১০২-০৪

১২৫। ,, ,, ,, ৪ সংখ্যা, কার্তিক, ১৩৫৭, পৃঃ ১৯-২০

১২৬। ,, ,, ২য় খণ্ড, ২ সংখ্যা, ফাল্গুন, ১৩৫৭, পৃঃ ৭-৮

১২৭। ,, ষোড়শ বর্ষ, ২য় খণ্ড, ১ সংখ্যা, মাঘ, ১৩৫৩, পৃঃ ৪৭১

১২৮। অনুবাদকের নাম নেই। — পরিচয়, পঞ্চদশ বর্ষ, ১ম খণ্ড, ১ সংখ্যা, শ্রাবণ, ১৩৫২, পৃঃ ১৬-১৭

১২৯। অনুবাদকের নাম নেই। সম্ভবতঃ সুকান্ত আচার্য। পরের সংখ্যায় তা স্বীকৃত। — পরিচয়, পঞ্চদশ বর্ষ, ১ম খণ্ড, ৩ সংখ্যা, আশ্বিন, ১৩৫২, পৃঃ ১৭২

১৩০। পরিচয়, পঞ্চদশ বর্ষ, ২য় খণ্ড, ৩ সংখ্যা, চৈত্র, ১৩৫২, পৃঃ ৫৯৮-৯৯

১৩১। পরিচয়, বিংশ বর্ষ, ১ম খণ্ড, শারদীয়, ৩ সংখ্যা, আশ্বিন, ১৩৫৭, পৃঃ ১০০-০২

১৩২। সুরেন্দ্রনাথ গোস্বামী ও হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, সম্পাদিত : প্রগতি, প্রগতি লেখক সংঘ, কলকাতা, ১৩৪৪ বঙ্গাব্দ, পৃঃ ১০৯-১০

১৩৩। তদেব,

১৩৪। তদেব, পৃঃ ১২১।